রাজা রামমোহন রায়

অর্পণ।

একটি উচ্চ, উদার, ও দেশহিতকর আদর্শ ও সেই
আদর্শ বাস্তব জীবনে সর্ব্বোতোভাবে প্রতিষ্ঠা
করিয়াছেন এরূপ একজন মহাত্মার চরিত্র
এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

দেশের জন্য যিনি যথার্থভাবে চিন্তা ও পরিশ্রম
করেন তিনি যে বিভাগেই থাকুন—চিন্তাশীল
দার্শনিক পণ্ডিত হইতে নিরক্ষর কৃষি-
জীবি পর্য্যন্ত সকলেরই হস্তে এই
গ্রন্থখানি আমি বিশেষ
শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ
করিলাম।

এই গ্রন্থের আদর্শ তাঁহাদের সকলের আদর্শ কিনা এবং
যাঁহার জীবনকার্য্য অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা
হইয়াছে তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের
আপনার লোক কিনা—ইহাই
তাঁহারা চিন্তা করিয়া
দেখিবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

দুই বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে ইহা আমার পক্ষে খুব আশা ও আনন্দের কথা। যে সমস্ত সম্পাদক ও সমালোচকগণ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পাঠ করিয়া সমালোচনা করিয়াছেন আজ আমি তাঁহাদের সকলের নিকটেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলিয়াছি "শশিপদ বাবুর জীবনবৃত্ত সাধারণের নিকট উপস্থিত করার সময় হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না।" এই কথা লিখিত হওয়ার পর পূর্ণ দুই বৎসর কাল কাটিয়া গিয়াছে, এই দুই বৎসর ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি ও দেশের শিক্ষিত সমাজের অনেকের সহিতই ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আজ বেশ মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তাঁহার বিস্তৃততর জীবনবৃত্ত দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করার সময় হইয়াছে, তাঁহার ভাব ও কার্য্য দেশের লোকের অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার জীবনে যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় সমস্যার সুন্দর মীমাংসা হইয়াছে সেই সমস্ত মীমাংসা দেশবাসীগণের অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অনেক সহৃদয় বন্ধু এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে তাঁহাদের সে অনুরোধ আমি এখন রক্ষা করিতে পারিলাম না, সময়াভাবই তাহার কারণ।

অবশ্য বর্ত্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইল। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলিয়াছিলাম যে শশিপদ বাবু একজন স্বভাবসিদ্ধ অতি সুনিপুণ শিক্ষক। তিনি বালক বালিকা-দিগের সহিত সমানভাবে মিশিয়া তাহাদের কোমল হৃদয়ে ভবিষ্য জীবনের উন্নত আদর্শের বীজ কি ভাবে বপন করিয়াছেন তাঁহা আলোচনা করা উচিত। ইহা ছাড়া নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষালোক বিস্তারে তিনি সিদ্ধ হস্ত। দেশে শিক্ষা বিস্তার করা, বালক বালিকা-দিগকে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দেওয়া, বিশেষরূপে শিক্ষা পদ্ধতিকে জাতীয় প্রকৃতির বিশিষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রভৃতি অতীব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন আমাদের জাতীয় সাধনার পুরোদেশে উদিত হইয়াছে। এই সমস্যাসমূহের মীমাংসায় শশিপদ বাবুর জীবন বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে ইহাই আমার বিশ্বাস, এ জন্য বর্ত্তমান সংস্করণে এ বিষয়ে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

শশিপদ বাবুর জীবনের মূলভাব তাঁহার ধর্ম্মজীবন, একথা প্রথম সংস্করণে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশেষভাবে তাঁহার ধর্ম্মজীবন আলোচনা করা হয় নাই। প্রথম সংস্করণে এই একটি বিশেষ ত্রুটি ছিল এবারে সেই ত্রুটি দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আর একটি কথা, পারিবারিক জীবন। আমাদের সমাজে ও চিন্তায় যে আদর্শ সংঘর্ষ চলিয়াছে তাহাতে পারিবারিক জীবনের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া যে কত প্রয়োজন তাঁহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই প্রশ্ন প্রত্যহই জটিল হইতে জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে। পরিবার প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হয় না। হিন্দু সভ্যতার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে পারিবারিকন্দু জীবনই হির বিশিষ্ট সাধন

ক্ষেত্র। আজকাল কেহ কেহ বলেন যে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রাচীন মধুর বন্ধন থাকিবে না। ইহা একটি ভ্রান্তি বলিয়াই মনে হয়। জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান আদর্শ আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতে পাইয়াছি। এই আদর্শে আমাদিগকে গড়িয়া উঠিতে হইবে কিন্তু এই কার্য্যের জন্য যদি আমাদের পারিবারিক জীবনের যাহা সুন্দর ও পবিত্র তাহা আমাদিগকে বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহা হইলে আমরা লাভবান না হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইব। আমাদের প্রাচীন পবিত্র পারিবারিক জীবন এ কালের শিক্ষার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে এজন্য আমাদিগকে পারিবারিক জীবনেরও উন্নতি বিধান করিতে হইবে। জীবনের যাবতীয় মহত্ত্বই পারিবারিক জীবনে অর্জ্জিত হয়—শশিপদ বাবুর জীবন হইতে এই পারিবারিক জীবনসম্বন্ধেও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায়। তিনি একজন আদর্শ গৃহস্থ। এই জন্য বর্ত্তমান সংস্করণে তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

গত দুই বৎসর 'দেবালয়' এর আদর্শ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও চিন্তা করা হইয়াছে—'দেবালয়'এর আদর্শের সহিত প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়ের জীবনের ও সাধনার সম্পর্ক কি তাহাও চিন্তা করিয়াছি এই সমস্ত চিন্তার ফল কিছু কিছু এই গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইবে।

তাহা ছাড়া নব্যবঙ্গের জাতীয় সাধনার ইতিহাসে 'দেবালয়'এর স্থান কোথায় তাহাও ভাল করিয়া আলোচনা করিতে যাইয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের কথা, বিশেষ করিয়া শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের কথাও আলোচনা করা হইয়াছে।

মোট কথা এই সংস্করণে অনেক নূতন কথার অবতারণা ও আলোচনা হইয়াছে। আবার আমি আমার প্রিয় দেশবাসিগণের নিকট আমার চিন্তা লইয়া উপস্থিত হইলাম প্রথমবারে তাঁহাদের নিকট যে অনুগ্রহ ও প্রশ্রয় পাইয়াছি আশা করি এবারেও তাহা হইতে বঞ্চিত হইব না। আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্যা সমূহ সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আমি অতীব বিনীতভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সে সম্বন্ধে সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আলোচনা করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। সকল বিষয়েই মতভেদ স্বাভাবিক, যাঁহাদের সহিত মতভেদ হইবে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থখানি স্থিরভাবে আলোচনা করিবেন, আর তাঁহারা যদ্যপি তাঁহাদের মত আমাকে জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। সত্যের জয়ই আমাদের প্রয়োজন, কোন বিশেষ মতের বা সিদ্ধান্তের নহে।

১৭ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন
কলিকাতা।
১লা মাঘ ১৩১৯।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ দেবশর্ম্মা।

উদ্দেশে।

সোদরপ্রতিম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন বি এ,

কর-কমলে।

আজ তুমি, দূরে—সিন্ধুপারে, বিদ্যার্থীর বেশে, গৌরবময় জীবন্ত সভ্যতার কেন্দ্রভূমিতে বসিয়া নব নব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তোমার প্রতিভাদীপ্ত জীবনের বিপুল পুষ্টি ও সার্থকতা সাধন করিতেছ। তুমি নিকটে থাকিলে এই ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সর্ব্বপ্রথমেই তোমার নিকট ব্যক্ত হইত ইহা নিশ্চিত—এবং তোমার চিন্তার মধ্য দিয়া পুনর্জন্ম লাভ করার পর জনসমাজে বাহির হইত।

বহুদিন হইতে আমাদের কতিপয় বন্ধুবর্গকে আশ্রয় করিয়া নিভৃতে যে একটি চিন্তার ক্রমবিকাশ হইয়া আসিতেছে তাহা তুমি জান—সম্প্রতি আমাদের দেশের একজন মহাপুরুষের জীবনের উজ্জ্বল সাধনাকে আশ্রয় করিয়া আমি আমাদের সেই আলোচিত চিন্তার কোন কোন দিক সাধারণের সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছি। তুমিই প্রথমে এই মহাপুরুষের জীবনের কথা এবং সাধারণ্যে তাঁহার জীবনকে যথার্থভাবে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা, আমার নিকট বর্ণনা কর। সে কথা ভাবিতে, যে আজ মনে কি ভাবের উদয় হইতেছে তাহা বলিতে পারি না—

এই গ্রন্থে যে সমস্ত কথার আলোচনা করিয়াছি—আমার চিত্তে তাহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ভাবিতে গেলে যে সমস্ত সুহৃদের মূর্ত্তি মানসপটে ভাসিয়া উঠে—তুমিই তাহাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম স্থান

অধিকার করিয়াছ। এতদিন আমাদের অন্তর্জীবন একই সাধনার মধ্য দিয়া গড়িয়া আসিয়াছে—ভবিষ্যতে কি তাহার অন্যথা হইবে? অন্যথা হইবে ভাবিতেও বড় কষ্ট হয়। আমার এই চিন্তা তোমার হস্তে দিয়া আমি বড়ই নিশ্চিন্ত হইলাম। অতীতের অভিজ্ঞতা আমাকে আশ্বাসিত করিতেছে যে, আমার এই চিন্তা তোমার হইয়া গেলেই তাহাদের সার্থকতা হইবে।

আমাদের এই জীবনগত যোগসূত্রটা এতই মধুর, যে ইহার একটা স্মৃতি রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। হয় ত এ প্রকারে এত কথা না লিখিলেই ভাল হইত--কিন্তু তোমার, কাছে না থাকাটা, সর্ব্বদা এতই তীব্রভাবে অনুভব করিতে হয় ও তোমার উপর আমরা এতটাই আশা নির্ম্মাণ করিতেছি, যে তোমার নাম না দিলে আমার সব চেষ্টাই যেন অকৃতার্থ হইয়া যাইত। সুতরাং যদি অন্যায় হইয়া থাকে কিছু মনে করিও না। আর কেহ স্নেহের সহিত আমার কথা না শুনুক, তুমি ত শুনিবেই—তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ। ইতি

স্নেহবদ্ধ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ।

ভূমিকা।

এই গ্রন্থখানি প্রচার করিবার প্রয়োজন কি তাহা গ্রন্থের প্রারম্ভেই নির্ণয় করা আবশ্যক। পরস্প। বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা যথার্থ মিলনের ভূমি নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে দেশের সমক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও কিরূপে বন্ধুর ন্যায়, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায়, হৃদয়গত প্রকৃত প্রীতির সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন, তাহা আলোচিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম বলিতে কেবলমাত্র পার্থিব প্রয়োজনের অতীত কোনও পদার্থ যদি আমরা বুঝি তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে ধর্ম্ম মানবীয় সভ্যতার একটি অঙ্গমাত্র। যদিও ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ ও অন্যান্য অঙ্গ সমূহের নিয়ামক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অসংস্কৃত বা অনুন্নত, অনুদার ও অন্ধতাপূর্ণ ধর্ম্ম লইয়া রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক দুর্নীতি প্রভৃতির সংস্কার হয় না, ইহাই বর্ত্তমান সমাজ-বিজ্ঞানের অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত। ভারতবর্ষে সুদূর অতীতকাল হইতে বহু প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের পাশাপাশি স্থান হইয়াছে এবং সময় সময় ভয়াবহ সংঘর্ষও হইয়াছে। যদিও এই সংঘর্ষ এক মহামিলনের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেছে সত্য, তথাপি বিংশশতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানোজ্জ্বল মানব কেবল দানবীয় সংঘর্ষের মধ্য দিয়া মিলনের দিকে অগ্রসর হইবে না। অতীব ধীরভাবে বিচার করিয়া নবযুগের প্রয়োজনীয় কল্যাণকর পন্থাসমূহ অবলম্বন করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মকেই, সমগ্র জগৎব্যাপী মানব-সভ্যতার যে নূতন আদর্শ দেখা দিয়াছে, তাহারই আলোকে সময়োপযোগীভাবে নিজ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের ও সঙ্গে সঙ্গে জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, এই পথেই মিলনের মহাভূমিতে গিয়া উপনীত হইবে। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠপুরুষ রাজর্ষি রামমোহনের—আমি যতদূর বুঝিয়াছি—ইহাই আদর্শ।

কয়েকমাস পূর্ব্বে বঙ্গীয় 'পরাবিদ্যাসমিতি'র (The Theosophical Society) পক্ষ হইতে 'দেবালয়' সমিতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া উপস্থিত হই। 'দেবালয়' সমিতির যাহা উদ্দেশ্য ও আদর্শ বর্ত্তমান-সময়ের অনেক ধর্ম্মসমিতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ ধীরে ধীরে সেইভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে মানবীয় সভ্যতায় ধর্ম্ম-সমিতি বিশেষকে স্বকীয় অস্তিত্বের রক্ষা করিতে হইলে 'দেবালয়' সমিতির আদর্শ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা বর্ত্তমান যুগের উদারভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ইহার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হইবে না।

'দেবালয়' সমিতির সংস্পর্শে আসিয়া এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহাশয়ের জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলী কয়েকখানি পুস্তকের সাহায্যে অবগত হই। এই সমস্ত গ্রন্থের প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত মান্যবর শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় ও ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জেমস্ উইল্‌সন সাহেবের নিকট আমি তজ্জন্য গ্রন্থের প্রারম্ভেই বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই গ্রন্থে সেবাব্রত শশিপদবাবুর জীবনের যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উপকরণ আমি তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত শশিপদবাবুর কর্ম্মময় বিচিত্র জীবনের ঘটনাবলীর অতি অল্পাংশই আমি অবগত হইয়াছি। সুতরাং তাঁহার জীবনবৃত্তের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা আমি করিতে পারি নাই এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার আবশ্যকও নাই।

শশিপদবাবুর জীবনবৃত্ত সাধারণের নিকট উপস্থিত করার সময় হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। রুশদেশীয় মনীষি, সম্প্রতি পরলোকগত টলষ্টয়ের এবং অন্যান্য অনেক মহাত্মার জীবনী তাঁহাদের জীবনকালে বাহির হইয়াছে। ইউরোপে জীবিত ব্যক্তির জীবনচরিত প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হইলেও আমাদের দেশের সাহিত্যের সমালোচনাপদ্ধতি দেখিয়া আমার মনে বিশ্বাস হইয়াছে যে আমাদের দেশে এখনও সে দিন আসে নাই।

ব্যক্তি-বিশেষের সত্তা যে প্রকৃত প্রস্তাবে একটা ভাবময় বস্তু, জাতীয় জীবনের হিসাবে ব্যক্তিত্ব যে কেবলমাত্র কতকগুলি সনাতন সত্যের প্রকাশ ও পরীক্ষামাত্র—এ জ্ঞান আমাদের সাহিত্যে এখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই—এই জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের মহত্ত্ব বর্ণনা করিলেই তাহা দলাদলির সৃষ্টি করিয়া থাকে, ব্যক্তিগত জীবনপরিধির বাহিরে যে একটা বিস্তৃততর ও যথার্থতর জীবন রহিয়াছে—তাহার জীবন্ত উপলব্ধির অভাবই যে ইহার কারণ তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।

এইজন্য এই গ্রন্থখানি সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে আমার সঙ্কুচিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য আমার মনে আদৌ সঙ্কোচবোধ হইতেছে না। আমাদের দেশের ও সমাজের যাহা যথার্থ প্রয়োজন বলিয়া আমি অন্তরের অন্তরে অনুভব করি, বহুদিন হইতে চিন্তা করিয়া আমার ক্ষুদ্র শক্তির সাহায্যে আমি তৎসমুদয়ের যে মীমাংসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি—তাহা দেশের সমক্ষে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা আমি একটা অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি—এই কর্ত্তব্যপালনে নিজের অক্ষমতা বা অপরের ভ্রুকুটির বিষয় চিন্তা করিয়া পশ্চাৎপদ হাওয়াটাকে আমি অগৌরবের কথা বলিয়াই মনে করি।

শশিপদবাবুর জীবনবৃত্তের যে সামান্য বিবরণ পাইলাম, তাহা আলোচনা করিয়া আমার মনে একটা বিশেষরূপ বল ও আশার সঞ্চার হইল। দেশে একটা নব জাগরণের দিন আসিয়াছে, অনেকেই কর্ত্তব্যের পথ প্রাপ্ত হইতেছেন না; যাঁহারা পথ পাইতেছেন তাঁহারাও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না. ভাবিতেছেন আমরা নিঃসম্বল। এই যে দেশের অবস্থা ইহা সত্যই বড় শোচনীয়। উন্নতির পথে পূর্ব্বে যত বিঘ্ন ছিল এখন তাহার অনেক কমিয়াছে—নূতন নূতন অন্তরায়ও যে আসিয়াছে তাহা অস্বীকার করি না—কিন্তু সে সমস্ত সত্ত্বেও যাহার ইচ্ছা আছে—তাহার নিরাশ হইবার কারণ নাই—একথাটা খুব জোর করিয়া আজ দেশের সমক্ষে কীর্ত্তন করা নিতান্ত প্রয়োজন। সেবাব্রত শশিপদবাবুর জীবনের ন্যায় জীবনের সাহায্যে এই কথাটা বলিলে কথাটার যতখানি জোর হইবে—কথাটা যতখানি সাহস, উৎসাহ ও আশা আনয়ন করিবে—ততখানি জোর পাইতে পারি এমন উপকরণ আমার নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে শশিপদবাবুর ন্যায় মহাপুরুষের জীবন-কাব্য কীর্ত্তন করিয়া নিজের নগণ্য জীবনের পবিত্রতা সাধনের ইচ্ছা আমার অন্তরে অতীব বলবতী হইলেও এই গ্রন্থে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক রূপেই তাঁহার জীবন আলোচিত হইয়াছে—মুখ্যরূপে নহে। এ কথাটাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন। ব্যক্তিবিশেষের মহত্ত্ব কীর্ত্তন যে পরমার্থিক-ভাবে সেই ব্যক্তিকে গৌরবান্বিত করা নহে—মানবজাতিরই কল্যাণ ও গৌরবসাধন করা এ কথাটা আমাদের দেশে ও আমাদের দেশের সাময়িক আলোচনা সাহিত্যে এখনও প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই—সেই জন্যই ইহার উল্লেখ প্রয়োজন।

শশিপদবাবুর জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, তিনি আমাদের দেশের সমগ্র সমস্যাকে সমগ্রভাবেই গ্রহণ করিয়া

তাহার মীমাংসায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমাজ যে একটি অখণ্ড জীবনের বিকাশমাত্র (an organic unity) তাহা শশিপদবাবু বহুপূর্ব্ব হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন। আমি বর্ত্তমান দেশের পক্ষে 'দেবালয়' এর আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী অতীব সমীচীন ও সুফলপ্রসূ বলিয়া বিবেচনা করি। তাই 'দেবালয়'এর উদ্যমকে নবযুগের সাধনা এই আখ্যা দিতে সাহস করিয়াছি।

যে ধর্ম্ম পার্থিব প্রয়োজন সমূহকে উপেক্ষা করে বা আপনার অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ বলিয়া বিশেষভাবে গ্রহণ না করে, সে ধর্ম্ম মানবসভ্যতার একটি অঙ্গমাত্র; কোন প্রাচীন সভ্যতা বা নবযুগের কোন উদীয়মান জাতির পক্ষে এ প্রকারের ধর্ম্ম যথেষ্ট নহে। এই প্রকারের ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়া স্বনামধন্য স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন বলিয়াছিলেন "Religion is not the crying need of India."

শশিপদবাবু নিম্নজাতির কল্যাণার্থ যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাদের বর্ত্তমান উত্থান চেষ্টার সহায়তার জন্য আমাদের জাতিকে এখন উপস্থিত অনেকদিন ধরিয়াই সেই পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কি নিম্নজাতির উন্নতি সাধন, কি বিধবা-সমস্যার মীমাংসা, কি স্ত্রী-শিক্ষা যাবতীয় কার্য্যেই তাঁহার অবলম্বিত কার্য্যপ্রণালী বর্ত্তমান সময়ের স্বদেশসেবকগণকে আদর্শরূপে আপনাদের সমক্ষেরাখিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপে 'পুণা-হিন্দু বিধবাশ্রম'এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। শশিপদবাবু যে প্রণালীতে বরাহনগরের স্ব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বিধবাশ্রম পরিচালন করিয়াছিলেন, পুণার আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ আশ্রমের আভ্যন্তরীণ পরিচালনাদি বিষয়ে সেই প্রণালী যথাযথ গ্রহণ করিয়াছেন।

১৮৯১ খৃঃ অব্দে মহামতি র‍্যানাডে পুণা নগরের প্রথম শিল্প সমিতির অধিবেশনে Organisation of Real Credit in India

শর্ষক প্রস্তাব পাঠ করেন। শ্রমজীবিগণের উদ্বৃত্ত সঞ্চিত অর্থের সমবায় ও তাহার সাহায্যে তাহাদের হিতসাধন কল্পে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করাই ইহার উদ্দেশ্য। শশিপদবাবুর 'আনা সেভিংস ব্যাঙ্ক' ইহার বহুপূর্ব্বের. কেবল প্রস্তাব নহে, বাস্তব অনুষ্ঠান। তাহার পর স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির প্রকৃত মীমাংসাও তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন. আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য এমন সব প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক যাহা এখনও বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, এবং যাহার জন্য আমরা এখনও সমবেতভাবে কোনওরূপ উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করি নাই। যেমন বালকবালিকাগণকে প্রকৃত সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা। আমরা বালকবালিকাগণকে পাঠশালায় অথবা ইস্কুলে পাঠাইয়া দিয়া, খুব জোর গৃহশিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত আছি কিন্তু ইহা ছাড়া কি তাহাদের আর কোন শিক্ষার প্রয়োজন নাই? এ প্রশ্ন এখনও বিশেষভাবে উত্থিত হয় নাই শশিপদবাবু কিরূপে বালকবালিকাদিগের সহিত সমানভাবে মিশিয়া তাহাদের কোমল হৃদয়ে ভবিষ্যজীবনের উন্নত আদর্শের বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা আমি গ্রন্থমধ্যে আলোচনা করিতে পারি নাই। পল্লীর বালকবালিকাগণের জন্য রবিবাসরীয় বিদ্যালয়—তাহাতে ধর্ম্মনীতি, একতা প্রভৃতির শিক্ষা হইবে—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'আশা সমিতি' (Band of Hope) সংগঠন প্রভৃতি বহুপূর্ব্ব হইতে তিনি করিয়া আসিতেছেন। এখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বাল্য সমাজ' কিরূপভাবে কার্য্য করিতেছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

বর্ত্তমান সময়ে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে আন্দোলন উপস্থিত। সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইয়াছে,

'ফ্রোএবেল সোসাইটি'ও বেশ কৃতকার্য্যতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। এই আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭২ খৃঃ অব্দে শশিপদ বাবু বালকবালিকাদিগের জন্য সর্ব্বপ্রথম এদেশে কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাহা বিশেষরূপেই জানেন, বর্ত্তমান 'ফ্রোএবেল্ সোসাইটি ও শশিপদবাবুর নিকট অনেক কার্য্যপ্রণালী লাভ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যগুপি কেহ তাঁহার জীবনবৃত্ত রচনা করেন তাহা হইলে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবেন, আশা করা যায়।

উপসংহারে একটিমাত্র কথা বলিতেই হইবে। আমার সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—এই গ্রন্থের, রাজা রামমোহন রায় শীর্ষক প্রবন্ধ রচনায় বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার যে সম্বন্ধ তাহাতে, প্রকাশ্যভাবে সৌজন্য রক্ষার জন্য ইহা স্বীকার না করিলেও চলিত—তথাপি বলা প্রয়োজন! তিনি বহুদিন হইতে রাজর্ষি সম্বন্ধে অনেক উপকরণ সংগ্রহ কবিয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহার সংগৃহীত উপকরণ ও তাঁহার রচিত প্রবন্ধ আমি ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হই। সেই সমস্ত উপকরণ হইতে আমি আরও অনেক কার্য্য করিতে পারিতাম কিন্তু এই গ্রন্থে স্থান ও সময় উভয়েরই অভাব বশতঃ রাজর্ষি সম্বন্ধে যতটা আলোচনা করা প্রয়োজন, ততটাও করিতে পারি নাই। সেজন্য আমি অতীব দুঃখিত। রাজর্ষি সম্বন্ধে আমার বন্ধুর সহায়তায় আমি অচিরেই বিস্তৃততর আলোচনা সাধারণ্যে উপস্থাপিত করিতে পারিব বলিয়া মনে হয়।

আমার চিন্তা আমার দেশের হউক—তাহার ভ্রান্তি লজ্জিত ও ধিক্কৃত হউক—যিনি বিশ্বজনীন পরমসত্য এই গ্রন্থে তাঁহার প্রকাশ

যতটুকু হইয়াছে, ততটুকুই আমার সার্থকতা—তিনিই আমাদের সহায়—জীবন পথের একমাত্র সম্বল হউন—তাঁহার আলোকে আমাদের জ্ঞানগর্ব্ব নিষ্প্রভ ও নিহত হউক—তাঁহার শাশ্বত অমৃত পতাকা জয়যুক্ত হউক—আমরা তাহার নিম্নে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের যথার্থ পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হই।

নবযুগের সাধনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্বজনীন উন্নতি ও ধর্ম্মসাধনায় তাহার স্থান।

আজ, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে, সর্ব্বত্রই মানবের বিজয়পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীন হইতেছে। এখনও কত উন্নতি, কত গৌরব, মানবীয় সাধনার পুরোভাগে বিদ্যমান, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? আজ জড়বিজ্ঞান, দেশগত ব্যবধান খর্ব্বীকৃত করিয়া, পৃথিবীর দূরদুরান্তবাসী মানববৃন্দকে ক্ষিপ্র আদান প্রদান ও ভাব বিনিময়ের মধ্যে আনয়ন করিয়াছে; ফলে, সমস্ত মানবজাতি আজ একই মহাসভার প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন মানবগণ হৃদয়ের দ্বারা, প্রাণের দ্বারা, পরস্পর পরস্পরকে যথার্থভাবে চিনিতে পারিলেই মঙ্গল। বিশ্বমানবের মধ্যে যে যথার্থ ঐক্যের ও নিবিড় প্রেম সম্বন্ধের সূত্র লম্বিত রহিয়াছে, তাহারই উপর মানবের দৃষ্টি পড়িলেই মঙ্গল। এই সূত্রের অনুসন্ধান ও অনুসরণের মধ্যেই এ কালের মানবমাত্রেরই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, সাহিত্যিক ও দার্শনিকের নিপুণ পরিশ্রম, কালগত পার্থক্যকেও পর্য্যন্ত

করিতে উদ্যত। সুদূর অতীতের চিন্তা ও সাধনা, সকল দেশের ও সকল জাতির, এমন কি প্রাথমিক চিন্তার ফলগুলিও স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত হইয়া, কবিহৃদয়ের সুষমা সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির নিকট, প্রত্যহই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর আকার ধারণ পূর্ব্বক বর্ত্তমানের সহিত আপনাদিগের অবিনাশী সম্বন্ধ প্রমাণীকৃত করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন কালের ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবের মধ্যে, বাহ্য পার্থক্য সমূহের অন্তরালে, মানবের প্রকৃতিগত যে সনাতন ঐক্য রহিয়াছে, এই সমস্তের সাহায্যে সেই ঐক্যের স্বরূপও আমরা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

এই উন্নতির স্রোত, এই বিশ্বজনীনতার উপলব্ধি, মানবের অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্য দিয়াও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। এখন কি প্রাচীন ভারতবর্ষ, কি চীন, কি পারস্য কি মিশর, কোন দেশেরই প্রাচীন সাহিত্য উপেক্ষার বিষয় নহে, সকল দেশের সকল ধর্ম্মের সকল তথ্য তুল্যরূপে গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। উপকথা ও কাহিনী সমূহ এতদিন ছোট ছোট বালক বালিকারাই আগ্রহ ও বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করিত, নিষ্কর্ম্মা প্রাচীনারাই তাহা কীর্ত্তন কারতেন, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। যাঁহারা জ্ঞানে ও বিদ্যায় উন্নত, তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এই সমস্ত নিরীহ উপকথার রাজ্যগুলি সশস্ত্রে আক্রমণ করিয়াছে। নিতান্ত অসভ্য ও বন্য জাতির কুসংস্কার সমূহ এবং তাহাদের বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ের হাস্যোদ্দীপক কল্পনা সমূহেরও পরিত্রাণ নাই, বিজ্ঞানমার্জ্জিত-বুদ্ধি সুধীগণ একান্ত আগ্রহ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত এ সমস্তও সংগ্রহ করিতে বসিয়া গিয়াছেন। মানবীয় সাধনার এই এক নূতনতর চেষ্টা।

ভিন্ন ভিন্ন কালে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত

সমূহকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ, আধুনিক উন্নত সাহিত্যের ও দর্শনের, একটা বিশেষ লক্ষণ। মানবীয় সাধনার ইতিহাসে যে এই যুগ-পরিবর্ত্তন, ইহার গোড়ার কথা মানবজাতির একত্বের বা বিশ্বজনীনতার উপলব্ধি। এখনকার উন্নতচিত্ত মানবমাত্রেই অনুভব করিতেছেন, যে, বিশ্বমানব একটি অখণ্ড মৌলিক পদার্থ। আমরা তাহার মধ্যে যে সম্প্রদায় ও ভেদের গণ্ডি স্থাপন করিয়াছি, তাহার সত্ত্বা ব্যবহারিক পারমার্থিক নহে। অর্থাৎ এই সম্প্রদায় ও ভেদের গণ্ডি প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিক ও প্রয়োজন হইলেও পরিণামে অভেদের জন্যই যে এই ভেদ তাহা সকল দেশের সকল সুধীই সকল যুগে উপলব্ধি করিয়াছেন! ভেদ ও সম্প্রদায়, বহুদিন হইতে প্রচলিত আচার নিয়ম বিধি ব্যবস্থা, যাহা তাহাদের উপকারীতা প্রতিপাদন করিয়া স্থায়ীত্ব লাভ করিয়াছে, এ সমস্তকে জোর করিয়া ধ্বংস করা মোটেই সঙ্গত নহে, তবে এই ভেদ যে পরিণামে এক মহামিলনে যাইবার পথ মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই—সকলেই আপন আপন গণ্ডিতে থাকিবেন অথচ পূর্ণাঙ্গ মত সহিষ্ণুতা ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই একালের সকল সিদ্ধান্তের সার কথা। এই অখণ্ড বিশ্বমানবের মধ্য দিয়া, নিখিলরসামৃতসিন্ধু সচ্চিদানন্দ আপনাকে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত করিতেছেন।

নব্যভারতের আদিগুরু রাজর্ষি রামমোহন রায়, যে কেবলমাত্র বঙ্গদেশের বা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, বিশ্বমানবের মৌলক একতা ও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের সুমহান আদর্শ ইউরোপে প্রচার করিয়া, তিনি জগতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। Comparative Religion বা তুলনা-মূলক ধর্ম্মালোচন নামক যে বিজ্ঞান, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার

শ্রেষ্ঠতম গৌরবের বস্তু, যে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ বিশ্বজনীন মহাদর্শের অভিমুখী হইতেছে—রাজর্ষি রামমোহন রায়ই সেই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা।

বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক একত্বের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তদবধি বিপুল সাধনা করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও নির্দ্দেশ করা সঙ্গত, যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মিলন, ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি, এই সাধনাকে সম্ভাবিত করিয়াছে। এই যুগ ইংরাজী ভাষায় The Greater Renaissance নামে খ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই সাধনার মূলে একটি ভ্রান্ত সংস্কার দীর্ঘকাল ধরিয়া নিহিত ছিল। বঙ্গের গৌরবস্থল, অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় রোম নগরে প্রাচ্যসাহিত্যবিৎ পণ্ডিতগণের মহাসভায় (Congrees of Orientalists) "বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম" শীর্ষক স্বকীয় প্রবন্ধে তাহা প্রদর্শন করেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে সেই ভ্রান্তিটুকু এই। মানব জাতির ইতিহাসের মধ্য দিয়া সেই সচ্চিদানন্দ অভিব্যক্ত হইতেছেন ;—কিন্তু সেই অভিব্যক্তি কি ভাবে হইতেছে ? সেই অভিব্যক্তির ক্রমগুলি কি একটি নির্দ্দিষ্ট সরল রেখা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতেছে ? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা তাহাই। তাঁহারা মনে করেন, যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্যজাতিই বিশ্বমানবের প্রতিনিধি, অনন্ত অতীতের সমগ্র সভ্যতা ও সাধনার ফল উত্তরাধিকারী স্বরূপে কেবলমাত্র তাঁহারাই উপভোগ করিতেছেন। জগতের অন্যান্য জাতির সভ্যতা ও ধর্ম্ম, নিম্নের স্তর মাত্র,—পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান

ও সভ্যতায় আসিয়া তাহারা পূর্ণতালাভ করিয়াছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, যখন তাঁহাদের ধর্ম্মের সহিত অপর কোন ধর্ম্মের তুলনা করেন, তখন দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, সেই অপর ধর্ম্ম একটা নীচের স্তরমাত্র, অভিব্যক্তির বা ক্রমবিকাশের একটা অপরিণত অবস্থা মাত্র, পাশ্চাত্য ধর্ম্মের উদ্যোগপর্ব্বের একটা অধ্যায় মাত্র।

শ্রীযুক্ত শীল মহাশয় অন্যান্য বিজ্ঞানের উদাহরণ দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন, যে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত—অভিব্যক্তি একটি নির্দ্দিষ্ট সরলরেখার উপর দিয়া হয় নাই। এখন বিজ্ঞান সমূহের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার আলোকে আলোচনা করিলে অভিব্যক্তি অনেকগুলি সমান্তর সরলরেখা ধরিয়া হইয়াছে, এইরূপ ধারণা করিতে হইবে। অভিব্যক্তির এই যথার্থ ধারণা ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে (Historico-comparative Method) যথাযথ প্রয়োগ না করিলে, আমরা সত্যের সাক্ষাৎ পাইব না।

পূর্ব্বোক্ত মত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণীয়। এখন, এই মতের সহিত যদি মানবের বাস্তব জীবনের ধর্ম্মসাধনার সামঞ্জস্য রাখিতে হয়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে ? যিনি সত্য ধর্ম্মের উপাসক, তাঁহাকে কি করিতে হইবে ? শীল মহাশয় অবশ্য এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই, কিন্তু আমরা সকলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতে পারি।

আমাদিগকে সকল ধর্ম্মেরই আলোচনা করিতে হইবে, বিশ্বমানবের ইতিহাসে যাহা কখন স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার কিছুই উপেক্ষার বিষয় নহে; কারণ বিশ্বমানবের ইতিহাস, সেই বিশ্বনাথের লীলা ব্যতীত

আর কিছুই নহে। এই লীলার মধ্য দিয়াই সেই অনন্ত লীলাময় আমাদিগকে ধরা দিবেন। এখন, সকল ধর্ম্মের অপক্ষপাতে আলোচনা কি প্রকারে হইতে পারে? হিন্দু, হিন্দুত্বের গর্ব্ব লইয়া মুসলমান ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম অবধারণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। কেবলমাত্র ধর্ম্ম সাহিত্যের আলোচনা, তাহা যতই তীক্ষ্ণবুদ্ধির সহিত অনুষ্ঠিত হউক না কেন, ধর্ম্ম জিনিসই তেমন নহে, যে গ্রন্থপাঠ দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব সমগ্রভাবে উপলব্ধ হইবে। ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মের একটা অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশ মাত্র; উপাসকের হৃদয় ও আত্মা, শ্রদ্ধান্বিত ভক্তের অনুভূতি, গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায় না। হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের ভাষা যদ্যপি নীরবে গ্রহণ করিতে পারা যায়, একটি প্রাণের উচ্ছ্বাস ও অনুভূতি যদি নিঃশব্দে অপর হৃদয়ে সংক্রামিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সাধুর সংসর্গে ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। মহামতি কার্লাইল বলেন "In every thing there is an inexhaustible meaning, the eye sees in it what the mind brings means of seeing" অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুরই অনন্তপ্রকার অর্থ আছে, মন এই অনন্তের যতখানি দেখিবার সামর্থ্য লইয়া অগ্রসর হয়, চক্ষু কেবল ততখানিই দেখিতে পায়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে সাধন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।" ইহার গভীর তাৎপর্য্য ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে"।

মুসলমান বা খ্রীষ্টানের ধর্ম্মসাহিত্য, মুসলমান বা খৃষ্টান সাধক কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন—শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বসমূহের সহিত ঐ ঐ ধর্ম্মের সামাজিক পারিবারিক প্রভৃতি সংস্কারপুঞ্জের (Associations) দ্বারা গঠিত চিত্ত ভক্তব্যক্তির হৃদয়ের ও আত্মার সম্বন্ধ কি, ঐ সমস্ত তত্ত্ব

ঐ ঐ ভক্তের চিত্তে কি মহাভাবের উদ্দীপনা আনয়ন করে, তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নিজ নিজ হৃদয় ও আত্মার দ্বারা গ্রহণ করিতে না পারিব, ততক্ষণ কি মহম্মদীয় ধর্ম্ম, কি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, আমরা সমগ্রভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিব না এবং ঐ সমস্ত সাধনার মধ্যে বিশ্বনাথের যে মহালীলা অভিনীত হইয়াছে ও হইতেছে, সে লীলা আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে এবং আমরা সত্যের পূর্ণ আলোকে বঞ্চিত হইব। সুতরাং কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি পাঠ করাই ঐ ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির বিষয়ে পর্য্যাপ্ত নহে। এই কথা পৃথিবীপৃষ্ঠে বিদ্যমান যাবতীয় মহাধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ইহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে বিজ্ঞানের ও সভ্যতার উন্নতিতে আজ বিশ্বের মানবমণ্ডলী এক মহাসভায় সমবেত হইয়াছে ; এমন আদান প্রদান ও ভাব বিনিময়ের সুবিধা, পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে মানবের যে সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, মানবের ইতিহাসে তাহা একেবারে নূতন। আমাদিগকে আধ্যাত্মিক অনুশীলন বিষয়ে এই সৌভাগ্য ও সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। এখন আমাদিগকে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি পারসিক, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল মতের সাধক ও উপাসকগণের নিকট, শ্রদ্ধার সহিত, তাঁহাদের উচ্ছ্বাস ও সমাধির সময়, তাঁহাদের হর্ষ ও পুলকের সময়, তাঁহাদের প্রেম, ভাব ও মহাভাবের সময়, তাঁহাদের ধর্ম্মের মর্ম্ম ও প্রভাব হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্রাণের মধ্যে, তাহার অন্তর্নিহিত রহস্যের মধ্যে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে। আমি মনে করি ইহাই নবযুগের সাধনা।

চিত্তকে উদার ও মহৎ করিতে হইবে, শ্রদ্ধান্বিত ও বিনয়ী হইতে

হইবে, শিক্ষার আলোক যেদিক হইতেই আসুক না কেন, সত্য যে দেশেই আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, হৃদয়ের সমস্ত দ্বার খুলিয়া রাখিতে হইবে, জাতিবর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তাহাকে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। অহঙ্কারের নাম হৃদয়গ্রন্থি, অবিদ্যা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, যে বিদ্যায় অমৃত লাভ হয়, সেই বিদ্যার শাণিত অস্ত্রে এই হৃদয়গ্রন্থি, এই সংকীর্ণতা ও অনুদারতার অন্ধকারময় পরিধি, ছিন্ন ও চূর্ণ করিতে হইবে। প্রাণকে আকাশের মত উদার ও নির্ম্মল করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, সেই অনন্ত লীলাময়ের সুমহান লীলানাটকের এক একটি দৃশ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সমস্তের যেখানে পূর্ণ সমন্বয়, সেই খানেই তিনি। মানবজাতির ইতিহাসে একদিন ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনেক বিরোধ, অনেক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে, একই ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিদ্বেষবিষ উদ্গীরিত হইয়াছে—সে জগতের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। উহা মানবজাতির শৈশবের চপলতা মাত্র। এখন মানবমন, অভিব্যক্তির যে সোপানে দাঁড়াইয়াছে—এখন যে উজ্জ্বল আদর্শ মানবীয় সাধনার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে—তাহার আলোকে এই বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে বালকসুলভ চপলতা ও অজ্ঞানতার ফল বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। সমস্ত কথার সার কথা এই, যে যাহাকে বিশ্বপ্রেম বা পরাভক্তি বলে, তাহারই প্রয়োজন। তাহার সহিত ভগবানে অবিচলিত বিশ্বাস এবং সর্ব্বোপরি, মনে রাখিতে হইবে যে, এই বিশ্ব, দেশ ও কালের দ্বারা খণ্ডিত হইলেও তাহা ব্যবহারিক মাত্র—পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহা অখণ্ড, বিশ্বনাথের লীলানাটক মাত্র। বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বপ্রহেলিকার ইহাই যথার্থ মীমাংসা। এই মীমাংসার আলোকে, জীবন সমস্যার মীমাংসা করিয়া লওয়াই নবযুগের যথার্থ আধ্যাত্মিক সাধনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশ্বধর্ম্ম মহামিলন, সাধারণ ধর্ম্মসভা ও অন্তর্জাতিক সম্মিলনী।

বিশ্বধর্ম্ম মহামলিন বা The world's Parliament of Religions এর কথা সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত চিকাগো নগরে এই মহামিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। পৃথিবীর যাবতীয় মহাধর্ম্ম, এই সভায় নিজনিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে নবযুগের অধ্যাত্মসাধনার যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছি, এই মহামিলনে ঠিক সেই পথই অবলম্বিত হইতেছে। কোনও সংবাদপত্রে * পড়িয়াছিলাম—

"The world's Parliament of Religions is the highest triumph of religious liberality—the grandest visible embodiment of that spirit of good will towards men and of toleration of other faiths, which has been slowly and steadily advancing among individuals and communities." অর্থাৎ এই বিশ্বধর্ম্ম মহামিলন ধর্ম্মগত উদারতার শ্রেষ্ঠতম বিজয়ের নিদর্শন ; নিখিল মানবের প্রতি শুভইচ্ছা ও অপর ধর্ম্ম সমূহের প্রতি মতসহিষ্ণুতা, যাহা ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সহিত ব্যক্তি সমূহ ও জাতিসমূহের জীবনে প্রসারলাভ করিতেছে, এই মহামিলন সেই সাধুভাবের উজ্জ্বলতম মূর্ত্তি।

আধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধর্ম্মবুদ্ধির অভিব্যক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বধর্ম্ম মহামিলন সম্বন্ধে বলেন—

---

* Indian Mirror. 8th. Nov. 1893.

—The Ideal of Humanity is not completely unfolded in any, for each race potentially contains the fulness of the ideal, but actually renders a few phases only, some expressing lower or fewer, others higher or more numerous ones. To trace the outlines of this Universal Ideal, we must collate and compare the fragmentary imperfect reflections, not *at all* in eclectic fashion, but as we seek to discover a real species or genus among individual variations and modes;—a Congress like this fulfills a glorious mission in helping to realise the vision of Universal Humanity, a vision no less wondrous than the manifestation of the Universe-body of the Lord in the Gita to Arjun's wondering gaze. অর্থাৎ বিশ্বমানবের যাহা আদর্শ তাহা যে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট জাতিবিশেষে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু প্রত্যেক জাতিতেই এই আদর্শের পূর্ণভাব অব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং প্রত্যেক জাতিতেই তাঁহার কতকগুলি করিয়া বিভাব ব্যক্ত হইয়াছে; তবে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য এই, যে কাহারও ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিতে অধিকতর সংখ্যক ও মহত্তর বিভাব ব্যক্ত হইয়াছে, কোন জাতিতে বা অল্পসংখ্যক ও নিম্নতর বিভাব ব্যক্ত হইতেছে। আমাদিগকে যদি ইতিহাসের মধ্য দিয়া এই বিশ্বমানবীয় মহাদর্শের এক চিত্র গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জীবনে প্রতিবিম্বিত, তাঁহার আংশিক ও অপূর্ণ ছায়াগুলি লইয়া তুলনা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাসে যে ছায়া বিম্বিত হইয়াছে, তাহার

কিছু কিছু বাদ দিয়া, নিজের সুবিধামত বাছিয়া কিছু কিছু লইলে চলিবে না; প্রত্যেক জাতির সমগ্রতাটুকু লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, যে প্রত্যেক ধর্ম্মের একটা মৌলিক স্বতন্ত্রতা আছে। সমস্তগুলিকে মিলাইয়া মিশাইয়া একটা কাল্পনিক চিত্র গড়িলে চলিবে না। এই বিশ্বধর্ম্ম মহামিলনের ন্যায় মহামিলন এক বিশেষরূপে গৌরবযুক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, কারণ ইহা এই প্রকারের বিশ্বমানবের মহাদর্শের প্রকৃত চিত্র পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই যে চিত্র, ইহা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্র অর্জ্জুনের সমক্ষে প্রকাশিত ভগবানের বিশ্বরূপ প্রদর্শন অপেক্ষা কম বিস্ময়কর নহে।

বিশ্বজনীন মহাধর্ম্মের বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শের কথা বলা হইল, গণিতশাস্ত্রের ভাষায় তাহা এই প্রকারে বলা যাইতে পারে। জগতে যত ধর্ম্ম আছে তাহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণণীয়ক (H. C. F. বা G. C. M.) সমন্বয়ের ভূমি নহে পরন্তু লঘিষ্ঠ সাধারণ গুনিতক (L. C. M.)ই এই সমন্বয়। অর্থাৎ অভেদের মধ্যে ভেদ চিরদিন থাকিবে ইহাই সনাতন ব্যবস্থা। ভেদ ভাঙ্গিয়া অভেদ হইবে না, ভেদগুলিকে রাখিয়াই অভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

প্রাগুক্ত অংশ হইতে বিশ্বধর্ম্ম মহামিলনের কার্য্য, ও আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা বলিয়াছি, তাহার অনেক অংশই বেশ বিশদ হইবে। বিশ্বধর্ম্ম-মহামিলন সম্বন্ধে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি মানবের বাস্তবজীবনের প্রয়োজনের দিক হইতে একটা অনুযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে। এই মহামিলন সম্বৎসর পরে কেবলমাত্র কয়েক দিনের জন্য হইয়া থাকে, তথায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন বটে, কিন্তু একটি বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এই প্রকারের

মহামিলন বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে বটে, কিন্তু মানবের হৃদয় ও আত্মার প্রয়োজন অনেক বেশী, আমরা সে প্রয়োজনের আভাষ পূর্ব্বেই দিয়াছি।

অবশ্য, এই অনুযোগের উত্তর দেওয়া অতি সহজ। এই মহামিলন একটি আদর্শ মাত্র, যাঁহারা এই আদর্শের সারবত্তা বুঝিয়াছেন, যাঁহারা এই আদর্শের মহত্ত্ব দর্শনে মুগ্ধ ও বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহাকে বাস্তবে আনিবার জন্ত চেষ্টা করিতে পারেন। আসল কথা এই যে, যতদিন এই আদর্শের অনুকরণে দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, এমন কি প্রত্যেক লোকালয়ে, এই প্রকার অধিবেশন বৎসরে কেবল কয়েক দিন মাত্র নহে, প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে না হয়, ততদিন মানবের এই নব-উদ্দীপিত আধ্যাত্মিক পিপাসার নিবৃত্তি ও সদ্ব্যবহার হইবে না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে রাজর্ষি রামমোহন রায়, তুলনামূলক ধর্ম্মালোচনা-বিজ্ঞানের (Comparative Religion) প্রতিষ্ঠাতা রূপে কেবল বঙ্গের বা ভারতবর্ষের নহে, জগতের ইতিহাসে একজন যুগ-প্রবর্ত্তকের আসন লাভ করিয়াছেন। তাহারপর সাধনার এই যে দ্বিতীয় সোপান, যাহার বিকাশ বিশ্বধর্ম্মমহামিলনে পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহারও প্রবর্ত্তনা একজন বঙ্গবাসীকর্ত্তৃক,. বিশ্বধর্ম্মমহামিলনের প্রথম অধিবেশনের ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, সাধিত হইয়াছে। ইহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে—আমি জগতের সাধনার ইতিহাসে এই মহা-পুরুষকে আর একজন যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিবেচনা করি। এই যুগপ্রবর্ত্তনা, কেবল বঙ্গের বা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে নহে, জগতের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে।

ইনি সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকাগো নগরে বিশ্ব-ধর্ম্মমহামিলনের প্রথম অধিবেশনের ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৩পূ

খৃঃঅব্দে তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "বরাহনগর সাধারণ ধর্ম্মসভা"ই সেই অনুষ্ঠান। বর্ত্তমান সময়ে দেবালয় নামক যে সমিতি কলিকাতা মহানগরীতে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ কার্য্য করিতেছে, সেই সমিতি এই সাধারণ ধর্ম্মসভারই পরিণতি। এই দেবালয়, সেই সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত। আমরা এই সাধারণ ধর্ম্মসভা ও দেবালয় সম্বন্ধে বিস্তৃততররূপে যথাস্থানে আলোচনা করিব। এই সাধারণ ধর্ম্মসভার সহিত বিশ্বধর্ম্ম মহামিলনের সম্বন্ধ বিষয়ে, মহামিলনের প্রথম অধিবেশন কালে, দুইখানি প্রখ্যাত সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ "ইণ্ডিয়ান মিরর" ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের চিকাগো নগরের বিশ্বধর্ম্ম মহামিলনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এই প্রকারের এক সমিতি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বরাহনগরে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার নাম সাধারণ ধর্ম্মসভা। এই সভা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান্ মিররে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

"এইস্থান খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান ও ব্রাহ্মদিগের সাধারণ মিলনভূমি ছিল। এই স্থানে মিলিত হইয়া তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতেন, কেহ কোন ধর্ম্মকে কোনরূপ আক্রমণ করিতেন না। সার্ব্বজনীন সত্য সমূহ এই স্থানে প্রচারিত হইত। এই প্রকারে মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব বাস্তবিকতার দ্বারা উদাহৃত হওয়ায়, মানবের মধ্যে যে পরম্পরাগত আধ্যাত্মিক যোগসূত্র রহিয়াছে, তাহা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিত। এই কার্য্যটি যে সে সময়ে কীদৃশ দুরূহ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়, উন্নত ধর্ম্মসাধনার নেতৃবৃন্দও তৎকালে এই অভিনব আন্দোলনের মর্ম্মাবধারণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এই সভার ভিন্ন ভিন

শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের এক সভা হয়। এই সভায় রেভারেণ্ড ডাক্তার জার্ডিন্ এই সাধারণ ধর্ম্মসভার কার্য্যপ্রণালী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশ হিন্দুমুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দ্বারা বিচ্ছিন্ন—সুতরাং এ সময়ে এ প্রকারের একটা আন্দোলন দেশের হিতকামী প্রত্যেক বন্ধুর সহায়তা ও সানুভূতির বিশেষরূপ উপযুক্ততা লাভ করিয়াছিল ইহা চিন্তা করিতেও আনন্দ আছে।"

The Purity Servant নামক পত্রে এই সময়ে এই বিষয়ে কয়েকটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হয়, আমরা সেই সমস্তের মধ্য হইতে এক অংশের অনুবাদ প্রদান করিতেছি—

"শশিপদবাবুর জীবনবৃত্ত বিশেষভাবে আলোচনা করিবার জিনিষ; তাঁহার জীবনের কিঞ্চিৎ বিবরণ একসময়ে মান্দ্রাজের 'প্রোগ্রেস্' পত্রে বাহির হইয়াছিল। আমরা এই সংখ্যায় কেবলমাত্র 'সাধারণ ধর্ম্মসভা' ও বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউটে তাহার উত্তরকালীন পরিণতি, সাধারণের অবগতির জন্য বর্ণনা করিতেছি। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্কের 'লিবারল্ খ্রীষ্টান্' নামক পত্র এই সাধারণ ধর্ম্মসভাকে সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মিলনসাধনোদ্দেশ্যে স্থাপিত বলিয়া বর্ণনা করেন। এই সভায় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা ছিল। এই বক্তৃতায় হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান স্বাধীনভাবে, নিজ নিজ ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা করেন; কেহই অপর কোন ধর্ম্মের নিন্দা করেন না। ইহা ছাড়া, প্রত্যেক বুধবারেএকটি প্রার্থনা-সভা হইয়া থাকে; এই সভায় একমাত্র সত্য ও প্রত্যক্ষ পিতাস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা হয়। উপাসনার উপদেশ বড়ই উদারতা-ব্যঞ্জক; সমবেত জনমণ্ডলীর বাস্তব-

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৭১ খৃঃ)

জীবনব্যাপারে যাহাতে উপকার হয়. সেইভাবে এই উপদেশ দেওয়া হয়। মাসিক সভাসমূহে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকই বক্তৃতাদানের অধিকারী।

এত দীর্ঘকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, একটি ধর্ম্মসভার ব্যাপকতা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইহাই সমসাময়িক সংবাদপত্রের অভিমত।

যে ধারণা হইতে এই সভার উদ্ভব হয়, তাহা যেমন উদার, তেমনি মৌলিক; আমেরিকার বিশ্বধর্ম্ম মহামিলনে যে ভাবের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং যে ভাব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তৎপূর্ব্বে আরও দুএকটি অনুষ্ঠান হইয়াছিল, এই সাধারণ ধর্ম্মসভা তৎসমূহের মধ্যে আদি। তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহে, এই ধর্ম্মসভার কার্য্যাবলীর যে বর্ণনা বাহির হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে একটি অধিবেশনের বিবরণী বিশেষভাবে আলোচ্য। বাঙ্গালা ১২৮১ সনের ৮ই আষাঢ় তারিখে সাধারণ ধর্ম্মসভার যে সাধারণ অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে ন্যূনকল্পে ৪০ জন মুসলমান ও অনেক ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দকর ব্যাপার এই, যে, আনুষ্ঠানিক হিন্দুসম্প্রদায়ের অনেক অধ্যাপক ও পুরোহিত সভায় আসিয়াছিলেন। একজন মুসলমান বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে উর্দ্দু ভাষায় রচিত একটি সঙ্গীত গান করা হয়। তৎকালীন বিবরণীতে দৃষ্ট হয় যে, এই অধিবেশন অতুলনীয় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিল; আনুষ্ঠানিক হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরোহিত ও অধ্যাপকগণও সভার কার্য্যাবলী সন্দর্শনে বিশেষরূপে প্রীতি প্রকাশ করেন। বাস্তবিকই, সকল ধর্ম্মমতের একটা সাধারণ ভিত্তি রহিয়াছে যদ্দ্বারা সমস্ত পৃথিবী আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ। এ প্রকারের একটা সভার বিবরণ পাঠ করিলে বড়ই দুঃখের সহিত এই কথাই মনে হয় যে, যেদেশে দুইটি প্রধান

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এত পার্থক্য বিদ্যমান, সেদেশে এই মিলন ও উন্নতির যুগে এই প্রকারের আন্দোলন বেশ বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না কেন? এই উদার ধর্ম্মসভার অধিবেশন প্রথমতঃ শশিপদবাবুর গৃহেই হইত। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যেরূপ উদার ও ব্যাপক, তাহাতে ইহা অধিকদিন সঙ্গত ও সুবিধাজনক হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, উদার মিলনের ভূমি আশ্রয় করিয়া, একত্রে সমবেত হইতে পারে, এপ্রকারের একটা সাধারণ স্থানের অভাব বড়ই তীব্রভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। ফলে, শীঘ্রই এই অভাব দূর করিবার জন্য বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট ভবন নির্ম্মিত হইল। এই গৃহ যেন ধর্ম্মসভার আদর্শের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। এই ধর্ম্মসভা কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বা কোনওরূপ বিশেষ ধর্ম্মমত প্রচার করিবার স্থান নহে। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার জন্‌ ফ্রিয়ার, এই গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই সত্য; তিনি বলিয়াছিলেন যে এই ভবন তাঁহার স্বদেশবাসী সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসর্গীকৃত। এই ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনের অর্পণপত্র (trust deed) পাঠ করিলেই আমরা প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ও মনোভাব বুঝিতে পারিব। সাধারণ ধর্ম্মসভা, বরাহনগর শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট ও দেবালয় একই মহৎ অনুষ্ঠানের তিনটি বিকাশ মাত্র। অদূর ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠান যে আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই 'ইন্‌ষ্টিটিউট্' বা ভবনের উদারভাব যে প্রথম হইতেই ছিল, পরবর্ত্তী সময়ে এই ভাব যোজিত হয় নাই, তাহা সহজেই প্রতীত হইবে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে, যে সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা সমসাময়িক

একখানি সংবাদপত্রে * নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছিল। "এই উৎসবের বিশেষ লক্ষণ এই, যে, তথায় সমবেত প্রত্যেক লোক, এমন কি অতি দরিদ্র শ্রমজীবী পর্য্যন্ত এই প্রস্তর স্থাপনায় সাহায্য করিয়াছিল। যেদিক হইতেই দেখা যাউক না কেন, উন্নততম উদারতার ছাপ যেন এই ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানটি সাধারণ ধর্ম্মসভার বেশ উপযুক্ত বাসস্থান। এই ভবনের প্রত্যেক অংশই এই উদার ভাবের দ্যোতক। এই ভবনের সম্মুখের দেওয়ালে যে বাক্য লিখিত আছে, তাহাও এই ভাবের দ্যোতক। তথায় লিখিত আছে, "ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ স্বাগত।"

এই ভবন যে কেবলমাত্র ধর্ম্মচর্চ্চারই স্থান, তাহা নহে। শশিপদবাবুর জীবনের একটি প্রধান গুণ এই, যে তিনি কর্ম্মপ্রধান, তিনি যাহাতেই হস্তক্ষেপ করুন না কেন, বাস্তব কার্য্যকে তিনি প্রাধান্য দিয়া থাকেন। জ্ঞানযুক্ত ধ্যান, ও সংস্কারের কার্য্য, এই উভয়ই তাঁহাতে সমভাবে বিদ্যমান। এই কারণে, এই ভবন কেবলমাত্র ধর্ম্মচর্চ্চার স্থান নহে, ইহা আরও অনেকগুলি লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানক্ষেত্র। বস্তুতঃ শশিপদবাবুর জীবনের মূলনীতিই এই, যে প্রত্যেক শুভকর্ম্মই ধর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ। কোন ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার যাবতীয় উদার ও লোকহিতকর কার্য্যসাধনের জন্য উন্মুক্ত রাখিলে, তাহাতে ধর্ম্মমন্দিরের অবমাননা হয় না, প্রত্যুত তাহাতে তাহার গৌরবই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই কারণে এই ভবন দিবসে স্ত্রীবোর্ডিং বিদ্যালয়ের ও হিন্দু বিধবাশ্রম বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। সন্ধ্যায় শ্রমজীবী বালক ও বৃদ্ধগণের উপদেশের জন্য অধ্যাপনা হইয়া থাকে। এই ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনের সহিত সংশ্লিষ্ট

* Indian daily news.

একটি পাঠাগার আছে, তথায় অনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র গৃহীত হয়। সেবাব্রত শশিপদবাবু সমস্ত জীবন ধরিয়া অনেক মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ করিয়া এক বৃহৎ লাইব্রেরী করিয়াছিলেন তাহা ছাড়া অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ বস্তু একত্রে করিয়া এক মিউজিয়মও করিয়াছিলেন। বরাহনগরের সর্ব্বসাধারণকে তিনি তাঁহার এই লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম দান করিয়াছেন। এই ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনে তাহা আছে। স্থানীয় উন্নতিসাধনের জন্য, ধর্ম্ম ও নীতির প্রসার বৃদ্ধির জন্য, এই ভবনে অন্যান্য সভাও হইয়া থাকে। ধর্ম্ম বলিতে কোনও বিশেষ ধর্ম্ম বুঝাইতেছে না—সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই এই ভবন ব্যবহার করিতে ও এই ভবনে নিজেদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে সমানরূপ অধিকার আছে। একমাত্র সর্ত্ত এই, যে কেহ কোন ধর্ম্মমত বা কোন তত্ত্বের নিন্দাবাদ করিবেন না!

একটি পবিত্র ভবনকে এই ভাবে ব্যবহার করার সঙ্গতিবিষয়ক ধারণা এখনও মানবজাতির সম্ভবতঃ হয় নাই। বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট বহুদিন পূর্ব্ব হইতে যে ভাবের প্রেরণায় কার্য্য করিতেছে, সেই ভাবটিই যাবতীয় উদার সামাজিক ও ধর্ম্মগত আন্দোলনের মূল কথা।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাধারণ ধর্ম্মসভা যে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, মানবসভ্যতা উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হইবে এই আদর্শ ততই গৃহীত হইবে। ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা তাহাকেও এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। এই উক্তির অসংখ্য প্রমাণ প্রত্যহ পাওয়া যাইতেছে। আমরা এ স্থলে দুইটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই হইতে ২৯শে জুলাই পর্য্যন্ত লণ্ডন

মহানগরীতে এক মহাসমিতির অধিবেশন হয়। ইহার নাম Inter-Racial Congress বা Races Congress.—আমরা ইহাকে অন্তর্জাতিক সম্মিলনী বলিতে পারি। এই সম্মিলনীর বিষয় একটু আলোচনা করিলেই আমরা এ যুগের সমস্যাগুলি কি, তাহা বুঝিতে পারিব এবং সাধারণ ধর্ম্মসভা বা দেবালয় এই সমস্যাগুলির আভাস বহুদিন পূর্ব্বে কিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও দৈনন্দিন জীবনে এই সমস্যাগুলির মীমাংসা কি প্রকারে হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব। এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য—"To discuss in the light of science and modern conscience, the general relations subsisting between the peoples of the West and those of the East, between the so-called white and the so-called coloured peoples, with a view to encouraging between them a fuller under-standing, the most friendly feelings, and a heartier co-operation." উদ্দেশ্য অতি মহৎ সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা অন্তর্জগৎ, বহির্জগৎ, সমাজ, ইতিহাস, মানবজাতির আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে মানুষ যাহা বুঝিত না এখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব ছিল এখন তাহা নিতান্ত সুখসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর মানবের ধর্ম্মবুদ্ধিও পরিবর্ত্তিত হইতেছে—এই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। যে মানুষ নিজকে লইয়াই বসিয়া থাকে, যাহাকে কখন অপরের সংস্পর্শে আসিতে হয় না তাহার পক্ষে নিতান্ত স্বার্থপর হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু যাহাকে দশজন বাহিরের লোককে লইয়া এক জায়গায় থাকিতে হয়, তাহাদের

সাহায্য করিতে হয় সে ততটা স্বার্থপর হইতে পারে না। পরের জন্য অল্প অল্প ভাবিতে ভাবিতে ও খাটিতে খাটিতে, সে ক্রমশঃ হয়ত একদিন বুঝিতে পারে যে, স্বার্থপরতাটাই অস্বাভাবিক, পরার্থপরতাই স্বাভাবিক। যেমন ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মবুদ্ধি এই প্রকারের শিক্ষা, সংসর্গ, অভ্যাস, সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়, সেই প্রকার ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যক বিভিন্ন ও বিচিত্র সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে আসার জন্য প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মবুদ্ধির অন্ততঃ পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ লোক তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি, পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। হিন্দুগণ পূর্ব্বে ভাবিতেন ম্লেচ্ছগণ কদাচারী, তাহাদের আহারাদি সম্বন্ধে আচার নাই, তাহারা অতি ঘৃণ্য, অতি নীচ। পূর্ব্বে তাঁহারা দূর হইতে ম্লেচ্ছদিগকে দেখিয়া এইরূপ মনে করিতেন। এখন সহস্র সহস্র বৈদেশিক পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোক হিন্দুর দুয়ারে উপস্থিত তাহারা হিন্দুর প্রতিবাসী হইয়াছে—হিন্দু দেখিতেছেন তাঁহাদের মধ্যেও মহাপুরুষ আছেন, ঋষি আছেন, ভক্ত আছেন, জ্ঞানী আছেন তাঁহাদের পদধূলি পাইলেও আমরা ধন্য হই। সুতরাং পূর্ব্বেকার ধারণাটা বদ্‌লাইতে হইল। এ প্রকার হইয়াই থাকে। একটি সুন্দর গল্প মনে পড়িয়া গেল। একজন লোক খুব ভোর বেলায় এক পাহাড়ের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখিলেন দূরে পাহাড়ের উপর এক বিশালদেহ দৈত্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই ভয় হইল। ভয়ে ভয়ে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, বুঝিলেন দৈত্য খুব বড় নহে—আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে দৈত্য নহে—কুয়াসার অন্ধকারে ও পার্শ্বস্থিত গাছপালাগুলির জন্য তাহাকে ঐরূপ দেখা

যাইতেছিল। সে দৈত্য নহে একজন সাধারণ মানুষ। আর একটু অগ্রসর হইয়া একেবারে কাছে আসিয়া দেখিলেন সে তাহার সহোদর ভাই—কোন কাজের জন্য ভোরবেলায় পাহাড়ে আসিয়াছে। মানুষেরও এই অবস্থা। বার্ব্বেরিয়ান্, জেণ্টাইল, বা ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক কথাগু'ল. যে যুগে মানুষ মানুষকে, একজাতি অপরজাতিকে দূর হইতেই দেখিত, সেই সময়েই সম্ভব ছিল। এখন সে ভাব দূর হইয়া যাইতেছে—ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও সভ্যতাবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন জাতি যখন একত্র সম্মিলিত হইয়াছে, তখন যাঁহারা শ্রেষ্ঠ লোক তাঁহারা পবস্পরের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব অনুভব করিতেছেন। এই জিনিষটাই modern conscience—বা একালের ধর্ম্মবুদ্ধি।

পূর্ব্বে যে অন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনীর কথা বলা হইল, তাহাব উদ্দেশ্য, এই আধুনিক বিজ্ঞান ও একালের ধর্ম্মবুদ্ধি, এই দুইটি জিনিসের সাহায্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় ভূখণ্ডের অধিবাসিগণের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত তাহা অবধারণ করা। ইউরোপ এশিয়াকে বুঝিতে পারে না। আবার এশিয়া ইউরোপকে বুঝিতে পারে না। মানুষ বোঝা বড় কঠিন। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের বলিতে কতকগুলি সংস্কার বা ধারণা আছে, এই সংস্কার বা ধারণার তুলাদণ্ডের সাহায্যে মানুষ অপরকে ওজন করিতে যায়। এই সংস্কার একটা রঙ্গীন চশমার মত, আমরা যখন অপরের বিষয় আলোচনা করি, তখন এই রঙ্গীন চশমার দ্বারা আমাদের মানসচক্ষু আচ্ছাদিত থাকায় আমরা তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি না। সংস্কৃত সাহিত্যে এই অবস্থাকে অন্ধের হস্তিদর্শন বলা হইয়াছে। একবার অনেকগুলি অন্ধ হাতি আসিয়াছে শুনিয়া হাতী

দেখিবার জন্ত দল বাঁধিয়া গিয়াছিল। তাহারা অন্ধ, তাহাদের চোখ নাই, তাহারা হাত বুলাইয়া হাতীকে অনুভব করিয়া আসিল। একজন লেজে হাত বুলাইয়া হাতী বুঝিল, একজন দাঁতে, একজন শুঁড়ে, একজন কাণে হাত বুলাইয়া হাতী কেমন তাহা ঠিক করিয়া লইল। ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের মধ্যে মহা বিবাদ। যে লেজে হাত দিয়াছিল, সে বলিল হাতী সরু একটা চাবুকের মত, যে দাঁতে হাত দিয়াছিল সে বলিল হাতী শক্ত তাহার মাথাটা ছুঁচালো ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রকারে আমরা অন্য জাতি বা অন্য সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করি। এই সংস্কারগত সঙ্কীর্ণতাকে ভাগবতে 'অঘ' বলা হইয়াছে, ইংরাজ দার্শনিক 'বেকন' ইহাদের নাম দিয়াছেন Idols, তিনি ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়া এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনাও করিয়াছেন। এই জন্য ইউরোপ এশিয়াকে বুঝিতে পারে না, আবার এশিয়া ইউরোপকে বুঝিতে পারেনা।

ইউরোপের সমাজ, সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে কতকগুলি সাধারণ সূত্র পাইয়াছি। কোনরূপ চিন্তা না করিয়া আমরা অন্ধভাবে ও নিতান্ত গায়ের জোরে সেই সূত্রগুলির সাহায্যে ভারতের সভ্যতা, সমাজ, রীতি নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া যাই, সেই জন্যই আমরা এশিয়াকে বুঝিতে পারি না—এই প্রকারের একটা চিন্তা আজকাল ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিতদিগের মনে উদিত হইয়াছে। সেই জন্যই তাঁহারা এই অন্তর্জাতিক সম্মিলনীর দ্বারা যাহাতে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা ইহাদের পরস্পর পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠ ও যথার্থ পরিচয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। যথার্থ পরিচয় হইলেই আর বিদ্বেষ ও পার্থক্য থাকিবে না।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মনে এই প্রকারের একটা নূতন ভাবের উদয় হইল কেন তাহাও আলোচনা করা উচিত। এই সম্মিলনী হইতে যে প্রবন্ধ-গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত উইয়ারডেল, ইহার উত্তর দিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন—In less than twenty years we have witnessed the most remarkable awakening of nations long regarded as sunk in such depths of somnolence as to be only interesting to the western world because they presented a wide and prolific field for commerciel rivalries * * * but which otherwise were an almost negligible quantity in international concerns." ইউরোপের জাতিসমূহ প্রাচ্য জগতে আসিয়া বাণিজ্য করিতেছিলেন। প্রাচ্য জাতিসমূহকে তাঁহারা মানুষ বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না, ভোজ্য বস্তুর সহিত ভোক্তার যে সম্বন্ধ তাঁহারা মনে করিতেন প্রাচ্য জাতিসমূহের সহিত ইউরোপীয় জাতিগণের ঠিক সেই সম্বন্ধ। তাঁহারা প্রাচ্য জগতে বাণিজ্য করিয়া, বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন, ভাবিতেছিলেন এই সমস্ত জাতি চিরকালের জন্য নিদ্রানিমগ্ন হইয়াছে—তাহাদের আর কোন কালে জাগ্রত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদের দেশ চিরকালই আমাদের ভোগায়তন হইয়া থাকিবে। হঠাৎ ইউরোপের এ ভ্রান্ত ধারণা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কুড়ি বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে প্রাচ্যজাতির উত্থান হইয়াছে। জাপান ইউরোপের যে কোন পরাক্রমশালী জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, চীনদেশেও একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে।

এই উক্তি হইতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ হঠাৎ প্রাচ্য জাতিগণকে ঈদৃশ সম্মানের চক্ষে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া

পড়িয়াছেন কেন। এইজন্য সম্মিলনীর নিমন্ত্রণ পত্রে লিখিত হইয়াছে—So far as possible special treatment will be accorded to the problem of the contact of Europeans with other developed types of civilisation, such as the Chinese, Japanese, Indian, Turkish and Persian, চীনদেশ জাপান, ভারতবর্ষ, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশের সভ্যতা বেশ উন্নত, ইউরোপ, অন্ততঃ পক্ষে ইউরোপের মনীষিগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই সমস্ত সুসভ্য প্রাচ্য জাতিকে আর উপেক্ষা করা বা বৈষম্যের চক্ষে দর্শন করা সম্ভবপর নহে। এই জন্য সম্মিলনী এই সমস্ত জাতির সহিত ইউরোপীয়গণের সম্বন্ধ বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সম্মিলনীতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিত-গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন বা প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সমস্ত আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ এই গ্রন্থপাঠ করিয়া এ যুগের উন্নততম চিন্তার পরিচয় পাইবেন। সে সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা অসম্ভব। এই সম্মিলনী অবশ্য বৎসর বৎসর হইবে, এইবার ইহার প্রথম অধিবেশন হইয়া গেল-এই অধিবেশনের দ্বারা মানবজাতির অদৃষ্টে কি ফল ফলিল তাহাই ভাবিবার কথা—এ সম্বন্ধে গ্রন্থের সম্পাদক পূর্ব্বাভাসে বলিয়াছেন—"Henceforth it should not be difficult to answer those who allege that their own race towers far above all other races, and that therefore other races must cheerfully submit to being treated or maltreated, as hewers of wood and drawers of water." এখন হইতে আর কোনও জাতি বলিতে পারিবে না যে, আমরা

জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি, অন্যান্য জাতিগণকে আমাদের দাসত্ব করিতে হইবে, তাহারা অন্যান্য জাতির সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে অধিকারী।

একদিক হইতে দেখিতে গেলে মানবসভ্যতার ইতিহাসে ইহাই নবভাব। যুগে যুগে মানবজগতে এই প্রকারের একটি করিয়া ভাব আসিয়া থাকে। ইহাই এ যুগের নবভাব। এই নবভাবের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই যে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে মতভেদ নাই। ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসমিতি ক্রমশঃ এই আদর্শ অতি পরিস্কার ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এমন কি এই ভাব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহারও আভাস পরোক্ষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি মাননীয় মিষ্টার আর, এন্, মাধোলকার মহাশয়ের অভিভাষণের যাহা সার কথা তাহা ও আমাদের 'দেবালয়' এর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহিত একেবারে অভিন্ন। ভারতবাসীগণের পুরোদেশে যে মহান ও উন্নত আদর্শ রহিয়াছে সভাপতি মহাশয় অতি সুন্দর ভাষায় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ও একতা বিধান করিয়া রাজনীতিক হিসাবে জাতীয়জীবন গঠন করা ব্যতীত নব্য-ভারতবর্ষের যে আর এক মহত্তর কার্য্য আছে তাহা সভাপতি মহাশয় সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সে উদ্দেশ্য এই "The reconciliation of jarring creeds, the harmonising of all religions, the unification of all faiths, the spiritualisation of life, in which, in the language of the holy "Bhagabad-gita" every thought, every word, every deed, is to be consecrated to God, is the task assigned to India."

দ্বন্দ্বশীল মত সমূহের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন, সকল ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, সকল বিশ্বাসের সমন্বয়, ও জীবনকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিয়া, পবিত্র ভগবদ্গীতার ভাষায় আমাদের সকল চিন্তা, সকল বাক্য ও সকল কর্ম্ম ভগবচ্চরণে সমর্পণ, ইহাই ভারতবর্ষের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। আশা করি সভাপতি মহাশয়ের এই উক্তির প্রতি দেশের সকলের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবে। আমাদিগের রাজনীতিক আন্দোলনের ভিত্তি যে আধ্যাত্মিক এ কথাও সভাপতি মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অশোক, গৌতম বুদ্ধ, ও মহাবীর যাঁহারা সমগ্র জগতে শান্তি, প্রীতি ও মৈত্রীর বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত পবিত্র পাটলিপুত্র নগরে মহাসমিতির এই অধিবেশন একটি বড় উচ্চ আশার উদ্দীপক একথা ও সভাপতি মহাশয় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যে ভাবের উপর 'দেবালয়'এর প্রতিষ্ঠা আমরা সর্ব্বত্রই সেই ভাবের পরিচয় পাইতেছি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিষ্টার মজহরল্ হক্ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের জাতীয় জীবনের কল্যাণের জন্য সেই ভাবের বিশেষ অনুশীলন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তিনি প্রাচীন পাটলীপুত্র নগরের হিন্দু রাজত্বকালের গৌরব ঠিক হিন্দুর হৃদয় ও চক্ষু লইয়া বর্ণনা করিয়াছেন —হিন্দু যুগের গৌরব যে তাঁহার নিজস্ব ইহা তিনি পূর্ণাঙ্গরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানকে আজ এই মহামিলনের দিনে ঠিক এই ভাবেই ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। অতীত কালে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও সংঘর্ষ, অনেক হিংসা, দ্বেষ ও রক্তপাত হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এ সমস্ত অতীতের কথা। আজ ভগবানের
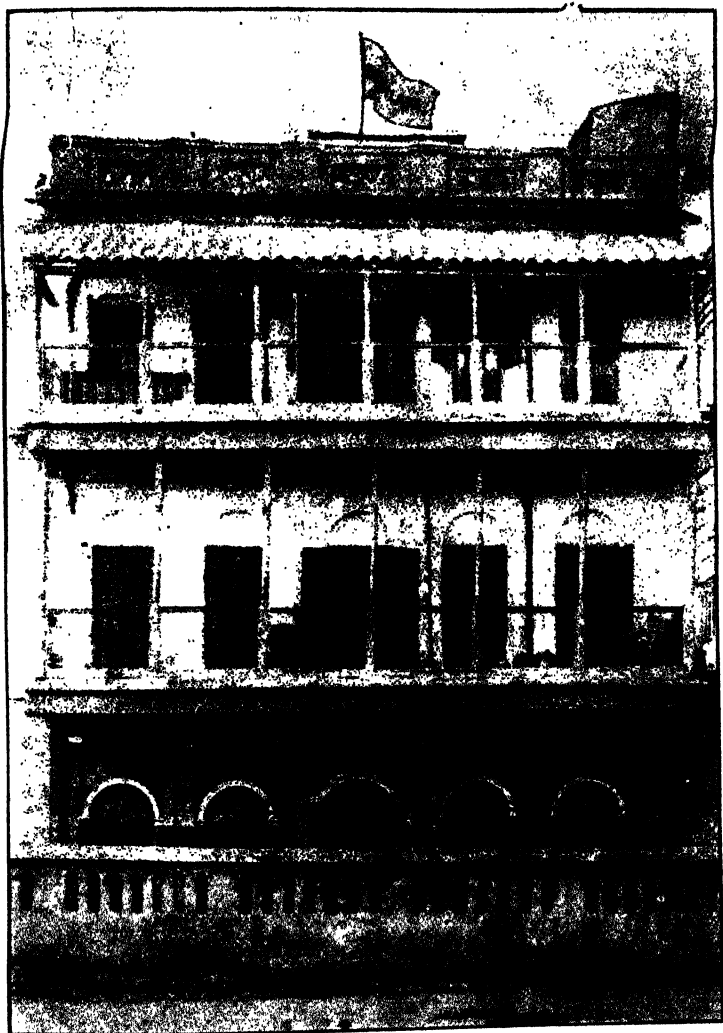
দেবালয়

নামে ও মাতৃভূমির নামে সে সমস্ত ভুলিয়া যাইতে হইবে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, কি পার্সি সকলেই আজ আকবর বা প্রতাপ সিংহ, শিবাজী বা আউরেংজেব সকল মহাত্মার নামেই তুল্যরূপে গৌরব অনুভব করুন। সকলকেই তুল্যরূপে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে আপনার লোক বলিয়া গর্ব্ব করিতে শিখুন। অতীতের মহাত্মাগণের আদর্শ আজ সকলের তুল্যরূপ অধিকারের বস্তু হউক তাহা হইলেই আমাদের হৃদয়গত মিলনের দৃঢ় ভিত্তির উপর ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবালয় ও তৎসংক্রান্ত মতামত।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা মহানগরীতে সাধারণ ধর্ম্মসভা "দেবালয় সমিতি" এই নাম গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সমিতিকে তাহার প্রতিষ্ঠাতা যে সম্পত্তি দান করিয়াছেন তাহার অর্পণ-পত্রে (Trust deed) ইহার উদ্দেশ্যের বর্ণনা নিম্নরূপ পরিদৃষ্ট হয়।

"ধর্ম্মানুশীলন এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশহিতৈষণা ও দান-ধর্ম্ম চর্চ্চা করা দেবালয়-সমিতির উদ্দেশ্য। এই দেবালয়ে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সাধু ও ভক্ত মাত্রেরই বক্তৃতা করার ও উপদেশাদি প্রদান করিবার অধিকার আছে।

দেবালয় সর্ব্ব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মিলন-মন্দির। সকল সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তেরাই "দেবালয়"কে নির্ব্বিরোধে তাঁহাদের নিজের নিজের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন—কোন একটী বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কখনও এই দেবালয়কে, কেবল তাঁহাদের নিজস্ব বলিয়া, মনে করিতে বা অধিকার করিতে পারিবেন না।

এই "দেবালয়"এ পূজা, অর্চ্চনা, বক্তৃতা আলোচনা বা উপদেশাদিতে এবং আলাপ ইত্যাদিতেও কেহ কখনও কোন ধর্ম্ম, ধর্ম্মমত, ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অথবা কোন সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নিন্দা, বিদ্রূপ, ঠাট্টা ও উপহাসাদি এবং কখনও কাহারও প্রতি বিদ্বেষাত্মক বা অবমাননাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। এই দেবালয়ের সভাসমিতিতে কখনও রাজনৈতিক বক্তৃতা ও

আলোচনা হইবে না। দেবালয়ের উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, তাঁহারা সভ্য হইতে পারেন। বার্ষিক চাঁদা ১৲০।"

'দেবালয়'এ রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা হয় না, এই অংশটুকু পাঠ করিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেশে যে রাজনীতিক আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনের সময় এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। এ কথাটি কিন্তু সত্য নহে। 'দেবালয়'এর প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যান্য কার্য্য হইতেই ইহা প্রমানীকৃত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বরাহনগরে তিনি "সামাজিক উন্নতিসাধিনী সভা" (Social Improvement Society) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার নিয়মাবলীর মধ্যেও রাজনীতিক আলোচনা বাদ দেওয়া হইয়াছিল। যেন ইহা হইতে কেহ মনে না করেন যে 'দেবালয়' প্রতিষ্ঠাতা শশিপদবাবু রাজনীতি চর্চ্চার বিরোধী। দেশের সমস্ত শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তির ন্যায় তাঁহারও রাজনীতিক মত আছে। তবে দেবালয় সমিতি মিলন ও প্রেমানুশীলনের স্থান—রাজনীতির ক্ষেত্রে মতভেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বীতা নিত্য ঘটনা—এই জন্যই রাজনীতিক আলোচনা 'দেবালয়'এর ও শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কার্য্যের বাহিরে রাখা হইয়াছে। এতদ্বারা রাজনীতিক আন্দোলনকে উপেক্ষা করা হইয়াছে ইহা যেন কেহ মনে না করেন।

এই ছয় বৎসরের মধ্যে, এই সমিতির প্রতি, দেশের যাবতীয় প্রধান প্রধান লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা স্বদেশানুরাগী, যাঁহারা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে প্রকৃত ধর্ম্মোন্নতি ও নৈতিক উন্নতির ভিত্তি ব্যতীত, আধ্যাত্মিক একতা ব্যতীত, প্রকৃত জাতীয় কল্যাণ অসম্ভব, যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের

বিশ্বসভ্যতার লক্ষণসমূহ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, যাঁহারা বিশ্বমানবের বিস্তৃততর জীবন প্রবাহের মধ্যে ভারতবর্ষকে সজীবও চেষ্টান্বিত করিয়া তুলিতে সমুৎসুক, তাঁহারা সকলে অতীব মনোযোগের সহিত, সুহৃৎ ও পৃষ্ঠপোষকরূপে, এই সমিতির প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; এবং এই সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত সর্ব্বোতোভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া, ইহার জন্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত, এরূপ কর্ম্মবীরের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা একটি অতীব আশা ও আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সহজেই প্রতীত হইবে যে, এই সমিতির প্রতিষ্ঠা, একটি দেশ ও পৃথিবীব্যাপী মহদনুষ্ঠানের সূত্রপাত মাত্র। এক্ষণে, কলিকাতা মহানগরীর বিপুল কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে, যে জীবনাঙ্কুরের ক্ষুদ্র দেহস্বরূপে, এই দেবালয় সমিতি, নিয়মিতভাবে স্বকীয় কর্ত্তব্যব্রত পালন করিয়া, দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতেছে, সেই বৃদ্ধি ও বিকাশশীল জীবনাঙ্কুর, সুদূর ভবিষ্যতের বিশ্বসভ্যতায়, ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া, আপনার পুণ্যময় শীতল ছায়ায়, মানবের দৈব-প্রকৃতির বিজয়ঘোষণা করিবে। দেবালয় সমিতির কথা চিন্তা করিলেই, আমাদের মনে সর্ব্বপ্রথমেই এই কথাটার উদয় হয়। সুতরাং, এই সমিতির কার্য্যের যতই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকুক না কেন, ইহার মূল্য ও উপযোগীতা চিন্তা করিলে, ইহার প্রতি আমাদের যতটা আগ্রহ ও অনুরাগ হওয়া উচিত, এখনও ততটা হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। অক্সফোর্ড ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার কার্পেণ্টার একখানি পত্রে, এই দেবালয় সম্বন্ধে শশীপদবাবুকে লিখিয়াছেন "You are actually creating a religious fellowship broader than any

creed.” অর্থাৎ আপনি ধর্ম্মগত যে আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহা প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমত অপেক্ষা অধিকতর উদার। দার্শনিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ প্রথিতনামা ডাক্তার কার্পেন্টারের এই উক্তি, সকলেরই বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

এই সমিতির মর্ম্ম, বেশ পরিষ্কারভাবে, আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণের নিকট, উপস্থাপিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি, সেই অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের প্রেরণা। এই দেবালয় জিনিসটি কি, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে ইহার স্থান কোথায়, ভারতের জাতীয় জীবনের যাহা পরমপুরুষার্থ, তাহা সম্পাদনে এই সমিতির উপযোগীতা কি, এবং ইহার প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি, সামর্থ্যমত চেষ্টা করিবে,—আশা করি, উপযুক্ততর ব্যক্তির মনোযোগ, এদিকে আকৃষ্ট হইলে, মহত্তর শক্তির নিয়োগে, ভবিষ্যৎ আমাদের ক্ষীণ চেষ্টার সার্থকতা, উজ্জ্বলতর ভাবে দেখিতে পাইবে।

এই সমিতির উদ্দেশ্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে ইহার কার্য্য নিম্নলিখিতভাবে সাধিত হইতেছে—

‘দেবালয়’এর কার্য্যপ্রণালী।

১। হিন্দুধর্ম্ম, দর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা মাসিক ৪ দিন (বিবেকানন্দ সমিতি, বঙ্গীয় থিওজফিক্যাল সোসাইটি, চৈতন্যতত্ত্ব প্রচারিণী প্রভৃতি সভার প্রতিনিধিগণ ও হিন্দুসমাজের অন্যান্য নেতৃবর্গ কর্ত্তৃক এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।)

২। ব্রাহ্মসমাজ

(ক) আদি সমাজ মাসিক ২ দিন

(খ) নববিধান সমাজ মাসিক ১ দিন।

(গ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারকগণ মাসিক ২দিন

(ঘ) এই তিন সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন এইরূপ অন্যান্য একেশ্বরবাদীগণ সুবিধামত কার্য্য করিয়া থাকেন

৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মাসিক ১ দিন

৪। আর্য্য সমাজ মাসিক ১ দিন

৫। খৃষ্টান বন্ধুগণ ঐ

৬। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা ঐ

৭। মুসলমান বন্ধুগণ ঐ

৮। কলিকাতা টেম্‌পারেন্স ফেডারেশন ঐ

৯। দি অর্ডার অব দি সন্স অব টেম্পারান্স ১ দিন

১০। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি, বিষয়ের আলোচনা সুবিধামত হইয়া থাকে।

১১। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূলক সঙ্গীত ১ দিন

১২। বাল্যসমাজ প্রত্যহ রবিবার অপরাহ্ণ কালে হইয়া থাকে।

এই পদ্ধতিতে 'দেবালয়'এর কার্য্য হইতেছে, ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার সমস্ত সভাসমিতিই নিজ নিজ প্রতিনিধি দ্বারা 'দেবালয়'এ কার্য্য করিয়া থাকেন। দেবালয়'এর বাল্যসমাজ একটি বড়ই হিতকর অনুষ্ঠান, এ সম্বন্ধে এ গ্রন্থে স্থানান্তরে বিশেষ আলোচনা করা হইবে। আজ যদি বিনীতভাবে বলা যায় যে আমাদের দেশে যে সমস্ত লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে তাহার সমস্তগুলিতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে এই কয়েকবৎসরের মধ্যে 'দেবালয়'এর অসাম্প্রদায়িক ও উদার প্রেমভাব সঞ্চারিত হইয়াছে, দেবালয় সমিতির কার্য্যতৎপরতার ফলে এই কয় বৎসরের মধ্যে

অন্যান্য সমিতেতেও কার্য্যতৎপরতা বাড়িয়াছে, তাহা হইলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবেনা।

ইহার সদস্য সংখ্যা উপস্থিত এক সহস্রের উপর। এতদ্ব্যতীত এই সমিতির একখানি মাসিকপত্র আছে; এই মাসিকপত্রখানি সুপরিচালিত। দেশের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যকগণ ইহার নিয়মিত লেখক। দেবালয় সমিতির সভ্যগণ ইহা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন। এই পত্রখানি ইতিমধ্যেই সাহিত্যসংসারে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

এই দেবালয় সমিতি, দেশে ও বিদেশে, ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছে। অনেক মনস্বী ব্যক্তিরই মনোযোগ, ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এসম্বন্ধে শত শত উক্তির মধ্যে সামান্য দুএকটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

এই সমিতি সম্বন্ধে মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"আপনি যে নিয়মে "দেবালয়"সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা, আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, অতি সঙ্গত ও সমীচীন। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস সকল ধর্ম্মের মূল, তিনি যখন এক এবং সকলেরই, এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীই যখন, তাঁহারই উদ্দেশে, নিজ নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে, ধর্ম্মকার্য্য করে, তখন ধর্ম্ম লইয়া বিরোধ, বড়ই আক্ষেপের বিষয়। জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা ও অবস্থাভেদে, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য যে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। তজ্জন্য, পরস্পরের বিদ্বেষভাব থাকিবার, কোন প্রয়োজন নাই। পরস্পর বিরোধ ও বিদ্বেষ না করিয়া, লোকে, আপন আপন জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে, নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণ, নিষ্ঠার সহিত করিলেই, তাহা সমাদৃত হইবার যোগ্য, ও সকলেই একমত হইবার আশা করা বৃথা, এই যে উদার সিদ্ধান্তে আপনি উপনীত হইয়াছেন, ইহা যথার্থ জ্ঞানী ও

ধার্ম্মিকের কার্য্য, এবং ইহাই ধর্ম্মবিষয়ক বিরোধ-মীমাংসার একমাত্র উপায়। এই সিদ্ধান্ত যখন 'দেবালয়' এর মূল ভিত্তি, তখন উহা অচিরেই অতি শুভকর হইবে, সম্পূর্ণ আশা করা যায়।"

ব্রহ্মবাদী নামক বিখ্যাত পত্রে এ সম্বন্ধে লিখিত হয় "সমঞ্জসীভূত উন্নতির যুগে, কলিকাতা নগরীতে, দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা, একটি মঙ্গলকর শোভন অনুষ্ঠান। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বিতণ্ডার দিনে, এই প্রকার উদার ও অসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা, কাহারও অস্বীকার করিবার হেতু নাই। ধর্ম্ম-মহামণ্ডলকে বিরাট আকারে যদি সর্ব্বধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য সমর্থন ও সাহায্যদানের উপযুক্ত হয়, তবে এই দেবালয়কে তাহারই অনুরূপ, অধিকন্তু একটী কার্য্যকরী সাধনক্ষেত্র বলিয়া সমর্থন করা প্রয়োজন। দেবালয় কেবল অন্ধ ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিয়া চলিবার পক্ষপাতী নহে। ধর্ম্মানুশীলন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশ-হিতৈষণা ও দানধর্ম্ম চর্চ্চা করা দেবালয়-সমিতির উদ্দেশ্য।"

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন—

"বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবার সময় মাটিকে বিদীর্ণ করিয়া উঠে—পরে যখন সে শাখায় পল্লবে পরিণতি লাভ করে তখন মাটিকে ছায়া দান করিতে থাকে।"

এক সময় ব্রাহ্মসমাজকে বিরোধের ভিতর দিয়া মাথা তুলিতে হইয়াছিল—আজ তাহার সে দিন যে অবসান হইবার উপক্রম করিতেছে, দেবালয়প্রতিষ্ঠাই তাহার প্রমাণ। এই বৃহৎ বনস্পতির উদারছায়াতলে, যাঁহারা মিলনের প্রশস্ত আসন প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই ইহার যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন, এই আমার বিশ্বাস।"

১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Indian Magazine and Review নামক পত্রিকায়, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট

সার চার্লস্ বেলি, এই দেবালয় ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে, যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা সঙ্গত। আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম—

"কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত, দেবালয় সমিতি নামক অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত কতকগুলি আবশ্যকীয় ও মূল্যবান কাগজপত্র, আমার নিকট আসিয়াছে। Indian Magazine and Review পত্রের পাঠকপাঠিকাগণের মনোযোগ, এবিষয়ে আকর্ষণ করিবার জন্য, আমি আহুত হইয়াছি। আমি, বড়ই আনন্দের সহিত এই আহ্বান গ্রহণ করিয়াছি; কারণ, এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বড়ই আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক, এ প্রকারের লোক আমি খুব কমই দেখিয়াছি। আমি তাঁহার প্রতি বহুদিন হইতেই উচ্চতম ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করিতেছি। তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করিয়া, তাঁহার চরিত্রগত একটি বিশেষ সদ্গুণের দ্বারা আমি একেবারে মোহিত হইয়াছি। তাঁহার প্রকৃতিতে একটা অসাধারণ সমন্বয় দেখিয়াছি। একদিকে প্রাচ্যদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের স্বাভাবসিদ্ধ ধ্যানযুক্ত অন্তর্দৃষ্টি, উচ্চ দার্শনিকতা, ও সকলদিকের সকল শিক্ষা গ্রহণের অবাধশক্তি, অপরদিকে পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠগুণ, নৈতিক উৎসাহ ও শৃঙ্খলার সহিত বৃহৎ কার্য্য করিবার দক্ষতা, এই দুই জগতের দুই শ্রেণীর সদ্গুণ, তাঁহার চরিত্রে সুন্দর সমন্বয় লাভ করিয়াছে। তাঁহার স্বদেশবাসীগণের মঙ্গলসাধনের আগ্রহ, তাঁহার হৃদয়ে অগ্নির মত জ্বলিতেছে। তিনি সকল ধর্ম্মের মত উদার ভাবে গ্রহণ করেন—এই ধর্ম্মবিষয়ক উদারতা ও মত-সহিষ্ণুতা, অগভীর আলোচনার ফল নহে, ইহা তাঁহার ব্যাপক ও সর্ব্বতোমুখী সাধনার ফল।

তাঁহার জীবনবৃত্তের অনেক কথাও অতীব বিচিত্র। উপস্থিত আমি দুই একটি মাত্র কথা বলিতে চাই। কলিকাতার অনতি দূরবর্ত্তী বরাহনগরের এক উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার সুবিধা, তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। তাহা হইলেও, তিনি তাঁহার তরুণ বয়স হইতে, আজীবন একাগ্র চিত্তে ও কৃতকার্য্যতার সহিত, লোকহিতকর ও সংস্কারমূলক কার্য্যাবলী সাধন করিতেছেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, বাড়ীর লোকের বিরুদ্ধ ধারণা সত্ত্বেও, তিনি তাঁহার অল্প বয়স্কা স্ত্রীকে শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমশঃ এই শিক্ষা-লোক বিস্তারের কার্য্য অন্যত্র প্রসারিত করিলেন। তাহার পর সুরাপান নিবারণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া, তাঁহার গ্রামের যাবতীয় মাতালের আড্ডাকে, সুরাত্যাগীগণের পাঠাগারে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। অতঃ-পর তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন বটে, কিন্তু চিরকালই আপ-নাকে 'হিন্দু' নামে পরিচিত করিয়া আসিতেছেন। ক্রমশঃ তাঁহার কার্য্য বৃদ্ধি হইল, তাঁহার সহানুভূতিও প্রসার লাভ করিতে লাগিল। তিনি বরাহনগর কলের শ্রমজীবিগণের জন্য, নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে আগমন করেন, তথায় কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের প্রভাব, তাঁহার জীবনে পতিত হয় এবং National Indian Associationএর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটে। বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া, তিনি বরাহনগরে "সাধারণ ধর্ম্মসভা" নামক এক সভা স্থাপন করেন। এই সভা বর্ত্তমান দেবালয়েরই সূত্রপাত। এই সভায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক আধ্যাত্মিক অনুশীলনকল্পে মিলিত হইত। সকলেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রচার করিতে পারিতেন। মতসহিষ্ণুতাই এই সভার একমাত্র সার কথা। এই সভায়,

কেহ, অপর ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতে পারিতেন না। এই সভায় দ্বারা এইটুকু দেখাইতে চেষ্টা করা হইত, যে, ধর্ম্মবিষয়ে মানবে মানবে সৌহার্দ্দের ভাব এতই অধিক, যে, তাহার সাহায্যে, সম্প্রদায়গত ও মতগত পার্থক্যকে, বেশ উপেক্ষা করা যাইতে পারে। আমি যে সমস্ত কাগজ পত্র পাইয়াছি, তাহা পাঠে বুঝিতে পারিতেছি যে, এই চেষ্টা বেশ সফলতা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে, বঙ্গদেশের অনেক ব্যক্তিই, এই অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই বরাহনগরে শশিপদ বাবু আরও দুইটি হিতকর কার্য্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমটির নাম শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট্—ইহা একটি সাধারণ সভাগৃহ; ইহাতে পুস্তকাগার ও বক্তৃতা স্থান আছে। এই গৃহ তিনি বরাহনগরের অধিবাসীগণের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দ্বিতীয়টির নাম বিধবাশ্রম—এপ্রকারের কার্য্যের মধ্যে এইটিই প্রথম। এই কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিকতাপূর্ণ ও সুফলপ্রদ। বিধবাগণ এইস্থানে আসিয়া আশ্রয়লাভ করিতেন ও ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারিতেন।* পক্ষান্তরে এই সমস্ত বিধবাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া, তাঁহারা যাহাতে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য বা অন্য কোনরূপ হিতকর কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা ছিল। এই আশ্রমের কার্য্য অনেকদিন বেশ চলিয়াছিল। পরে শশিপদবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ ও তাঁহার কন্যার মৃত্যুনিবন্ধন এই কার্য্যটি বন্ধ হইয়া গেল; ইহার পরিচালনার জন্য লোক পাওয়া গেল না। যাহাহউক এই প্রকারের কার্য্য একেবারে বন্ধ হয় নাই।

---

* বিধবাশ্রম বিবাহের ব্যবস্থা আদৌ করিতেন না। সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা সহায়তা করা আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। আশ্রম হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর অভিভাবকগণ বিবাহ দিতে পারিতেন। আশ্রমের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক ছিল না। এই আশ্রমের কথা স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার।

অন্তভাবে এই কার্য্য চলিতেছে; এখন স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যের উপযুক্ত করিবার জন্ত বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের জীবিকার জন্ত বৃত্তিদানেরও ব্যবস্থা আছে। National Indian Association এইভাবে এক্ষণে সাধ্যমত এই কার্য্যকে সাহায্য করিতেছেন।

এইবার আমি শশিপদবাবুর শেষ কার্য্য দেবালয়ের কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে, যে সাধারণ ধর্ম্মসভার কথা বলা হইয়াছে, এই "দেবালয়" তাহারই পরিণতিমাত্র—ইহা তদপেক্ষা স্থায়ীতর ভিত্তি ও বিস্তৃততর কার্য্যপদ্ধতি লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ মহাশয়, ইহার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য যে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতরভাবে আমি ইহা বর্ণনা করিতে পারিব না। তত্ত্বভূষণ মহাশয় বলেন—

"দেশ মধ্যে প্রচলিত যাবতীয় মহাধর্ম্মের যে সাধারণ ভিত্তি, সেই ভিত্তির উপর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। ইহা ধর্ম্মচর্চ্চা, সাহিত্য, বিজ্ঞান লোকহিতকর কার্য্য ও দানধর্ম্মাদির স্থান। এই স্থানে অসাম্প্রদায়িকভাবে সপ্তাহে একটি করিয়া উপাসনা হইয়া থাকে—এই উপাসনায় সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোক যোগদান করিতে পারেন। এই দেবালয়ের সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সাময়িক সভার বক্তৃতায়, ভিন্ন ভিন্ন সকল ধর্ম্মেরই মত উদারভাবে প্রকাশ করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একতা ও পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি পূর্ণ আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপনা করা, অথচ কাহাকেও কাহারও মত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না এইরূপ অবস্থা আনয়ন করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই দেবালয়ের একটী চতুষ্পাঠী আছে—তথায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। এক পুস্তকাগার ও পাঠাগার আছে। এই সমিতি, যে

উদারনীতির উপর স্থাপিত সেই উদারনীতি অনুসারে, একখানি মাসিকপত্র পরিচালিত হইয়া থাকে! শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু ২১০-৩-২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থিত স্বকীয় চারিতল বাসবাটী দেবালয়ের সম্পত্তিরূপে আইনঅনুযায়ী গঠিত ট্রাষ্টিদিগের হস্তে রেজিষ্ট্রী করিয়া অর্পণ করিয়াছেন এই দেবালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যের সহিত যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, এইরূপ পরিবারকে উপরতলের গৃহগুলি ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে—এই প্রকারে যে আয় হয় ট্রাষ্টিগণ দেবালয়ের কার্য্য ও অন্যান্য দানাদি কার্য্যে তাহা ব্যয় করিয়া থাকেন। দেবালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য, হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা হইতে গৃহীত হইয়াছে।"* দেবালয় কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলের জন্যই উন্মুক্ত। ঈশ্বরবাদী উদারচিত্ত সকলেই, তিনি যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন, দেবালয়ে বক্তৃতাদি করিতে পারেন। কেবল সর্ত্ত এই যে, কেহ কোনরূপ অপর ধর্ম্মকে নিন্দা বা উপাহাসাদি কোন প্রকারে করিবেন না। দেবালয়ের সভায় রাজনীতি চর্চ্চা একেবারে নিষিদ্ধ।

এক্ষণে, এই সমিতি National Indian Associationএর সহানুভূতি ও সহায়তা প্রার্থনা করিতেছে! ভারতবর্ষে সাধারণভাবে লোকের "সহানুভূতি, প্রার্থনা, সাহায্য, ও অর্থদান" এর জন্য এক নিবেদনপত্র বাহির করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এই দেবলায় সমিতির সম্পাদক, বিলাতের বন্ধুগণকে, এই সমিতির ক্ষুদ্র পুস্তকাগারকে পুস্তকাদি দ্বারা সাহায্য করিতে প্রার্থনা করিতেছেন এবং আরও প্রার্থনা করিতেছেন যেন, এই কার্য্য National Indian Association

* পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ মহাশয় যৎকালে ইহা বলিয়াছিলেন তখন এইরূপই ছিল, কারণ তখন অন্য সম্প্রদায়ের লোক পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে এতদ্ব্যতীত মুসলমান, খ্রীষ্টান, ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। গ্রন্থকার

এর সভ্যগণকে অবগত করান হয়। কার্য্যটি বিশেষ মহৎ, যিনি ইহার প্রতিষ্ঠাতা তিনি আমাদের আন্তরিক প্রশংসা ও সহায়তার উপযুক্ত এবং আমি এই নিবেদনপত্র সমিতির সভ্যগণের নিকট বিশেষ অনুরোধের সহিত উপস্থাপিত করিতেছি।”

পূর্ব্বোক্ত অংশের একটী কথা বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। আমাদের দেশ বড়ই দরিদ্র. অনেক সদনুষ্ঠান আরদ্ধ হইয়া অর্থাভাবে অনেক সময়েই লুপ্ত হইয়া যায়। অবশ্য, শুভ সঙ্কল্পের বীজ কখনও নষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রকারে এক শুভ অনুষ্ঠান নষ্ট হইয়া যাওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়। সংহতভাবে সাধুকার্য্য সাধন করার শক্তি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যতটা জন্মিয়াছে, আমাদের দেশে ততটা এখন হয় নাই। অবশ্য সাধুকার্য্য, যে আমাদের দেশে কম তাহা নহে। তবে আমাদের প্রাচীন প্রণালী পাশ্চাত্য প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে কোন সৎকার্য্য নষ্ট হইলে, কেবল যে সেই কার্য্যটি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে, লোকের মনে একটা নিরাশার ভাব জাগিয়া উঠে। এক সম্প্রদায় লোক আছেন, তাঁহারা কখনই কোন শুভকর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন না, কিন্তু কেহ কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে, অন্যান্য দশটা কার্য্যের উদাহরণ দিয়া, বলিয়া থাকেন, যখন এই সমস্ত কাজই স্থায়ী হইল না, তখন একার্য্য আর করিয়া কি হইবে? ইহাও স্থায়ী হইবে না। আমাদের দেশের এই সমস্ত লোক, যত অধিক উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে দেশের উন্নতির পথে ততই অধিক বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, এই কথাটা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সেবাব্রত শশিপদবাবু অসংখ্য শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, এই কথাটী যেমন বুঝিয়াছেন, এমন বোধহয় খুব কম লোকেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

যাঁরা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রত্যেক শুভকার্য্যেরই বিরুদ্ধে কি ভীষণ শক্তি কার্য্য করে তাহা যাঁহারা কখনও কোন শুভানুষ্ঠান না করিয়াছেন তাঁহারা ধারণাই করিতে পারিবেন না।

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। সেবাব্রত শশিপদবাবুর ভগবদ্বিশ্বাসই যে তাঁহাকে আজীবন এই সেবাব্রতে অবিচলিত রাখিতে পারিয়াছে, তাহাতে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই প্রকার একটা গভীর ভগবদ্বিশ্বাসের উপর তাঁহার জীবনের ভিত্তি, যদ্যপি প্রতিষ্ঠিত না হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে বীরের মত আজীবন দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্যব্রত পালন করা, অনেক সময়েই বোধ হয় তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত। যাঁহারা সেবাব্রত শশিপদবাবুর শক্তির গুপ্তরহস্য জানিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এই কথাটা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

দেবালয় যাহাতে স্থায়ী হয়, অর্থাভাবে দেবালয় যাহাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য শশিপদবাবু কি করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বের উদ্ধৃত অংশে বিবৃত হইয়াছে। তিনি স্বকীয় চৌতল বাসভবন লেখাপড়া করিয়া দান করিয়াছেন। সাধারণ ধর্ম্মসভা প্রসঙ্গে যে বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউটের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার গৃহনির্ম্মাণ ব্যতীত পরিচালনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার হাজার টাকা এককালীন দান করিয়াছেন। ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্য পরিচালনার জন্য ট্রাষ্টি ও কার্য্যকরী সভা গঠন করিয়া দিয়াছেন আবার দেবালয় সমিতির বার্ষিক সভা প্রকাশ্য স্থানে যাহাতে প্রত্যেক বৎসর নিয়মিত ভাবে হইতে পারে সে জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত এই অর্থের সুদে বার্ষিক সভার

সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। শশিপদবাবু দেবালয়কে যাহা দিয়াছেন, তাঁহা যদি কেবল অর্থ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে অবশ্য খুব অধিক নহে, কিন্তু আমরা তাঁহার জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারিব যে তিনি দেবালয়ে তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়াছেন, তাঁহার জীবনের সমগ্র মহাসাধনাই এই দেবালয়ের ভিত্তি। জীবিতকালে সর্ব্বস্বদান করিয়া শশিপদবাবুর ন্যায় নিঃস্ব হওয়ায় দৃষ্টান্ত খুব অধিক দেখা যায়।

শশিপদবাবু আদর্শ স্থাপনা করিয়াছেন, এখন এই বিশ্বমানবের কার্য্য, বিশ্বমানবকে করিতে হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ পাঠে এইটুকু দেখা যাইতেছে যে কি স্বদেশে কি বিদেশে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য কি ভাবে গৃহীত হইতেছে।

সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রত্যহই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হলে হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে দেবালয় সমিতির যে ষান্মাসিক অধিবেশন হয় তাহাতে দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা এই স্থলে প্রসিদ্ধ বক্তৃবর্গের বক্তৃতার ইংরাজী মর্ম্ম যাহা কার্য্য বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম। শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন এই সভার কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে আমি একটু ইতস্ততঃ করিলাম, আমি ভাবিলাম একটি ধর্ম্মালোচনার সভায় কার্য্যভার গ্রহণের আমার অধিকার নাই। আমি সাংসারিকতায় নিমজ্জিত,

আমি সর্ব্বদাই মনে করি যে ধর্ম্মসভায় শ্রোতা ও শিক্ষার্থী হওয়াই আমার অধিকার বক্তা বা শিক্ষক হওয়া নহে। কিন্তু দেবালয় সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত বিশেষ করিয়া তাহার উদার মতসহিষ্ণুতার সহিত আমার আন্তরিক সহানুভূতি থাকায়, আমাকে এই দ্বিধা অতিক্রম করিতে হইল এবং আমি সভাপতি মহাশয়ের নিদেশক্রমে 'দেবালয়' সমিতি ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা সম্মানার্হ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি—দেবালয় সমিতি যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পবিত্র ও লোকহিতকর এবং এতদিন বেশ কৃতকার্য্যতার সহিত ইহা অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছে। আমার মনে হয় সংস্কার, মনোবৃত্তি ও শিক্ষা ভেদে, ধর্ম্মভেদ অবশ্যম্ভাবী, কেবল যে ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন অংশবাসী জাতিতে জাতিতেই এই প্রভেদ থাকিবে তাহা নহে, একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যেও এইরূপ প্রভেদ থাকা অবশ্যম্ভাবী। সামান্য বিষয়, সীমাবদ্ধ বিষয়, যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই যখন মতভেদ, তখন যে বিষয়ে সীমাবদ্ধ মানবমন অসীমকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে সেখানে যে মতভেদ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পক্ষান্তরে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ধর্ম্ম, যাহা আমাদিগকে আমাদের সকলের যিনি সাধারণ নিয়ন্তা ও পিতা তাঁহার দিকে লইয়া যায়, সেই ধর্ম্ম বিষয়ক মতভেদ লইয়া বিরোধ ও শত্রুতা হওয়াই অতীব আশ্চর্য্য। সুতরাং দেবালয় সমিতির মত একটি সমিতি যথায় সর্ব্বসম্প্রদায়ের ও সর্ব্ব ধর্ম্মের লোক স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মবিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ লইয়া স্বাধীন ভাবে আলাপ করিতে পারেন, এ প্রকারের একটি সমিতি যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ইহা বড়ই সান্ত্বনার কথা। দেবালয়ের সভাগুলির বিশেষ সুখকর লক্ষণ এই যে কোনও ধর্ম্মের লোকেরা যে

সমস্ত বিষয়কে পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন কেহ সেই বিষয় সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার সহিত কিছু বলিতে পারিবেন না। মানুষের মন অসীমকে জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়া যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে সেই সমস্ত ধর্ম্মে মতভেদের কারণ বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, কিন্তু যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া লোকে বিবেচনা করে তাহাদের মতভেদের মীমাংসা কোথায়? আমি কিন্তু এখানেও কোন অপরাজেয় বাধা দেখিতেছি না।

প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহও ভিন্ন ভিন্ন বিধানে বিশ্বাস করেন, ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি ও যুগভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিধান জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। আবার প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি কেবলমাত্র সৌভাগ্য-শালী অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। সাধারণ লোক সমূহের পক্ষে ঈশ্বরের আদেশ সাক্ষ্য ও অনুমানের উপর নির্ভর করে দুর্ব্বল মানবগণ এ বিষয়ে এক উপপত্তিতে উপস্থিত হইতে পারে না। এরূপ বলা যাইতে পারে যে এই সমিতির কার্য্য সত্যের সহিত সন্ধিস্থাপন। সত্য এক, কিন্তু অতিবৃহৎ, মানুষের মন অতি ক্ষুদ্র বলিয়া সেই সত্যকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে না।

বক্তা মহাশয় এই স্থলে অন্ধের হস্তীদর্শন বর্ণনা করিলেন। অন্ধেরা প্রত্যেকে হস্তীর বিভিন্নরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছিল। হস্তী সম্বন্ধে অন্ধেরা যখন এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতে উপস্থিত হইতে পারে তখন ধর্ম্মের ন্যায় উচ্চ বিষয়ে যে মতভেদ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? মানবের মন রঙ্গিন কাচের মধ্য দিয়া সমস্ত দেখে সুতরাং সে একরূপ অন্ধ, কাজেই তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করিলে তাহারা ক্ষমার্হ। এই স্থানে যে কেবল সাধারণ বিষয়েরই আলোচনা হয় তাহা নহে, ইহা ছাড়া আর একটি বড় মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান

হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এখানে আসিয়া থাকেন তাঁহাদিগের মধ্যে চিন্তার আদান প্রদান হয় কাজেই প্রত্যেকেই তাহার অপরিস্ফুট দৃষ্টি অপরের সাহায্যে আরও পরিস্ফুট করিয়া লইতে পারেন। মতসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে গীতার একটী শ্লোক মনে পড়িয়া যায় তাহার অর্থ এই যে যাহারা আন্তরিক ভক্তির সহিত আমি ছাড়া অন্যের উপাসনা করে তাহারাও আমারই উপাসনা করে।”

রেভারেণ্ড ডব্লিউ, এস্, আরকুহার্ট বলেন—“ইহা নিশ্চিত যে আমরা সকলেই শ্রদ্ধাস্পদ সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অশেষ ঋণী কারণ তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এতগুলি লোককে একত্র করিয়াছেন। আমি খৃষ্টান এই সমিতির সহিত আমার সহানুভূতি খুবই অধিক। আমরা একই ঈশ্বরকে, একই পরম পিতাকে অন্বেষণ করিতেছি। দেবালয় সমিতির যাহা উদ্দেশ্য তাহা কার্য্য বিবরণীর প্রথম পৃষ্ঠাতেই পরিদৃষ্ট হইবে। যাঁহারা সত্য সত্য ধর্ম্মপ্রাণ, তাঁহাদের আদর্শই ‘দেবালয়’এর আদর্শ। ধর্ম্মের যাহা যথার্থ আদর্শ তাহা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত। মানব যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তৎসমুদয় একত্র করিয়া স্বাধীনভাবে আলোচনা করিলে যাহা পূর্ণাঙ্গ সত্য তাহা প্রকাশিত হইবে। খৃষ্টধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের নিন্দা করার কখনই পক্ষপাতী নহে। খৃষ্টধর্ম্ম বলেন যে এক সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম আছে, সেই ধর্ম্ম আবিস্কার করাই মানবের কর্ত্তব্য। এই দেবালয় সমিতিরও তাহাই ভাব—ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা ও ঈশ্বরের পিতৃত্ব এই ধর্ম্মের মূল কথা। আমি প্রার্থনা করি এই সমিতির চেষ্টা সফল হউক।”

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন

যখন আমাদের বিশিষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন তখন আমার যে অধিকার নাই ইহা বলাই বাহুল্য। তবে 'দেবালয়' সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে সেই সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্যই আমি দণ্ডায়মান হইয়াছি।

শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্মের সংজ্ঞায় বলেন যে তথায় বিবাদ হইতেই পারে না। ধর্ম্ম সাধারণতঃ তাহার উদ্দেশ্য ও সাধন লইয়াই বিচারিত হয়। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য "সর্ব্বেষাং স পরোধর্ম্মোযতো ভক্তিরধোক্ষজ" হে অধোক্ষজ তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যাহা ভক্তিতে লইয়া যায়। আবার "প্রীয়তে হ্যমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যৎ বিড়ম্বনং" অমলা ভক্তি দ্বারাই হরি তুষ্ট হয়েন আর সব বিফল। আমার বিশ্বাস এ কথায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা কি দেখিতেছি? জগতে ধর্ম্ম লইয়া যত বিরোধ এত আর অন্য কিছু লইয়াই নহে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক যদ্যপি বন্ধুরূপে অথবা সত্যান্বেষীরূপে একত্রে সম্মিলিত হয়েন এবং তাঁহাদের পরস্পরের চিন্তা ও বিশ্বাস বিনিময় করেন তাহা হইলে সম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তিরোহিত হইবে। এইরূপ আশা করা যায়। বুদ্ধদেব বলিতেন "যখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইবে তখন তর্ক করিও না, তোমার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে স্থাপন কর তাহা হইলেই তাহারা তোমার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে, কারণ তর্ক করিলে জিগীষা জন্মায় ও ধর্ম্ম তাহাতে নষ্ট নয়। সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখাইতেছেন যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মতগুলি কি ভাবে আলোচিত

হইবে। ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্কীর্ণতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্ত প্রত্যেক যুবকেরই "দেবালয়"এ যোগদান করা উচিত।"

অন্যান্য বক্তার বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় একটি সুন্দর বক্তৃতায় এই সমিতির সহিত তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন ও 'দেবালয়' এর প্রতিষ্ঠাতা মহাশয়, এ প্রকারের প্রশস্ত ও উদার ভিত্তির উপর "দেবালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন, বলিলেন জাষ্টিস্ চন্দ্রভারকর "Heart of Hinduism" নামক তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে হিন্দুভাব হিন্দুদের মধ্যে এখনও জীবিত, তিনি জাষ্টিস্ চন্দ্রভারকারের এই কথায় বিশ্বাস করেন ও দেবালয়ের মঙ্গলকামনা করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল, বেদান্তরত্ন মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন যে দেবালয়, তাহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যের জন্য অন্য সমস্ত বক্তৃবর্গের নিকট যে প্রশংসা লাভ করিয়াছে তাহা খুবই সুখের কথা। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ্য স্থাপন করাই 'দেবালয়'এর প্রধান কার্য্য। জগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় ভ্রাতার মত একতাবদ্ধ হইলে ইহাই বুঝায়, যে পরমেশ্বরেই তাহাদের সকলের পিতা অথবা সকল ধর্ম্মই সেই এক উদ্দেশ্যে যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ। কাজেই ইহা সঙ্গত যে প্রত্যেক ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের সহিত শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের সহিত ব্যবহার করিবে, কোন ধর্ম্মই এরূপ অহঙ্কার করিবেনা যে সেই ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, অন্যান্য ধর্ম্ম মিথ্যা ও কাল্পনিক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"

ভগবানের ইচ্ছায় ভারতবর্ষে হিন্দু, পার্শি, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, শিখ প্রভৃতি একত্রে মিলিত সুতরাং ভারতবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকে

একই পরম জ্ঞান-বৃক্ষের শাখারূপে না বুঝিলে ভারতের জাতীয় জীবন গঠন করিবার কোনই আশা নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যদি সমস্ত ধর্ম্মই এক ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে, তাহা হইলে একাধিক ধর্ম্ম হইল কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। হিমালয় হইতে যে জলরাশি আসিতেছে তাহা একটি ধারায় না আসিয়া গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি ধারা ধরিয়া আসে কেন? একটি ধারা তাহা যতই বিশাল হউক না কেন, তাহার সাধ্য নাই যে হিমালয়ের সমস্ত জলরাশি নিস্কাসিত করে, তাহার বক্ষে সেই জলরাশি ধারণ করিতে পারে। এইরূপ ঈশ্বরের সমগ্রভাব ধারণ করা বা প্রকাশ করা কোনও একটি ধর্ম্মের সাধ্য নাই। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন বিভাবের প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম জগতকে দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। যখন এইগুলি সমস্ত একত্র হইবে তখনই ঈশ্বরের পূর্ণভাব প্রকাশ হইবে। 'দেবালয়' এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং এই সমিতি ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শশিপদ বাবু সাধারণের নিকট যে সহানুভূতি পাইয়াছেন ইহা অতি সঙ্গতই হইয়াছে।"

এই পরিচ্ছেদ শেষ করিবার পূর্ব্বে এ যুগের উদার ধর্ম্মান্দোলনের যাহা প্রাণের কথা তাহা লইয়া একটু আলোচনা করিতে চাই। শ্রীযুক্ত আরকুহার্ট সাহেব তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত বক্তৃতায় যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম একটু ধীরভাবে গ্রহণ করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব। তিনি বলিলেন যে ধর্ম্মের আদর্শ মানুষের হাতগড়া জিনিস নহে, ইহা ভগবানের করুণার দান। মানুষ সত্যান্বেষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলে, নানা উপকরণ সংগ্রহ করিবে কিন্তু এই চেষ্টার সফলতা ভগবানের করুণার দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শ ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে খৃষ্ট ধর্ম্ম

অপর ধর্ম্মের নিন্দা করার পক্ষপাতী নহেন, খৃষ্ট ধর্ম্ম মানব সকলকে সত্যান্বেষণ করিতে অনুরোধ করেন, সত্যান্বেষণের জন্য মানববৃন্দ একত্র হইয়া ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ করিলেই জগৎ খৃষ্টান হইবে, সমস্ত মানব খৃষ্টধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। জগতের সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই এইরূপ বিশ্বাস। হিন্দু বলেন সমস্ত জগৎবাসী একত্র হইয়া শ্রদ্ধার সহিত সরলপ্রাণে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে 'বেদান্ত' ই জগতের ধর্ম্ম হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া বলেন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"

বৌদ্ধগণের বিশ্বাস যে জগৎ পরিণামে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, মুসলমানের ও বিশ্বাস সকল জগৎ মুসলমান হইবে। জগতের সকল ধর্ম্মেই এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই ধর্ম্মশীল মানব বাঁচিয়া আছেন ও ধর্ম্মার্থে আনন্দের সহিত আত্মোৎসর্গ করিতেছেন। লোকে মনে করে এইখানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ কিন্তু এইখানেই মিলন। এই বিশ্বাসই যে মিলনের ভূমি তাহাই 'দেবালয়' সমিতি প্রতিপাদন করিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেবালয় ও শশিপদ বাবুর জীবনী।

এই দেবালয়-সমিতি সম্বন্ধে যথার্থভাবে আলোচনা করিতে হইলে ইহার প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শশিপদবাবুর জীবনও আলোচনা করা প্রয়োজন। শশিপদবাবুর সমগ্র জীবনের ইতিহাসের সহিত, এই সমিতির প্রতিষ্ঠা, অতীব নিবিড় এবং একরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। শশিপদবাবুর জীবনের ইতিহাস, আলোকের মত আমাদিগকে এই সমিতির অন্তরতম কথা উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবে। শশিপদ-বাবু, সমগ্র জীবন, যে মহা সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই অতুলনীয় সাধনবৃক্ষের ফলস্বরূপে এই দেবালয় সমিতি আমাদের দেশে বিকশিত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই সাধনবৃক্ষের একটি চিত্র প্রদান করিয়াছি।

শশিপদবাবুর জীবন যে কেবল এই দেবালয় প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গেই বিশেষভাবে আলোচ্য, তাহা নহে—তাঁহার জীবন, সাধারণ বিষয়-লিপ্ত মানবের জীবন হইতে, এত স্বতন্ত্র ও মহৎ, যে আমরা অবিসম্বাদিতরূপে তাঁহার জীবনকে, এ যুগের অন্যতম আদর্শজীবনরূপে, গ্রহণ করিতে পারি। প্রাতঃস্মরণীয়, মানবের হিতকর্ত্তা, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত, পরম-ভাগবত মহাপুরুষগণের নামের সহিত, তাঁহার নাম গ্রথিত হইবার কিরূপ উপযুক্ত, তাহা তাঁহার জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হইবে। এ প্রকার একজন ক্ষণজন্মা কর্ম্মবীরের জীবনবৃত্ত যদ্যপি বিশেষভাবে আলোচিত না হয়, তাঁহার আদর্শ যাহাতে বিস্তৃতভাবে অনুসৃত হইতে পারে, আমাদের সাহিত্য যদি তাহার ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে আমাদের দেশ যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এবং এই ক্ষতি যে অপূরণীয় ক্ষতি, ইহাই আমার বিশ্বাস।

শশিপদবাবুর জীবন বিস্তৃতভাবে এই ক্ষুদ্র কলেবর গ্রন্থে আলোচনা করা অসম্ভব। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলি, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে, যে গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ কথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে, বঙ্গের অন্যান্য অনেক ছোটলাটও শশিপদবাবুর সহিত ঘনিষ্ট-ভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার জীবন ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তুল্যরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ, আমি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের দু একটি মাত্র কথা বর্ণনা করিব। তাঁহার প্রাণপণ আত্মনিয়োগে, দেশে যে সমস্ত হিতকর অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা, আমাদের বর্ত্তমান সময়ের আবশ্যকতার অনুরোধে, বিশেষভাবেই প্রয়োজন।

শশিপদবাবুর জীবন—সেবার জীবন, ত্যাগের জীবন, ভক্তি ও প্রেমের জীবন। এই সেবা ও ত্যাগের মধ্যে, এই মানবের হিতসাধন ব্যাপারে কোনও "কিন্তু" নাই—আপনাকে বজায় রাখিবার বা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কোনও প্রয়াস নাই। ভগবদ্গীতায় নিষ্কামকর্ম্মের যে স্বর্গীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমরা দেখিতে পাইব যে, শশিপদবাবুর জীবনে সেই আদর্শ ও সেই সাধনা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইয়াছে—এই দেবালয়, সেই মহা সাধনারই অবশ্যম্ভাবী ফল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শিরোরত্ন মহাশয় বহুদিন তাঁহার জীবনের সহিত পরিচিত, তিনি তাঁহার "কর্ম্মযোগী শশিপদ" নামক গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন।

"যিনি শান্ত, উপরত, তিতিক্ষু হইয়া কর্ম্মফল ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া জগতের হিতকর কার্য্যসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনি জীবন্মুক্ত মহাত্মা। শশিপদ বাবুতে পূর্ব্বোক্ত গুণ সমুদয় বিদ্যমান। তিনি সংসারী হইয়া সন্ন্যাসী, কর্ম্মফলকাঙ্ক্ষী না হইয়া কর্ম্মী। ক্ষমা তাঁহার ভূষণ, বিনয়সমন্বিত তেজঃ তাঁহার কবচ,

ভগবান তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু, কর্ম্ম তাঁহার ইষ্টমন্ত্র, সংসার তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র তীর্থ; এই মহাতীর্থে কর্ম্মযোগ সাধন করিয়া তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সিদ্ধপুরুষের যে সকল লক্ষণ, সে সকল তাঁহাতে পরিস্ফুট। তিনি রোগে কাতর নহেন, শোকে বিমর্ষ নহেন, বিপদে ও সম্পদে উচ্ছ্বসিত হয়েন না, আততায়ী শত্রুর প্রতিও ক্ষমাশীল। প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ, দুঃখ, বিষাদ, বিপদ, সম্পদ প্রভৃতি বিপরীত গুণ সকল তাঁহার নিকট এক, এই বিপরীত গুণ সকল তাঁহার নিকট তুল্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তিনি দ্বন্দ্বাতীত সিদ্ধ পুরুষ। তাঁহার শক্তি বিশাল, অক্ষুন্ন ও অপরাহত। বৃদ্ধবয়সে শশিপদ বাবু তাঁহার বরাহনগর ও কলিকাতার কার্য্যের জন্য যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করিতেছেন। যে ভগবদ্বিশ্বাস ও উদারতা লইয়া তিনি জীবনের ব্রত কর্ম্মযোগীর ন্যায় সম্পাদন করিয়াছেন সেই ভগবদ্বিশ্বাস ও উদারতাকে ভিত্তি করিয়া তিনি দেবালয়-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই দেবালয় তাঁহার জীবন বৃক্ষের অমৃতময় ফল—ভবিষ্য-বংশীয়গণ ইহার আস্বাদনে কৃতার্থ হইবেন ও এই আদর্শে ভারতবর্ষ স্বকীয় গৌরবময় স্থান পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। যে দেশে যখন শশিপদ বাবুর ন্যায় কর্ম্মযোগী মহাপুরুষের আবির্ভাব বহুলপরিমাণে হয়, তখন সেই দেশ ধন্য হয়, সে দেশের শক্তি, জ্ঞান, অর্থ অলক্ষিত ভাবে বৃদ্ধি পায়। ভগবানের কৃপাই উক্তরূপ মহাত্মাদিগের আবির্ভাবেব কারণ। আমরা তাঁহার করুণাপাতের জন্য উন্মুখ হইয়া আছি। তাঁহার করুণায় শশিপদ বাবু আরও দীর্ঘজীবী হউন। তাঁহার জীবন আদর্শ রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, আমরা তাহা দেখিয়া আমাদের শক্তি, উৎসাহ ও বিশ্বাস বর্দ্ধিত করি।"

আর একটি কথা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের অভাব কোথায়, আমাদিগকে কোথায় কোথায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, কি

উপায় দ্বারা আমাদের দেশের উন্নতির অন্তরায়গুলি যথার্থভাবে দূরীভূত হইবে, আমাদের প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণের পথ কোন্ দিকে শশিপদ-বাবুর সমগ্র জীবনেতিহাস নিঃশব্দে ও প্রত্যক্ষ উদাহরণদ্বারা, "আপনি আচরি" তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। ব্যষ্টিভাবে শশিপদবাবু স্বকীয় ব্যক্তিগত জীবন যে সাধনার মধ্য দিয়া জাতীয়ভাব যথাযথ রক্ষা করিয়া অবিচলিতভাবে বীরের মত অসত্য, অন্যায়, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার সহিত তীব্রভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে পরিচালনা করিয়া আনিয়াছেন, আমাদের এই জাতিকে, আমাদের এই দেশকে সমষ্টিভাবে সেই সাধনার মধ্য দিয়া, সোপানের পর সোপান বাহিয়া, সেইরূপে অসত্য, অন্যায় কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ শশিপদবাবু এই মহা সাধনার ফলে, দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আমাদের জাতি সমষ্টিভাবে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে আমাদের দেশও প্রকৃত দেবালয়ে পরিণত হইবে। অধর্ম্ম দুর্নীতির দানব নির্ম্মূলিত ও পর্য্যুদস্ত হইবে ;—আমরা যাহাকে সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্ঠা বলি, কর্ম্মযোগের যাহা লক্ষ্য খৃষ্টীয় উপাসক স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা বলিলে যাহা বুঝেন সে দিন তাহাই সত্য সত্য সাধিত হইবে। এই জন্যই শশিপদবাবুর জীবন, বিনীতভাবে আলোচনা করা বিশেষরূপে প্রয়োজন, কিন্তু উপস্থিত প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করা ব্যতীত উপায় নাই।

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তি বরাহনগরে সন ১২৪৬ সালে মাঘমাসে (ইংরাজী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী) শশিপদবাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম গঙ্গামণি। তাঁহার পিতা একজন বিশেষ রূপ স্বদেশহিতৈষী লোক ছিলেন। দেশের হিতকল্পে অনুষ্ঠিত, যাবতীয় শুভানুষ্ঠানের সহিত, তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ও প্রেমযুক্ত চেষ্টা ছিল। চারি ভ্রাতার মধ্যে শশিপদবাবু

তৃতীয়। শশিপদবাবুর জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতাই অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

যে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে শশিপদবাবু জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরিবার বরাহনগরের আদিম নিবাসী নহে। এই পরিবারের আদিবাস পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে। অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত এই পরিবারের জনৈক ধর্ম্মশীল মহাত্মা, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, বরাহনগরে গঙ্গাতীরে ধর্ম্মচর্য্যা উপলক্ষে আসিয়া দীর্ঘকাল বাস করেন। এই ব্রহ্মচারীর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী এখনও প্রচলিত আছে। কথিত আছে তিনি একটি ক্ষুদ্র ভাণ্ড হইতে একশত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়াছিলেন, একবার তিনি বৃষ্টি নিবারণ করিয়াছিলেন। অসময়ে এক ব্রাহ্মণের প্রার্থনা মত আম আনিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, বরাহনগরের অধিবাসীগণ এই মহাত্মাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতেন ও বিশেষরূপে ভক্তি করিতেন। যে স্থানে এই ব্রহ্মচারীর কুটীর ছিল, বরাহনগরের অধিবাসীগণ গভীর ভক্তির সহিত, এখনও সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই সিদ্ধ ব্রহ্মচারীর ভ্রাতৃপুত্র রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বরাহনগরে আগমন করেন। এই স্থানে তাঁহার খুল্লতাত ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে এই ব্রহ্মচারী, বরাহনগরেই তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ই বরাহনগরের বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের আদিপুরুষ।

শশিপদ বাবু রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। শ্রীযুক্ত শশিপদবাবুর পিতা ৺রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের স্বদেশানুরাগ ও পরার্থপরতার কথা,পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শশিপদ বাবুর জীবনে তাঁহার স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরাণীর প্রভাবও বিশেষরূপে আলোচ্য।
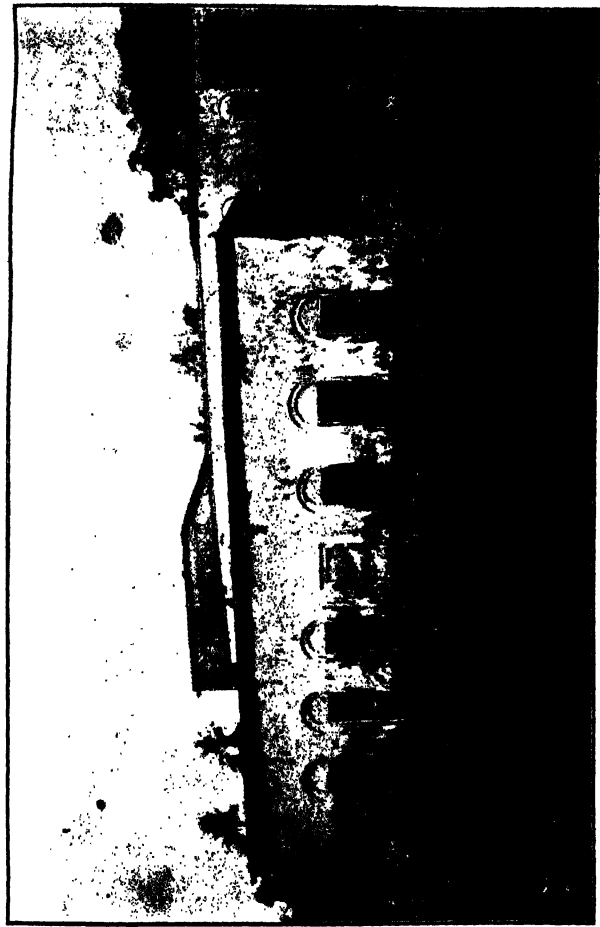
সিদ্ধ পুরুষ অকিঞ্চন ব্রহ্মচারীর সাধনভিটা ও শশিপদ বাবুর জন্ম স্থান।
এই বাটীতে শশিপদ বাবর স্ত্রী শিক্ষার কার্য্য প্রথম আরম্ভ হয়।

শশিপদ বাবুর মাতা সেকালের ব্রাহ্মণ রমণী। গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যে বিদ্যা অর্জ্জিত হয়, তাহা অবশ্য তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও, সদ্বংশোদ্ভূতা ব্রাহ্মণ ললনার ন্যায়, তাঁহার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ, খুব উন্নত ও উদার ছিল। তাঁহার চরিত্রে এমন স্বর্গীয়গুণ অনেক ছিল, যাহা কেবল মাত্র গ্রন্থ পাঠে বা বুদ্ধি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে লাভ করা যায় না। পুত্রগুলি যাহাতে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত হয়, চরিত্রবলে মহীয়ান হয়, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার তৃতীয় পুত্র শশিপদ বাবুর চরিত্র সংগঠনে, তাঁহার মাতার উপদেশ ও আদর্শ যে বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হৃদয়বৃত্তির কোমলতা, প্রবল ভক্তির উচ্ছ্বাস, সর্ব্বভূতে করুণা, একেবারে আত্মহারা হইয়া সেবা ও এই সেবার মধ্যেই জীবনের পূর্ণ পরিতৃপ্তির উপলব্ধি প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ, রমণীকে আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি বলিয়া চিরপূজনীয়া করিয়া রাখিয়াছে, সেই সমস্ত গুণের বিরামহীন ক্রিয়া, শশিপদবাবুর জীবনের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আলোচনা করিলে, এই সমস্ত সদ্‌গুণের বীজ তাঁহার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণী কর্ত্তৃক, অতি শৈশবেই, তাঁহার হৃদয়ে রোপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এগুলির যাহা মূল উৎস তাহা তিনি মাতৃস্তন্যের সহিত পান করিয়াছেন, সেই জন্যই এগুলি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইতে পারিয়াছে।

শশিপদবাবুর বয়ঃক্রম যখন পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। বাল্যে শশিপদবাবু সাধারণ ভাবে গ্রাম্য পাঠশালায় ও পরে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। পারিবারিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন তাঁহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাসিক ৮ টাকা বেতনে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়।

জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই তাঁহার চিত্তে, সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ, কিরূপ উজ্জ্বল ও জীবন্তভাবে, বিরাজমান ছিল, এবং সেই আদর্শের তাড়নায়, তিনি সর্ব্ববিধ লাভের আশা, সর্ব্ববিধ বিদ্রূপ ও তাড়না, কেমন অকাতরে, বীরের মত সহ্য করিতে পারিতেন, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, প্রাণ দিয়া কেমন তাহা পালন করিতেন, তাঁহার প্রথম জীবনের কয়েকটি ঘটনা হইতেই তাহা বেশ পরিদৃষ্ট হইবে। শশিপদ বাবু কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান যখন তাঁহার বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রমও অধিক নহে। এখন যেমন বিবাহে পণ গ্রহণ প্রথা নিবারণ করিবার জন্য কত বক্তৃতা, কত প্রতিজ্ঞা বন্ধন, সংবাদপত্রে কত লেখালেখি হইতেছে, সে সময়ে এ সমস্ত কিছুই হয় নাই। শশিপদ বাবুর যখন বিবাহ হয় তখন তাঁহাদের সংসারও বেশ সচ্ছল ছিল না। কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান, ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছেন, বিবাহে অবশ্য অনেক টাকাই পণ গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি একমাত্র নিজের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দ্বারা তাঁহার বিবাহে পণ গ্রহণ করিতে দেন নাই। তাহার পর অর্দ্ধশতাব্দীর শিক্ষা ও উন্নতি দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তথাপি যখন দেখি শিক্ষিত যুবক অন্যায় জানিয়াও অবস্থার অসচ্ছলতা প্রভৃতির ওজরে মনকে বুঝাইয়া, "যে স্বেচ্ছায় আসিতেছে তাহাকে আসিতে দাও" এই প্রকার যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অম্লানবদনে বিবাহে পণ গ্রহণ করিতে দেন, তখন বুঝিতে পারি এই কার্য্যে শশিপদ বাবুর চরিত্রগত মহত্ত্ব কোথায়?

বিবাহের পর শশিপদ বাবু বুঝিলেন, তাঁহার বালিকা স্ত্রীকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্র যাঁহাকে সহধর্ম্মিণী বলিয়াছেন, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ পার্থিব প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, জীবনের যাবতীয় মহত্তর কার্য্যে, যাবতীয় উন্নত আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে

সমগ্রভাবে না পাইলে, গার্হস্থ্য জীবন যে পক্ষাঘাত রোগের দ্বারা অর্দ্ধাঙ্গ শূন্যবৎ হইয়া পড়িবে, এই জ্ঞানটা তাঁহার মনে প্রথমেই উদিত হইল। সে কালের সম্মিলিত পরিবার, এখনকার দিনে স্বপ্ন রাজ্যের কথার মত মনে হইবে। সে সময়ে স্ত্রীর সহিত স্বামীর দিবসে সাক্ষাৎ হওয়াই নিন্দার কথা ছিল, তাহার উপর স্ত্রীকে স্বামীর লেখাপড়া শিখান, তাহা যে পরিবারবর্গের কিরূপ উপহাস ও বিদ্রূপের কারণ হইয়াছিল, তাহা একালের অনেক লোক অনুমান করিয়াই উঠিতে পারিবেন না। ক্রমে ক্রমে, শশিপদ বাবু, নানারূপ অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা পরাজয় করিয়া, তাঁহার পত্নীকে নিজের সামাজিক, পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শে, শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। এই প্রকার স্ত্রীশিক্ষার প্রথা, পরিবার মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে, বিশেষ সুফল ফলিতে লাগিল ; যাহা সত্য, তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী, কেবলমাত্র একবার সংস্কারের অন্ধকারাগারের দ্বার, ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া, সত্যের জ্যোতি তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবার অপেক্ষা, তাহা হইলেই সত্য, আপনার স্থান আপনি, করিয়া লইবেন। ক্রমশঃ শশিপদ বাবুর পরিবারান্তর্গত অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের মনে, জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়া উঠিল। সকলেই গ্রন্থাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করায়, তাঁহার পরিবারে একটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার Social Reform in Bengal নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে দেশে বিবাহিতা মহিলা ও বিধবাদিগের শিক্ষাদানের ইহাই প্রথম সূত্রপাত।

শশিপদ বাবু, যৎকালে তাঁহার স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইয়া, নিজের উদার ও বিজ্ঞানমার্জ্জিত আদর্শে উন্নীত করিবার জন্য ব্যাকুল, অথচ, রাশি রাশি প্রতিবন্ধকতা, তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, সেই সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ, তাহা তৎকালীন 'ডেলিনিউজ' সংবাদ-

পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত জেমস্ উইলসন, তাঁহার "বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা" নামক ইংরাজী পুস্তকে অল্প কথায় অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"This was an anxious thought to him—either he must help her up or himself go down to her level, He passed several days and nights in earnest solitary prayer for help to overcome this difficulty, and his prayers were not in vain"

অর্থাৎ তিনি এই চিন্তায় বড়ই উদ্বেগের সহিত দিন কাটাইতে লাগিলেন. হয় তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া তাঁহার স্ত্রীর অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে হইবে অথবা তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীর অবনত অবস্থায় নামিয়া যাইতে হইবে। কয়েক দিন দিনরাত্রি ধরিয়া, তিনি নির্জ্জনে এই সমস্যা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, একান্তভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; তাঁহার এই প্রার্থনা বিফল হয় নাই।

উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে শশিপদ বাবুর চরিত্রগত দুইটি বিশেষ লক্ষণ অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ স্বামীস্ত্রীর সুপবিত্র স্বর্গীয় বন্ধনের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার উদার ও মহৎ ধারণা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনাশীলতা।

এই ঐকান্তিক প্রার্থনাশীলতা কেবলমাত্র এক আধটি বিশেষ ঘটনায় নহে, ইহা তাঁহার জীবনের চিরসঙ্গী। বিবাদে বিপদে, সম্পদে মঙ্গলে. সকল কার্য্যের প্রারম্ভে একাগ্রচিত্তে অন্তর্যামী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা, তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ। এই প্রার্থনাশীলতার মধ্যেই তাঁহার জীবনের যথার্থ ভিত্তি বুঝিতে পারা যায়। অনেক লোক তাঁহার দারুণ ক্ষতি করিয়াছে, অকারণ বিবিধপ্রকার যন্ত্রণা দিয়াছে, কিন্তু তিনি বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও কখনও তাঁহার প্রতিদানে আততায়ীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন

নাই। যে সহস্রপ্রকারে তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই বিসূচিকারোগে আক্রান্ত, কেহই সাহস করিয়া সেবা করিতে অগ্রসর হইতেছে না, এমন সময়ে সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র শশিপদ বাবু তাহার রোগ শয্যার পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; একাগ্রচিত্তে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার সেবা করিয়াছেন। এ প্রকারের ঘটনা একটি নহে, দুইটি নহে, তাঁহার জীবনে অনেকবারই ঘটিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার কর্ম্মপূর্ণ জীবনের সহিত পরিচিত, তাঁহারা সকলেই ইহা অবগত আছেন। ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতগণ যে তাঁহাকে "সেবাব্রত" এই উপাধি অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন তাহা অতি যথার্থই হইয়াছে। এই প্রকারে প্রেম ও মৈত্রীর দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করার উপদেশ ধর্ম্মশাস্ত্রে যথেষ্ট পরিদৃষ্ট হইলেও, সংসারের চতুর লোক তাহাতে বিশ্বাস করেন না। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্র এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ, প্রাচীন ভারতে ও অন্যান্য সকল দেশেই কল্পিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু", আর নীতিশাস্ত্র বলিতেছেন "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" শঠকে শঠতার দ্বারা আপ্যায়িত কর; "আততায়ী বধার্হণঃ" আততায়ীকে বধ করাই সঙ্গত ইত্যাদি।

অর্থশাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের এই বিরোধস্থাপনা করা যে মানবের নৈতিক বৃত্তির একটা বিকার হইতে উৎপন্ন, ইহা যে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরনির্ভরতার অভাবমাত্র, এই দারুণ 'কলিযুগে' ও প্রেমের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, ক্ষমা ও সাধুভাবের দ্বারা ভীষণ শত্রুকেও বশীভূত করা সম্ভব, তাহা যাঁহারা বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা শশিপদবাবুর জীবনের সেই সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিলে বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন।

কেমন একটা জীবন্ত আদর্শ, নিত্যকাল জাগরিত থাকিয়া, শশিপদ বাবুর জীবন চালনা করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কি গৃহস্থালীতে, কি সমাজে, কি নিজের জীবনে, যেখানে কিছু গ্লানি, অভাব বা কপটতা আছে, শশিপদবাবুর দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ তাহার উপর পতিত হইয়াছে, আর তিনি নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই; অমনি তাহা সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ শক্তি তাহাতে নিয়োগ করিয়াছেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শশিপদবাবুর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। এই শিশু জন্মের অব্যবহিত পরেই সূতিকাগৃহে প্রাণত্যাগ করে। আমাদের দেশের সেকালের সূতিকাগৃহ যে কিরূপ অস্বাস্থ্যকর ও ভীষণ ছিল, তাহা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এখনও সুদূর মফঃস্বলে সেই প্রাচীন পদ্ধতি বিদ্যমান আছে; তবে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার কল্যাণে, অপেক্ষাকৃত জ্ঞানোন্নত পরিবারের দৃষ্টি, এই দারুণ অবিবেচনাপূর্ণ ব্যবস্থার উপর পতিত হইয়াছে। শশিপদবাবু দেখিলেন যে, এই সূতিকাগৃহের অস্বাস্থ্যকর অবস্থাই শিশুর জীবনহানির অন্যতম কারণ, তিনি আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। সূতিকাগৃহের যাহাতে সংস্কার হয়, যাহাতে সকলের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিলেন। অনেকের দৃষ্টি বড় বড় কার্য্যের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়, কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারের ছোট ছোট বিষয়গুলির উপর অনেকেরই দৃষ্টি পতিত হয় না। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহারের মধ্যে যাহা কদর্য্য ও অশোভন, তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট না হইলে, বড় বড় সংস্কার কেমন করিয়া সম্ভব, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। এই সামান্য কার্য্যে অর্থাৎ সূতিকাগৃহের সংস্কারসাধনেও শশিপদবাবুকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ও সহজবোধ্য ব্যাপারের বিরুদ্ধেও সহস্রবিধ আপত্তি সহস্রদিক হইতে উত্থিত হইয়া অসহায় তরুণ সংস্কারককে আক্রমণ করিল। সত্যের আলোকে সাহসিক শশিপদবাবু এ সমস্তের দ্বারা বিরত হইলেন না। তাঁহার নিজের গৃহে আবশ্যকীয় সংস্কার সাধিত

হইল, তাঁহাদের উদাহরণ অন্যান্য পরিবারেও গৃহীত হইল। আজ, যে কথা অতি সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও যিনি প্রথম দিন প্রচার করেন, সেদিন তাঁহাকে বিরুদ্ধবাদীদিগের হস্তে কিরূপ নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

শশিপদবাবু যখন সূতিকাগৃহের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন তাহার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও এমন কি এই কলিতাতা সহরেই মিউনিসিপ্যালিটি প্রত্যেক বৎসর শিশুদিগের মৃত্যুর হার দেখাইয়া এদিকে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম-জীবন।

শশিপদ বাবুর জীবনবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনই সর্ব্ব প্রথমে বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি ও ঈশ্বরনির্ভরতাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব। এই ভগবৎ প্রেমই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র, তাঁহার কর্ম্মজীবনের একমাত্র প্রেরণা। তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া মানবকে যেমন ভাল বাসিয়াছেন, মানবের জন্য আজীবন নিস্বার্থভাবে যেমন পরিশ্রম করিয়াছেন, তেমন ত্যাগ, তেমন পরিশ্রম, খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার এই বিশ্বপ্রেম ও সেবা কোন হিতবাদমূলক দার্শনিকমত বা কোন প্রত্যক্ষ-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; তাহা সেই সত্য ও পরমাত্মাস্বরূপ, পূর্ণ প্রেমমূর্ত্তি ভগবানের সুগভীর ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে উৎপন্ন। একটা স্বতঃসিদ্ধ ও আজন্ম প্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানই, ধ্রুবনক্ষত্রের মত, এই অন্ধকার-ময় সংসারে তাঁহাকে উন্নত হইতে উন্নততর পথের মধ্য দিয়া অবশেষে জীবন দিবার অবসানমুখে এই শান্তিসদন 'দেবালয়ে'এ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। শশিপদ বাবু ভক্তি-বিনম্রভাবে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, "এই সমস্ত কার্য্য, আমি ইহার কিছুই করি নাই; আমি যন্ত্রপুত্তলিকা, তাঁহার কার্য্য তিনিই করিয়াছেন।" ইহারই নাম বরণ, (Election) ইহাই ভক্তিমার্গের প্রাণস্বরূপ।

শশিপদ বাবুর ধর্ম্মজীবনের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইলে, প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় কথার আলোচনা বিশেষরূপেই আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচনা করি। হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মসর্ব্বস্ব জাতি যে জগতে নাই তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। হিন্দুর ধর্ম্মমতের সহিত অগণিত কুসংস্কার কালপ্রভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া গেলেও, হিন্দুর

ধর্ম্মানুষ্ঠান বড়ই ব্যাপক ও বিস্তৃত। বৈদেশিক চিন্তা ও ইউরোপীয় ইহসর্ব্বস্ববাদের আদর্শ, আমাদের জীবনস্রোতে একটা পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ জাগরিত করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগেও আমাদের গৃহস্থালী নিত্য-সংসাধিত ধর্ম্মকার্য্যের সাধনভূমি ছিল। ইহুদী-দিগের মত আমরাও ধর্ম্মগত সংস্কার সমূহকে বড়ই মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করেন ইহুদি জাতির মধ্যেও অনেক সংস্কার প্রচলিত আছে কিন্তু আমাদিগের সংস্কার তদপেক্ষা অনেক অধিক। আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই, কোন না কোন ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। অবশ্যপালনীয় দশবিধ সংস্কার ব্যতিরেকে হিন্দুর অনুষ্ঠেয় অসংখ্য ব্রত, পূজা ও উৎসব আছে। এই সমস্ত অনুষ্ঠা-নের মধ্যে হিন্দুর জীবন, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, এক বিরামবিহীন পুণ্যসাধনার প্রবাহের মত প্রতীত হয়।

হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক জীবন, দীর্ঘকালব্যাপী দুরবস্থার মধ্যেও নিদ্রিত বা মৃত হইয়া পড়ে নাই। হিন্দুর পারিবারিক জীবন, বড়ই কৃতকার্য্যতার সহিত, চিরদিনই জীবনের উপর, অতীব শৈশবকাল হইতেই, একটা আশ্চর্য্য রকমের ধর্ম্ম-প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এই প্রকারের হিন্দু পরিবারে, শশিপদ বাবুর জন্ম। তাঁহার মাতার ধর্ম্মজীবন বড়ই উন্নত ছিল। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মণ মহিলার মত, পারিবারিক জীবনের আনুষ্ঠানিক অংশ যে কেবলমাত্র অন্ধভাবে পালন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, এই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রকৃত অর্থ, তাঁহার করুণা-কোমল হৃদয়ের নিকট অজ্ঞাত ছিলনা, এই সমস্ত অনুষ্ঠান যে, দয়া, পরার্থপরতা, সংযম, ঈশ্বরনির্ভরতা, ভক্তি, বিনয় প্রভৃতি দৈবী সম্পৎসমূহের অধিকারের মধ্যে, মানবের আত্মাকে ক্রমে ক্রমে বিকশিত করিয়া, সেই প্রেমময় শাশ্বতধামের পথে অগ্রসর করে,

ইহা তিনি সুন্দররূপেই বুঝিতেন এবং তাঁহার চরিত্র বাক্য, তাঁহার এই উপলব্ধি, সর্ব্বদাই প্রকাশ করিত। এই গৃহস্থালী ও এই মাতৃপ্রভাব শশিপদ বাবুর ধর্ম্মজীবনের প্রথম কথা।

হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনে ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্থান কিরূপ আদ্যন্তব্যাপী তাহা বলিয়াছি। হিন্দুর সমাজও ঠিক এই আদর্শে গ্রথিত। দরিদ্র ভিক্ষুক, গান করিতে করিতে, খঞ্জনী বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে, পথে চলিয়াছে, তাহার গান, সংসারী মানবের কর্ণে, সর্ব্বদাই ভগবানের মহিমার কথা, মানব আত্মার গৌরবের কথা, পৌরাণিক প্রাতঃস্মরণীয় চরিত্রাবলীর কথা ধ্বনিত করিতেছে। তাহার পর কথকতা। পূর্ব্বে দেশে কথকতার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। সুললিত ভাষায়, সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া কথকগণ,পৌরাণিক সাধুগণের চরিত্রকথা ভগবানের অনন্ত লীলা ও অপার করুণার কথা ভক্তিগদগদ কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন; দিবসের ক্লান্তির পর, উৎসুক নরনারী, নিষ্ঠার সহিত, সেই পবিত্র কথা শ্রবণ করিতেন, তাঁহাদের হৃদয় গলিয়া যাইত, দেশ মধ্যে এই অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের বিরাম ছিল না। বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে অধুনাতন দেশের এই সমস্ত প্রাচীন সুব্যবস্থাগুলি একে একে লোপ পাইতেছে, শিক্ষিত লোকের এদিকে দৃষ্টি নাই। পূর্ব্বে একতা ও উন্নতির যে ব্যবস্থা ছিল, আমরা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, মুখে একতা ও উন্নতির কথা সর্ব্বদাই বলিতেছি, কিন্তু ইহার জন্য কোন নূতন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

বাল্যকাল হইতে, শশিপদ বাবু, কথকতা শ্রবণের একজন বড়ই অনুরাগী ভক্ত ছিলেন, নিকটে যেখানেই কথকতা হউক না কেন, তিনি অতীব আগ্রহের সহিত তথায় উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার হৃদয়ের উপর এই কথকতার প্রভাবও অত্যন্ত অধিক ছিল। তিনি শিশুকাল হইতে

কথকতা শুনিতে শুনিতে অঝোরে রোদন করিতেন, লোকে বালকের এই ভাবাবেশ দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইত। কথকতা শুনিয়া কাঁদিতেন, বাড়ী আসিয়া সেই পৌরাণিক চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেনে। স্বর্গীয় বদন অধিকারীর প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ-যাত্রার তিনি একজন অতিশয় অনুরক্ত শ্রোতা ছিলেন। কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের সেই অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস স্মরণে এখনও তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পরও তিনি সর্ব্বদা কথকতা ও যাত্রা শুনিতে যাইতেন ও ভাবে বিভোর হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, লোকে দেখিয়া বুঝিতে পারিত না, অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। ভিক্ষুকদিগের ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণেও শশিপদ বাবুর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল ; ইহা দ্বারাও তিনি বিশেষভাবে অভিভূত হইতেন। এই সমস্তের প্রভাব তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উন্মেষে যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহা তিনি সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞহৃদয়ে বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে শশিপদ বাবুর ধর্ম্মজীবনের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

ভগবানের আনন্দময় সত্ত্বা, জীবনের প্রথম হইতেই, শশিপদ বাবুর হৃদয়ে কেমন সত্যের আলোক প্রজ্বালিত করিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যখন তিনি বালক, সঙ্গীদিগের সহিত খেলা করিতেন, সেই সময়ে ঠাকুর পূজা করা তাঁহার একটি অতি প্রিয় খেলা ছিল। এই সমস্ত খেলাঘরের পূজায় তিনিই পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। মানুষ যে একেবারে শূন্যহৃদয়ে জগতে আসে না, যে কারণেই হউক মানুষ যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্বভাব লইয়া জগতে আসে এবং উত্তরকালের কার্য্যের অঙ্কুর অতি শৈশব হইতেই পরিস্ফুট হয়, এই ঘটনা তাহার একটি জলন্ত উদাহরণ। শশিপদ বাবুর উপনয়ন সংস্কার হওয়ার পর হইতেই তাঁহার মনে আধ্যাত্মিক উপা-

সনার সত্যতা আপনা আপনি জাগিয়া উঠিল। দ্রব্যময় যজ্ঞ, এক অবস্থায় প্রয়োজনীয় হইলেও তিনি অভিব্যক্তির যে সোপানে অবস্থিত, সেই সোপানে জ্ঞানময় যজ্ঞই সেই পরমাত্মার উপাসনা, এই জ্ঞান শশিপদ বাবুর জীবনে প্রায় কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রম কালে অতীব প্রবলভাবে জাগরিত হয়। ইহা তাঁহার মনের একটা স্বাভাবিক বিকাশ।

পূর্ব্বে তিনি যে সাধনপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বহুদিন ধরিয়া তাহা অতীব নিষ্ঠা, ভক্তি ও আন্তরিকতার সহিত পালন করিয়াছিলেন। দেব পূজার পুষ্পনিবেদন, চন্দনলেপন প্রভৃতি কার্য্যে তিনি যে সৌন্দর্য্যানুভাবকতা ও আনন্দযুক্ত একাগ্রতা প্রকাশ করিতেন তাহাও সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার উপনয়ন হয়, উপনয়নের পর হইতেই তিনি সময়ে সময়ে পৈতৃক শালগ্রাম পূজা করিতেন। এই পূজায় তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা ছিল; পুষ্প, নৈবেদ্য, তুলসী, দূর্ব্বা প্রভৃতি অতি যত্নে সুন্দরভাবে সাজাইয়া, ঠাকুরকে স্নান করাইয়া, এমন সুন্দরভাবে চন্দনসজ্জাদি করিতেন যে সকলে বালকের এই নিষ্ঠা ও পারিপাট্যদর্শনে চমৎকৃত হইত, কতদিন তাঁহাদের কুলগুরু পূজার পর পূজার ঘরে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের এই সজ্জা দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেন ও বালক পূজকের অনেক প্রশংসা করিতেন। কিন্তু শৈশবের পরিচ্ছদ যেমন যৌবনের অনুপযুক্ত হয়, তদ্রূপ তাঁহার নিকট এই দ্রব্যময় আনুষ্ঠানিক উপাসনা, অবশ্য ইহার দ্বারা চিত্তের যে বিকাশ, আত্মার যে প্রসার সাধিত হয়, তাহা সাধন করার পর প্রকৃতির নিয়মানুসারে, অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। তাঁহাদের পারিবারিক গুরু ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিত ৺কৃষ্ণহরি শিরোমণি মহাশয় একজন ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ ছিলেন। শিষ্যের এই অভাব উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহাকে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লী হইতে "আনন্দং ব্রহ্মেতি" মন্ত্রে
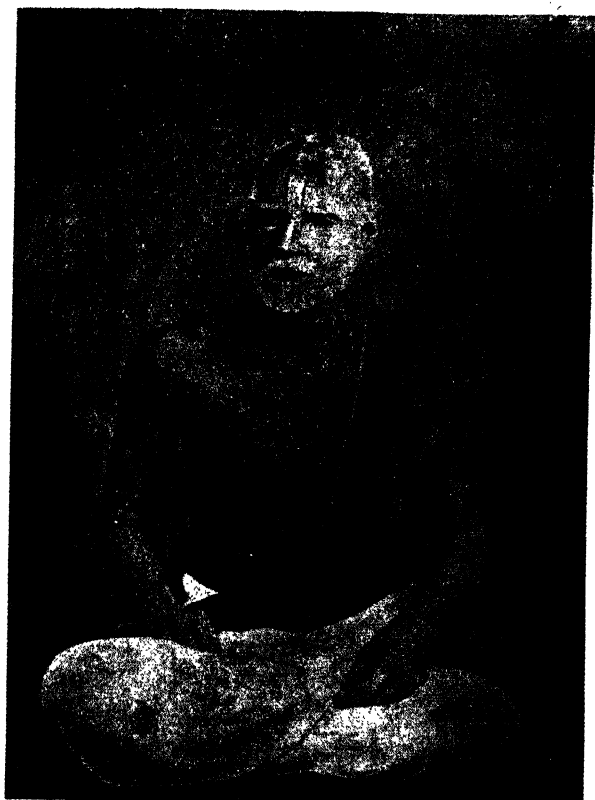
স্বর্গীয় পণ্ডিত কৃষ্ণহরি শিরোমণি

পুনরায় দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার এই যে আধ্যাত্মিক চিত্তবিকাশ, ইহা কোন সংস্কারক সমিতির প্রভাবের দ্বারা সাধিত হয় নাই; সময়ের একটা সাধারণ ধর্ম্মের বা ফ্যাসনের অনুসরণ হইতে তাঁহার মনে এই ভাব জাগরূক হয় নাই। তিনি এই নূতন দীক্ষা গ্রহণের পর সাধনায় যে পথ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা অধুনাতনকালে হিন্দুসমাজে গৃহস্থকে সচরাচর দেওয়া হয় না, তাহার কারণ সদ্‌গুরুর অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে; কারণ মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের কথা রহিয়াছে।

"এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষেব জুহ্বতি॥
বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃত্তিমক্ষয়াং॥
জ্ঞানেনৈবাপরেবিপ্রা যজন্ত্যেতৈ র্মখৈঃ সদা
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞান চক্ষুষা॥"

মনু ৪-২২-২৪।

অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তর-যজ্ঞানুষ্ঠান-শাস্ত্রজ্ঞ, বাহ্য চেষ্টা সমুদয় হইতে উপরত হইয়া সর্ব্বদা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার দ্বারাই এই পঞ্চ মহা-যজ্ঞ (ঋষিযজ্ঞ বা বেদাধ্যয়ন, দেবযজ্ঞ বা হোম, মনুষ্যযজ্ঞ বা অতিথি সৎকার এবং পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি) সম্পাদন করেন।

কোন কোনও জ্ঞানী গৃহস্থ, বাক্য এবং প্রাণবায়ুতে যজ্ঞনিষ্পা-দনের অক্ষয় ফল জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যে প্রাণবায়ু এবং প্রাণবায়ুতে বাক্য আহুতি প্রদান করেন।

অপর কতিপয় ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উপনিষদ-চক্ষু দ্বারা দেখেন যে, জ্ঞানই সমুদায় যজ্ঞের মূল।

এই সমস্ত শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট বলেন "শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসংন্যাসিনাং গৃহস্থানাং অমী বিষয়াঃ।"

মনুসংহিতা হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল, এই কথা গীতা ও উপনিষদেও আছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন ভারতে এপ্রকার উপাসনা, গৃহস্থের জন্যও বিহিত ছিল; এখন অনেকে বলেন যে, ইহা সন্ন্যাসীদিগের জন্য, একথা আদৌ সত্য নহে, আসল কথা তাহা সদ্‌গুরুর অভাব। তাহার পর কলিতে সন্ন্যাস নাই এবং কর্ম্মও জ্ঞানের সমন্বয় বা নিবৃত্ত কর্ম্মই প্রকৃত সন্ন্যাস। এই সমস্ত শাস্ত্রীয় উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলেও, গৃহস্থকে এই দীক্ষার ও এই উপাসনা পদ্ধতির অধিকারী বলিতে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না। যাহা হউক এবিষয়ে শশিপদ বাবু ভাগ্যবান। তাঁহার এই কুলগুরুর দীক্ষাই তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনপথের সহায় হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অগ্নিময়ী বক্তৃতা শ্রবণে শশিপদবাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন বটে, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশকালে কোনরূপ দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার কুলগুরুর নিকট যে দীক্ষা লইয়াছিলেন সেই দীক্ষাই তাঁহার জীবনের একমাত্র দীক্ষা। তিনি তাঁহার এই কুলগুরুকেই আজীবন গুরুভক্তি অর্পণ করিয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রাণ গুরুদেবের সহিত শশিপদ বাবুর সম্বন্ধও বিশেষভাবে আলোচ্য। গুরুদেব বাড়ীতে আসিলে বাড়ীর সকলে তাড়াতাড়ি আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া যাইতেন, তিনি ৭।৮ দিন বাড়ীতে থাকিতেন কিন্তু তাঁহার সহিত কাহারও শাস্ত্র বা সাধন সম্বন্ধে বা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে কোন আলাপ বা আলোচনা হইত না তাঁহার যা বার দিন সকলে প্রণমা করিয়া বার্ষিক প্রণামী দিতেন। গুরুর সহিত শিষ্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহা যেন তাঁহারা বুঝিতেন না। শশিপদ বাবু

তাঁহার গুরুদেবের নিকট প্রথমেই এই অভিযোগ আনয়ন করেন ও তাঁহাকে বলেন যে একালের লোক নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত ও নূতন আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের অন্তর্জীবনে যে সমস্ত নূতন নূতন সমস্যা বা সংশয়ের উদ্ভব হইয়াছে গুরুদেবগণকে তাহার মীমাংসা করিতে হইবে নতুবা গুরুশিষ্যের এই প্রাচীন ও অত্যাবশ্যকীয় সম্বন্ধে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিবে ও ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। গুরুদেব শিষ্যের এই কথাগুলি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছিলেন। শশিপদ বাবুর গুরুভক্তি ও বিশেষভাবে স্মরণীয়, গুরুর সেবার প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল, তিনি কলিকাতা হইতে নূতন নূতন ফল প্রভৃতি গুরুদেবের জন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যক্তিগত অনধীনতার ভাব কিছু প্রবল, এই ভাবের প্রেরণায় আমাদের দেশে যুবক সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রত্যহ কমিয়া যাইতেছে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শিক্ষক, গুরু প্রভৃতিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা না করিলে মানুষের মঙ্গল হয় না এ কথা আমরা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি, আজকাল চারিদিকেই উচ্ছৃঙ্খলতা। এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবিনয়ের দিনে শশিপদ বাবুর গুরুভক্তি বিশেষভাবেই অনুসরণীয়। গুরুদেব যখন তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিতেন, তখন শশিপদ বাবু সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট বসিয়া ধর্ম্ম ও সাধনা সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ গ্রহণ করিতেন। শশিপদ বাবুর যেমন গুরুভক্তি ছিল, তাঁহার গুরুদেবেরও তাঁহার প্রতি সেইরূপ স্নেহ ছিল। এই স্নেহ চিরদিনই সমভাবে বিদ্যমান। শশিপদ বাবু পরে এমন অনেক সামাজিক কার্য্য করিয়াছিলেন যাহা সর্ব্বসম্প্রদায়ের হিন্দু সে সময়ে অনুমোদন করিতে নাই এবং তাঁহার গুরুদেবও অনুমোদন করিতেন না, কিন্তু তথাপি তাঁহার গুরুদেব এরূপ উদারচরিত্রের লোক ছিলেন যে শিষ্যের প্রতি তাঁহার স্নেহের কখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহার কারণ এই যে তাঁহার গুরুদেব দেখিতেন যে তাঁহার শিষ্য যাহা করি-

তেছে তাহা সকলের অনুমোদনীয় না হইতে পারে কিন্তু তিনি যাহা করিতেছেন তাহা সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আন্তরিকতার সহিত দেশের কল্যাণের প্রতি চাহিয়াই করিতেছেন, নিজে যশস্বী হইবার জন্যও নহে, নিজের সুখ সুবিধার জন্যও নহে। অধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এই সরল বিশ্বাস, পরার্থপরতা ও আত্মোৎসর্গই প্রশংসার বস্তু।

শশিপদ বাবুর গুরুদেবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অতি সুন্দর ও মধুর ছিল। উত্তরকালে তাঁহার গুরুদেব শশিপদ বাবুর বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন, কিন্তু দেশাচারের অনুরোধে তথায় আহার করিতে পারিতেন না, গুরুদেব আসিলে শশিপদ বাবুর পৈতৃক বাটীতে যাইয়া সপরিবারে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। শশিপদ বাবু দ্বিতীয় পক্ষে বিধবাবিবাহ করার পরেও তাঁহার গুরুদেব তাঁহাদের পৈতৃক বাটিতে স্বয়ং দাঁড়াইয়া তাঁহাদের প্রসাদ দিয়াছেন। এই ভাবটি যদি আমাদের দেশের সকল সংস্কারক অবলম্বন করিতেন, যদ্যপি তাঁহারা সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াও পৈতৃক বাসভবন ও জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের সহিত এবং গুরু পুরোহিত প্রভৃতি যাঁহাদের সহিত বংশানুক্রমিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে তাঁহাদের বর্জ্জন না করিয়া তাঁহাদের সহিত সখ্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন, তাহা হইলে অনেক অনৈক্য ও বিদ্বেষের অবসান হইত।

একবার সুপ্রসিদ্ধ কেইন সাহেব শশিপদবাবুর নিমন্ত্রণে বরাহনগরে গমন করেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শশিপদ বাবুর গুরুদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কেইন্ সাহেবকে পুষ্পমাল্য দ্বারা অভিনন্দিত করেন। সরলতা ও শ্রদ্ধার দ্বারা জগতের সকল বৈষম্যের মীমাংসা হয়, ভারতবর্ষের উদীয়মান জাতীয় জীবনের ঐক্য বন্ধনে এই সরলতা ও শ্রদ্ধার

প্রয়োজন, এই দুইটি গুণের অনুশীলনে শশিপদ বাবু আমাদের দেশবাসীগণের বিশেষভাবে অনুকরণীয়।

শশিপদ বাবুর ধর্ম্মজীবনের কথা আলোচনা করিতে হইলে, একটি বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমেই দৃষ্টি পতিত হয়, ইহা তাঁহার অসাধারণ বিশ্বজনীনতা, তিনি জীবনে সর্ব্ববিধ সংস্কারের কার্য্যে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; উদারতম ধর্ম্ম ও সামাজিক মত, তিনি চিরকালই পোষণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি আপনাকে চিরদিন হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিতে তিনি বিশেষরূপ গৌরব অনুভব করেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এমন একটা দিন ছিল, যখন অনেক ব্রাহ্ম 'হিন্দু' এই নামকে অতীব ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। শশিপদ বাবু সে সময়েও নিজেকে গৌরবের সহিত 'হিন্দু' বলিতেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক উপহাসও সহ্য করিতে হইয়াছিল। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান আদর ও আস্থা, একটা পরম সমন্বয়ের ভিত্তি হইতে সর্ব্ববিধ উপাসনাপদ্ধতি দর্শন, ইহাই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বিশেষ লক্ষণ। সকল সম্প্রদায়ের লোক, তাঁহার গৃহে, সমানভাবে গৃহীত হইতেন এবং সর্ব্ববিধ উপাসনায় তাঁহার অনুরাগ ছিল।

শশিপদ বাবু যৎকালে শ্রমজীবিদিগের জন্য নানারূপ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই সময়ে বরাহনগরে "কর্ত্তাভজা" নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকগুলি উপাসনা স্থান ছিল। বনহুগলীতে নিমচাঁদ মৈত্রের বাগান এই সমস্তের মধ্যে অন্যতম। এই স্থানে, সপ্তাহে একদিন করিয়া, নিম্নজাতীয় হিন্দুগণ সম্মিলিত হইত এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে, স্তোত্র পাঠ ও আরাধনা করিত। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু সময়ে সময়ে এই স্থানে যাইতেন। তিনি স্বীকার করেন যে, তাহাদের উপাসনার ঐকান্তিকতার দ্বারা

তিনি সেই দলে মিশিয়া বিশেষরূপ উপকৃত হইতেন। এই দলের অনেক লোকও শশিপদ বাবুর বাড়ীতে যে ধর্ম্মসভা হইত, তথায় আসিত। এখন আর, এই সমস্ত উপাসনার স্থান বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন বরাহনগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে অনেক সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ঐ সমস্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের ঐকান্তিকতা সেই সঙ্কীর্ত্তনে পরিদৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তৎপ্রণীত নিম্নশ্রেণীর উন্নতি বিষয়ক ইংরাজী পুস্তিকায় (Elevation of the masses and the Depressed classes) এই সমস্ত সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই সব দল সংগঠনে বা কীর্ত্তনের মধ্যে সকলকে সম্মিলত করিতে শশিপদবাবুও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহা হউক এদিকে তাঁহার চেষ্টা ভগবানের কৃপায় বেশ সফলতা লাভ করিয়াছে। এখন দেশে আবার নূতন করিয়া সংকীর্ত্তনের বহুল অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শশিপদবাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন ও বরাহনগরে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অবশ্য তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও পরিবার-বর্গের মধ্যে এই লইয়া একটা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। তিনি সমাজচ্যুত হইলেন ও তাঁহার উপর নানারূপ অত্যাচার হইতে লাগিল। এই সমস্ত অত্যাচার ঈদৃশ বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল যে, তিনি তাঁহার ছয় পুরুষের অধ্যুষিত প্রাচীন পারিবারিক গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রথম বয়সে শশিপদবাবু তাঁহার গ্রামবাসীগণের হস্তে যে অতি ভীষণ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন তাহা ধারণাতীত। দুইবার জেল, জল বন্ধ, পথবন্ধ, ধোপানাপিত ও নৌকা বন্ধ, প্রাণনাশের চেষ্টা, তাহা ছাড়া অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে কত সভা করা, নিন্দা করা, এ সমস্তের ত

কথাই নাই। যাঁহারা তাঁহার বন্ধু, গ্রামের মধ্যে তাঁহারা পর্যান্ত সাহস করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিতেন না, কলিকাতায় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহারা দেখা শুনা করিতেন। সন্তান প্রসবের সময় ধাত্রী পর্য্যন্ত বন্ধ, তখন নূতন ধাত্রী সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয় নাই, তাঁহাকে নিজে ধাত্রীর কাজ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। গ্রামের লোক মেথরকে পর্য্যন্ত বলিয়াছে যে তুমি যদি শশিবাবুর কাজ কর তাহা হইলে আমরা তোমায় রাখিব না! সে ব্যক্তি পর্য্যন্ত ভয়ে শশিবাবুর কাজ করে নাই। এই সমস্ত অত্যাচার ও নির্য্যাতন তিনি সহ্য করিয়াছেন, তথাপি স্বগ্রাম পরিত্যাগ করেন নাই, ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতীত্বের পরিচায়ক। এই সমস্ত অত্যাচারের মধ্যেই সত্যের পরীক্ষা হয়, প্রহ্লাদকেও কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, এই সমস্ত পরীক্ষা ভগবানের মঙ্গলকর ইচ্ছার প্রকাশ, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই মানবের সত্যনিষ্ঠা অবিসম্বাদিত বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। শশিপদ বাবু কি ভাবে এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সমস্ত অত্যাচার যে ভগবানের করুণাও পরীক্ষা ইহা তিনি চিরদিনই অনুভব করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসু মহাশয় তাঁহার "বিশ্বাস ও প্রেমের জয়" নামক পুস্তিকায় এই সমস্ত অত্যাচার কাহিনী ব না করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন "এই সমস্ত দেখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ক্ষমার অ'তার বলিয়াই মনে হয়।"

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি যে অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইয়াছে তাহার অতি সংক্ষেপে আভাস মাত্র প্রদত্ত হইল। বরাহনগরনিবাসী "পীযুশ লহরী" "দম্পতিপ্রেম সঙ্গীত" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ও প্রতিবাসী পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অতি প্রাচীন শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সমস্ত নির্য্যাতন স্বচক্ষে

দেখিয়াছিলেন তিনি তৎপ্রণীত "সেবাব্রত উপাখ্যান" নামক কবিতা গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিয়াছেন।

"বরাহনগরে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার প্রতিবাসী এবং বন্ধু। তিনি আমার অপেক্ষা দশবৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ. আমি তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করি ও ভালবাসি। তিনি দেশের উন্নতি কল্পে আধুনিক উদার পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষার পরিধি বাড়াইতে গিয়া রক্ষণশীল অনুদার দেশের দলপতিগণের বিষনয়নে নিপতিত হয়েন। নারী শিক্ষা ও ব্রাহ্মণেতর সাধারণ জাতির বিদ্যা শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া দেশের পরম শত্রু ও ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধাচারী প্রভৃতি বিবিধ অভিধানে অভিহিত হয়েন। সমস্ত দেশ এক হইয়া তাঁহার সংশ্রব ত্যাগ করিল। যাঁহারা কৃতবিদ্য তাঁহারা ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইয়া সেবাব্রতের সমস্ত কার্য্যে বিঘ্নোৎপাদন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সেবাব্রত যখন ইংলণ্ডে তখন তাঁহার ক্যার্য্যকলাপের উপর তীব্র সমালোচনা করিবার জন্য বরাহনগরে একটী সভা আহুত হইল। অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করা শিষ্টাচার সঙ্গত নয় বলিয়া ডাঃ ডিঃ, ওয়াল্‌ডি সাহেব প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সে প্রতিবাদে কোন ফল হইল না দেখিয়া, তিনি ক্রোধের সহিত সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। শশিপদ বাবুর উপর অত্যাচারের পর অত্যাচার, নির্য্যাতনের পর নির্য্যাতন পূর্ণ মাত্রায় চলিতে লাগিল লেখক স্বচক্ষে সে সমস্ত দেখিয়াছে কিন্তু সমস্ত লোকের প্রতিকূলে সহানুভূতি দেখাইবার সুবিধা পায় নাই। যাঁহারা প্রথমে পক্ষ সমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের অধিকাংশ বেগতিক দেখিয়া সেবাব্রতকে ব্যাঘ্রের মুখে সমর্পণ করিয়া আপনারা সরিয়া দাঁড়াইলেন।"

ডাক্তার ওয়াল্‌ডি সাহেব বরাহনগরের একজন অধিবাসী, তাঁহার

বরাহনগরে সাল্‌ফিউরিক এসিড্‌ প্রভৃতির কারখানা ছিল। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর। ইনি শশিপদ বাবুর সমস্ত কার্য্যের একজন বিশেষ উৎসাহ দাতা ছিলেন। উদ্ধৃত অংশ হইতে একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার আছে। গ্রন্থকার ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহানুভূতি মুখের কথায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই আর আজ তিনি তাহা মুদ্রিত গ্রন্থে প্রচার করিতেছেন। দেশের চিন্তা প্রণালী এই ৪০ বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ও ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু কেশববাবুর মতের সহিত শশিপদ বাবুর মতের সমস্ত বিষয়ে মিল ছিল না। যেমন কেশববাবু যজ্ঞসূত্রধারী পুরোহিতকে ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিতে দিতেন না, এই বর্জ্জনের সহিত শশিপদ বাবুর আদৌ সহানুভূতি ছিল না, বরং তিনি চিরদিনই এই প্রকার বর্জ্জননীতির বিরোধী। মানুষ যে মানুষ বলিয়া পবিত্র, মানুষের আত্মাই যে প্রকৃত মানুষ এবং সেই মানবের আত্মাতেই যে ভগবানের পূর্ণতম বিকাশ, এ জ্ঞানটা শশিপদ বাবুর জীবনে চিরকালই বিশেষভাবে জাগ্রত। মানুষের বেশভূষা, আচার, আচরণ এ সমস্ত অতি বাহিরের কথা; এ সমস্ত বিষয়ে সকলেরই স্বাধীনতা থাকিবে। এই বাহিরের ব্যাপারের যে মিলন, তাহা ত ক্ষণস্থায়ী বাহিরের মিলন। অনেক সময়ে এ মিলন আবশ্যক হইতে পারে সত্য কিন্তু, তাহা হইলেও ইহা ব্যবহারিকমাত্র। যাঁহারা অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন, মানবের এই স্থূল ও নশ্বর দেহকে, সেই বিশ্বনাথের, সেই নিত্যানন্দময়ের, আসন বলিয়া যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা নিজের আত্মায় ও বিশ্বমানবের আত্মায় সেই পরমাত্মাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই প্রেমময় বিশ্বপ্রাণকে আরও নিবিড়ভাবে, আরও স্পষ্টভাবে, অনুভব ও উপভোগ

করিবার জন্য, যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি সত্য সত্যই পাগলের মত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সচ্চিদানন্দ সত্যস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপকে সমাজে সংসারে ও আমাদের যাবতীয় সাংসারিক সম্বন্ধে, আমাদের প্রেমে, স্নেহে, বন্ধুতায়, আমাদের আহারে, বিহারে, ব্যবহারে, আমাদের বিষাদে, বেদনায়, আশায়, আনন্দে, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যাঁহার কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহার সর্ব্ববিধ সংস্কারের আদর্শ সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্ঠা, তাঁহার বাহিরের অনিত্য বিষয় লইয়া বিরোধ করিবার সময় নাই। আভ্যন্তরীণ ঐক্য, পারমার্থিক সাম্য, তাঁহার মনকে সর্ব্ববিধ বৈষম্য ও বিরোধের ঊর্দ্ধে শাশ্বত মিলনভূমিতে তুলিয়া রাখিয়াছে। ইহাই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের, ও সর্ব্বচেষ্টা সর্ব্বসাধনা সমন্বয়ের একমাত্র ভূমি। শশিপদ বাবুর জীবনের আদর্শ ইহাই, তিনি আজীবন এই আদর্শের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, "দেবালয়" এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার চরম ফল।

বিবিধ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ লইয়া, ব্রাহ্মসমাজে যখন বড়ই গোলযোগ চলিতেছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, এক আশ্চর্য্য প্রকারের কার্য্যসাধন করিয়া শশিপদ বাবু তাঁহার এই সমন্বয়প্রবণ চিত্তের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে, তিনি, এককালেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মনেতা ধর্ম্মপ্রাণ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, বরাহনগর সমাজের বেদীতে উপবেশন করাইলেন। ইহা ছাড়া আরও দুইবার, তিনি, তাঁহার পারিবারিক বেদীতে মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দকে একত্র করিয়াছিলেন। শশিপদ বাবুর চরিত্রের এই অংশটি অনেকের নিকটেই দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার মত বোধ হইয়াছে।

আমাদের মনে হয় প্রত্যক্ষ ভাবে সর্ব্বত্র ঈশ্বরের সত্তা ও ক্রিয়াশীলতা অনুভব করাই, তাঁহার প্রকৃতিগত এই সমন্বয়ের হেতু। তাঁহার

ভগবিশ্বাস কিরূপ অদ্ভুত, তাহা, এই ভৌতিক বিজ্ঞান বা জড়বাদের যুগে, আমরা সহজে ধারণাই করিতে পারি না। প্রার্থনার দ্বারা কি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি অতি বিখ্যাত ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

বিশ্বাস ও প্রার্থনা দ্বারা সকল প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয়, জীবনের সকল সমস্যার মীমাংসা হয় ইহাই শশিপদবাবুর দৃঢ়তম বিশ্বাস। এ বিশ্বাস কেবল মুখের কথায় বিশ্বাস নহে, তিনি বাস্তব জীবনে, জীবনের অতি কঠিন পরীক্ষার সময়, অতি নিশ্চিন্ত ভাবে এই বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার তেমন বিশ্বাস নাই, তিনি বলেন কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া যে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়, যে ঔষধ বিশ্বাস ও ভগবৎ প্রার্থনার সহিত ব্যবস্থা করা ও সেবন করান হয় না, সে ঔষধে রোগীর উপকার হয় না। তাঁহার নিজের কোন ব্যাধি হইলে তিনি প্রথমে নিজের চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাহা আন্তরিক বিশ্বাস সহকারে নহে। তিনি বলেন প্রার্থনা ও বিশ্বাস, ব্যাধি নাশের অদ্বিতীয় উপায়।

শশিপদ বাবুর চতুর্থ কন্যার ডাক নাম সোফিয়া; দুরারোগ্য ডিপথিরিয়া রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েন। পারিবারিক চিকিৎসকের সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইয়া গেল, রোগের উপশম হইল না, ক্রমে ক্রমে রোগী মৃত্যুর সমীপস্থ হইলেন। অস্ত্রচিকিৎসক প্রস্তাব করিলেন যে শ্বাসনলীতে ছিদ্র করিয়া দিতে হইবে। এই কার্য্য অত্যন্ত কঠিন বলিয়া, তিনি, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য, আর একজন অস্ত্রচিকিৎসককে আনাইতে বলিলেন। প্রতিকারের এই শেষ উপায় অবলম্বিত হইবার পূর্ব্বে, কলিকাতা হইতে আর একজন সুচিকিৎসক আনাইবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। শশিপদবাবুর স্ত্রীর আর ব্যাকুলতার সীমা নাই

কিন্তু সেই চিকিৎসককে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাইবেনা, তাঁহার আসিতে অন্ততঃ পক্ষে দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। আর সময় নাই, রোগীর অন্তিমকাল উপস্থিত, ঊর্দ্ধশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে, রোগী, মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হইয়া, ক্ষীণ ও ভগ্ন স্বরে আত্মীয় বন্ধু ও পিতামাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। এই অবস্থায় শশিপদবাবু চিত্তের স্থৈর্য্যবিধান করিয়া, ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করিলেন, কয়েক মূহুর্ত্ত নীরবে ধ্যানস্থ থাকিয়া, তিনি বালিকাকে ক্রোড়ে লইলেন ও সেই কক্ষের এদিকে ওদিকে বেড়াইতে লাগিলেন, তিনি যে সময়ে এই ভাবে বেড়াইতে ছিলেন সেই সময়ে একাগ্র চিত্তে, ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত গান করিতেছিলেন। কয়েকবার ঘরের চারিদিকে এইভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে রোগীর ঊর্দ্ধশ্বাস কমিয়া গেল, যন্ত্রণার উপশম হইল, একপক্ষ কাল যন্ত্রণায় রোগীর নিদ্রা হয় নাই, এখন সে বেশ সুস্থভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। সময়ে চিকিৎসক স্বর্গীয় অন্নদাচরণ কাস্তগির আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার আর চিকিৎসার প্রয়োজন নাই, তাঁহার বিজ্ঞানের অতীত কোনও অলৌকিক পদ্ধতিতে বালিকা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এই ঘটনার পর কয়েকদিনের মধ্যেই বালিকা বেশ সারিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য। শশিপদ বাবুর স্ত্রী পীড়িত, কিছুদিন হইতে তাঁহার উদরে এক অসহ্য বেদনা অনুভূত হইতেছিল। অনেক চিকিৎসক চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, বিশেষ ধীরতার সহিত বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রদান করিলেন, এক সপ্তাহ কাল সেই ঔষধও সেবন করান হইল, কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। এই প্রকারে সমস্ত চিকিৎসকের চেষ্টা যখন বিফল হইল, রোগীর যন্ত্রণা যখন একেবারে চরমে উঠিয়াছে, তখন শশিপদ বাবু

তাঁহাকে বলিলেন "এখন সমস্ত চিকিৎসাইত হইয়া গেল, কিছুতেই কোন ফল হইল না, এখন আমার ঔষধ একবার ব্যবহার করিয়া দেখিলে হয় না ?" রোগী সম্মত হইলেন। তখন শশিপদ বাবু বলিলেন "তোমার সমস্ত পাপ ভগবানের নিকট স্বীকার করিয়া অনুতাপ কর, আমি ইতিমধ্যে প্রার্থনা করিতেছি।" এই বলিয়া শশিপদ বাবু ধ্যানস্থ হইলেন. তাঁহার স্ত্রী তাঁহার চরণ মূলে বসিয়া রহিলেন। এই ভাবে বসিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিলেন, কথায় বা কার্য্যে, যত কিছু অপরাধ করিয়াছিলেন, সমস্ত স্বীকার পূর্ব্বক মার্জ্জনা ভিক্ষা করতঃ তিনি তাঁহার ধ্যানস্থ স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া, রোগাক্রান্ত স্থানে তাহা লেপন করিলেন। ইন্দ্রজাল অপেক্ষাও অদ্ভুত ফল ফলিল। এতদিন বহু বহু বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় যাহা হয় নাই, দেখিতে দেখিতে তাহাই হইল ; তাঁহার নিদারুণ ও অসহনীয় রোগযন্ত্রণা মুহূর্ত্ত মধ্যে সারিয়া গেল। শশিপদ বাবুর পত্নী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। এই ঘটনাটি শশিপদ বাবুর স্ত্রীর দৈনন্দিন লিপিতে লিখিত আছে। আমরা শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের লিখিত "ইন্দুবালা— গার্হস্থ্য চিত্র" নামক ইংরাজী গ্রন্থ হইতে এই ঘটনা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই সময় হইতে শশিপদ বাবুর বাটিতে এক অভিনব প্রথার উদ্ভব হইল। পারিবারিক উপাসনার পর, তাঁহাদের বাটির প্রত্যেকেই নিজ নিজ গুরুজনকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এখন অনেক ব্রাহ্ম পরিবারেই উপাসনার পর যাঁহারা কনিষ্ঠ তাঁহারা জ্যেষ্ঠদিগের পাদবন্দনা করিয়া থাকেন। প্রথম অবস্থায় এই ভাব আদৌ ছিল না। এই প্রথার প্রবর্ত্তন খুবই আনন্দের বিষয়, কারণ হিন্দু জাতির যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, এই পাদ বন্দনা তাহার প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি মাত্র।

তৃতীয় ঘটনাটি এই। শশিপদ বাবুর দ্বিতীয়া কন্যা অন্তঃপুর নামক বিখ্যাত পত্রের সম্পাদিকা স্বর্গীয়া বনলতা দেবীর বয়ঃক্রম তখন পঞ্চদশ বৎসর। তাঁহার কিছুদিন হইতে খুব জ্বর হইয়াছে, উত্তাপ খুব অধিক, ১০৬ ডিগ্রী। তাহার উপর আর এক উপসর্গ, রোগীর ভীষণ শ্বাস কষ্ট হইতেছে। ক্রমশঃ শ্বাস কষ্ট এতই বাড়িয়া উঠিল যে, রোগীর আর জীবনের আশা নাই, পরিবারের সমস্ত লোক আসিয়া রোগীর শয্যা-পার্শ্বে সমবেত হইলেন। আর উপায় নাই, রোগীর মাতা কাতর স্বরে রোদন করিতেছেন। চিকিৎসক ডাকিতে লোক গেল, কিন্তু আর সময় নাই, চিকিৎসক আসিতে আসিতেই সমস্ত ফুরাইয়া যাইবে। শশিপদ বাবু কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এক নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন, তথায় কিছুক্ষণ একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিয়া, এক ঔষধের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া একখণ্ড আর্দ্র বস্ত্র রোগীর নাভীর উপর বসাইয়া দিতে বলিলেন। দেখিতে দেখিতে যন্ত্রণা কমিয়া গেল, চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন. কিন্তু দেখিলেন তাঁহার সহায়তার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সমগ্র চিকিৎসা শাস্ত্র মন্থন করিয়া যাহার আভাষ মাত্র পাওয়া যায় না, এই প্রকারের চিকিৎসার সাহায্যে রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

আর একটি ঘটনা এই। শশিপদ বাবুর কন্যা ইন্দু, একদিন বিধবা-শ্রমবাসিনী একটি যুবতীর সঙ্গে রন্ধনে নিযুক্ত ছিল। সেইবড় মেয়েটির অসাবধানতা বশতঃ তরকারির-কড়া উল্টাইয়া যাইয়া ইন্দুবালার পায়ের উপর পড়িয়া গেল, হাঁটু হইতে সমস্ত পা একেবারে দগ্ধ হইয়া গেল; সে যে কি কষ্ট তাহা যাঁহারা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই জানেন। বালিকা পায়ের জ্বালায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং মুখ ও চক্ষু নীলবর্ণ হইয়া গেল। অনেক প্রকার ঔষধাদি দেওয়া হইল, কিছুতেই জ্বালা নিবারণ হইল না।

শশিপদ বাবু সমস্ত দেখিয়া গম্ভীরভাবে নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন এবং ঐকান্তিক ভক্তিযুক্ত প্রার্থনার সহিত কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। একটু পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে বলিলেন "কিছুতেই ইন্দুর পায়ের জ্বালা নিবারণ হইল না? একটু কাঁচা দুগ্ধ আন এবং পাতলা নেকড়া দুগ্ধে ভিজাইয়া দগ্ধ স্থানে লাগাও] এখনই জ্বালা নিবারণ হইবে।" এই বলিয়া তিনি ইন্দুর কাছে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। দুগ্ধের নেকড়া ভিজাইয়া ইন্দুর পায়ে দেওয়া হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে জ্বালা কমিয়া গেল। এই ঘটনায় সকলেই কিরূপ বিস্মিত হইলেন তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রার্থনা দ্বারায় প্রাপ্ত ঔষধে নিজের ও অপরের রোগ আরোগ্য করার ঘটনা শশিপদ বাবুর জীবনে অনেক আছে। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী যদি কখনও লিপিবদ্ধ হয় তাহা হইলে এই সমস্ত ঘটনা সকলে জানিতে পারিবেন। এই ঔষধের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে তাঁহার একটি বিশেষ ধারণা আছে, এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষ ভাবে আলোচ্য। নিজের কোনও একটি ব্যাধি আরোগ্যের জন্য ধ্যান ও প্রার্থনার ফলে একটি ঔষধ পাইয়া তাহা ব্যবহার করিলেন, ফলে রোগ সারিয়া গেল। কয়েক বৎসর পরে আবার সেই রোগ দেখা দিল, তখন যদি সেই ঔষধই নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে তাহাতে ফল হইবে না। তিনি বলেন কেবলমাত্র বস্তুশক্তিতেই ব্যাধি আরোগ্য হয় না, প্রার্থনার দ্বারা সঞ্জাত ভগবানের করুণা বা অপর কোন শক্তি বস্তু শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বা বস্তু শক্তির সহিত মিলিত হইয়া আরোগ্য বিধান করে। কাজেই আমরা যদি নিজের জ্ঞানের অহঙ্কারে ঐ প্রার্থনাকে বাদ দিয়া কেবল বস্তু লইয়াই অগ্রসর হই, তাহা হইলে কৃতকার্য্যতা নাও হইতে পারে। এ প্রকারের পরীক্ষাও

তাঁহার জীবনে অনেক হইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থই হইতে পারে। তাঁহার এই মতের বিষয় চিন্তা করিলে একটি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ গল্প মনে পড়িয়া যায়। একজন দরিদ্র লোককে আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি রূপে চলে?" সে উত্তর করিল "কোন দিন ভগবান চালাইয়া দেন আর কোন দিন আমি নিজে চালাই।"

প্রশ্ন—"সে কি রকম?"

উত্তর—"যেদিন তিনি চালান, সেদিন বেশ সুখে চলিয়া যায়, আর যে দিন আমি নিজে চালাই সেদিন আর চলেনা।"

শশিপদ বাবুর ধর্ম্মজীবনের প্রভাব তাঁহার পরিবারবর্গের ধর্ম্মজীবন, প্রীতি, সন্তোষ ও শান্তিশীলতা হইতে আমরা পরিস্কাররূপে বুঝিতে পারি। শশিপদ বাবুর জীবনের আদর্শই এই যে, সমস্ত সৎকার্য্যই ভগবৎ-প্রেম হইতে নিঃসৃত হয়। তিনি দৈনিক প্রার্থনাকে ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতেই দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছেন। পরিবারে ধর্ম্মভাব সুষ্ঠুরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সকলে একত্র হইয়া সরল ও হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত, শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশ সহ প্রত্যহ উপাসনা করিতেন। ফলে, সন্তানগণ জীবনেব প্রথম প্রত্যুষ হইতে, চেতনার উন্মেষ হইতেই সেই প্রেমস্বরূপ মঙ্গলালয়ের শান্তিসুরভির মধ্যে নন্দনকাননের পারিজাত কুসুমের মত বিকশিত হইয়া উঠে।

প্রার্থনা ব্যতীত শশিপদ বাবু কোন বিশেষ কার্য্য আরম্ভ করেন না। প্রার্থনা হইতে প্রাপ্ত আলোক ব্যতীত তিনি জীবনের কোনও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন না। তাঁহার এই গম্ভীর ও নিত্যকালব্যাপী প্রার্থনার ভাব কেবল তাঁহার পরিবারবর্গের নহে, যে কেহ তাঁহার সন্নিধানে ও সংসর্গে আগমন করেন অলক্ষিতভাবে,

কোনরূপ চেতন চেষ্টা ব্যতিরেকে, তাঁহার জীবনে সঞ্চারিত হয়।

তাঁহার গুরুদেব স্বর্গীয় কৃষ্ণহরি শিরোমণি মহাশয় শশিপদ বাবুর পরিবার সম্বন্ধে বলিতেন যে, ইহা সর্ব্বাংশে প্রাচীনকালের ঋষিদিগের আশ্রমের সহিত তুলনীয়।

গভীর প্রার্থনাশীলতা, প্রার্থনার আলোকে আত্মাধ্যয়ন, প্রীতি, ক্ষমা, বিনয় ও সেবা দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ব্যবহার এই সমস্ত শশিপদ বাবুর জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় পরিদৃষ্ট হয়।

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার স্মারকলিপির মধ্যে তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ইংরাজীভাষায় যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম, ইহা হইতে তাঁহার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারা যাইবে। অনুবাদ এই—

"১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিসূচিকা রোগে আমার মাতার মৃত্যু হয়। আমি তখন শালকিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্রের পিতা স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয় এই বিদ্যা-লয়ের স্বত্বাধিকারী ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষেত্রধন বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মাতার মৃত্যুর দুই মাস পরে বিসূচিকা রোগেই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও মৃত্যু হয়।

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরাপান এই সময়ে খুব বেশী পরিমাণে প্রচলিত ছিল। যে মদ খাইতে আপত্তি করিত, লোকে তাহাকে অসভ্য ও উন্নতির সহিত অপরিচিত বলিয়া বিবেচনা করিত এবং তাহাদিগকে অনেক গঞ্জনা ও উপহাস সহ্য করিতে হইত। ফলে এ সময়ে বরাহনগরে সুরাপান বড়ই প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। আমার ভ্রাতা ও তাঁহার বন্ধুগণ আপনাদিগকে উন্নত বলিয়া খুব গর্ব্ব বোধ করিতেন সুতরাং সুরাপানও করিতেন। আমাদের বাড়ীতে

সুরাপায়ীদিগের দল বসিত। এই উদাহরণের কুফল যে আমার চরিত্রে ফলে নাই তাহা ও নহে! আমার বয়স যখন আঠার বৎসর, আমি তখন তাহাদের দলে মিশিয়া পড়িলাম, তবে ভগবানের কৃপায় অধিকদিন আমাকে তাহাদের দলে থাকিতে হয় নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষ অংশে আমার খুব কঠিন পীড়া হয়, এই পীড়া হইতে আমি সারিয়া উঠিলাম বটে তবে আমার চিন্তারাজ্যে এই পীড়া এক ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। আমার মনে অনেক গভীর বিষয়ের চিন্তা জাগিয়া উঠিল। ভগবানের করুণ হস্তের স্পর্শ এই প্রথম আমি আমার জীবনে উপলব্ধি করিলাম, আমার জীবনের গতি এই প্রথম পরিবর্ত্তন হইল।* এই ঘটনার পর মাতার মৃত্যু! তাহার পরেই আমার ভ্রাতা পরলোক গমন করিলেন। জীবনে এক মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, উপর্য্যুপরি সংঘটিত এই তিনটি ঘটনায় আমার মনে অনেক গভীর চিন্তার উদয় হইল আমার অতীত জীবনের কথা ভাবিয়া আমার মনে অতিশয় তীব্র অনুতাপের উদয় হইল। আমার ব্যথিত হৃদয়ে দারুণ অশান্তির উদয় হইল। আমি একা নির্জ্জনে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রথমে আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের কুলগুরু পূজনীয় কৃষ্ণহরি

---

* In the latter part of 1859, I had a severe illness from which I recovered, but it gave a good healthy shock to my mind by bringing grave thoughts in me. This was the first touch of His hand for turning my life's dial to the right. Then came my mother's death which was followed by the death of my brother. A change came upon me. Grave thoughts now crowded upon me and I began to look with disgust and remorse upon my past life. I used to rove about alone and in solitude &c. &c.

শিরোমণি মহাশয়ের নিকট আমাদের কুলমন্ত্র বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। এইমন্ত্রে আমার ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি আসিল না। প্রাণপ্রদ একটা কিছু পাইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। সেই বৎসরেই গুরুদেব পূজার অবকাশের সময় আমাদের বাড়ী আসিলেন তাঁহার সহিত কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত আমার ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহাতে আমার প্রাণে আরাম হইতেছে না। তিনি আমার কথা শুনিলেন এবং আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া পুনরায় আমায় দীক্ষা দান করিলেন, তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লী হইতে "আনন্দং ব্রহ্মেতি" মন্ত্রে তিনি আমায় দীক্ষিত করিলেন। এই সময় হইতে আমার এক নবজীবনের সূত্রপাত হইল। এই বৎসর আমি আমার স্ত্রীকে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলাম, তাঁহাকে বর্ণমালার সহিত যেমন পরিচয় করাইতে ছিলাম, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও উপদেশ দিতে লাগিলাম।

আমি আমাদের জাতীয় ব্রহ্মজ্ঞানে দীক্ষিত হইলাম এবং আমার সাধন ও এই ভাবে চলিয়াছে। এই কারণে আমি হিন্দু। যে সময় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় হিন্দু নামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, আমি সে সময়ে নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতাম। পাশ্চাত্য চিন্তা ও শিক্ষা যে আমার মধ্যে প্রবেশ করে নাই তাহা নহে, এই চিন্তা ও শিক্ষাদ্বারা আমার বাহ্য জীবনে অনেক প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু অন্ত র্জীবনে সেই এক ভাবই আছে, সেই ভাব আমি আমার গুরুদত্ত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে লাভ করিয়াছিলাম।

আমি হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করার জন্য সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ আমার উপর তত প্রসন্ন ছিলেন না। এই ঘটনার অনেক দিন পরে বাবু রাজনারায়ণ বসু ১৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ (সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে, পূর্ব্বে যে বাড়ীতে ট্রেনিংস্কুল ছিল) বাড়ীতে হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় (তখন তিনি মহর্ষি হন নাই) এই সভায় সভাপতি ছিলেন। এই বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজে বেশ একটু আন্দোলন আরম্ভ হইল। কেশববাবু ইহার প্রতিবাদে দুইটি বক্তৃতা করেন। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লক্ষ্ণৌ নগরীতে একটি বক্তৃতা করেন। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজে কুফল হইবে তাহাই নষ্ট করার জন্য এই বক্তৃতা। কেশববাবু ও অন্যান্য অনেকে সে সময়ে হিন্দু নামের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।* কাজেই আমার উপর

---

* স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় উত্তরকালে যেমত প্রচার করিয়াছেন এইটুকু পাঠ করিয়া আমরা যেন তাহা বিস্মৃত না হই। তিনি পরবর্ত্তীকালে "জাতীয় বিধান" নামক প্রবন্ধে বলিতেছেন "কিন্তু এই বৃক্ষের (নববিধানের) রস হিন্দু। এই বিধানের দক্ষিণ হস্তে ইংরাজী বিদ্যা ও সভ্যতা বামহস্ত মুসলমান তেজঃ কিন্তু ইহার রক্তে হিন্দুর যোগ ভক্তি, হিন্দুর কোমল প্রীতি। যিনি নববিধানের ব্রাহ্ম তিনিই প্রকৃত হিন্দু। কেননা যিনি প্রকৃত ব্রাহ্ম তাঁহার চরিত্রে স্বদেশীয় ভাব বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হয়। যিনি বেদবেদান্ত পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে এবং মহাদেব দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তি হইতে নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করিয়া লেন এবং যিনি আপনার দৈনিক আচার ব্যবহারে ধর্ম্মের সাত্ত্বিক নিয়মাদি পালন করেন, তাঁহার ন্যায় যথার্থ হিন্দু আর কোথায় আছে।* * নববিধানের ভক্ত প্রকৃত হিন্দু। ব্রাহ্মদিগের হিন্দু-বিরোধী জাতিচ্যুত বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করা সঙ্গত নহে, সত্য নহে। বাস্তবিক ব্রাহ্মেরাই প্রকৃত হিন্দু। এই দেশের মাটি হইতে এই নববিধান বৃক্ষকে কে উৎপাটন করিতে পারে?

ঈশ্বর হিন্দুমাটী ও হিন্দুরক্ত লইয়া এই নববিধান গঠন করিয়াছেন, কাহার সাধ্য ইহাকে হিন্দুভাববিহীন করেন? ঈশ্বর এই নববিধানকে আরও হিন্দুভাবে সুশোভিত করিবেন, এবং ইহা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন সমুদয় রত্ন পুনরুদ্ধার করিবেন। হে নব-বিধানভক্ত, তুমি কি যোগী? তবে তুমি হিন্দু। তুমি বৈরাগী, তবে তুমি হিন্দু, তুমি দয়ালু, তবে তুমি হিন্দু। তোমার প্রাণের মধ্যে যদি ধ্যানপরায়ণতা, যোগ, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, কোমলতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে তোমার রক্ত হিন্দু। তোমার প্রাণের

তাঁহাদের বিরক্তি ছিল। এই হিন্দু নামের বিরোধভাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও প্রবেশ করিল এবং সাধারণ সমাজের তৎকালীন সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয় নিজেকে হিন্দু বলার জন্য আমাকে উপহাস করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রসমূহের প্রতি কখনই আমি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি নাই। চির দিনই কথকতা শুনিতে যাই এবং শুনিতে শুনিতে আজীবনই চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসে।"

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বলিখিত পুস্তক হইতে তাঁহার ধর্ম্মজীবন সংক্রান্ত কয়েকটি মূল্যবান কথার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে তাঁহার চরিত্রের ও ধর্ম্মজীবনের বিশেষত্ব সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনের বিশিষ্টতাও অপূর্ব্বতা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার আত্মীয় ও কুটুম্ব যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহার এই ধর্ম্মজীবনের বিশেষত্বের এক একটি দিক উল্লেখ করিয়াছেন আমরা নিম্নে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিলাম।

চাবী খুলিয়া দেখিলাম. হে নববিধানভক্ত, তুমিই প্রকৃত হিন্দু। আরও যত তুমি উন্নত ব্রাহ্ম হইবে, তত তুমি প্রকৃত হিন্দু হইবে। যতই নববিধান প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম লক্ষণাক্রান্ত হইবে ততই ইহা বদ্ধমূল হইয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবে। হে ব্রাহ্ম, যতই তুমি হিন্দুর প্রকৃত ধ্যান, যোগ, বৈরাগ্য, কোমলতা, ভক্তি প্রভৃতি বিবিধ রসে অভিষিক্ত হইবে ততই তোমার ধর্ম্ম জগতে আদৃত হইবে, যতই তুমি তোমার স্বজাতীয় আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় ধ্যানপরায়ণ যোগী হইবে, শাক্যের ন্যায় নির্ব্বিকার নির্ব্বাণপ্রিয় হইবে, চৈতন্যের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত হইবে ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত আমেরিকা ইউরোপ চিন তাতার প্রভৃতি সমুদয় দেশ তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। যতই তুমি স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিবে ততই নববিধান জাতীয় গৌরব ও বিক্রম লইয়া দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইবে। "(সেবকের নিবেদন" রবিবার, ২রা কার্ত্তিক ১৮০২ শক।)

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তৎপ্রণীত "ইন্দুবালা" নামক ইংরেজী পুস্তিকার উপসংহারে ইন্দুর অকাল মৃত্যু বর্ণনা করার পর শশিপদ বাবু সম্বন্ধে বলিতেছেন—"

"A man whom no one has ever seen shaken by grief, though he has lost many a children nursed and educated with the greatest care. Nothing shakes him—not death not poverty, not dishonour. Nothing makes him omit the least duty he owes to anybody. His heart is swallowed up with loving faith in a living and loving God—in a God in whose world there is no death, no separation and no evil that is not a step to good."

"বহুযত্নে যে সমস্ত পুত্র কন্যাকে প্রতিপালন করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন এ প্রকারের অনেক পুত্র কন্যার মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু কেহ কখন ও তাঁহাকে শোকে বিচলিত হইতে দেখে নাই। মৃত্যু, দারিদ্র্য অপমান কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করে না। কাহারও প্রতি কর্ত্তব্যের একটুকুও কোনও কারণে তিনি কখন ও ত্রুটি করেন না। প্রত্যক্ষ ও প্রেমময় ভগবানের প্রতি প্রেমযুক্ত বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। এই ঈশ্বরের রাজ্যে, মৃত্যু নাই, বিচ্ছেদ নাই, এমন কোন অশুভ নাই যাহা মঙ্গলের সোপান নহে।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে শোকের দিনে কর্ত্তব্য প্রতিপালনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এ বিষয়ে একটু আলোচনা প্রয়োজন। তিনি জীবনে অনেক শোক পাইয়াছেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সংসারে এমন একদল লোক আছে যাহাদের হৃদয়ে স্নেহ বলিয়া একটা বৃত্তি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এই সমস্ত লোক অতীব কঠোরহৃদয় ও ইন্দ্রিয় সর্ব্বস্ব

তাহারা শোকে কাতর হয় না, কিন্তু যাহাদের হৃদয় স্ত্রীলোকের মত কোমল, যাহাদের স্নেহ আপন স্ত্রীপুত্র-কন্যা প্রভৃতিকে প্লাবিত করিয়া বিশ্বমানবের মধ্যে ব্যাপ্ত তাঁহারা যদ্যপি প্রিয়জনের বিয়োগের দিনে আত্মহারা হইয়া না পড়েন তাহা হইলে এই কথাই বলিতে হইবে, যে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির নিকট এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিশ্বই সমগ্র বিশ্ব নহে, পরলোক তাঁহাদের নিকট কেবলমাত্র একটা মুখের কথা নহে, এই ইহলোকের মত তাহা প্রত্যক্ষ, ইহলোক এবং পরলোক একই রাজ্য; তাঁহার অসীম রাজ্যের বাহিরে যখন কেহই যায় না, বিশ্বের সর্ব্বত্র যখন তাঁহারই লীলা শক্তি নিমিত্তরূপে দেদীপ্যমান তখন যিনি ভক্ত ও জ্ঞানী তাঁহার শোকের কারণ নাই। গীতা শাস্ত্রে তাঁহাকে নির্দ্বন্দ্ব বলা হইয়াছে, তিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা ও সুখে স্পৃহা শূন্য। জাগতিক হিসাবে যাহাকে আমরা সুখ বলি, তাহাতেও তিনি উল্লসিত নহেন আবার সংসারের শোক দুঃখে ও তিনি অবসন্ন নহেন শশিপদ বাবুর জীবন যাঁহাদের পরিচিত তাঁহারা সকলেই বহুবার তাঁহার এই অপূর্ব্ব ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। তখন তিনি কলিকাতায়, মৃতদেহ বাহিরে আনিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উদ্যোগ হইতেছে। সে দিন বরাহনগরে কলিকাতা হইতে তিনি একজন বক্তা পাঠাইবেন ও তাঁহার তথায় বক্তৃতা হইবে এইরূপ কথা ছিল, এ কথা সংবাদ-পত্রে যথারীতি প্রচার করাও হইয়াছিল। শশিপদ বাবু এই শোকের মধ্যে ও সে কথা বিস্মৃত হন নাই। মৃতদেহের সৎকারাদির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাও করিতেছেন, আবার তাহারই মধ্যে বক্তা-দিগের নিকটে গিয়া বরাহনগর যাইবার জন্য অনুরোধও করিতেছেন। একজন দুইজন করিয়া অনেক বক্তাকেই বলিলেন; সকলেই বলি-লেন, এই দুর্ঘটনার দিন আজ আর বক্তৃতায় কাজ নাই, কিন্তু

শশিপদ বাবু এ প্রকারে ম্রিয়মান হইবার লোক নহেন, তিনি অনেক চেষ্টার পর একজন বক্তা স্থির করিয়া, তাঁহার যাইবার ব্যবস্থাদি করিয়া তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কার্য্যাদিতে মনোযোগী হইলেন। ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ। সমস্ত কাজ ভগবানের, তিনিই কর্ত্তব্যের প্রেরণা হৃদয়ে দিয়াছেন, আমার ব্যক্তিগত লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় বা হর্ষ বিষাদ ভ্রান্তিমাত্র, তাহার জন্য ভগবানের কাজ বন্ধ হইবে কেন? সমগ্র ভগবদ্‌গীতা কর্ম্ম সম্বন্ধে এই মতই প্রচার করিয়াছেন।

সেবাব্রত শশিপদ বাবুর ধর্ম্মজীবনের একটি বিশেষত্ব কর্ত্তব্যপরায়ণতা। যতই বড় বিপদ হউক না কেন তিনি অতি ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যটি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েন না। একবার তাঁহার একটি কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, মৃত দেহ তখনও অপসৃত হয় নাই এমন সময় শশিপদ বাবু বারান্দা হইতে দেখিলেন চুণওয়ালা তাহার প্রাপ্য টাকার জন্য আসিয়াছে, শশিপদ বাবু অমনি নীচে আসিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা তাহাকে প্রদান করিলেন। পরে এই ব্যক্তি বিপদের কথা শুনিয়া বড়ই লজ্জিত হইল শশিপদ বাবু তাহাকে বলিলেন, আমার বিপদ হইয়াছে, কিন্তু এজন্য জগতের লোককে কি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে হইবে? তুমি হয়ত এই টাকা লইয়া অন্যকে দিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়াছ। আমি আমার এই সামান্য কর্ত্তব্যটুকু নিজের শোককাতরতার উপেক্ষা করিলে অনেক লোককেই কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইতে হইবে। পুত্রের মৃত্যুতেও তিনি কর্ত্তব্যগুলির অণুমাত্র ও ত্রুটি করেন নাই। মৃতদেহ অপসারিত হইবার মাত্র গৃহ পরিষ্কার করিয়া বাড়ীর যাহার যাহা কর্ত্তব্য সকলকে মনে পাড়াইয়া দিলেন, শিশুদিগকে খাইতে দিতে হইবে ও অন্যান্য কার্য্যগুলি করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলেন। গীতায় এই অবস্থাকেই "স্থিতপ্রজ্ঞ" এর অবস্থা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভগবানের

আহ্বান সেই আহ্বান শুনিয়া আমাদের চলিতে হইবে। কি শোকের দিনে, কি আনন্দের দিনে সে আহ্বান উপেক্ষা করার আমাদের অধিকার নাই, উপেক্ষা করিলেই আমাদের পতন হইবে—শশিপদবাবুর সমগ্র জীবনের ইতিহাস এই বিশেষত্ব টুকু প্রতিপাদন করিতেছে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পারিবারিক সমাধি মন্দিরের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু নূতন রাজ্য সম্বন্ধে একটি উপদেশ প্রদান করেন আমরা সেই উপদেশ তৎকালে প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে পুনমুদ্রিত করিলাম, ইহা হইতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের এক অংশবুঝিতে পারা যাইবে।

"আমেরিকার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একটী নূতন রাজ্য ইউরোপের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে লোকের চিন্তা ও কল্পনা এক নূতন আকার ধারণ করিল। পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী প্রত্যক্ষীভূত স্থানের চিন্তাতেই তাহারা নিমগ্ন থাকিত এখন আর একটী দূরতরদেশ তাহাদের চিন্তা ও কল্পনাকে আকর্ষণ করিল। তাহাদের চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দলে দলে লোক নূতন দেশের নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে, ধন সম্পত্তি আহরণ করিতে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। কি ব্যক্তিগত ভাবে কি জাতিগত ভাবে সেই দেশের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কত লোক কত জাতি অর্থে, জ্ঞানে, ধনী হইতে লাগিল। এই উন্নতি, আমেরিকা আবিষ্কার না হইলে হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু আমেরিকা, আবিষ্কারের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল ও পরেও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এত দিন ইউরোপের জ্ঞানের বহির্ভূত ছিল বলিয়া তাহাদের এ উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই বস্তুটী অথবা বিষয়টী থাকিলেই হয় না; তাহা আমাদের জ্ঞানে থাকা চাই। এই যেমন আমেরিকা সম্বন্ধে, আমাদের এই পরিবার সম্বন্ধেও একটী নূতন রাজ্য আজ ৩০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কার হইয়াছে।

আমার প্রথমা সহধর্ম্মিনী রাজকুমারী দেবীর পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্য আমার নিকট আবিষ্কৃত হয়। তাঁহার মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে পরকাল আমার নিকট নিতান্ত কুয়াসাচ্ছন্ন, প্রায় উপকথায় শ্রুত অজানা দেশের মত অপরিচিত ছিল। নিকট আত্মীয় অজানা প্রবাসে গেলে সে দেশে যেমন আর অজানা থাকে না, প্রতিদিনই তাহার জ্ঞাতব্য কিছু না কিছু বিষয়ের খবর পাওয়া যায়, তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইয়া প্রতিদিনই আমাকে সে দেশের খবর দিতেছেন। ক্রমে আমার পুত্রকন্যা অনেকেইত এখন সে দেশে গিয়াছে! সে দিন আবার আমার অন্যতমা স্ত্রী গেলেন। সকলেই আমাকে কতরূপে কত সূত্রে সে দেশের কথা, তাঁহাদের সকলের কথা বলিয়া দিতেছেন। এই পরলোকের রাজ্য আবিষ্কার হওয়াতে আমি ধন্য হইয়াছি, অনেক বিষয়ে আমি ধনী হইয়াছি। প্রথমতঃ আমার পরলোকের সহিত সম্বন্ধ অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্ব্বে পরলোক আমার নিকট যেমন ছিল এখন আর তেমন নাই। এখন পরলোক আমার চির আরাম নিলয়। এই আবিষ্কারের দ্বারা বুঝিয়াছি ধর্ম্ম শুধু শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের অনুশাসন নহে, ধর্ম্ম জীবনে, ধর্ম্ম জীবনের প্রতিকার্য্যে, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে। আরও বুঝিয়াছি ধর্ম্ম শুধু বাহিরের কতকগুলি অনুষ্ঠান নহে, অথবা উন্নত মত মাত্র নহে, ধর্ম্ম জীবনের ভিতরের অনুষ্ঠান। প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের জন্য যে ভগবানের সঙ্গে আমাদের যোগ তাহা ভাল করিয়া বুঝা, তাহা ভাল করিয়া জীবনে পরিণত করা ও তাঁহার লীলা জীবনে দেখাই ধর্ম্ম। এই দীর্ঘ ৩০ বৎসরের মধ্যে অনেকবার অনেক ঘটনাতে ইহা ভাল করিয়া অনুভব করিয়া আসিতেছি। আমার পরিবারের এক একটী অমর আত্মা এই দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছেন আর পরকাল আমার নিকট আরও উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, নিকট

হইতে নিকটতর প্রতিভাত হইতেছে। বিগত বৎসর চারিটী অমর আত্মা * আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন আর মনে হইয়াছে বিদেশ হইতে বিপনি পরিপূর্ণ চারিখানি তরণী যেন আমাদিগকে স্বর্গের প্রসাদ বিতরণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। দয়াময়ের কি অপার করুণা!

মানুষ নিজ বিষয়ের একটী উত্তরাধিকারী রাখিয়া যায় আমি আমরা পার্থিব জিনিষের কথা বলিতেছি না। এই সমুদয় তুইদিনের জিনিষ, তুইদিন পরে নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বর্গের জিনিষ যাহা আমি পাইয়াছি, যাহা পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি সেই জিনিষ আমার যাহারা তাহাদিগকে দিতে প্রাণে আমার একটা আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। আজ আমি এখানে বর্ত্তমান আছি জানি না আগামী বৎসর আবার এইরূপ এইখানে সমাধিক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলিতে পারিব কি না। আমার প্রস্থানের পূর্ব্বে, আমার যাহারা, তাহাদিগকে সেই স্বর্গীয় জিনিষের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতে বড় বাসনা হইতেছে। তোমরা কেহই পরকালের বিষয় ভুলিও না সম্মুখের ছবি দেখ, ইহা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখ, মৃত্যু যে পরলোককে আনিয়া দেয়, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। পরলোকের তত্ত্ব তোমাদের নিকট আরও প্রকাশিত হউক। অনেক বিষয়ে নূতন সত্য নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া নিজেরা ধন্য ও সুখী হও। ভগবান তোমাদের নিকট পরলোকের তত্ত্ব উজ্জ্বল করিয়া দিন এবং সেই পরলোকের তত্ত্ব তোমাদিগকে আরও বিশ্বাসী করুক। জ্ঞানে প্রেমে তিনি তোমাদিগকে উন্নত করুন। ভগবানের নিকট আজ আমার এই প্রার্থনা।

---

* ১০১২ সন ১১ই আষাঢ় দৌহিত্রী, ৮ই শ্রাবণ দৌহিত্র, ২৯শে শ্রাবণ কন্যা, ১৫ই মাঘ দ্বিতীয়া স্ত্রী।

"ইহলোক তুমি, পরলোক তুমি,
চিরবাস স্থান চির জন্মভূমি।
যত আত্মীয় স্বজন, হারান রতন,
একাধারে প্রভু তোমাতে পাই—" *

বঙ্গের কৃতি সন্তান সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় কে, জি, গুপ্ত মহাশয় শশিপদ বাবুর চরিত্র বল, ধৈর্য্য ও ধর্ম্মজীবনন জানেন। গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রীর পরলোক: গমনের পর ১৯০৯ খৃঃ অব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বিলাত হইতে তিনি শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুকে একপত্র লেখেন সেই পত্রে শশিপদ বাবুর চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

—I wish I had your living faith in the next world that enables you to bear your bereavements with such strength and fortitude."

অর্থাৎ আমার মনে হয় যে আপনার পরজগতে জীবন্ত বিশ্বাস থাকায় আপনি শোকের দিনে শক্তি ও ধৈর্য্যের সহিত শোক সম্বরণ করেন, আমার ইচ্ছা হয় যে আমারও আপনার মত জীবন্ত বিশ্বাস থাকিলে বড়ই ভাল হইত।

---

* সেবাব্রত শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে সমস্ত মঙ্গলকর অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনা করেন তন্মধ্যে পারিবারিক সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠা একটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা। বরাহ নগরে শশিপদ বাবুর পারিবারিক সমাধি মন্দির আছে। বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু হইলে চিতাভস্ম আনিয়া এই স্থানে প্রোথিত করা হয় এবং মৃত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় তাহার উপর এক প্রস্তর ফলকে লিখিত হয়। সমাধি মন্দিরের উপকারিতা কি তাহা শশিপদ বাবুর পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি হইতে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমাদের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়ার সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। মৃত আত্মীয়গণের স্মৃতি আমাদিগকে জীবনের বিশালতায় ও মানবাত্মার অমরতার দিকে লইয়া যায় এবং ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি নষ্ট করে, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই যে চরিত্রবল, ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা ইহার সহিত তাঁহার দীক্ষার সম্বন্ধ আছে, এ বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তাঁহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন "গুরুঠাকুর শশিপদ বাবুকে নূতন মন্ত্র প্রদান করিলেন। সেই মন্ত্র তৈত্তিরীয় উপনিষদের অমর অমৃত মন্ত্র বেদবাণী—"আনন্দং ব্রহ্মেতি" অর্থাৎ ব্রহ্মেতেই আনন্দ। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুতেই আনন্দ নাই। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলপ্রাপ্ত হইলে যেরূপ আনন্দিত হন, শশিপদ বাবু তেমনি নূতন মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি সেই মন্ত্র সাধন করিয়া নব আলোক-ময় পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার উপর দিয়া ঝড় তুফা-নের ন্যায় কত নির্য্যাতন, অপমান, পুত্রকন্যা শোক, স্ত্রী বিয়োগ, কত পরীক্ষা চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি স্রোতকম্পিত বেতসের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত হন নাই, কোন ঘটনাতেই তাঁহাকে নিরাশ নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, অবসন্ন করিতে পারে নাই। তিনি এখন ইহ জীবনের শেষ সীমাতে উপস্থিত হইয়াছেন; এই প্রাচীন বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় কর্ম্মপরায়ণ। নিকটে আত্মীয় স্বজন কাহাকেও রাখেন না একাকী বাস করেন। এই একাকীত্বের মধ্যে, বার্দ্ধক্য-পীড়িত জীর্ণ শরীরে তিনি, আনন্দং ব্রহ্মেতি মন্ত্র জপের সুফল লাভ করিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ জ্যোতি প্রস্ফুটিত। গুরুর মন্ত্র প্রদান সার্থক হইয়াছে।" (কুশদহ ৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যা।)

দুর্ঘটনা ও শোকের দিনে এইরূপ ধীরভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতে যাহাতে পারা যায় সে জন্য প্রত্যেকেরই প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। হিন্দু জীবনের ইহা আদর্শ। শশিপদ বাবু বিশিষ্ট সাধনার দ্বারা এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। এই সাধন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বরিশাল নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র

'ব্রহ্মবাদী'তে একবার বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মনমোহন বাবু একবার কলিকাতা আসিয়া শশিপদ বাবুর সহিত দেখা করেন, শশি বাবুকে দেখিয়া তাঁহার মনে এই ধারণা হইল যে শশিপদ বাবু পরলোকে বাস করেন। শশিপদ বাবুর প্রথম জীবনের ইহা একটি গূঢ় রহস্য। তিনি মৃত আত্মীয়গণের ছবিগুলি সর্ব্বদা নিজের চারিদিকে রাখিতেন, যাহারা প্রিয় তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে খুব দৃঢ়ভাবে তাহা চিন্তা করিতেন। এই ভাবে তিনি প্রথম জীবনে আসক্তির মধ্যে অনাসক্তি অভ্যাস করিয়াছেন। একবার তিনি ও তাঁহার প্রথমা স্ত্রী একত্রে বসিয়া আছেন তাঁহার স্ত্রী শিশু পুত্রকে আদর করিতেছেন, এইটি তাঁহাদের দ্বিতীয় পুত্র, ইহার পূর্ব্বেরটি সূতিকা গৃহেই মারা গিয়াছিল। শিশু শশিপদ বাবুর কোলে শুইয়া হাসিতেছে, এমন সময়ে শশিপদ বাবু তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন এই ছেলেটি যদি এখনি মরিয়া যায়! তাঁহার স্ত্রী এই অমঙ্গলের কথা শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। শশিপদ বাবু হাস্য করিতে লাগিলেন। এ এক খুব বড় সাধনা। এই পদ্ধতিতে চিন্তা করিলে মানুষ আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান, হইয়া উঠে। হিন্দুশাস্ত্রের ও ইহাই উপদেশ। এমন কি নীতিশাস্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যা মর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥"

সংসারের বিদ্যা ও অর্থের বিষয়ে যখন কার্য্য করিতে হইবে তখন ভাবিতে হইবে আমি অজর ও অমর; আর আধ্যাত্মিক সাধনায় ভাবিতে হইবে মৃত্যু কেশে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পরাধীনতাই দুঃখের কারণ। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" পরবশ হওয়াই দুঃখ আর আত্মবশ হওয়াই সুখ। আমরা জগতের সকলেরই অধীন, স্ত্রী চাই, পুত্র চাই, ধন চাই, গৃহ চাই,

সম্পদ চাই তবে সুখী হইব, ইহার অর্থ এই যে আমরা এই স্ত্রী পুত্র, ধন গৃহ সকলের ক্রীতদাস। ইহাই পরাধীনতার বা বন্ধনের অবস্থা। আমরা চাই মুক্তি। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে—আত্মারাম হইতে হইবে, আমি আমার স্বরূপে চিদানন্দময় অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ—এই অবস্থায় আমাদিগকে আরোহণ করিতে হইবে। আমরা শশিপদ বাবুর আধ্যাত্মিক সাধনার একটি অতি সরল ও সাধারণ কথা বলিলাম, তীব্র সংবেগ সহকারে এই সাধন অবলম্বন করিলে সকলেই শক্তি পাইবেন।

এই গেল তাঁহার সাধনা। সাধনার সময় তিনি পরকালেই থাকিতেন, এখন তিনি পরকাল ও ইহকাল মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। জীবিত ও মৃত উভয়ই সমান, ইহকাল ও পরকাল একই, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ভেদ নাই এখন তিনি এই জ্ঞানে বিরাজমান। তাঁহার সাধনার চিন্তার একটি দিক বলা হইল। কিন্তু সাধনায় তিনি সেবার পথই মুখ্যরূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন একথা অন্য এক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আনন্দময়ের উপাসনা,

প্রকৃত ভগবদ্ভক্তির একান্ত প্রেরণায় মানব বিবিধপ্রকার সংস্কার-মূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহার কারণটা কি তাহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। প্রথম প্রশ্ন ভগবান কোথায়? তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ও ইউরোপে মধ্যযুগে এক সম্প্রদায় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা বলিতেন যে এই জগৎ, এই মানবমণ্ডলী, মানবের এই বিবিধ প্রকার কার্য্য ও সম্বন্ধ, এ সমস্তের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ ত নাইই, পরন্তু এ সমস্তই তাঁহার বিরোধী ও বিপরীত। এইরূপ মতবাদ আশ্রয় করিলে ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার, ইহলোকের সহিত পরলোকের, সংসারের সহিত ধর্ম্মের বিরোধ ও বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। এই মত যাঁহারা অনুসরণ করিতেন তাঁহারা সমাজ, সংসার ও যাবতীয় মানবীয় সম্বন্ধ পরিহার করিয়া, অরণ্যে অথবা গুহায়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহদ্বারা, সেই পরমাত্মার জ্যোতি অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেন। ইংরাজী ভাষায় এই মতবাদের নাম Deism.

ইহা ছাড়া আর এক মত আছে তাহার নাম Pantheism, তাঁহারা বলেন এই বিশ্বই ব্রহ্ম, এই প্রকৃতিই ব্রহ্ম, সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম বিদ্যমান, এই দৃশ্যমান বিশ্বের বাহিরে তিনি নাই। আর এই দুই মতের একটা সমন্বয়ও আছে। তিনি বিশ্বেও আছেন, বিশ্বের বাহিরেও আছেন। বিশ্ব তাঁহাতেই আছে সত্য, কিন্তু তিনি বিশ্বের মধ্যে সমগ্রভাবে নাই। তিনি অসীম লীলার আনন্দের জন্য সসীমের মধ্যে ধরা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার

অসীমত্বের ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি সসীমের মধ্যে সসীম হইয়া পড়েন নাই। তিনি এই বিশ্বেও যেমন আছেন, তেমনি আবার নিজের অসীম মহিমায় রহিয়াছেন, তাঁহার যেমন স্বরূপ লক্ষণ আছে তেমনি তটস্থ লক্ষণও আছে। এই দুইটি দিকই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় সসীমের সহিত অসীমের এই বিচিত্র সম্বন্ধ অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে॥
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা॥
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বদ্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা॥"

ইহাই লীলাময়ের লীলা, সসীম সর্ব্বদা অসীমকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল, আবার সেই অসীম, তিনি সসীমের মধ্যে ধরা দিবার জন্য তুল্যরূপে ব্যস্ত। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া নাই। এই ধর্ম্মমত যে দিন মানবচিত্তে অভিব্যক্ত হইল, সেদিন মানবজাতি ধন্য হইল, মানব আপন স্বর্গীয় প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

পূর্ব্বে যে ধর্ম্মমতের কথা বলা হইল, ইহা বর্ত্তমান সময়ে সভ্য-জগতের সুধীবৃন্দকর্ত্তৃক অত্যন্ত আদরের সহিত আলোচিত ও অবলম্বিত হইতেছে। অনেকে বলেন যে, এই মতবাদ ভারতবর্ষের নহে। একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগকে রামানুজ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অথবা তৎপূর্ব্বে জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির জীবন ও শিক্ষা আলোচনা করিতে বলি; বাঙ্গালা-গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃতে অতি স্পষ্টভাবে এই মতের নিম্নরূপ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়।

"অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত।
মণি যেছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার,
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার।"

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের আদ্যোপান্ত এই সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত।

এই মতবাদ আশ্রয় করিলে মানবের ধর্ম্ম কিরূপ আকার ধারণ করে তাহা দেখা যাউক। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটি পথের মধ্যে বিরোধ প্রাচীনকাল হইতে জগতের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। এখন অবশ্য এই তিনটিই তুল্যভাবে এক মানবপ্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মবিহীন ভক্তি অথবা কর্ম্ম ও ভক্তিবিহীন জ্ঞান অথবা জ্ঞান ও ভক্তিহীন কর্ম্ম, অসম্ভব। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি কেহই কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সৎ, চিৎ, আনন্দ একই অখণ্ড পদার্থ। চৈতন্যের দিক হইতে যাহা দেখিলে সৎ, চিৎ, আনন্দ, প্রকৃতির দিক হইতে দেখিলে তাহাই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যেখানে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা তাহা অব্যক্ত সুতরাং আমাদের বিবেচনার অতীত। এখন জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনের সমন্বয়ই ধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দকে অনুভব করিতে হইবে, ধ্যান, ধারণা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে, শুধু তাহাই নহে, তাঁহাকে

প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, আমাদের সমাজে, আমাদের গৃহস্থালীতে, আমাদের জাগতিক নিখিল সম্বন্ধ ও ব্যবহারের মধ্যে তাঁহার বিজয়দণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পর, তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে, অন্তরের অন্তরে ব্রহ্মরূপে, অনন্ত বহিঃপ্রকৃতিতে পরমাত্মারূপে এবং অনন্তলীলা বা ইতিহাসের মধ্যে তাঁহাকে ভগবানরূপে উপভোগ করিতে হইবে। তিনি রসস্বরূপ, তাঁহার রসকণা লাভ করিয়া জগৎ আনন্দে অধীর, তাঁহার সেই রস উপভোগ করিতে হইবে, তিনি প্রেমস্বরূপ, সেই প্রেমের স্বাদ লইতে হইবে, সেই প্রেমে মত্ত ও অধীর হইতে হইবে! এই তিনই একসময়ে চলিবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি বিশ্ব হইয়াও বিশ্বের অতীত; সুতরাং বিশ্বজীবনের মধ্যে মিশিয়া বিশ্বনাথের কার্য্যও করিতে হইবে; আবার এই সমস্তের মধ্যে তাঁহার দিকে উন্মুক্ত থাকিতে হইবে, ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই সাধনা।

তাহা হইলে সমাজের সেবা করিতে প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত বাধ্য। তিনি যেখানে দেখিবেন গ্লানি ও দুর্নীতি, যেখানে দেখিবেন মানবের অবিদ্যা ও অস্মিতা সেই বিশ্বনাথের পূর্ণ জ্যোতিকে আবরণ করিয়াছে, তাঁহার উদ্যত কর সেই বিশ্বনাথের আহ্বানে সেইখানেই পতিত হইবে। এই যে মানবের সেবা, ইহা প্রশংসালাভের জন্য নহে, প্রাণের ব্যাকুলতায়, হৃদয়ের একান্ত আগ্রহে। দুঃখীর দুঃখের মধ্যে, পীড়িতের আর্ত্তনাদের মধ্যে, পাপীর পাপের মধ্যেও বিশ্বনাথের বাঁশরী বাজিতেছে, সেই প্রেমময় সেখান হইতে ব্যাকুলভাবে আমাদের আহ্বান করিতেছেন, আমাদিগকে হৃদয়ভরা প্রেম হইয়া সেখানে ঢালিয়া দিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের সমাজসংস্কার—এই প্রকারের প্রেরণাই ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে সমাজসংস্কার কার্য্যে লিপ্ত করে।

সেবাব্রত শশিপদ বাবু আনন্দব্রহ্মের উপাসক, এই আনন্দব্রহ্মের উপাসনার মর্ম্ম চিন্তা করিয়া আমরা শশিপদ বাবুর জীবনের অনেক রহস্য বুঝিতে পারিব। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আনন্দ ব্রহ্মের উপাসনা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে। এক হিসাবে দেখিতে গেলে এই উপাসনাই উচ্চতম অধিকারের উপাসনা। এই জন্যই এ বিষয়ে আমাদের একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রারম্ভেই বলিয়া রাখা ভাল যে উপনিষদের এই আনন্দব্রহ্মের উপাসনাই বৃন্দাবনের নন্দনন্দনের উপাসনা। উপনিষদে যাহার বীজ আছে ভাগবতে তাহা বৃক্ষ হইয়াছে।

বরুণের পুত্রের নাম ভৃগু। ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তাঁহার পিতা তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যে বিশিষ্ট চিন্তাপ্রণালী, তাহা বলিয়া দিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান তো আর কেহ কাহাকেও দিতে পারেন না, যিনি গুরু তিনি ধ্যান ধারণার প্রণালী বা বীজমন্ত্র দিতে পারেন এবং শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। কিন্তু শিষ্যকে তপস্যা দ্বারাই সেই বীজকে বৃক্ষ করিতে হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

বরুণ বলিলেন যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মায়, জন্মের পর যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে শেষে আবার যাঁহাতে লয় পায়, চিন্তা-কর, তিনিই ব্রহ্ম। ভৃগু কিছুদিন তপস্যা করিয়া তাঁহার পিতার নিকট আসিলেন, বলিলেন অন্নই ব্রহ্ম, কারণ অন্নের সহিত পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি সব মিলিয়া যাইতেছে। বরুণ কিছুই বলিলেন না, আমরা হইলে হয়ত ভৃগুর সহিত তর্ক করিতাম, তাহাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতাম যে তাহার এই মত ভুল, কিন্তু একজনের মত ভুল ইহা যদি তাহাকে তর্ক বা যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হই-লেই কি সে তাহার মত ছাড়িয়া উন্নততর মত গ্রহণ করিতে পারে?

বরুণ এ তত্ত্ব বুঝিতেন এবং তিনি আরও বুঝিতেন যে যিনি যে মতেই থাকুন, সেই মতের যে টুকু ভাল সেটুকু লইয়া তাঁহাকে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেওয়াই তাহার যথার্থ উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করা। এই প্রকারে নিজের যাহা সাধুমত তাহা লইয়া চিন্তা করা ও কার্য্য করার নামই তপস্যা। বরুণ ভৃগুকে অন্য কিছু না বলিয়া তপস্যা করিতে উপদেশ দিলেন। ভৃগু আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিছুদিন তপস্যার পর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পিতাকে বলিলেন প্রাণই ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্মের সমস্ত লক্ষণ প্রাণে রহিয়াছে। বরুণ ভৃগুকে অন্যকিছু না বলিয়া বলিলেন তপস্যা কর। আবার ভৃগু তপস্যা করিলেন, তপস্যার পর তাঁহার পিতাকে বলিলেন মনই ব্রহ্ম। তাঁহার পিতা আবার তপস্যা করিতে বলিলেন, পুনরায় তপস্যা করিয়া আসিয়া বলিলেন বিজ্ঞান বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই ব্রহ্ম। এবারেও বরুণ তপস্যা করিতে বলিলেন। পুত্র তপস্যা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন ও বলিলেন আনন্দই ব্রহ্ম। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

এই আনন্দ ব্রহ্মের উপাসনাই ভৃগুবারুণী বিদ্যার শেষ কথা, ভাগবত ধর্ম্মও এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। এইবার এই তত্ত্বটি মানবের জীবনগত ব্যবহারের মধ্য দিয়া আলোচনা করা যাউক।

যে ব্যক্তি লোভী ও ঔদরিক সে যাহা ভাল লাগে তাহাই খায়, যখন ভাল লাগে ঘুমায়, কোন নিয়মের ধার ধারে না। এখন হয়ত কতকগুলি মুখরুচিকর ও দুষ্পাচ্য খাবার পেট ভরিয়া খাইল তাহার পর রোগ যন্ত্রণায় অস্থির। এ ব্যক্তির চৈতন্য অন্নময় কোষেই প্রধানতঃ নিবদ্ধ, এ ব্যক্তি অন্নব্রহ্মের উপাসক। অথবা যে লোক নানাবিধ উপায়ে কেবল দেহের সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যস্ত, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি তত নহে সে ব্যক্তিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

তাহার পর আর একজন লোক, আহার করিবার সময় কেবল মুখ রুচিকর খাদ্যেই তুষ্ট নহে, প্রাণশক্তির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে সে পুষ্টিকর খাদ্য চায়, কেবল ক্ষুধানাশ তাহার উদ্দেশ্য নহে সে চাহে দেহের বল ও আয়ু বৃদ্ধি। কিন্তু সবল ও সুস্থ দেহ হইলেই সে সন্তুষ্ট, এ ব্যক্তির চৈতন্য প্রাণময় কোষেই নিবদ্ধ, প্রাণময় কোষই তাহার 'লয় কেন্দ্র' এ ব্যক্তি প্রাণ ব্রহ্মের উপাসক। অবশ্য সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এ ব্যক্তি দেহ বা অন্নময় কোষকে উপেক্ষা করে না তবে প্রাণশক্তির দ্বারা সে দৈহিক আকাঙ্খাগুলিকে নিয়মিত করিতেছে।

দেহ সুস্থ ও সবল হইলে এবং আয়ুবৃদ্ধি হইলেই তো আর মানব জীবনের চরিতার্থতা হইল না—যে মুর্খ, যাহার মনন শক্তির অনুশীলন হয় নাই সে সুস্থ ও সবল দেহ লইয়াই বা কি করিবে? এই জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত মানব কেবল সবল ও সুস্থ দেহ চাহে না—ইহার সঙ্গে মনোবৃত্তির বিকাশ চায়। "A sound mind in a sound body" এ ব্যক্তি আহার করিবার সময় রুচিকর ও পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়া খাদ্যের আরও একটি গুণ চায়—সে চায় যে মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষও সাধিত হউক। এব্যক্তির চৈতন্য প্রধানতঃ মনোময় কোষে নিবদ্ধ বা এ ব্যক্তি মন ব্রহ্মের উপাসক।

আমাদের যে মনন শক্তি তাহা স্বভাবতঃ সংশয়াত্মিকা। যুক্তিতর্কে প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিতেছি, নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, যেমন বাগ্মী তেমনই লেখক, লোকে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিতেছে, এই প্রকারের অবস্থায় মানুষ কিছুদিন বেশ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি হইলে বা দৃষ্টি একটু আত্মনিষ্ঠ হইলে এই "সংশয়াত্মক, বা তর্কাদি গোচর জ্ঞানে মানুষের তৃপ্তি হয় না। তখন মানব জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে জানিতে চায়, সত্য জানিতে চায়—এই জ্ঞানের নাম

বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির জন্য যাহা অনুকূল মানব এ অবস্থায় তাহাই পাইতে চায়। এ সময়ে মানব দেহ প্রাণ, মন, সমস্তই রক্ষা করিতে চায় কিন্তু এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির জন্য। এই অবস্থায় মানব বিজ্ঞান-ব্রহ্মের উপাসক।

এই অবস্থায় উপস্থিত হইলেই বিশ্বরহস্যের মীমাংসা হইয়া গেল, এতদিন যে অবিদ্যারূপ হৃদয়গ্রন্থি মানবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা চূর্ণ হইয়া গেল এইখানে সকল সন্দেহের শেষ, মানব আনন্দময়ের সন্নিধানে আসিল, প্রবাসী গৃহে ফিরিল।

ব্যক্তির জীবনে ইহাই আনন্দময়ের উপাসনা। এইবার জাতীয় জীবনে, বিশেষ করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে আনন্দময়ের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। আমাদের অভাবের সীমা নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য নানারূপ জল্পনা কল্পনা ও চেষ্টা উদ্যম চলিতেছে। সাধু সংকল্প! সকলেই সফলকাম হউন!

একদল লোক দেশের অর্থ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। যৌথ কারবার, কৃষি শিল্পের উন্নতি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি করিলেই মঙ্গল হইবে— ইহাই অন্নব্রহ্মের উপাসনা।

একদল লোক বলিতেছে এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতেই হইবে, কিন্তু এই কার্য্য করিতে হইলে দেশের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, লোকের স্বাস্থ্য নাই, লোক অল্পায়ু হইতেছে মৃত্যুর হার বাড়িয়া যাইতেছে, এরূপ অবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব। ইহাই প্রাণ ব্রহ্মের উপাসনা।

আর একদল বলিতেছেন আর্থিক অবস্থার উন্নতি চাই, স্বাস্থ্যের উন্নতিও চাই কিন্তু দেশের লোক যে মূর্খ, দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কর, শিক্ষা বিস্তার না করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে না, আর্থিক উন্নতিও হইবে না। ইহারা মন ব্রহ্মের উপাসক।

আর একদল বলিতেছেন শিক্ষা তো বিস্তার করিবে কিন্তু শিক্ষার প্রণালী কই? পাঠাগারের নামে কারাগার করিয়া যে বিজাতীয় ভাবে শিক্ষাদান করিতেছে তাহাতে উন্নতি হইতেছে না, অবনতি হইতেছে, তাহা কি ভাবিয়াছ? আগে আমাদের জাতীয় প্রকৃতির মূল সূত্র-গুলি বুঝিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে একটা নিশ্চয় করিয়া আদর্শ ও প্রণালী প্রস্তুত কর, নতুবা শিক্ষার নামে কুশিক্ষা ও অশিক্ষা দিয়া লোকসান বৈ লাভ হইবে না। এই ভাব বিজ্ঞানব্রহ্মের উপাসনা।

ইহা ছাড়া আর একদল লোক আছেন তাঁহারা বলিতেছেন দেশে আস্তিক্য বুদ্ধি জাগ্রত কর, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম দেশবাসী নরনারীর হৃদয়ে জাগ্রত কর, শৈশব হইতে বালকবালিকাগণকে সেই উপ-নিষদের ঋষিগণ প্রচারিত মানব জীবনের অমরত্বের কথা শিক্ষা দাও, তাহা হইলে জাতীয় আদর্শ নিশ্চিত হইবে, শিক্ষা প্রণালী তদনুসারে স্থিরীকৃত হইবে, সে শিক্ষার আলোক দেশে ব্যাপ্ত হইলে দেশে একতা, ত্যাগশীলতা ও পরার্থপরতা জাগিয়া উঠিবে তখন স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, লোক ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও দীর্ঘায়ু হইবে, অর্থনৈতিক সমস্যাই বল, আর রাজনৈতিক সমস্যাই বল, সমস্তের সুমীমাংসা হইবে ইহাই আনন্দব্রহ্মের উপাসনা।

আনন্দব্রহ্মের উপাসনার মর্ম্ম একটু পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি কথার প্রবর্ত্তনা করা যাইতেছে। আমাদের শাস্ত্রে একটি নিয়ম আছে তাহার নাম "উৎসর্গ অপবাদ।" ইংরাজী ভাষায় ইহার অর্থ বলিতে হইলে এই বলিতে হয় "A higher Stage in Evolution does not negate the lower ones bnt fulfils them." "অভিব্যক্তির বা ক্রমবিকাশের যাহা উন্নততর সোপান তাহা নিম্নতর সোপানগুলিকে উপেক্ষা, অনাদর ও অবজ্ঞা করে না, তাহাদিগকে সফল করে।

আনন্দময়ের উপাসনাই সকল মতের ও সকল পথের এবং মানবীয় সাধনার সকল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়।

অধিকারী ভেদে মানবের আদর্শ ও উপায় বিভিন্ন হইবেই, জগতে ইহা মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এজন্য যিনি বিরোধ করেন বা দলাদলি করেন অথবা সকলকে সমানরূপে আপনার বলিয়া উদার বক্ষে আদর করিয়া স্থান দিতে না পারেন তিনি আনন্দব্রহ্মের উপাসক নহেন। আনন্দব্রহ্মের উপাসককেই শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগবতোত্তম বা উত্তম ভক্ত বলা হইয়াছে। তাহার লক্ষণ এই ঃ—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১১।২-৪৩।

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর মতে শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এই- যিনি সকল ভূতেই ব্রহ্মভাবের দ্বারা আপনার সমন্বয় দেখেন এবং ব্রহ্মরূপ যে আপনার অধিষ্ঠান তথায় সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন তিনিই উত্তম ভাগবত।

পূর্ণাঙ্গ মতসহিষ্ণুতা ও সকল ভাবের ও সকল সাধনার যথার্থ সমন্বয় দর্শন করা এই অবস্থার লক্ষণ এই অবস্থাতেই মানবের কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না বিশ্বব্যাপার ভগবানের লীলা বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বভূতেই ব্রহ্মদর্শন ঘটে। শ্রীধর স্বামী পূর্ব্বের শ্লোকের টীকায় মশকেও নিয়ন্তারূপে ও অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন আর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অনুবর্ত্তনে লিখিয়াছেন,—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ।
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্ট দেব স্ফূর্ত্তি॥"

তাহা হইলেই আনন্দময়ের উপসনা কি প্রকার তাহা বুঝিতে

পারিতেছি। এই উপসনায় কর্ম্ম ও জ্ঞান আসিয়া অনিমিত্তা ও অহৈতুকী ভক্তিতে সমন্বয় লাভ করিয়াছে। অন্তরে আনন্দময় আদর্শ রূপে রহিয়াছেন, কিন্তু বাহিরে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না, তিনি ছিলেন, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তিনি যেন অন্তরালে দাঁড়াইয়া বাঁশি বাজাইয়া ডাকিতেছেন। ইহাই সাধকের বিরহ দশা। বিরহদশায় ব্রজগোপীগণ যেমন বৃক্ষলতা পশু পক্ষী প্রভৃতি সকলকেই কৃষ্ণের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, আনন্দময়ের উপসকও তেমনি সর্ব্বত্র তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করেন।

গোপীভাবে এই আনন্দময়ের উপাসনার উচ্চতম অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। অধিক কি এই আনন্দময়কে পাইয়া জীবন সফল করিতে হইলে এই গোপভাবের অনুগত হইয়া সাধন করিতে হইবে ইহাই বৈষ্ণব সাধুগণের উপদেশ। প্রেমই গোপীদিগের ভাব। এই প্রেম কামের বিপরীত।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেমেত প্রবল।"

আনন্দময়ের উপাসক পরদেবতাকে যে ভাবে উপলব্ধি করেন, সেই ভাবের নাম কৃষ্ণভাব। যে ভাবে ভগবান কেবল অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান লইয়া জগতের আশ্রয় রূপে রহিয়াছেন সেই পরমাত্মা বা ব্রহ্মভাবের পর এই কৃষ্ণভাবের উপলব্ধি। এই সময় ভক্ত দেখেন যে, ভগবান বড়ই মধুর, তিনি অচিন্ত্য মাধুর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ করিতেছেন।

"পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন।"

এই ভাবে ভগবানের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া জগতের সেবার মধ্যে যে আনন্দময়ের উপাসনা শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর জীবনে তাহাই পরিদৃষ্ট হইবে।

হিন্দুজাতির জীবনের ও ধর্ম্ম সাধনের যাহা বিশিষ্টতা তাহা শশিপদ বাবুর জীবনের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইবে। দু একটী উদারণ দিই।

শরৎকালে বাঙ্গালা দেশে মহামায়ার পূজার আনন্দ, হিন্দুর ঘরে ঘরে মহা উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। শশিপদ বাবু ব্রাহ্ম, অতএব সাধারণ লোকে হয়ত মনে করিবেন যে এই উৎসবে শশিপদ বাবুর কোন সাহানুভূতি নাই; কিন্তু এই উৎ-সবের আনন্দে তাঁহার আন্তরিক যোগ চিরকালই আছে কারণ তিনি আনন্দময়ের উপাসক।

দুর্গোৎসবের সময় শশিপদ বাবুর গৃহে নিয়মিত ভাবে চণ্ডী পাঠ ও ব্যাখ্যা ও মাতৃভাবে সেই পর ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইত। দেশ আনন্দ মাতিয়াছে. আনন্দময়ীর পূজায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা মাতিয়া উঠিয়াছে। সকলের অবলম্বিত পদ্ধতির সহিত আমার মিল না হইতে পারে, কিন্তু আমি কি দেশের লোক নই? আমি ও কি আনন্দময়ীর পুত্র নই? ইহাই শশিপদ বাবুর অভিমত।

জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে শশিপদ বাবুর পুত্র কন্যাগণ তাঁহার উপদেশ মত নূতন বস্ত্র, মিষ্টান্ন ও ফুল দিয়া মাতার চরণ পূজা করিতেন। এই সমস্ত পূজায় তিনি পুত্র কন্যাগণ সহ আত্মীয় বন্ধুদিগের গৃহে গিয়া উৎসবে যোগ দিতেন। পদ্ধতিতে

এক না হইয়া ভাবে একহওয়া যায় ইহাই শশিপদ বাবুর ধারণা আর জীবনের সুখ দুঃখ যদি হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলে যে জীবন নষ্ট হইয়া গেল ইহাই তাঁহার অভিমত।

বাড়ীতে কাহারও পীড়া প্রভৃতি হইলে শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডী পাঠ নারায়নকে তুলসী প্রদান প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দুর গৃহে হইয়া থাকে। হিন্দু জাতির অকৃত্রিম ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভগবদ্বিশ্বাসের ইহা একটী সুন্দর অভিব্যক্তি। শশিপদ বাবুর গৃহে কাহারও অসুখ হইলে তিনি অষ্টাহকাল বাড়ীতে ভগবদুপাসনার ব্যবস্থা করিতেন।

ভগবদ্বিশ্বাসই হিন্দু জীবনের বিশিষ্টতা অথবা হিন্দুজীবনের অন্যান্য বিশেষত্বগুলির ইহাই বীজ। শশিপদ বাবু এই বীজটুকু ধরিয়া আজীবন জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়াছেন। তিনি জীবনে অনেক প্রকারের কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার সমস্ত কার্য্য ভবিষ্যতে গৃহিত হউক বা না হউক কিন্তু এই কথা বলিতে পারা যায় যে এই বীজ ভাব হইতে তিনি কখনই বিচ্যুত হয়েন নাই। তিনি যে সমস্ত সংস্কার কার্য্যের হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইংরাজদের এই সব আছে বা এই সব করিলে ইংরাজেরা তুষ্ট হইবে এইরূপ চিন্তা দ্বারা চালিত হইয়া তাহা করেন নাই। যাহা শাস্ত্র সঙ্গত ও মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে শশিপদ বাবুর যাহা আন্তরিক বিশ্বাস এস্থানে তাহাও বর্ণনা করা আবশ্যক। তিনি বিশ্বাস করেন আমাদের সমাজে সময়োপযোগী সংস্কার বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক, যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই জন্য যদি কেহ হিন্দু সমাজকে গালাগালি করেন তাহা হইলে তিনি তাহা একেবারে সহ্য করিতে পারেন না। তিনি বলেন জগতের সমস্ত
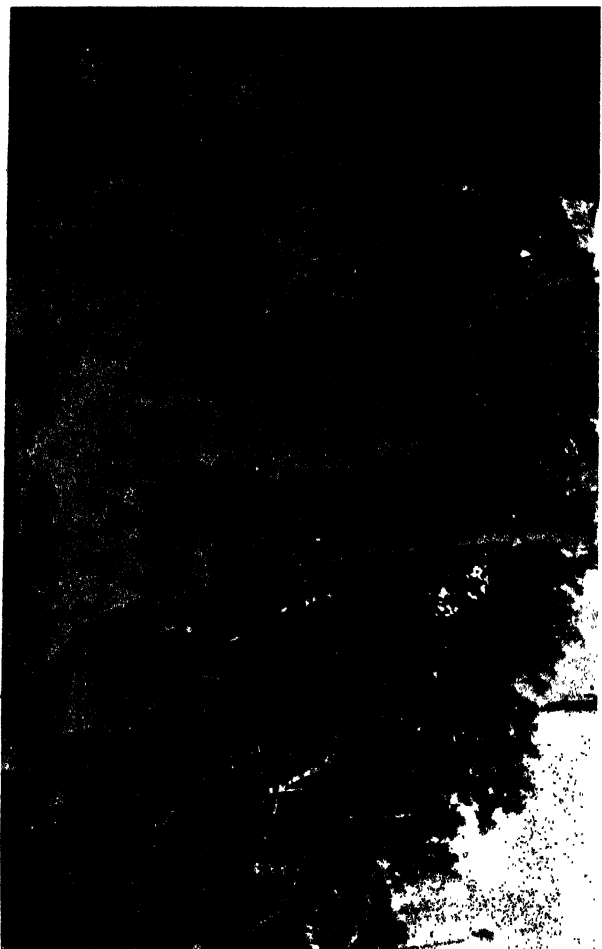
শশিবাবুর পারিবারিক সমাধি-মন্দির

সমাজে দোষ আছে, মানব যখন এখনও সম্পূর্ণরূপে দেবভাব পায় নাই, জগৎ যখন এখনও দেবালয় হয় নাই, মানব যখন অবিশ্বাচ্ছন্ন তখন মানবের সমাজে অপূর্ণতা থাকিবেই। জগতের সমস্ত সমাজের ভাল ও মন্দ লইয়া যদ্যপি বিচার করা যায় তাহা হইলে হিন্দু সমাজ এখনও জগতের মধ্যে অনেক বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও পবিত্র। এখনও হিন্দু সমাজে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব আছে জগতে অন্য কোনও সমাজে তাহা নাই। এটুকু যিনি না বুঝিয়াছেন তিনি হিন্দু সমাজ দেখেন নাই, জগতের অন্যান্য সমাজ দেখেন নাই এবং তুলনা করিয়া সত্য নিরূপণ করিবার শক্তি ও তাঁহার নাই।

হিন্দু জাতির দৃঢ় ভগবদ্বিশ্বাস শশিপদ বাবুর জীবনে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রকৃত ভক্তগণ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া হাসিতে হাসিতে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, নির্ভয়ে বনজন্তু সঙ্কুল বনপথে গিয়াছেন। কারণ ঈশ্বর যখন আনন্দময় তখন তিনি বিচার বুদ্ধির বিষয় নহেন, হৃদয়ের অন্তরতম বস্তু, সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ। একবার শশিপদ বাবু উপাসনা করিতেছেন এমন সময়ে একটি সাপ আসিয়া উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিল, মন্দিরের সমস্ত লোক যেমন স্বভাবতঃ করিয়া থাকে, সাপ সাপ বলিয়া লাফাইয়া উঠিল, ও সতর্ক ভাবে সরিয়া দাঁড়াইল, শশিপদ বাবু একবিন্দুও নড়িলেন না যেমন উপাসনা করিতেছিলেন তেমনি উপাসনা করিতে লাগিলেন। সাপটি আপনি তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আর একবার কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি কালে উপাসনার সময় একটি বিছা তাঁহার গায়ের উপর আসিয়া উঠিল। তিনি কিন্তু বিচলিত হইলেন না। এই দৃঢ় ভগবদ্বিশ্বাসই তাঁহার জীবনের ধ্রুবনক্ষত্র। এইখানেই আমরা দেখিতে পাই, জাতীয় ভাব কিরূপ। আনন্দময়ের উপাসনা ও উপলব্ধি হিন্দু-জীবনের মর্ম্মকথা, এই মর্ম্মকথাই শশিপদ বাবুর সমগ্র জীবনে

পরিস্ফুট সুতরাং তাঁহার জীবন হিন্দু সাধনার একটি পরিপক্ক ফল।

ভগবদ্বিশ্বাসে ও ভগবদনুভূতিতে মানবের যে সমস্ত অবস্থা হয় প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে তাহার যথেষ্ট বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিখিত আছে এ কালের অনেক লোকে তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ কালের অনেক লোক সমাধিকে স্নায়বিক ব্যাধি পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। সুখের বিষয় যে আজ কাল মানব বিজ্ঞানের অত্যধিক উন্নতিতে মানবের বিস্তৃততর চৈতন্যের (Larger consciousness) অনেক রহস্য আলোচিত হইতেছে, শশিপদ বাবুর জীবনেও এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা এই বৃহত্তর চৈতন্যের রহস্যালোচনা ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা যায় না, তাঁহার অনেক সময়ে সমাধি হইয়া থাকে। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের "ইন্দুবালা" গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। শশিপদ বাবুর ৫ম কন্যা ইন্দুর পিতৃভক্তি ও পিতার সেবায় অনুরাগ বর্ণনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে এক একদিন শশিপদ বাবু তাঁহার পারিবারিক সমাধি মন্দিরে ধ্যান, ধারণা ও পরমার্থ চিন্তা করিতেন। এই সময়ে তিনি অজ্ঞান বা সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। বাহ্য জ্ঞান একেবারে থাকিত না। এই অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। এই প্রকারে একদিন তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন। হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ইন্দুর তাহার পিতার প্রতি দৃষ্টি ছিল। ইন্দু আসিয়া ছাতা ধরিয়া অনেকক্ষণ বৃষ্টি নিবারণ করে।

এই গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের আর একটি প্রয়োজনীয় কথা আলোচিত হইয়াছে। হরি সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় প্রায়ই শশিপদ বাবুর বাড়ী আসিত, তিনি এই সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে অনেক সময়ে একেবারে ভাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন। ইন্দু তাহার পিতাকে

বড়ই ভাল বাসিত। সে নিজে যদিও সঙ্গীতের বড়ই অনুরাগিণী ছিল তথাপি পাছে পিতা অচেতন হইয়া পড়েন, পাছে তাঁহার অঙ্গে কোনরূপ আঘাত পায় এই আশঙ্কায় সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিলে ইন্দু বড়ই ভীত হইত। এই ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্য শশিপদ বাবু জীবনে যে তপস্যা ও কৃচ্ছসাধন করিয়াছেন এই গ্রন্থে স্থানান্তরে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেবা

আনন্দময়ের উপাসনা সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে তাহার বিষয় চিন্তা করিলেই শশিপদ বাবুর জীবনের রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। শশিপদ বাবুর জীবনের রহস্য বুঝিবার জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। আমাদের দেশে এক নূতন ভাব আসিয়া আমাদের সম্মুখে এক নূতন কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়াছে, আমাদের সেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতিকে গৌরবে ও মহত্বে লইয়া যাইতে হইবে। অনেকেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, শক্তিশালী ও প্রতিভাশালী লোকের অভাব নাই. তাঁহাদের মধ্যে যে ত্যাগশীলতা নাই তাহাও নহে।

এই সমস্ত কর্ম্মবীরগণের জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, দেশের লোককে কোন্ সাধনায় দীক্ষিত করিলে আমরা নূতন কর্ম্মী সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারিব ও নবযুগের সাধনায় আমাদের সিদ্ধি হইবে তাহা নিরূপণ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের ঘটনা, উদাহরণ স্বরূপে উল্লিখিত হইতেছে। ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে সেবাব্রত উপাধি প্রদান করেন, তাঁহারা শশিপদ বাবুর জীবন আজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের মূল ভাব, তাঁহার হৃদয়ের যাহা প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা তাঁহারা তাহা জানিতেন বলিয়া তাঁহারা সেবাব্রত উপাধি দিয়াছিলেন। সর্ব্বজন সম্মানিত সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পরলোকগত মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বামা-বোধিনী পত্রিকায় এই উপাধি দান প্রসঙ্গে বলেন যে এই উপাধি

একেবারে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রও ঠিক এই কথাই বলেন। আজকাল দেশে শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে, সর্ব্বত্রই দেশের লোকে দলবদ্ধ ভাবে নানারূপ শুভ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। ইহা ছাড়া মিউনিসিপালিটির কমিশনাররূপে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যরূপে, শিক্ষাবিস্তারের সহায়কারীরূপে, নবগঠিত লাটসভার সভ্যরূপে ও অন্যান্য অনেক পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশের লোকে দেশ সেবার অধিকারী হইতেছেন। এখন দেশের প্রকৃত সমস্যা এই যে আমাদিগকে এই সমস্ত কার্য্যের উপযুক্ত হইয়া স্বদেশ প্রেমের প্রমাণ দিতে হইবে। অধিকার লাভ করায় মঙ্গলও হইতে পারে অমঙ্গলও হইতে পারে। অনুপযুক্ত লোকে এই সমস্ত দায়িত্ব ও সম্মানপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যদ্যপি আত্ম প্রতিষ্ঠার অন্বেষণ করেন, অথবা স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদান করেন তাহা হইলেই দেশের একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে, দেশহিতের জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন, এত জল্পনা কল্পনা সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই যুগের ইহাই এক প্রকাণ্ড সমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য এই পরিচ্ছেদ লিখিত হইতেছে।

আনন্দময়ের উপাসনায় আধ্যাত্মিক জীবনের যে আদর্শ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই দুইটি পাইয়াছি যে, যাহা আধ্যাত্মিক তাহা ভৌতিক বা মানসিক ভাবের বিরোধী নহে, এই সমস্তের পরিপূর্ণতা। আনন্দময়ের আনন্দালোকের মধ্যে অন্তরাত্মাকে অধিষ্ঠিত রাখাই মানব জীবনের একমাত্র পুরস্কার। যিনি ভক্ত তিনি অন্য পুরস্কারের প্রার্থী নহেন। ভগবানের এই আনন্দ পাওয়ার অর্থ, অন্য কিছু হইতে বঞ্চিত হওয়া নহে, ইহাই আমাদের সব পাওয়া। এই সব পাওয়ার দেশের আস্বাদ পাইয়াই ভক্ত বলেন,—

"ইন্দ্রত্বে বা মনুত্বে বা স্বর্গভোগং ফলম্ চিরম্
নাস্তি মে মনসো বাঞ্ছা তৎপাদসেবনং বিনা॥"

হে প্রভো! ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব, বা অক্ষয় স্বর্গসুখ চাহি না, তোমার চরণ সেবা ব্যতীত আর কিছুতে বাঞ্ছা নাই।" তাঁহার চরণ সেবাই জগতের সেবা, মানবের সেবা। প্রকৃত ভক্ত হইলেই তিনি সেবাব্রত হইবেন।

শশিপদ বাবু তাঁহার সমস্ত জীবনে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা দেশের জন্য প্রয়োজন। এই সমস্ত যদ্যপি বিস্তৃতভাবে আলোচিত না হয় তাহা হইলে দেশের অশেষ ক্ষতি হইবে। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার উপকরণও যথেষ্ট রহিয়াছে—বর্ত্তমান গ্রন্থে স্থানাভাব ও গ্রন্থকারের উপস্থিত সময়াভাব নিবন্ধন আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা অসম্ভব। প্রধান প্রধান কার্য্যগুলির মধ্যে যে বিশেষত্ব আছে সেই বিশেষত্বটুকু এবং প্রসঙ্গক্রমে দুই একটি কার্য্যের সামান্য বিবরণ দেওয়াই এই গ্রন্থে সম্ভব।

যে কাজই করি না কেন যাঁহার কাজ তাঁহাকে ভুলিলেই কাজ পণ্ড হইয়া যায়; আনন্দময়ের সেবায় আনন্দ, সেই আনন্দের সহিত নিত্যকাল যদি হৃদয়ের স্পর্শ না থাকে তাহা হইলে স্বার্থবুদ্ধি দানবের মত আসিয়া আমাদের কাজ নষ্ট করিয়া দেয়। শশিপদ বাবুর কাজের বিশেষত্ব এই যে যাঁহার কাজ তাঁহাকে তিনি কখনই ভুলেন নাই এবং কাজের যাহা একমাত্র পুরস্কার সেই পুরস্কার অর্থাৎ আনন্দময়ের উপলব্ধি ব্যতীত, কখন ভুলিয়াও অন্য পুরস্কারের প্রত্যাশী হন নাই। এই কারণেই তিনি নিজে ধনবান বা জাগতিক হিসাবে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত বা প্রতিভাবান না হইয়াও যতগুলি কাজ করিয়াছেন তাহা আর অন্যত্র দেখা যায় না। আজ তাঁহার জীবনের অপরাহ্ণ —আজ তিনি দরিদ্র সন্ন্যাসী, বাস ভবন পর্য্যন্ত দান করিয়া একেবারে

অকিঞ্চন হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি দীনাতিদীন, দেবালয়ের দেবতা সেই আনন্দময়ের পূজারি, ইহাই আজ তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্মান ও পুরস্কার।

তিনি যখনই যাহা করিয়াছেন সমস্তকেই সেই আনন্দময়ের অভিমুখী করিয়া করিয়াছেন। সুরাপান নিবারণে মনোনিবেশ করিলেন। মানুষ অজ্ঞান. ভবিষ্যজ্ঞানহীন তাই সামান্য ও সাময়িক উত্তেজনা বা সুখের লালসায় সুরাপান করে। সরকার বাহাদুরকে লিখিয়া আইন করিতে পারিলে সুরাপান কমাইতে পারা যায়—এবং এরূপ করারও যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে। অনেক সুরাপান নিবারণের উদ্যোগী পুরুষ এই চেষ্টাই করিতেছেন। যদি কঠোর আইন করিয়া সুরাপান বন্ধ করা যায় তাহাতেই কি কাজের শেষ হইল, প্রকৃতভাবে সুরাপান নিবারণ হইল? লোকে মদ না খাইলেই যদি সুরাপান নিবারণ হয়, এইরূপ আমরা মনে করি তাহা হইলে আমাদের এখনও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিকশিত হয় নাই, এখনও আমরা মানব জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। মনে করুন একজন লোককে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া বা ভয় দেখাইয়া মদ খাওয়া ছাড়াইলাম। ইহাতে তাহার হিত হইল কি অহিত হইল তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। অবিদ্যার ভূমিতে পাপের বীজ থাকে, অসৎ সংসর্গ, কুসংস্কার প্রভৃতির সলিল সিঞ্চনে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া থাকে, তাহা যাহা হউক একটা মূর্ত্তি গ্রহণ করে অর্থাৎ একটি বিশেষ দিক দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। এখন, তাহা যে দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে আমরা যদি সে দিক কোন কৃত্রিম উপায়ে রুদ্ধ করিয়া দিই, তাহা হইলে পাপের বীজও থাকিল অবিদ্যার ভূমিও থাকিল সেই বীজ সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিল, সুযোগ পাইলেই অন্যরূপ, হয়ত ভীষণতর মূর্ত্তি লইয়া সে আপনাকে প্রকাশ করিবে।

এরূপ ঘটনা জগতে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহার বেশ উদাহরণ পাওয়া যায়। শরীরে বার বার চর্ম্ম রোগ হইতেছে—এখানে বাহির হইতে চর্ম্ম রোগ আরোগ্য করা যেমন দরকার তেমনি রক্তদুষ্টিরও চিকিৎসা চাই। রক্তদুষ্টির চিকিৎসা না হইলে হয়ত রক্তের সেই দোষ চর্ম্মরোগ অপেক্ষা কোন কঠিনতর দুরারোগ্য রোগে পরিণত হইবে। শশিপদ বাবু সুরাপান নিবারণের সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক পুস্তকালয় স্থাপন করিলেন। সুরাপানের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মনিশী জ্ঞানগর্ভ পুস্তক লিখিয়াছেন সেই সমস্ত পুস্তক যাহাতে দেশের সমস্ত লোকে পড়িতে পায় এবং এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাহাতে জ্ঞান লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ঐ যে পাপবীজ তাহা যাহাতে ধ্বংস হয় সে জন্য সদালাপ ও সৎসংসর্গের ব্যবস্থা ক'রলেন। এই যে ভাব অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনাকে তাহার মূল পর্য্যন্ত অনুসরণ করা ইহা তাঁহার কার্য্যের একটি বিশেষত্ব এবং সমস্ত কার্য্যেই ইহা পরিদৃষ্ট হইবে।

স্ত্রী শিক্ষার কথা পরে বলা হইবে, এ বিষয়েও তিনি কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন ও এই সমস্যার সকল দিক কিরূপভাবে দেখিয়াছেন তাহাও বিশেষভাবে আলোচ্য। হিন্দুনারীর যাহা বিশেষ মহত্ব, স্ত্রী শিক্ষার দ্বারা এ কালের স্ত্রীলোকেরা যদ্যপি তাহা হারায়, যদি তাহারা স্বার্থপর হয়, বিলাস পরায়ণ হয়, বৈদেশিক ভাবে অতি মুগ্ধ হইয়া জাতীয়ভাব বিসর্জ্জন দেয়, অপরের সেবা করিয়া জীবনে যে আনন্দ লাভ, যাহা হিন্দু রমণী নিত্য উপভোগ করেন, যদি তাহা চলিয়া যায়, এই শ্রমশীলতার স্থানে যদি আলস্য ও বিলাসিতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যে স্ত্রী শিক্ষার দ্বারা ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবে ইহা শশিপদ বাবু প্রথম হইতেই বুঝিতেন। বালিকাদের শিক্ষা, পুর-

রমণীদের শিক্ষা, বিধবাদের শিক্ষা সকল দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি পুর স্ত্রী দিগের জন্য এক "বিতরণকারী পুস্তকালয়" Circulating Library প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রিস, এণ্ড রয়েট্ পত্রের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যের একজন বিশেষ বন্ধু ও সাহায্যকারী ছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রে আছে সমস্ত কার্য্যই জ্ঞানমূল। মূলে যদি জ্ঞান না থাকে, বাহ্য ক্রিয়া যন্ত্রের মত করিয়াই যাই তাহা বিফল—অনেকে একেবারেই বিফল বলিয়াছেন, একেবারে বিফল হউক বা না হউক অনেকটা বিফল তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"কুরুতে গঙ্গাসাগর গমনং
ব্রত পরিপালন মথবা দানং
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন
মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন।"

ক্রিয়ার মধ্যে থাকিয়া এই জ্ঞানের দিকে উন্মুখ থাকিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা সমস্ত কার্য্যের মূলে যাইতে পারিব। আজ কাল দেশে এমন অনেক বড় বড় কার্য্য হয় যাহা একটা অন্ধ অনুকরণের দাসত্বপূর্ণ আড়ম্বর মাত্র। অন্যে করিয়াছে বা অন্যে এই প্রকারে করে অতএব করা যাউক। এই প্রকারের, মূলে জ্ঞান নাই এমন অনেক আড়ম্বর পূর্ণ কার্য্যে, দেশের অনেক অর্থ অপব্যয় হইয়া যায়। প্রাচীন অনুষ্ঠানাদির কথা বলিতেছি না, দেশ হিতৈষণার নামে নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরই এমন অনেক কার্য্য আছে ও হইয়া থাকে। উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বত্রই দেখিতে হইবে যে মানুষ যেন যন্ত্রবদ্ধ গতানুগতিকতায় ডুবিয়া না যায়। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজ, শ্রমজীবি-সমিতি প্রভৃতি যাহা কিছু শশিপদ বাবু করিয়াছেন সর্ব্বত্রই লোকে যাহাতে জ্ঞানলাভ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয়

নিজে চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারে, যাহাতে অন্ধ মেষপালের মত শক্তিশালী পালকের তাড়নায় না চলে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা নিজের প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াসী তাঁহারা এদিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না, কারণ তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থহানি হইতে পারে।

শশিপদ বাবুর একটি উক্তি আছে। "ভিতরে প্রার্থনা, বাহিরে সেবা, কার্য্য আর কিছুই নহে সেবা। ভিতরে যত প্রার্থনায় ডুবে যাওয়া, বাহিরে তত সেবার বৃদ্ধি। জীবনব্যাপী প্রার্থনা, জীবনব্যাপী সেবা। প্রার্থনা সেবার ভাবকে সতেজ রাখিয়াছে আবার সেবা প্রার্থনার ভাবকে জীবন্ত করিয়াছে।" তাঁহার আর একটি উক্তি আছে—

"আমার জীবনে ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে পৃথক করিয়া দেখান বা বুঝান যায় না। ধর্ম্মকে দেখাইতে গেলেই কর্ম্ম আসিয়া পড়ে, আবার কর্ম্মের কথা বলিতে গেলেই ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। এই দুইটিকে পৃথক রাখা অসম্ভব। পৃথক করিতে গেলেই আমার জীবনের বিশেষত্বটুকু থাকে না। অক্‌সিজেন্ ও হাইড্রোজন্ মিশিয়া জল হয়, এই দুইটিকে পৃথক পৃথক কর আর জল থাকে না, এই দুইটি বাষ্পের সংমিশ্রনে জল হয় তেমনি ধর্ম্মও কর্ম্ম একত্র হইয়া আমার জীবন। ইহাদের এক একটি পৃথক করিয়া বর্ণনা করিলে আমার জীবনের ঠিক বর্ণনা হয় না। প্রতাপ বাবু এক সময়ে কেশব বাবুর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া লণ্ডনের "এন্‌কোয়ারার" কাগজে লিখিয়াছিলেন, (তত্ত্বকৌমুদী ১লা ভাদ্র ১৮০০ শক) সমাজ সংস্কার কেশব বাবুর জীবনের কার্য্য নহে; ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। আমার জীবনে কিন্তু এই দুইটিকে (ধর্ম্ম ও সমাজ সেবাকে) সেইরূপ পৃথক ভাবে দেখান যাইতে পারে না, দুইটি গ্যাসের সংমিশ্রনে যেমন জল হয় তেমনি কর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা একত্র হইয়া আমার জীবন গঠিত হইয়া আসিয়াছে, একটিকে দেখিতে বা বুঝিতে হইলেই অপরটিকে দেখিতে হইবে।"

শশিপদ বাবু যেমন ধর্ম্মে সমস্ত অধিকার গুলির পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় যে আনন্দময়ের উপাসনা সেই উপাসনা, পথের পথিক, কর্ম্মে তেমনি তিনি সকল বিভাগে কার্য্য করিয়া 'দেবালয়'এ তাহার পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় করিয়াছেন।

তাহার কার্য্যগুলির উল্লেখ মাত্র করিলেই সকলে ইহা বুঝিতে পারিবেন—

• স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সমিতি গঠন, উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষে ও ঝড়ের সময়ে বিপুল পরিশ্রম ও সাহায্য, সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও শ্রমজীবিগণকে বিশ্রামকালে বস্ত্র বয়ন শিক্ষা দেওয়া। সমাজের উন্নতি চেষ্টা (Social Improve ment sociely, Social Improvement Assciation) নর্থ সুবার্বন এসোসিয়সন্ নামক একটি সভা। যাহারা পীড়িত তাহাদের সেবা, যাহারা মৃতদেহ সংকার করিতে না পারে তাহাদের সাহায্য করা, এই প্রকারের অন্যান্য কার্য্য এই সভা করিতেন। কলেরা হইলেই দল গঠন করিয়া সেবার কার্য্য। স্ত্রী শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা। বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির তিনি অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। রাস্তা নর্দ্দমা প্রভৃতির সংস্কার লইয়া ও সাধারণ লোকের অভাব অভিযোগ প্রভৃতির সংবাদ তিনি কিরূপভাবে রাখিতেন তাহা তাঁহার বিলাত যাইবার সময় তাঁহার গ্রামবাসী ব্যক্তিগণ যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন তাহাতে অতীব স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির সম্পাদকের কার্য্য করিবার সময় তিনি সহরের উন্নতির জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এখনও সেই ব্যবস্থা মত কার্য্য চলিতেছে, তাঁহার প্রস্তাবিত সমস্ত সংস্কার এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপে একটি কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বরাহনগরে ভাগবতাচার্য্যের পাঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

তথায় আসিয়াছিলেন এইস্থান বৈষ্ণবদিগের পবিত্র তীর্থ। বরাহ-নগরের গঙ্গার ঘাট হইতে পাঠবাড়ী পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মানের প্রস্তাব তিনি করিয়া ছিলেন, এখনও তাহা হয় নাই। শশিপদ বাবু স্বয়ং এই পাঠবাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতেন, এই পবিত্রস্থানে যাতায়াতের যাহাতে সুবিধা হয় সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। তাঁহার এ প্রস্তাব এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বরাহনগরে একটি ষ্ট্র্যাণ্ড-(নদীর তীরে প্রশস্ত রাজপথ) নির্ম্মাণ করা তাঁহার আর একটি প্রস্তাব, এই প্রস্তাব এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তবে এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

এই সময়ে এড়িয়াদহ নিবাসী ইন্‌জিনিয়ার রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরও বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য ছিলেন। সহরের নানারূপ সংস্কারমূলক কার্য্যের জন্য শশিপদ বাবু প্রসন্নবাবুর সহিত সর্ব্বদাই পরামর্শ করিতেন। শ্রীযুক্ত প্রসন্নবাবু এক্ষণে কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া তন্ময়চিত্তে সাধন ভজনে দিন পাত করেন, তিনি ও বরাহনগর নিবাসী জমিদার রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি এই ভাগবতাচার্য্যের পাঠ বাড়ী সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই চেষ্টা সফল হইলে তাঁহারা বৈষ্ণব সমাজের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

বরাহনগরে মিউনিসিপালিটি শশিপদ বাবুর নামে একটি রাস্তার নাম-করণ করিয়াছিলেন। নিজের বা নিজের কাহারও নামে নামকরণ করাইবার জন্য আজকাল লোকে কিরূপ চেষ্টা করে ও অনেক অর্থ ব্যয়ও করিয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন। শশিপদ বাবু কিন্তু সাধারণের কার্য্যের বিনিময়ে এই খ্যাতি চাহেন নাই। তিনি পত্র লিখিয়া এই নাম পরিবর্ত্তন করাইয়া, তাঁহার নামের বোর্ড উঠাইয়া দেওয়াইলেন।

এক সময়ে বরাহনগরে তাঁহার প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। ছোটলাট সার, রিচার্ড টেম্পল্, বরাহনগর গেলেন শশিপদ বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এই প্রতিপত্তি তিনি কখনও নিজের কোনরূপ স্বার্থাভিসন্ধিতে প্রয়োগ করেন নাই, ইহা তাঁহার চরিত্রের একটি খুব বড় বিশেষত্ব। এক কথায় তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ্ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই পদের জন্য কত লোকে লালায়িত!

যাঁহারা সাধারণের কার্য্য অবৈতনিক ভাবে করেন তাঁহাদের অধিকাংশস্থলেই এইরূপ্ বিশ্বাস যে তাঁহারা এই কাজ করিয়া যেন দেশকে কৃতার্থ করিতেছেন; এই অবস্থা বড়ই ভয়ানক। যাঁহাদের এইরূপ মনোভাব তাঁহাদের কোন লোকহিতকর কার্য্যে অবৈতনিক ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে নাই। অবৈতনিক কার্য্যের জন্য উচ্চ-পদস্থ হইলে আমাদের সর্ব্বদা অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে হইবে যে এই প্রকারের কার্য্য সাধন করিবার বা সাধারণের সেবা করি-বার সুযোগ ও অধিকার পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আনন্দ-ময়ের উপাসক না হইলে এই কৃতার্থতার ভাব আসিতে পারে না।

আমরা দেখিতে পাইতেছি দৈহিক, আর্থিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধনেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই সেবা তাঁহার উপাসনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। সেবা করিয়াই তিনি কৃতার্থ। এই জন্যই তিনি সেবাব্রত!

বরাহনগর কালী বাড়ীতে ভিক্ষুকদের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে শশি-পদ বাবু একবার আহার করিয়াছিলেন। এই কথাটি সে সময়ে বিশেষভাবে রাষ্ট্র হইয়াছিল—নানাজনে ইহার নানারূপ অর্থও করিয়া-ছেন্। এই ব্যাপারে তাঁহার চরিত্রের বড় সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই ঘটনা তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপ বর্ণনা করিলাম।

একবার মাঘোৎসবের সময় শশিপদ বাবু তিন দিন তিন ব্রাহ্মসমাজে অর্থাৎ একদিন সাধারণ সমাজে একদিন আদি সমাজে আর এক দিন নববিধান সমাজে যোগদান করিলেন। তাহার পর তিনি ভাবিলেন ব্রাহ্মোৎসবে সকলের সহিত মিলিয়া যাইতে হইবে। তিন দিন তিন সমাজে যোগ দান করিলাম কিন্তু হিন্দু সমাজে যোগ দেওয়া হইল না, এখন হিন্দু সমাজে যোগ দেওয়া উচিত। এই মনে করিয়া তিনি কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন, মনের মধ্যে এক উপায় জাগিয়া উঠিল।

তাহার পর শশিপদ বাবু এক ছিন্ন কম্বল মুড়ি দিয়া খালি পায়ে বরাহনগর বাড়ী হইতে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাইতেছেন। পথে একজন খঞ্জ ভিক্ষুকের সহিত দেখা হইল, সে ব্যক্তি লাঠিতে ভর দিয়া যাইতেছে, শশিপদ বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে "ভাই তুমি কোথায় যাইতেছ?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল "ঠাকুর বাড়ী প্রসাদ খাইতে যাইতেছি।" শশিপদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "সেখানে কি যে যায় সেই প্রসাদ খাইতে পায়?" ভিক্ষুক উত্তর করিল "না সকলে পায় না যাহার টিকিট আছে সেই কেবল পায়?" শশি-পদ বাবুর মনে এক অতি গভীর চিন্তার ভাব জাগিয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন এই সংসারের অন্ধ ও পঙ্গু আমরা, লাঠিতে ভর করিয়া অতি কষ্টে সংসারের ধূলামাখা পথ দিয়া চলিয়াছি। বিশ্ব-নাথের মন্দিরে যাইব তাঁহার প্রাসাদাম পাইব ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এব্যক্তি সত্যই বলিয়াছে পুণ্যের টিকিট সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু আমি কি টিকিট সংগ্রহ করিয়াছি? এই চিন্তায় তিনি বড়ই বিমনা হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে চাহিয়া দেখিলেন সেই ভিক্ষুককে আর দেখিতে পাইলেন না। সে ইতিমধ্যে অন্যপথ ধরিয়া স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীর দিকে চলিয়া

গিয়াছে তথায় টিকিট ব্যতীত প্রসাদ দেওয়া হয় না। এ দিকে শশিপদ বাবু সেই বেশে ধীরে ধীরে রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও ঐ মন্দিরের পূজারী পাচক প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে চিনিত তথাপি কম্বল মুড়ি দিয়া থাকায় কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তিনি সেই সমস্ত অন্ধ খঞ্জ ভিক্ষুকদিগের সহিত বসিয়া প্রাসাদ পাইলেন। সেই দলের মধ্যে একজন ভিক্ষুক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি তখন কাহাকেও কিছু বলে নাই। তাহার পর এই কথা আর গোপন রহিল না। আহারের পর সেই ভিক্ষুক কথাটি রাষ্ট্র করিয়া দিল।

মন্দিরের পূজারি ও অন্যান্য কর্ম্মচারী তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি প্রত্যেককে কিছু কিছু অর্থ দিলেন। বুদ্ধিমান লোকে ইহার রহস্য নির্ণয় করিতে পারিল না, তাহারা রাষ্ট্র করিল যে শশিপদ বাবুর স্ত্রীর অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে মা কালার স্বপ্নাদেশ হইয়াছে যে যদি তুমি ভক্তির সহিত আমার প্রসাদ খাও তাহা হইলে তোমার স্ত্রী আরোগ্য লাভ করিবে।

এই ঘটনা হইতে তাঁহার হৃদয়ভাব বুঝিতে পারা যাইতেছে। সেবা সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা আলোচনা করিলে এই সেবার তত্ত্বও বুঝিতে পারা যাইবে। ফুলঝারি নামক একজন মেথর ও তাহার স্ত্রী শশিপদ বাবুর বাড়ীতে কাজ করিত, এই মেথর দম্পতি বড়ই ভাল লোক ছিল, তাহারা কখনও উচ্চৈঃস্বরে কথা পর্য্যন্ত কহিত না। কিছুদিন পরে ফুলঝারির অসুখ হইয়াছে, সে ব্যক্তি মেথরদের বসতি ‘নব্যারাকে থাকে। শশিপদ বাবুর মনে হইল যে আমার কোন বন্ধুর যদ্যপি অসুখ হইত তাহা হইলে আমি তাহাকে দেখিতে যাইতাম, এই মেথর আমার যেরূপ সেবা করে সেরূপ সেবা আর কেহই করিতে পারে না। তাহার এই অসুখের সময় তাহার প্রতি কি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই?

দুইদিন এই চিন্তা তাঁহার মনে মধ্যে মধ্যে উঠিয়াছিল, তৃতীয় দিনে তিনি পোষাক পরিয়া কলিকাতা আসিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পৃষ্ঠে কে যেন আঘাত করিয়া বলিল "কৈ তুমি ত গেলে না?" শশিপদ বাবু সেই বেশেই ব্যারাকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মেথরেরা যে খানে বাস করে তাহার চারিদিকে ময়লা ফেলিবার পাত্র। এই স্থানে তাহারা শশিপদ বাবুকে দেখিয়া একেবারে চমকিত ও বিস্মিত হইয়া উঠিল। শশিপদ বাবু একজনের নিকট ফুলবাগির ঘর কোন্ খানি জানিয়া লইয়া তথায় গেলেন, তাহার বিছানার পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া ও অর্থ সাহায্য করিয়া আসিলেন।

সেবা তাঁহার ব্রত, স্বভাবের প্রেরণায় তিনি এই সেবাকার্য্য যেরূপভাবে সাধন করিয়াছেন আমাদিগকেও সেই ভাবে লোকহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

সেবাব্রত শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আজীবন দেশের লোকের সেবা করিয়াছেন, যখন যেখানে অভাব দেখিয়াছেন বিগলিত প্রাণে সেইখানেই উপস্থিত হইয়াছেন, এই যে সেবা, ইহার ভিতরের প্রেরণা কি তাহা আমরা বর্ণনা করিলাম, আনন্দময়ের উপাসনাই সেই প্রেরণা। এই সেবার কার্য্য তিনি যে প্রণালীতে করিয়াছেন সেই প্রণালীও আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য।

যাঁহারা তাঁহার বিপক্ষ, যাঁহারা পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে তাঁহার অনিষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, এরূপ লোকেরও যে তিনি কত সময়ে সাহায্য করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিপক্ষের সহিত তাঁহার এই যে ব্যবহার, এই ব্যবহারের পশ্চাতে এক দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সাধনার প্রকৃতি আমাদের সকলের অবগত হওয়া উচিত।

বিপক্ষের সহিত ব্যবহারে সর্ব্বপ্রথমে তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন। এই 'আত্ম' জাগতিক স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন 'আমি' নহে—পারমার্থিক আমি—The Spiritual self. যাহার সম্বন্ধে চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়াছেন "আত্মানং সততং রক্ষেৎ।" কেহ বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিলেই তিনি ভাবিতেন, ভগবান এইবার আমার পরীক্ষা করিতেছেন, বিপক্ষের প্রতি যদি বিরোধভাব পোষণ করি, তাহার প্রতি যত্মপি ক্রোধ বা বিরক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তাহাতে আমার নিজের ক্ষতি, এই সমস্ত রিপু অন্তর মধ্যে জাগ্রত হইলেই আমার আধ্যাত্মিক জীবন নষ্ট করিবে, এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজে যাহাতে বিপক্ষ ভাবাক্রান্ত না হন সেজন্য জীবনব্যাপী সাধনা করিতেন। এই প্রকারে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখিয়া তিনি বিরোধীর প্রতি যাহাতে বিরোধ ভাবের পরিবর্ত্তে প্রেমভাব দিতে পারা যায় তজ্জন্য চেষ্টা করিতেন। বিরোধীর মধ্যেও সদ্গুণ আছে, দেখিতে পারিলে জগতের সর্ব্বত্রই ভাল আছে তবে সূর্য্য যেমন ক্ষণেকের জন্য মেঘে আবৃত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ জীব অবিদ্যার মেঘাবরণে আচ্ছন্ন হয় মাত্র, তাহার নিত্য জ্যোতি কখনও নির্ব্বাণ হয় না। এই প্রকারে বিরোধীর ভাল দিক দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রতি প্রেম ও সহানুভূতি জাগ্রত হইত।

বিপক্ষকে সাহায্য করা, কোনরূপ চেষ্টা করিয়া সাহায্য করা নহে, সরল প্রাণে সহজভাবে হৃদয়ের স্বাভাবিক আবেগে সাহায্য করার উদাহরণ তাঁহার জীবনে যে কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি যখন সুরাপান নিবারণী সভার সম্পাদক সেই সময়ে একদিন মদের দোকানদার একজন ভদ্রলোক একটি সভার অধিবেশন কালে তাঁহাকে অকারণ অপদস্থ করিবার জন্য সভাস্থলে আসিয়া

সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিল, যে সম্পাদক মহাশয় আমার দোকানের দেনাটি যদ্যপি পরিশোধ করিয়া দেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। শশিপদ বাবুকে অপদস্থ করাই উদ্দেশ্য। এই ব্যক্তিকে শশিপদ বাবু অবশ্যই কিছু বলেন নাই। ইহার কিছুদিন পরে গ্রীষ্মকাল, সেই ব্যক্তি পথে যাইতেছে, শশিপদ বাবু গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন. সঙ্গে ছাতা ছিল, তিনি গাড়ী থামাইয়া এই লোকটিকে ডাকিয়া বলিলেন "ওহে এই রৌদ্রে তুমি কষ্ট পাইতেছ এই ছাতাটী নাও।" এই বলিয়া নিজের ছাতাটি তাহাকে দিলেন।

তাঁহার অনুষ্ঠিত হিতকর অনুষ্ঠান, যাহা তিনি দেশের কল্যাণের প্রতি চাহিয়া প্রাণ পাত করিয়া করিতেছেন সেই অনুষ্ঠান নষ্ট করিবার জন্য কোনও পদস্থ ব্যক্তি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যখন আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য কোনও ব্যয়সাধ্য মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন সেই সময়ে শশিপদ বাবু, পাছে স্বহস্তে দিলে তিনি না লন, এই জন্য কোনও বন্ধুর মধ্যস্থতায় তাঁহাকে নিজের সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, এমন কি তাঁহার ভ্রাতা পীড়িত হইলে একদিন তাঁহার পদসেবা পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

এই সেবার ভাব তাঁহার জীবনে কেমন আদ্যন্তব্যাপী তাহা একটি সাধারণ উদাহরণে জানিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু যখন ডাক বিভাগে কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে একদিন একজন ঐ বিভাগের কর্ম্মচারী তাঁহাকে বলেন যে তিনি এত পরিশ্রম করেন কেন? তিনি যেরূপ খাটেন স্বয়ং পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলও তত খাটেন না। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন যে "পোষ্টমাষ্টার জেনারেল টাকার জন্য খাটেন আর আমি আমার দেশের জন্য, আমার আত্মার মুক্তির জন্য খাটি। একজন বিধবা, তাহার পুত্র

বিদেশে চাকুরী করে, সে তাহার পুত্রের পত্রের জন্য ব্যাকুল আগ্রহে আশা পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, আমি যদি আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার পত্র খানি তাহার নিকট যাহাতে যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি তাহাতেই আমার আত্মপ্রসাদ।"

ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয় দেশে বসিয়া রহিয়াছেন, জীবের সেবা করাই ঈশ্বরের সেবা। জগতে কেহই চিরকালের জন্য পতিত নহে, আজ যে পাপী সেও কালে সংশোধিত হইবে। ঈশ্বর সকল জীবকেই উদ্ধার করিবেন। এই ভাবের প্রেরণায় তিনি কত পতিত ব্যক্তিকে যে আশ্রয় দিয়া তাহাকে সৎপথে আসিতে সহায়তা করিয়াছেন তাহারও সংখ্যা নাই। তিনি ঘৃণা কাহাকে বলে জানেন না, মানবের উদ্ধার সম্বন্ধে কখনও নিরাশ নহেন। জ্ঞান বাবুর নাম অনেকেই জানেন, সে একজন বিখ্যাত প্রতারক। প্রতারণা তাহার ব্যবসায় ছিল। প্রতারণার দ্বারা সে এক দিন কলিকাতায় খুব গৌরবে ও বিলাসে দিন কাটাইয়াছে। এই জ্ঞান বাবুর একবার প্রতারণার জন্য জেল হয়, সে ব্যক্তি যখন হাজারিবাগ জেলে তখন শশিপদ বাবু কর্ম্মোপলক্ষে হাজারিবাগ গিয়াছিলেন, তিনি জেলে গিয়া তাহার সহিত দেখা করেন ও সদুপদেশ দিয়া আসেন, জ্ঞান বাবু কতবার প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া জেলে গিয়াছে, সমস্ত লোকেই তাহাকে ঘৃণা করে ও অবিশ্বাস করে। একবার এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা হইল। এক দিন রাত্রিতে জ্ঞান বাবু মদ খাইয়া বরাহনগরে সমস্ত রাত্রি হল্লা করিয়া বেড়াইল, পথে যাহাকে পাইল ধরিয়া কামড়াইয়া দিল, এই প্রকারে সমস্ত রাত্রি হন্তা কুকুরের মত উন্মত্তভাবে ঘুরিয়া প্রাতঃকালে তাহার বোধ হয় কিছু অনুতাপের উদয় হইল। এই অবস্থায় কাপড়ের খুঁট গলায় জড়াইয়া সকাল বেলায় শশিপদ বাবুর নিকট উপস্থিত। আসিয়াই বলিল "আমি

আপনার শরণাপন্ন হইলাম, অপনি আমায় আশ্রয় দিন।" শশিপদ বাবু একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, তাহার বাপ আছেন, ভাই আছেন, তাঁহারা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সর্ব্বজনের ঘৃণিত ব্যক্তি তাহার মুখে আজ হঠাৎ এই কথা শুনিয়া শশিপদ বাবু মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিলেন ও বলিলেন "তুমি আমার এখানে থাকিতে পারিবে?" সে ব্যক্তি দৃঢ় স্বরে বলিল "ঠিক পারিব।" শশিপদ বাবু তাহাকে বলিলেন "আমি তোমার থাকিবার জন্য যে নিয়ম করিব সেই নিয়ম সমস্ত পালন করিতে পারিবে?" সে সম্মতি প্রকাশ করিল। শশিপদ বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাকে স্থান দিলেন, তাহাকে এমন নিয়মের মধ্যে রাখিলেন যে সেই দেশ-বিখ্যাত প্রতারক ক্রমে সংশোধিত হইয়া উঠিল। তাহার দুই বৎসর পর এই জ্ঞান বাবু আবার অসৎ পথে পতিত হয়, এখন সে নিরুদ্দেশ কিন্তু শশিপদ বাবুর ভরসা যে তাঁহার তাহাকে সংশোধন করিবার জন্য দুইবর্ষ কালব্যাপী এই কঠোর চেষ্টা ও প্রচুর অর্থব্যয় ইহা বিফল হইবে না। এই জ্ঞান বাবু যখন শশিপদ বাবুর গৃহে থাকিত তখন নিয়ম ছিল যে তাহার আহার ও স্নানের জল সেই স্থানে থাকিবে, সে কাহারও সহিত মিশিবে না ও কথা কহিবে না। এক দিন জ্ঞান শশিপদ বাবুকে বলিল যে সে একজনব ন্ধুর শালখানি চাহিয়া লইয়া তাহা বন্ধক দিয়াছে, এই জন্য তাহার মনে কষ্ট হইতেছে, শশিপদ বাবু তাহাকে অভয় দিলেন ও সমস্ত সংবাদ লইয়া নিজে টাকা দিয়া শালখানি উদ্ধার করিয়া যাহার শাল তাহাকে দিলেন। জ্ঞানের ন্যায় বিখ্যাত প্রতারক ও দুষ্ট স্বভাবের লোককে বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া কত বড় কথা! শুধু আশ্রয় দেওয়া নহে, জ্ঞানের স্ত্রী পুত্রকে পর্য্যন্ত তাহার নিকট আনিয়া দিয়া তাহাদের সমস্ত ব্যয় ভার তিনি অতীব হৃষ্টচিত্তে বহন করিয়াছেন।

সেবা সম্বন্ধে শশিপদ বাবুর উপলব্ধি এই, যে একই প্রাণশক্তি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত। সূত্রান্তর্যামী বিরাট তাঁহার হৃদয়ের নিকট প্রত্যক্ষ সত্য। আমাদের দেশের গৌরব স্থল মণীষি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্ভিদের মধ্যেও অনুভবশক্তি আছে। এই কথা অবশ্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করিয়া তিনি যে যশোলাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞান রাজ্যে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু এই কথাটি হিন্দুর দেশে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মজ্জাগত। মনু বলিয়াছেন :—

"অন্তসংজ্ঞ ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতঃ।"

শশিপদ বাবুর বাড়ীতে অনেক গাছপালা ছিল। ছেলেমেয়েরা কেহ কখনও কোন গাছের ডাল ভাঙ্গিলে বা পাতা ছিঁড়িলে তাঁহার মনে কষ্ট হইত এবং ছেলেদের বুঝাইতেন যে ইহাদের ও অনুভূতি আছে। সহজ দৃষ্টিতে হৃদয়ের দ্বারা সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অবস্থিতির এই যে অনুভূতি ইহা শশিপদ বাবুর সেবার মূলভাব এবং এই ভাবটিই প্রকৃত হিন্দুভাব। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে যখন একটি ক্ষুধিত কুকুরকেও এক মুষ্টি অন্ন দিবে তখন মনে মনে করিবে যে এই কুকুরের মধ্যে নারায়ণ আছেন আমি সেই নারায়ণের সেবা করিয়া নিজেকে কৃতার্থ করিতেছি, ইহাই হিন্দু জাতির সেবার ভাব; শশিপদ বাবু আজীবন এই সেবার ভাবের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট একবার একজন বলেন যে "জীবে দয়া" করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া স্বামীজি বলিলেন, তুমি দয়া করিবার কে? ভগবান দয়া করিবেন, তুমি সেবা করিবার অধিকারী, সেবা করিবে। ইহাই হিন্দুর সেবার ভাব; শশিপদ বাবু এই ভাবের প্রেরণাতেই সেবাব্রতে জীবন যাপন করিয়াছেন।

• তিনি তাঁহার জীবনের এই বহুমুখী সেবার কার্য্য যখন চিন্তা করেন

তখন বলেন যে "When I take a retrospect I see that my life has been a great Romance, more so than what any human imagination can create. It is the play of His fingers on the harp of time."

বাস্তবিকই তাঁহার জীবনের ইতিহাসের বিষয় ভাবিলে ইহা উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়কর মনে হয়; মানব, কল্পনার সাহায্যে যাহা রচনা করিতে পারে তদপেক্ষাও অলৌকিক। তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন ধরিয়া যেন তাঁহাব হৃদয়দেব আনন্দমূর্ত্তি পরমদেবতার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বার্থবুদ্ধির ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া নব অনুরাগে সেই প্রাণনাথের সহিত সঙ্গত হইবার জন্য এই জীবনের পথে বিচিত্র সেবার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

শশিপদ বাবুর ধর্ম্মজীবনের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার সাধন সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে আলোচনা করা উচিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা বর্ণনা করা অসম্ভব। এমন অনেক কথা আছে যাহা সাধারণ ভাবে আলোচনার অতীত। পূর্ব্বে পারিবারিক সমাধি-মন্দিরে সমাধিস্থ হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সাধন বিষয়ে স্থানের মাহাত্ম্য অস্বীকার করা যায় না। মানুষ যদ্যপি খুব চঞ্চলচিত্ত ও বহির্মুখী না হয়, যদি বেশ শ্রদ্ধান্বিত ভাবে মনকে অন্তর্মুখী করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যায়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থান যে চিত্তের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উদ্রিক্ত করে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। সত্য-কাম প্রভৃতির আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্যসাধন হইতে আরম্ভ করিয়া এই ভাবটি হিন্দু সাধনার ইতিহাসে সর্ব্বত্রই বিশেষ ভাবে স্বীকৃত ও আলোচিত হইয়াছে। কেবল হিন্দুজাতির নহে, জগতে সকল জাতিরই ধর্ম্ম সাধনায় এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

শশিপদ বাবু মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার পর বরাহনগরের নির্জ্জন শ্মশান

ঘাটে যাইয়া নির্জ্জন সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐ শ্মশানে তাঁহার পিতা, মাতা, পিতামহ পিতামহী, স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি আত্মীয় ও প্রিয়জনের দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, তিনি তাহাদিগের সহবাস অনুভব করিতে ও মানব জীবনের মহারহস্য ধ্যান করিতে এই শ্মশানে যাইতেন এবং সমাধি মন্দিরের ন্যায় এই স্থানেও বাহ্যচৈতন্য হারাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। পরলোকগত কেদারনাথ রায় সেই সময়ে শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি সেই সময়ে বরাহনগরে শশিপদ বাবুর বাটীতে প্রায়ই আসিতেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। কিছুদিন পরে কেদারনাথ রায়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তিনি স্ত্রীর মৃতদেহ বরাহনগরের নির্জ্জন শ্মশানে সৎকার করেন। স্ত্রীর সৎকারের পর ঐ শ্মশানে তিনিও মধ্যে মধ্যে শশিপদ বাবুর সঙ্গী হইতেন।

বিশ্বের সর্ব্বত্রই সেই আনন্দময়ের মহতী লীলার অভিনয় হইতেছে —আমরা ভাবুক ও রসিক নহি বলিয়া আনন্দময়ের সেই ভাব অনুভব করিতে ও সেই রস আস্বাদন করিতে পারি না। কিন্তু যতক্ষণ এই ভাব ও রসের সহিত আমাদের হৃদয়ের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততক্ষণ আমরা যতই বড় বড় মত আশ্রয় করি না কেন ধর্ম্মজীবন সফল হইবে না। ধর্ম্মের ভিত্তি যুক্তি তর্কের উপর নহে। মানব হৃদয়ের একটি অতি গভীর পিপাসা আছে—সংসারের সুখৈশ্বর্য্যে বা মান সম্ভ্রমে অথবা পাণ্ডিত্যে সেই পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। ধর্ম্ম সেই পিপাসার জল—পিপাসু না হইলে ধর্ম্মাচরণ করা অসম্ভব। শশিপদ বাবু তাঁহার জীবনে এই ভাব ও রস কি প্রকারে প্রতিমুহূর্ত্তে উপলব্ধি করেন তাহা বর্ণনা করা একেবারে অসম্ভব, তাহা হইলে তাঁহার অন্তর্জীবনের এক বিস্তৃত ও আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লিখিতে হয়, আবার এই ভাবের বর্ণনাও সকল সময়ে সম্ভব নহে। আমাদের হৃদয়ের বা আত্মার যাহা গভীরতম অনুভূতি তাহা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়,

আমাদের চিত্তবুদ্ধি প্রভৃতি তাহার রসে প্লাবিত হইয়া যায়, কিন্তু ভাষার সাধ্য নাই যে তাহা বর্ণনা করে। আমরা একটি মাত্র উদাহরণ দিলে তাহার এই ভাব গ্রহণ বা রসানুভূতি কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে।

আকাশের প্রতি চাহিয়া তারকাপুঞ্জে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনেক সময়ে তিনি একেবারে ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন, সে সময়ে তাঁহার মনে কতরূপ চিন্তার উদয় হইত। তিনি ভাবিতেন তাঁহার পিতামাতা পিতামহ প্রভৃতি এবং অনন্ত কালের কত লোক ঐ তারকা সমূহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি তারার আলোকের মধ্য দিয়া যেন সেই অনন্ত অতীতের পিতৃলোকের দৃষ্টি দেখিতে পাইতেন এবং একেবারে পুলকিত হইয়া উঠিতেন।

শশিপদ বাবুর সাধনের অনেক দিক আছে—জীবনের প্রতিকার্য্যই সাধনার অঙ্গরূপে তিনি অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি সেবাব্রত, আজীবন জগতের সেবা করিয়াছেন কিন্তু নিজে কখনও কাহারও সেবা গ্রহণ করেন নাই। যখন অবস্থা ভাল ছিল, দাস দাসী ও লোক-জনের অভাব ছিল না, সে সময়েও তিনি নিজের কাপড়খানি পর্য্যন্ত কাহাকেও কাচিতে দিতেন না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কেমন একাকী থাকেন সে কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি চিরকালই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন "ঠাকুর আমায় কাঙ্গালের কাঙ্গাল কর।" শশিপদ বাবুর দ্বিতীয়া পত্নীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার প্রথমা কন্যা সুখতারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহাতে তিনি শশিপদ বাবুর অপরের এই সেবা গ্রহণ না করার কথা এবং সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থিতির কথা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শশিপদ বাবু সে সময়েও সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন নাই।

স্বর্গীয়া শান্তিময়ী দেবী।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস।

শশিপদ বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা "গৃহলক্ষ্মী" সম্পাদিকা স্বর্গীয়া শান্তিময়ী "পিতার প্রতি" শীর্ষক একটি কবিতায় শশিপদ বাবু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। এই কবিতাটি তিনি আপন মনেই রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন. তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে এই কবিতাটী পাওয়া গিয়াছে। কন্যাগণ শশিপদ বাবুকে কি ভাবে দেখিয়াছেন ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

পিতার প্রতি।

"হে সন্ন্যাসি,

পরিপূর্ণ সুখের সংসার
পেয়েছিলে বিধাতার দান,
নিত্য সেথা ধ্বনিয়া উঠিত
বিশ্ব দেবতার স্তুতি গান।
আনন্দের কিরণে উজ্জ্বল
শত কণ্ঠে হর্ষ কলরব,
পরিপূর্ণ সুখের সংসারে
নিত্য ছিল কি মহাউৎসব!
আজ সব ভেঙ্গে গেছে তার,
ফুরায়েছে যত হাসি খেলা,
একা তুমি হে মহা সন্ন্যাসী,
দাঁড়ায়ে রয়েছ সন্ধ্যাবেলা!
একে একে পুত্র কন্যাগুলি
চলে গেল সমাপিয়া গান,
হে সন্ন্যাসী, মেনে নিলে তুমি—
বিধাতা নিলেন তাঁর দান!

ক্রমে আলো নিবে গেল ঘরে,
থেমে গেল সব কলরব,—
সন্ধ্যাবেলা আছ নিরুদ্বেগে
যাঁর ভার তাঁরে দিয়ে সব।
যে টুকু শকতি আছে দেহে,
যতখানি প্রেম আছে প্রাণে,
যা কিছু সম্বল আছে আজ
উৎসর্গিলে দেবতা চরণে!”

২২শে মার্চ্চ, ১৯০৮।

শশিপদ বাবুর সাধন তাঁহার দাম্পত্যজীবন হইতেও বুঝিতে পারা যায় তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে “দেবতা” বলিতেন। ইহাই প্রাচীন হিন্দুভাব। স্বামী স্ত্রীর গুরু। আজকাল কিন্তু আমাদের এই প্রাচীন ভাব লোপ পাইতেছে। কিন্তু শশিপদ বাবু তাঁহার দাম্পত্য জীবনে এই ভাবটি রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তাঁহার এই গূঢ় ও সর্ব্বকালব্যাপী সাধনা। এই সমস্ত কথা পারিবারিক জীবন বর্ণনায় বর্ণনা করা যাইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিম্ন শ্রেণীর উন্নতির সাধন।

কুলগুরুর নিকট জাতীয় আনন্দ-ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশের সেবা কার্য্যে সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিয়োগ করিয়া সেই আনন্দময়ের আজীবন অন্বেষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই সেবা কার্য্য অতীব বিস্তৃত সে সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অসম্ভব। সেই সমস্ত বিষয়ের উপকরণ যথেষ্টই আছে, কেহ ইচ্ছা করিলে সেই সমস্ত ইতিহাসের দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।

এই সেবার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই এই সেবায় যে জাতীয় ভাব অতীব যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে তাহাই আলোচনা করা উচিত। এই জাতীয় ভাব আমাদের যুগধর্ম্মের মেরুদণ্ড। বিশ্বজনীনতা চাই, অনুদার হইয়া বিশ্বের সহিত পৃথক হইয়া থাকিলে চলিবেনা, কিন্তু জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্বজনীনতার মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেও হইবেনা। জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া এই জাতীয় ভাবকেই বিশ্বজনীনতার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। নতুবা সকল সংস্কার, সকল উন্নতি একটা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র ও নিতান্ত বিফল। জাতীয় প্রকৃতির বিশিষ্টতা টুকুকে বিশ্বজনীনতায় লইয়া যাওয়াই নবযুগের সাধনা।

পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা আমাদের হিন্দুসমাজে সেবার ভাব যে সহস্রগুণে অধিক তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়, তবে উভয় দেশে পদ্ধতি পৃথক। আমাদের দেশে সাধারণের সমবেত সাহায্যে ভিক্ষা-ভবন বা দাতব্য চিকিৎসালয়, অধিক ছিল না। ইহার কারণ এই যে প্রত্যেক গৃহস্থই সাধ্যমত নিজের অবশ্য পাল্য ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ এই

সমস্ত কার্য্য করিতেন, কাজেই এ সমস্তের তত প্রয়োজন ছিল না। যে দেশে চিকিৎসকগণ অর্থগ্রহণ না করিয়া দুঃস্থ রোগীর চিকিৎসা করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য ছিলেন সে দেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনই ছিল না। এখন দিন কাল ও আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী যখন বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, পল্লী ভাঙ্গিয়া যখন বড় বড় সহর গড়িয়া উঠিতেছে, পাশ্চাত্য দেশের এই সমস্ত সেবামূলক অনুষ্ঠান আমাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য সাধারণ ভিক্ষাভবনে, বা সেবাসদনে চাঁদা দিই বলিয়া যদি আমরা গার্হস্থ্য জীবনে অতিথি সৎকারাদি বন্ধ করিয়া দিই তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবেনা ইহাও সত্য। কিন্তু এই প্রকারের সাধারণ অনুষ্ঠানও চাই। খৃষ্টীয় সমাজের এই প্রকারে সমবেত ভাবে কার্য্য করার শক্তি খুবই অধিক। খৃষ্টানেরা আসিয়া আমাদের দেশে অনাথাশ্রম করিয়াছে, বিধবাশ্রম করিয়াছে, সেখান হইতে বৎসর বৎসর শত শত শিশু ও বিধবা একেবারে জাতীয় ভাব ছাড়িয়া খৃষ্টীয় সমাজে প্রবেশ করিতেছে আমরা অনেকে তাহার খবরই রাখি না। পাছে কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া খৃষ্টীয় সমাজ ও ইহা গোপনে রাখেন। খৃষ্টীয় সমাজ অনাথাশ্রম ও বিধবাশ্রম করিতেছে, ইহাতে খৃষ্টীয় সমাজের নৈতিক লাভ (Moral gain) আর আমরা মনে করিতেছি এ প্রকারে সম্মিলিত হইয়া কোনও সাধুকার্য্য করিবার শক্তি আমাদের একেবারেই নাই।

এই বিষয়টি অতি প্রথম বয়সেই শশিপদ বাবুর মনের মধ্যে উদয় হয়। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন জাতীয় ভাবে করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপে বিধবাশ্রমের উল্লেখ করিতে পারা যায়। অবশ্য তাঁহার বিধবাশ্রম হওয়ার পরে খৃষ্টানেরা বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমে হিন্দুভাব অতি যত্নে রক্ষিত হইত।

আমাদের দেশের সাধারণ ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে শিক্ষার

বিস্তার ও তাহাদের উন্নতিসাধন একান্ত প্রয়োজন। এখন এই সমস্যার প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি ধীরে ধীরে পতিত হইতেছে। এ বিষয়ে সময়ে সময়ে কাগজ পত্রে আলোচনা ও সভাসমিতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু যে আগ্রহ ও ঐকান্তিকতার প্রভাবে আমরা যথার্থরূপে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিব, তাহার অভাব রহিয়াছে।

মাননীয় মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় এজন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন এবং লাট সভায় সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রস্তাবও উত্থাপিত হইয়াছে।

দেশের সাধারণ লোকের সহিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে যে যোগসূত্র ছিল, যে আদান প্রদানের জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল, তাহা বৃদ্ধি হওয়া ত দূরের কথা, এখন যেন প্রত্যহই তাহা শিথিল হইয়া যাইতেছে। আমরা কেমন করিয়া নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা ও উন্নতি বিধান করিতে পারি? কি ভাবে চেষ্টা করিলে, আমাদের চেষ্টা সত্যসত্যই তাহদের মধ্যে ফলোপধায়ী হইতে পারে? এই প্রশ্নের মীমাংসা সেবাব্রত শশিপদ বাবু নিজের জীবনের দ্বারা যাহা করিয়াছেন তাহা আমাদের কেবল মাত্র আলোচনা করা নহে, সর্ব্বদা অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

আজকাল সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কথা লইয়া আন্দোলন হইতেছে। দেশের কোন কোন লোক ইহার বিরোধী। তাঁহাদের যুক্তিগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পওয়া যাইবে যে তাঁহার শিক্ষা বিস্তারের বিরোধী নহেন, তবে পাছে শিক্ষার নামে অশিক্ষা বা কুশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় অথবা পাঠাগারের নামে কারাগার করিয়া আমাদের স্বাস্থ্য ও জাতীয়ভাব নষ্ট হইয়া যায়, এই তাঁহাদের ভয়। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এই বিরোধের একটি

মীমাংসা রহিয়াছে। এক দিকে যেমন রাজবিধি দ্বারাই হউক বা অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়াই হউক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে তেমনি এই কার্য্যের জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল শিক্ষকও গঠন করিতে হইবে। আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা শশিপদ বাবুই সর্ব্বাগ্রে করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার চেষ্টায় এই সমন্বয় সুন্দর ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আমরা সাধারণতঃ যে সব চেষ্টা করি তাহা অনেকটা বাহ্য। যাঁহারা বক্তৃতা করেন বা শিক্ষা বিস্তারের সভায় সভাপতি হইয়া উপদেশ প্রদান করেন তাঁহারা নিজে নিজে যদি একটি একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ও করিয়া তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন, তাহা হইলে মীমাংসা সকল দিক হইতে সহজ হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে সার, ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট্ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এই মহাত্মা এক সময়ে ভারত সচিব ছিলেন। তাঁহার পুত্র বোম্বাই প্রদেশের লাট সাহেব ছিলেন। এই মহাত্মার সহিত বিলাতে শশিপদ বাবুর আলাপ হয়। শশিপদ বাবু একসিটারে এই মহাত্মার বাড়ী গিয়াছিলেন সেখানে গিয়া দেখিলেন তাঁহার বাড়ীতে একটি বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীর বালকবালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া হইত। শশিপদ বাবুর কার্য্য প্রণালী এখন বিশেষ ভাবে আলোচ্য কারণ তাঁহার অবলম্বিত পদ্ধতিতেই আমাদের এই সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রারম্ভে একটি কথা বলি। সাধারণ লোক ও নিম্নশ্রেণীর লোকের অভাব অভিযোগের প্রতি শশিপদ বাবুরই মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল, অন্য কাহারও হইলনা ইহার কারণ কি? অবশ্য ইহার কারণ নির্ণয় একেবারে অসম্ভব। সকল মানবের প্রবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তি একরূপ নহে, একই প্রকার কর্ত্তব্যের

প্রতি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না—সুতরাং সমস্ত কারণটা নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব। তবে প্রসঙ্গটা যখন উত্থাপন করা হইয়াছে তখন ইহার একটা কারণ দেখান যাইবে—সে কারণ এমন যে তাহার প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া দরকার, নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে একটি বড় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাঁহারা লেখা পড়া শিখিতেছেন অথবা যাঁহাদের অবস্থা কিছু সচ্ছল তাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করিতে অনিচ্ছুক। পল্লীগ্রামে সৎসঙ্গ নাই, বিলাসের উপকরণ নাই, পানীয় জল, রোগে চিকিৎসা নাই ইহা ছাড়া আরও শত শত কারণ আছে। এই জন্য পল্লীগ্রামের ভাল লোকগুলি সব সহরে আসিয়া জমিতেছেন। কেহ কেহ সময়ে সময়ে দুপাঁচ দিনের জন্য পৈতৃক ভিটায় গমন করেন, অনেকে তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং এই ভুলিয়া যাওয়াটাকেই গৌরবের জিনিস বলিয়া মনে করেন। সেই জন্যই দেখিতেছি পল্লীগ্রামের লোক কলিকাতায় বসিয়া স্বদেশপ্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, কাগজ চালাইতেছেন, সভা সমিতি করিতেছেন এবং হয়ত কিছু কিছু টাকাও দেশের জন্য হয় নিজে ব্যয় করিতেছেন নতুবা সংগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রামে যে পানীয় জল নাই, রাস্তা নাই, বিদ্যালয় নাই, চিকিৎসা নাই, গ্রামবাসী বালক যুবক প্রভৃতিকে সুশিক্ষা দিয়া সৎপথে আনিবার কোন ব্যবস্থা নাই, সে সমস্ত কথা তিনি স্মরণ করেন না। এ প্রকারের ঘটনা হাজার হাজার দেখিতে পাইবেন। খবরের কাগজে ও বক্তৃতামঞ্চে স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে যাঁহার নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে, গ্রামে গিয়া অহঙ্কারে তিনিই প্রতিবাসীর সহিত বাক্যালাপ করিতে লজ্জাবোধ করেন।

অবশ্য যাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়াছেন তাঁহাদের স্বপক্ষে যে কিছু বলিবার নাই তাহা নহে। তবে ব্যাপারটা এই। শশিপদ বাবুর বাড়ী বরাহনগর, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাহার জন্ম। ২৫ বৎসর বয়সের সময় তিনি বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্রেরণায় প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। সে আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর কথা। সে সময়ে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে প্রাচীন সমাজের হস্তে কিরূপ উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, একালের যাঁহারা সহরে বাস করেন তাঁহারা তাহা ধারণাই করিতে পারিবেন না। নাপিত বন্ধ, ধোপা বন্ধ, আত্মীয় স্বজনের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ, পৈতৃক বাস ভবন হইতে বিতাড়িত, ষড়যন্ত্রে পড়িয়া হাজত বাস, এমন কি জীবনের বিরুদ্ধেও চক্রান্ত! বন্ধুগণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বাস করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন. তাঁহার হিতৈষী বন্ধু স্বনাম খ্যাতা কুমারী কার্পেণ্টার পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্থানান্তরে বাস করিতে উপদেশ দিলেন। কলিকাতা তাঁহার কর্ম্মস্থান, পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই পান নাই, পরিশ্রম করিয়াই জীবিকার্জ্জন করিতে হয় এ অবস্থায় বরাহনগরে থাকিয়া তাঁহার লাভ কি? কিন্তু শশিপদবাবু কাহারও কথা শুনিলেন না, অত্যাচার অভাব, নিন্দা, উৎপীড়ন সমস্তই নীরবে সহ্য করিয়া বরাহনগরেই বাস করিতে লাগিলেন। নব্যবঙ্গের ইতিহাসে স্বগ্রামপ্রীতির এমন উদাহরণ আর নাই। প্রসঙ্গক্রমে এইস্থলে শশিপদ বাবুর স্বগ্রামপ্রীতির আর একটি উদাহরণ দেওয়া সঙ্গত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শশিপদবাবু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর তদানীন্তন বঙ্গের ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শশিপদবাবু তখন জনসাধারণের

সকলদিকে উন্নতি সাধনের জন্য বরাহনগরে নানারূপ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এই সমস্ত কার্য্যই তাঁহার জীবন—অধিক কি জীবন অপেক্ষাও প্রিয়—তাঁহার অনুপস্থিতিতে এ সমস্ত কার্য্য নষ্ট হইবে বুঝিয়া লাটসাহেবের সে কথা রাখিতে পারিলেন না। অর্থের অভাব ছিল, ডেপুটি গিরি লইলে তাঁহার আর্থিক উন্নতি হইত কিন্তু তাঁহার নিজের আর্থিক উন্নতি অপেক্ষা এই কাজগুলি অধিক মূল্যবান মনে করিয়া—তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিলেন না। তিনি বরাহনগরের উন্নতির জন্য কি করিয়াছেন—বরাহনগরের অধিবাসিগণ তৎকর্তৃক কিরূপ উপকৃত হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই এখনও বরাহনগরের শ্রমজীবিসমিতি, ইনষ্টিটিউট ভবন ও বৃহৎ লাইব্রেরী তাহার জীবন্ত উদাহরণ। বরাহনগরের অধিবাসিগণ বিলাত যাইবার সময় শশিপদ বাবুকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন তাহাতেই তাঁহার কার্য্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সেই অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কত উন্নতিকর অনুষ্ঠান তিনি করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করাই কঠিন, বরাহনগর-হিন্দু-বিধবাশ্রমের কথা কে না অবগত আছেন? সামাজিক উন্নতির জন্য তিনি বরাহনগরে যে সভা করেন * (Social Improvement Society) তৎসম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদ পত্রাদিতে যে সমস্ত মত প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার দুই একটি মাত্র উদ্ধার করিতেছি—ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে নীরব সাধক ও কর্ম্মবীর শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নব্যবঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে স্থান কোথায়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন—"It (Baranagar Social Improvement Society,) has already initiated several healthy movements which bid fair to

* ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে এই সভা প্রতিষ্ঠিত করেন।

prove that the institution is not, as many others are, a merely talking body"

Indian Daily News—বলেন—

"Much credit is undoubtedly due to Sasi Babu, one of the most earnest and the least talkative of his countrymen. He is worth a lakh of the glib chatterers who talk and write, and do so little– He has known how to suffer and to win and we shall have greater faith in India as we see more like him."

The Daily Examiner 13 March 1871.—"It is gratifying that in Barahanagar a village four miles north of Calcutta, active measures are being taken for the elevation of the working classes. There is an evening school, a working men's club and a Savings Bank. For all of these institutions the inhabitants are indebted to the highly praise-worthy endeavours of Babu Sasipada Banerji. He has also established a Girl's school, a vernacular School, a Social Improvement Society and a Local public Library."

পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী অভিমত গুলির বঙ্গানুবাদ এই—ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন বরাহনগরের 'সমাজ সংস্কার সমিতি' ইতিপূর্ব্বে এমন কতকগুলি হিতকর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন যাহা হইতে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এই সমিতি অন্যান্য অনেক সমিতির মত কেবল বক্তৃতা করিবার সমিতি নহে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ বলেন—দেশবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অকপট ও অল্প বচনবাগীশ শশিপদবাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অসংশয়িতরূপে বিশেষভাবেই প্রশংসনীয়। যাঁহারা কেবল অনর্গল লেখেন ও বক্তৃতা করেন এবং কাজের বেলায় কিছুই করেন না, শশিপদ বাবু একা তাহাদের এক লক্ষ লোকের সমান. কেমন করিয়া ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক সফলতা লাভ করিতে হয় তিনি তাহা জানেন। তাঁহার মত লোক অধিক দেখিতে পাইলে ভারতবর্ষের উপর আস্থা বর্দ্ধিত হইবে।"

ডেলি একজামিনার বলেন—"বড়ই আনন্দের বিষয় যে কলিকাতা হইতে উত্তরে চারি মাইল দূরবর্ত্তী বরাহনগর গ্রামে শ্রমজীবিগণের উন্নতিসাধন কল্পে যথার্থ কার্য্য হইতেছে। তথায় শ্রমজীবিগণের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, শ্রমজীবিসমিতি ও সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে। এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের জন্য গ্রামবাসিগণ অশেষরূপে প্রশংসাভাজন শশিপদ বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ। শশিপদ বাবু একটি বালিকাবিদ্যালয়, একটি বঙ্গবিদ্যালয়, সংস্কার সমিতি ও একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।"

মাননীয় স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় এই সভা সম্বন্ধে যাহা লেখেন তাহা বিশেষরূপে স্মরণীয়। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্র ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লেখেন,

"We have before us the last annual report of the Baranagore Social Improvement Society. It is a most interesting record. It is divided into three branches, literary, educational, and general. Several excellent addresses were delivered at the Society in the literary section during the year. In the educational section it assisted the local Vernacular and Girl Schools. In the general section's it co-operated with the Magistrate of

24 Pergannas, and the Municipal Committee by distributing carolina paddy seeds, pamphlets on vaccination and established a circulation Library of which Mr. H. Cockrell, the Magistrate, is the President. The Society received a local habitation last year through the munificence of the Borneo Company. Strange to say the Society is doing so much good with an income of only Rs 165 per annum. The economy with which it manages its affairs is worthy of emulation by our Finance Minister. Babu Sasipada Banerjee the young reformer of Baranagore, is the moving spirit of the Society. We wish every important village in the Mofussil had such a local body to watch after its affairs."

অর্থাৎ আমরা বরাহনগর-সমাজহিতকরী সভার বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। এই কার্য্যবিবরণী খুব শিক্ষাপ্রদ। এই সভার কার্য্য তিন ভাগে বিভক্ত, সাহিত্য, শিক্ষা ও সাধারণ। গত বৎসর সাহিত্য বিভাগে অনেক গুলি সুন্দর বক্তৃতা হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগে এই সভা স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয় ও বালিকা-বিদ্যালয়কে সাহায্য করিয়াছে। সাধারণ বিভাগ ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিটিকে কারোলিনা ধান্যের বীজ বিতরণ, টীকা দেওয়া সম্বন্ধীয় পুস্তিকা বিতরণে সাহায্য করিয়াছে, এই সভা পুস্তক বিতরণের জন্য একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছে ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত এইচ্, কক্‌রেল এই পুস্তাকাগারের সভাপতি। বোর্ণিও কোম্পানির বদান্যতায় গত বৎসর এই সভার একটি নিজের বাড়ী হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সভা এত হিতকর কার্য্য করিতেছে বটে কিন্তু ইহার

বার্ষিক আয় মাত্র ১৬৫৲ টাকা। এই সভা যেরূপ মিতব্যয়িতার সহিত অর্থব্যয় করেন তাহা হইতে আমাদের রাজস্ব-সচিব মহাশয়েরও শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যুবক সংস্কারক শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সর্ব্বস্ব। প্রত্যেক গ্রামে এই প্রকার সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

৪৫ বৎসর পূর্ব্বে বরাহনগরে বসিয়া শশিপদ বাবু যাহা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে যে আলোচনা হয় নাই তাহা নহে। বর্ত্তমান সময়ে সে সমস্ত কথা একবার ভাল করিয়া স্মরণ করিলে বিশেষ লাভ হইবারই সম্ভাবনা।

আজকাল নিম্নশ্রেণীর শিক্ষাবিধানের জন্য বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া অনেক স্থূলদর্শী মহাত্মা প্রাচীন সমাজের প্রতি অযথা কটুবাক্য বর্ষণ করেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন প্রাচীনকালে এই সমস্ত লোকের শিক্ষার জন্য কোনই ব্যবস্থা ছিল না। এ কথাটি কতদূর সত্য তাহা ভাবিবার বিষয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই অতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এ কালের মত লেখা পড়া শিক্ষার প্রথা না থাকিলেও ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। এখন যেমন সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দেশবাসিগণ সুতীব্র জীবন-সংগ্রামে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন তখন তাহা ছিল না। বঙ্গের প্রত্যেক গ্রাম ধর্ম্মসাধনার লীলাভূমি ছিল। কিন্তু সে সত্যযুগের কথা, সে দিন আর ফিরিবে না, তাহার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন নিষ্ফল। এখন শ্রমজীবিগণ পল্লীভবন ছাড়িয়া প্রাচীন সমাজের প্রভাবের বাহিরে জীবিকার জন্য নগরে আসিয়া সমবেত। শিক্ষা, সদুপদেশ ও সৎ আদর্শের অভাব, তাহার উপর প্রলোভন, স্বাধীনতাও যথেষ্ট, ফলে তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

আজ কাল আমরা কেবল বলি Depressed Class—এ কথাটি

যে ঘৃণার কথা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহাকে ঘৃণা করি, তাহার উপকার করিবার জন্যও যদি আমরা তাহার দ্বারস্থ হই তাহা হইলে সে আমাদের ভয় করিতে পারে। কিন্তু প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। শশিপদ বাবু ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়াই এই সমস্ত লোককে ভাল বাসিয়াছিলেন। এই প্রেমেই সকল বিরোধের ও সকল পার্থক্যের সমন্বয় হয়—এই শ্রমজীবিসভায় যে সকল উপদেশ দেওয়া হইত এবং যে সকল সঙ্গীত রচিত ও গীত হইত সেই সকল উপদেশ ও গান ছোট ছোট কাগজে ছাপাইয়া বিতরণ করা হইত। মোট কথা শ্রমজীবিগণের মন যাহাতে এই হিতকর কার্য্যে বিশেষ রূপে আসক্ত হয় সে জন্য শশিপদবাবু একাগ্রচিত্তে দিন রাত্রি চিন্তা করিতেন, ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন।

বরাহনগরে অনেক কল ও কারখানা আছে; এই সমস্ত কলে কাজ করিবার জন্য সহস্র সহস্র শ্রমজীবী তথায় বাস করে। এই সমস্ত শ্রমজীবীর নৈতিক ও ধর্ম্মগত অবস্থা কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়। এখনও যে সমস্ত স্থানে অধিকসংখ্যক কলের মজুর বাস করে তথাকার অধিবাসিগণ চুরি ডাকাইতির ভয়ে সর্ব্বদাই শশব্যস্ত। নিম্নশ্রেণীর লোকগণ যখন পল্লীগ্রামের শীতল ছায়ায় গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে বাস করে, তখন তাহারা একরূপ বেশ সৎভাবেই থাকে। পল্লীগ্রামে প্রলোভন ও উত্তেজনা খুব কম, তাহার উপর পল্লীর সমাজ ও স্ত্রীপুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ তাহাদের নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষায় বিশেষরূপে সহায়তা করিয়া থাকে। এই সমস্ত পল্লীবাসী শ্রমজীবী যখন নগরের কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে আসিয়া সমবেত হয়, তখন তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়ে। শিক্ষা, সদুপদেশ ও সৎ আদর্শের অভাব, তাহার উপর

প্রলোভন এবং স্বাধীনতাও যথেষ্ট, তখন তাহাদের দানবীয় প্রকৃতি স্বকীয় নগ্ন বর্ব্বরতা প্রকাশ করিয়া বিভীষিকাময় তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুবর্ত্তনে আমাদের দেশে কল প্রভৃতির যতই প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে—নগর সমূহের যতই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, পল্লীসমূহ যতই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে—ততই এই সমস্যা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। অতীতের সুখময় দিন স্মরণ করিয়া কেবলমাত্র বিলাপ করিলে চলিবে না—এই প্রত্যক্ষ সমস্যাটিকে তাহার বিশালতা ও জটিলতার মধ্যে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শশিপদ বাবুর করুণ দৃষ্টি যথা সময়ে এই শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের উপর পতিত হইল, তাহাদের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য, তাহাদের অজ্ঞান হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রজ্বালিত করিবার জন্য, তাহাদের মধ্যে মিতাচার, মিতব্যয়িতা, সচ্চরিত্রতা ও ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, এক কথায় তাহাদের পাশব ভাবকে বিদলিত করিয়া তথায় সচ্চিদানন্দ বিশ্বময়ের বিজয়পতাকা স্থাপনা করিবার জন্য ভগবৎ-সর্ব্বস্ব শশিপদ বাবুর করুণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। নিম্নশ্রেণীর উন্নতি সাধন কল্পে আমাদের দেশে ইহার পূর্ব্বে আর কোনওরূপ চেষ্টা হয় নাই। শশিপদ বাবুই এই সাধু কার্য্যের পথ-প্রদর্শক। সেই সময়ের "সময়" ও "নববার্ষিকী" পত্রে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছিল। শ্রমজীবিগণের অবস্থা দর্শন করিয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি অন্তরের অন্তরে অনুভব করেন, তাহার জন্য প্রাণপাত করিতে তিনি বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করিবার লোক নহেন—বিধাতার আহ্বান উদাত্ত গভীর নিনাদে অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করিয়া যে দিক হইতেই ধ্বনিত হউক না কেন, বীরের মত, কোন প্রতিবন্ধ-

কতায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইবার পিপাসা—সেই পথে চলিয়া কর্ত্তব্যের মধ্যে হৃদয়েশ্বরকে পূর্ণতররূপে পাইবার পিপাসা, তাঁহার কতদূর প্রবল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যৌবনের পূর্ণ উদ্যম লইয়া শশিপদ বাবু শ্রমজীবীগণের সেবায় আত্মসমর্পণ করিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে তিনি এক সাধারণ সভায় অনেক শ্রমজীবিকে আহ্বান করেন। তাহারা সমবেত হইলে তিনি এক সুদীর্ঘ ও সুললিত বক্তৃতায় তাহাদিগকে নিজেদের অবস্থার উন্নতি বিধান কল্পে, সমবেত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োজন, বুঝাইয়া দিলেন। এই সভার ফলে শ্রমজীবিগণের শিক্ষার জন্য সেই দিন বরাহনগরে এক নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, ক্রমশঃ, কামারপাড়া, এড়িয়াদহ ও কুটিঘাটা প্রভৃতি স্থানেও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রমজীবিগণের পুত্রকন্যাদিগের জন্য শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বরাই নামক স্থানে যে মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাও এই আন্দোলনেরই ফল।

এই সমস্ত নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুফল শীঘ্র শীঘ্র ফলিতে লাগিল। যে সমস্ত ধনী মহাজনদিগের কলে এই সমস্ত শ্রমজীবীরা কার্য্য করিত, তাঁহারা দেখিলেন যে, যে সমস্ত শ্রমজীবী অবকাশ সময়ে ঐ সব নৈশবিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করে, তাহাদের দ্বারা চারুতররূপে কার্য্য সাধিত হয়। যাহারা বিদ্যালয়ে যায়, তাহারা দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর বিশ্বাসী, শ্রমশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতেছে, তাহাদের নৈতিক অবস্থারও সবিশেষ উন্নতি হইতেছে এ কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে লাগিলেন। ফলে, অবশ্য শশিপদ বাবুর চেষ্টার ফলে, এই সমস্ত মহাজনেরাই এইসব নৈশবিদ্যালয়ের রক্ষা ও উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন।

এই গেল প্রথম সোপান, শশিপদ বাবু প্রাণপণ যত্ন ও আগ্রহে এই সমস্ত বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে তৎপর রহিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শশিপদ বাবু এই দিক হইতে আর একটি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার যত্নে ও উদ্যোগে ঐ সময়ে "শ্রমজীবি-সমিতি" (Working men's club) প্রতিষ্ঠিত হইল। শশিপদ বাবুর বাড়ীতে ও অন্যান্য সদস্যগণের বাড়ীতে এই সমিতির অধিবেশন হইত। এই সমিতির কার্য্য অনেক দিন যাবৎ বেশ নিয়মিত ভাবে চলিয়াছিল। যে দিন এই সমিতির অধিবেশন হইত, সে দিন শ্রমজীবিগণের আর আনন্দের সীমা থাকিত না, তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সকলেই এই নির্ম্মল আনন্দে যোগদান করিত। শশিপদ বাবুর চেষ্টায় স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, স্বর্গীয় কালীশঙ্কর সুকুল প্রভৃতি খ্যাতনামা বক্তাগণ এই সমিতিতে যাইতেন ও নিয়মিত ভাবে বক্তৃতা করিতেন। নৈতিক বিষয়ে ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা হইত। শ্রমজীবিগণের দৈনন্দিন অভ্যাসে এই সমিতির কার্য্য ও এই সমস্ত বক্তৃতা যে কি পরিমাণে সুফলপ্রদ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সমিতির সদস্যগণ ক্রমে ক্রমে সচ্চরিত্র, কষ্টসহিষ্ণু, অনলস, মিতব্যয়ী ও মিতাচারী হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করিতে হইলে একেবারে সুরাপান পরিত্যাগ করিতে হইত।

শশিপদ বাবু যে শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের কেবলমাত্র পুরুষদিগের উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন তাহা নহে। সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকায় আমাদের সমাজ যে কি পরিমাণ দুর্ব্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহা শশিপদ বাবু প্রথম হইতেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। তিনি এই সমস্ত শ্রমজীবিগণের স্ত্রীলোকদের লইয়াও সভা করিতে লাগিলেন। শশিপদ বাবুর বাড়ীতেই স্ত্রীলোকদিগের

সভার অধিবেশন হইত—এই সমস্ত সভায় ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে নানাবিধ কৌতূহলোদ্দীপক ও জ্ঞানগর্ভ বিষয় প্রদর্শিত হইত। অন্যান্য প্রকারের বিশুদ্ধ আমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। ফলে, স্ত্রীলোকগণ এই উন্নতিকর আন্দোলনে বিশেষ আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিত। শশিপদ বাবুর প্রথমা স্ত্রী স্বর্গীয়া রাজকুমারী দেবী ইনি স্বনাম খ্যাত কোচিনের দেওয়ান, এল্‌বিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস্, সি, আই, ই, মহাশয়ের মাতা) এই কার্য্যে বিশেষ ভাবে সকল বিষয়েই তাঁহার স্বামীকে সাহায্য করিতেন। সময়ে সময়ে বিশ্রাম দিনে শ্রমজীবি-পুরুষদিগের জন্য দল বাঁধিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সুন্দর ও দর্শনীয় স্থান সমূহে ভ্রমণ করিতে যাইবারও ব্যবস্থা ছিল।

এই গেল সাধারণ ভাবের কার্য্য। এই সমস্ত কার্য্য করার পরেও শশিপদ বাবু যাহা করিতেন, তাহাও বিশেষ ভাবে আলোচ্য। তিনি এই সমস্ত শ্রমজীবীদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাহাদের সুখ, দুঃখ নিজের সুখ দুঃখের মত অনুভব করিতেন। কাহারও অসুখ হইলে রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তন্ময় ভাবে তাহার সেবা করিতেন, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাহাদের সামান্য ভোজ্য তাঁহাকে প্রদান করিলে, আনন্দ ও তৃপ্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিতেন। শশিপদ বাবু এই সমস্ত শ্রম-জীবীদিগের সহিত যখন ভ্রাতৃভাবে মিশিতেন, তখন তিনি যে উচ্চবংশ-সম্ভূত ও সম্ভ্রান্ত, তাহা একেবারেই ভুলিয়া যাইতেন। ইহাই প্রকৃত ভগবৎপ্রেম। এই প্রেমে সকল বিরোধের ও সকল পার্থক্যের সমন্বয় হয়—এই প্রেমের স্পর্শেই দস্যু সাধু হয়—সহস্র সহস্র জগাই মাধাই উন্নত জীবনের পবিত্র আলোকে মহীয়ান্ হয়। এই প্রেমেই মানব বিশ্বাত্মার সহিত স্বকীয় একাত্মতা বুঝিতে পারে। যাবতীয় ধর্ম্মসাধনার ইহাই লক্ষ্য। এই প্রেম শত্রুকে মিত্র করে, সংসারকে

স্বর্গ করে, মানবকে দেবতা করে। এই প্রেমই দেবালয়ের ধ্রুব পথ।

আজ আমরা দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধনকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছি, কিন্তু একথা স্থির, যে যতদিন আমরা এই প্রেম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের সফলতা সুদূরপরাহত।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবু ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন সে কথা অন্য পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, শ্রমজীবী ও সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য, আরও বিস্তৃততরভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি "ভারত শ্রমজীবী" নামক এক পয়সা মূল্যের এক সচিত্র মাসিকপত্র প্রচার করেন। এই মাসিকপত্রের প্রভাব ও প্রচার আশাতীত রকমের হইয়াছিল। পনর হাজার খানি কাগজ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইত, সে আজ চল্লিশ বৎসরের কথা। সুতরাং ব্যাপার বড় সহজ নহে। এই মাসিকপত্র সুদূরবর্ত্তী গ্রাম্য কৃষকদিগের নিকট পর্য্যন্ত যাইত। বঙ্গের প্রত্যেক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, এই পত্র ক্রয় করিতেন। অনেক সদাশয় লোকই এই কাগজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবু "বরাহনগর সমাচার" বলিয়া একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন, এই পত্রখানিও শ্রমজীবী সাধারণ লোকের অভাব অভিযোগের কথা সাধারণের গোচরে আনিয়া তাহাদের দূরীকরণে নিরন্তর চেষ্টা করিত।

শশিপদবাবু এখন বরাহনগরে থাকেন না, তথাপি তিনি যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া আসিয়াছেন, তাহা এখনও চলিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে শশিপদ বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকরী সভার হস্তে

২০০০\ টাকা অর্পণ করিয়াছেন—শ্রমজীবিগণের শিক্ষার জন্য বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করাই ইহার উদ্দেশ্য। শ্রমজীবিগণকে Practical Religion and morality অর্থাৎ যে শিক্ষার দ্বারা বাস্তব জীবনে ধর্ম্মভাব ও সুনীতির সঞ্চার হইবে তাহারই জন্য এই অর্থ প্রদান করেন। কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া দাতার অভিপ্রায় নহে। এই কার্য্যের মধ্যেও দেবালয়ের উদার ভিত্তির সুস্পষ্ট আভাস রহিয়াছে।

শশিপদ বাবুর এই চেষ্টা সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। যাহারা অস্পৃশ্য ও অজলাচরণীয় বলিয়া সমাজে প্রত্যাখ্যাত; শশিপদ বাবু তাহাদের ও বন্ধু। চণ্ডাল, কেওরা প্রভৃতি জাতির, সহিত তিনি সমান ভাবে মিশিতেন ও তাহাদের শুভকল্পে শ্রম করিতেন।

আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করার প্রধান আপত্তি এই যে, ভদ্রলোকদিগের কাহারও কাহারও ধারণা, নিম্নশ্রেণীর লোক লেখাপড়া শিখিলে আর তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবে না। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধেও ঠিক এই প্রকারের আপত্তি উত্থাপিত হয়। এই কারণে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারময় নরকের মধ্যে ভদ্র সমাজ নিম্নশ্রেণীকে রাখিয়া দিয়াছেন। ইহাতে নিম্নশ্রেণীর লোক ত অবনতির গহ্বরে দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছেই, অধিকন্তু ভদ্র সম্প্রদায়ও বালুকার ভিত্তির উপর নিজেদের ভ্রান্ত সম্ভ্রমের স্বপ্নসৌধ উত্তোলন করিয়া, নিজেদের অজ্ঞাতসারে অবনতির পথে চলিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর উন্নতি ব্যতীত সমাজদেহের বলাধান হওয়া একেবারে অসম্ভব। আমাদের সমাজের কথা মনে করিলেই, মনে একটি অতীব হাস্যোদ্দীপক চিত্রের উদয় হয়। একটি বালক, তাহার মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ ও পুষ্ট, তাহা এত

বৃহৎ যে এক জন দৈত্যের স্কন্ধের উপরেই তাহা স্থাপিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বালকের অন্যান্য অঙ্গ অসম্ভবরূপ ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র। হাত পা ঝাটার কাঠির মত, আঙ্গুল, পেট, বুক নাই বলিলেও হয়। আমাদের বর্ত্তমান সমাজও ঠিক তাহাই। পাশ্চাত্য জগতের উচ্চতম জ্ঞান বিজ্ঞান লইয়া এক সম্প্রদায় লোক পৃথিবীর যে কোন সুধী সমাজের সমকক্ষতা লাভের যোগ্য, এমন কি কেহ কেহ সমগ্র পৃথিবীর উন্নততম মনীষিবৃন্দ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন। তাঁহারা কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি সকল বিষয়েই উন্নততম আদর্শ পোষণ করিতেছেন, ইহাই আমাদের সমাজদেহের মস্তক, তাহার পরেই অকথ্য অজ্ঞানতা। এখন যাহাতে সমগ্র দেহের মধ্যে অবাধে ও উপযুক্ত ভাবে রক্ত চলাচল করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। নতুবা মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে যে সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়, আমাদের সমাজদেহেও সেই সমস্ত ব্যাধি উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে।

শশিপদবাবু নিম্নশ্রেণীর হিতকল্পে আরও অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি এই সমস্ত কার্য্য করেন, তখন তাহা একেবারেই নূতন ছিল, এখন অবশ্য তাহার কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে। ইহার মধ্যে প্রথমটি এই যে, তিনি শ্রমজীবিগণকে স্বাবলম্বনের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তিনি তাহাদের বলেন যে, আজ যদি তোমাদের কল উঠিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা কি প্রকারে জীবিকার্জ্জন করিবে? এই শিক্ষায় ও শশিপদ বাবুর বিশেষ ব্যবস্থার ফলে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে তাঁতের সাহায্যে বস্ত্রবয়ন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রমজীবিগণ দিবসে কার্য্য করিয়া রাত্রিকালে ও ছুটির দিনে নিজ নিজ গৃহে বস্ত্রবয়ন করিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন। এখন দেশীয় শিল্পের প্রতি

দেশের লোকের বিশেষ অনুরাগ হইয়াছে, এখন সকলেই বুঝিয়াছেন যে দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন ব্যতিরেকে আমাদের মঙ্গল অসম্ভব। দেশীয় শিল্পের প্রতি যে এই দৃষ্টির আবশ্যক, বর্ত্তমান আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে শশিপদ বাবুর মনে তাহা উদয় হইয়াছিল। তিনি এই ভাব লইয়াই নিশ্চিন্ত ভাবে ছিলেন না। বরাহনগরের বস্ত্রশিল্প এক দিন বিশেষরূপে বিখ্যাত ছিল, বিদেশী প্রতিযোগিতায় এই শিল্পের ধ্বংস হয়। আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, শশিপদবাবু একাকী এই দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতির কল্পে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সে সময়ে দেশের লোক তাঁহার চেষ্টার যথার্থ মূল্য অবধারণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তাঁহার চেষ্টায় অনেক কার্য্য হইয়াছিল।

শ্রমজীবিগণের কল্যাণের জন্য শশিপদবাবু একটী "আনা সেভিংস্ ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠিত করেন। তখনও নানাস্থানে গভর্ণমেণ্টের "সেভিংস্ ব্যাঙ্ক" হয় নাই। কেবলমাত্র কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে তিনটি সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ছিল। তাহার পর প্রথমে গভর্ণমেণ্ট যখন, জেলায় সদর ও মহকুমায় সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপনা করিলেন, তখন শশিপদবাবু অনেক চেষ্টা করিয়া বরাহনগরে একটি সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপনা করেন। অবশ্য বরাহনগর জেলার সদরও নহে, মহকুমাও নহে, কেবলমাত্র শশিপদবাবুর চেষ্টাতেই এই শুভকার্য্য তথায় হইয়াছিল। এই প্রকারে শিক্ষা, ধর্ম্ম, একতা, স্বাবলম্বন, সঞ্চয়শীলতা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ প্রকৃত প্রেমের সহিত শশিপদবাবু শ্রমজীবিমণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভগবানের নিকট একান্তভাবে প্রার্থনাদ্বারাই তিনি এই দুরূহকার্য্য সাধনের শক্তি ও উপায় পাইয়াছিলেন।

নিম্নশ্রেণীর লোক ও শ্রমজীবিগণের মধ্যে কার্য্য করিয়া শশিপদ বাবু যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়কর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি বরাহনগরে এই কার্য্য যেরূপ বিস্তৃতভাবে

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেরূপ বিস্তৃতভাবে এই প্রকারের কার্য্য এখনও দেশে কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার এই কৃতকার্য্যতার মূলে যে সমস্ত হেতু বিদ্যমান আছে ও যে প্রণালী তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত।

নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর অত্যাচার হয়, তাহারা অসহায় ও সমাজে নিগৃহীত। এই নিগ্রহের জন্য 'বাবু' বা ভদ্রলোকেরাই দায়ী। ভদ্রলোকদের কথা ভাবিতে গেলেই তাহাদের মনে এই সমস্ত অত্যাচারের কথা স্বভাবতঃ জাগিয়া উঠে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, কোন ভদ্রলোক সত্য সত্যই নিম্নশ্রেণীর উন্নতি সাধন করিব বলিয়া অগ্রসর হইলে তাহারা প্রথমে বিশ্বাসই করিতে পারে না। তাহাদের মনে এই সন্দেহ হয় যে, এই কল্যাণ-চেষ্টার মূলে কোনও অভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে। শ্রমজীবিগণ ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর লোক শশিপদ বাবুকে তাহাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী বলিয়া জানিত। যখন তাহারা কোন বিপদে পড়িত তখনই তাহারা শশিপদ বাবুর নিকটে আসিত। আর এই প্রকারের বিপদ প্রায়ই ঘটিত সুতরাং শশিপদ বাবুকে সর্ব্বদাই ইহাদিগের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। কেহ তাহাদের কাহারও জমি কাড়িয়া লইয়াছে, শশিপদ বাবুকে তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। কাহাদের বিরোধ হইয়াছে তাহা মিটাইয়া দিতে হইবে। কাহারও অসুখ হইয়াছে শশিপদ বাবুর উপদেশ ও পরামর্শ মত চিকিৎসা হইবে—এই সমস্ত কার্য্য তাঁহাকে সর্ব্বদাই করিতে হইত। সে সময়ে কলের শ্রমজীবিগণ ধর্ম্মঘট করিত না। তাহাদের কলে কোন অসুবিধা হইলে তাহারা শশিপদ বাবুর নিকট আসিত—তিনি তাহাদিগকে শান্ত, সংযত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে উপদেশ দিতেন তাহার পর কলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যাইয়া তাহাদের অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। কলের কর্ত্তৃপক্ষ-

গণেরও শশিপদ বাবুর উপর বিশেষ আস্থা ছিল। ফলে তিনি মধ্যস্থতা করিয়া অনায়াসেই শ্রমজীবিগণের অভাব অভিযোগের ন্যায্য প্রতীকার করিতে পারিতেন।

এই প্রকারে শ্রমজীবিগণের হিতসাধনে তিনি সর্ব্বদা উদ্যুক্ত থাকিতেন, শ্রমজীবিগণ অন্তরে অন্তরে তাহা জানিত এই জন্যই শশিপদ বাবুর চেষ্টা এতাদৃশ সফলতা লাভ করিয়াছিল। এই প্রকারে শ্রমজীবিগণের সেবায় শশিপদ বাবুকে সময়ে সময়ে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। একটি অতি ভয়ানক ঘটনা বর্ণনা করিলে দেশের অবস্থা, শ্রমজীবি-দরিদ্রগণের প্রতি শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের ব্যবহার, এবং শ্রমজীবিগণের প্রতি যাহাতে ন্যায্য ব্যবহার হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে গিয়া শশিপদ বাবুর ক্লেশভোগ এই তিনটি বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং আমাদেরও অনেক শিক্ষা হইবে। এই ঘটনাটি শশিপদ বাবুর স্বলিখিত ইংরাজী বিবরণ হইতে সংগৃহীত হইল।

ইংরাজী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বরাহনগরের পুলিশের দারোগা শ্রীযুক্ত নামক কনেষ্টবলের সহিত বিধু বেওয়া নামক কলের একটি স্ত্রীলোককে মালিপাড়ায় অবস্থিত তাহার কুটির হইতে জোর পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গেল। স্ত্রীলোকটি তখন কুটিরে ছিল, তাহার কুটিরে তাহার একটি বার বৎসর বয়স্ক ভাই ছাড়া আর কেহই ছিল না। এই দরিদ্র স্ত্রীলোকটির স্বভাব চরিত্রের বিরুদ্ধে কখনও কিছু শোনা যায় নাই সুতরাং তাহাকে ভালই বলিতে হইবে। প্রথমে কনেষ্টবলটি তাহার ঘরের দুয়ারে যাইয়া তাহাকে ডাকাডাকি করে, সে বাহিরে আসিলে পর কনেষ্টবল তাহাকে বলে যে দারোগা বাবু তাহার ঘরে রাত্রিযাপন করিতে চাহে। স্ত্রীলোকটি শুনিয়া খুব জোরে আপত্তি করে। তাহার পর দারোগা ও কনেষ্টবল উভয়ে মিলিয়া স্ত্রীলোকটিকে জোর করিয়া

ধরিয়া লইয়া যায়। স্ত্রীলোকটি কাতরে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, কিন্তু এই আর্ত্তনাদে পাষণ্ডদ্বয় নিবৃত্ত না হইয়া তাহাকে গুহ ঘাটে ধরিয়া লইয়া যায়।

অক্ষয় তন্তুবায়, রাম পাল ও কেদার এই অবস্থায় স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে পায় এবং দারোগা ও কনেষ্টবলকে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনেক অনুনয় করে কিন্তু তাহারা ইহাদের অনুনয় গ্রাহ্য করে না। স্ত্রীলোকটিকে ঘাটে লইয়া গিয়া কিছু দূরে কনেষ্টবল প্রহরীরূপে দাঁড়াইয়া থাকিল আর পাষণ্ড দারোগা স্ত্রীলোকটির উপর জোর পূর্ব্বক অত্যাচার করিল। স্ত্রীলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল!

পরদিন রাত্রিকালে সেই দারোগা ও সেই কনেষ্টবল আবার সেই স্ত্রীলোকটির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় অদ্যও তাহাদের অসদভিসন্ধি ছিল। কনেষ্টবল আসিয়া স্ত্রীলোকটিকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকটি ঘরে ছিল না। নিজেকে খুব লাঞ্ছিত মনে করিয়া মনের দুঃখে সে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, ভয় ও হইয়াছে, আবার দারোগা আসিতে পারে। এই সব কারণে স্ত্রীলোকটি চলিয়া গিয়াছিল। তাহাকে না পাইয়া কনেষ্টবল সেইখানকার আর একটি স্ত্রীলোককে ডাকিল ও জিজ্ঞাসা করিল বিধু কোথায়? সে উত্তর করিল যে বিধু মনের দুঃখে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কনেষ্টবল তখন এই দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকেই ধরিল, সে বৃদ্ধা তাহাকেই টানিয়া লইয়া চলিল। গত রাত্রির ঘটনা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল, আজ আবার গোলমাল হইবামাত্র অনেক লোক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। যদুনাথ পাল সেই পাড়ার একমাত্র ভদ্রলোক, তিনিও আসিলেন, যদুবাবুর কথায় কনেষ্টবল ও দারোগা চলিয়া গেল!

দারোগার স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিবার এইরূপ পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় শ্রমজীবিগণ ভীত হইয়া ১৫ই রাত্রিকালে শশিপদ বাবুর নিকট আসিয়া পূর্ব্ব রাত্রির ও সেই রাত্রির সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জানাইল।

এদিকে দারোগা খবর পাইল যে, শ্রমজীবিগণ শশিপদ বাবুর নিকট যাইয়া সমস্ত কথা বলিয়াছে—শশিপদ বাবু তাহার বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের নিকট লিখিতে পারেন এই ভাবিয়া, ১৫ই তারিখের রোজ নামচায় দারোগা লিখিয়া রাখিল যে, ৯জন লোক রাত্রিকালে মদ খাইয়া গোলমাল করিয়া শান্তিভঙ্গ করিয়াছে। এই মর্ম্মে সে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক রিপোর্ট পাঠাইয়া দিল। এই রিপোর্টে এইরূপ লিখিত হয় যে, এই লোকগুলি মদ খাইয়া কতকগুলি স্ত্রীলোক লইয়া রাত্রিতে বড়ই গোলযোগ করে। কনেষ্টবল তাহাদের সাবধান করিতে গেলে কনেষ্টবলের সহিত ঝগড়া করে। দারোগা বাবু এই পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন ও ভয় দেখাইয়াছেন যে, যদি তাহারা পুনরায় ঐরূপ করে তাহা হইলে তাহাদের নামে রিপোর্ট করা হইবে ও শান্তি রক্ষার জন্য তাহাদের মুচলকা দিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া তাহাদের ভয় হইয়াছিল ও তাহারা একজন স্থানীয় ভদ্রলোকের নিকট গিয়াছিল, এই ভদ্রলোক তাহাদের সাহস দিয়াছে ও বলিয়াছে যে পুলিশের বিরুদ্ধেও তাহারা অভিযোগ আনয়ন করিবে।

ইহার পর প্রত্যেকের নিকট হইতে পঞ্চাশ টাকার মুচলকা লওয়া হইল। তাহাদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা রুজু হইল। শমন আসিল যে ২৭শে জুন তারিখে আলিপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে তাহাদের বিচার হইবে।

২৫শে জুন রাত্রিকালে এই সমস্ত গরীব লোক শশিপদ বাবুর

বাড়ী আসিল—তাহাদের আলিপুর যাইতে হইবে এজন্য তাহাদের বড়ই ভয় হইয়াছে, আসামী হইয়া আলিপুরে গেলে তাহাদের কলে কাজ থাকিবে না। তাহাদের ভয়ের সীমা নাই, মোকর্দ্দমার আর এক দিন বাকি তাহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে মোকর্দ্দমার জন্য প্রস্তুতও হইতে পারিবে না।

শশিপদ বাবু তাহাদের শমনগুলি সমস্তই নিজে নিলেন ও বলিলেন তোমরা ভাবিওনা। মনে কর এই সমস্ত শমনগুলি আমার উপরেই জারি হইয়াছে—যাহা করিতে হয় আমিই করিব।

পরদিন ভোরে উঠিয়া উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া রাত্রি চারিটার সময় শশিপদ বাবু বরাহনগর হইতে বাহির হইলেন—শমনগুলি লইয়া কলিকাতা আসিলেন—এই সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য কিছু করিতে হইবেই এই তাঁহার সঙ্কল্প। ২৭শে তারিখে যাহাতে তাহাদের আলিপুর যাইতে না হয় তাহাই প্রথম করিতে হইবে। শশিপদ বাবুর একটু দুর্ভাবনাও হইল। মিষ্টার রিস্ (Mr. Rees) তখন ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট। শশিপদ বাবুর সহিত তাঁহার আলাপ ছিল না। মিষ্টার ভার্ণার একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তিনিও এ বিষয়ে কোনরূপ সাহায্য করিবেন, শশিপদ বাবুর এরূপ বিশ্বাস ছিলনা। কারণ শশিপদ বাবুর কাগজ "বরাহনগর সমাচর" এ মিষ্টার ভার্ণারের কার্য্য সম্বন্ধে কিছু অপ্রিয় আলোচনা হইয়াছিল, মিষ্টার ভার্ণার বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন।

শশিপদ বাবু ভগবানের উপর নির্ভর করিলেন, ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি মিষ্টার ভার্ণারের নিকট গেলেন। মিষ্টার ভার্ণার তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। তাহার পর তিনি ২৪ পরগণার জজ মিষ্টার বোকোর্ট

সাহেবের নিকট গেলেন—মিষ্টার বোফোর্টের সহিত শশিপদ বাবুর বিশেষ বন্ধুতা ছিল। শশিপদ বাবু জজ সাহেবের নিকট সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। ভগবানের কৃপায় সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বোফোর্ট সাহেবের হৃদয় দ্রব হইল। শশিপদ বাবু জজ সাহেবের নিকট একটি অতি সামান্য অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই মোকর্দ্দমাটি আলিপুরে না হইয়া যাহাতে বরাহনগরে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বরাহনগরে সপ্তাহে একদিন করিয়া জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই সপ্তাহে একদিন করিয়া বরাহনগরে কাছারী হওয়া ইহাও শশিপদ বাবুর আবেদন ও তাঁহার কাগজে এ সম্বন্ধে আন্দোলন করার ফলেই হইয়াছিল।

দরিদ্র লোকগুলিকে হায়রাণ করাই পুলিশের দারোগার অভিপ্রায় ছিল। বিচারে এই সমস্ত লোক যদ্যপি দোষী সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের শাস্তি হউক কিন্তু এ প্রকারে তাহাদের হায়রাণ করার উদ্দেশ্য কি? শশিপদ বাবুর কথায় কাজ হইল, তাঁহার অনুরোধে বোফোর্ট সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট রীজ্ সাহেবকে একখানি পত্র দিলেন—এই পত্রে মোকদ্দমাটির শুনানি যাহাতে আলিপুরে না হইয়া বরাহনগরে হয় তজ্জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। সকাল ৮ ঘটিকার সময় শশিপদ বাবু বোফোর্ট সাহেবের নিকট এই পত্র পাইলেন। শশিপদ বাবু তখন বরাহনগরের সাব রেজিষ্ট্রার। তাঁহাকে সাড়ে ১০টার সময় আপিস করিতে হইবে। তিনি ভাবিলেন যদি আলিপুরে যাইয়া মিষ্টার রীজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে যথা সময়ে আপিস করা অসম্ভব। এইরূপ ভাবিয়া তিনি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ভার্ণারের নিকট পুনরায় গমন করিলেন। মিষ্টার ভার্ণারের নিকট তিনি সমস্ত কথা বলিলেন, দারোগার

ব্যবহারের কথা, দরিদ্রদিগকে হায়রাণ করিবার জন্য আলিপুরে মোকদ্দমা করার কথা সবই বলিলেন ও তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যাহাতে মোকদ্দমার শুনানি আলিপুরে না হইয়া বরাহনগরে হয়। ভার্ণার সাহেব শশিপদ বাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে যাইতেছিলেন, শশিপদ বাবু সাহেবের মুখে অসম্মতির চিহ্ন পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—আমি জজ সাহেব বাহাদুরের নিকট গিয়াছিলাম তিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এজন্য এক পত্র দিয়াছেন। এই কথা শুনিতে শুনিতেই সাহেবের মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। তখন শশিপদ বাবু তাঁহাকে বলিলেন যে, আমাকে সাড়ে দশটার সময় বরাহনগরে আপিস করিতে হইবে, আর বেশী সময় নাই এই পত্র লইয়া যদি আমাকে আলিপুর যাইতে হয় তাহা হইলে আর আপিস হয় না। ভার্ণার সাহেব চিঠি খানির ভার লইলেন ও বলিলেন, এ বিষয়ে কি করিতে পারা যায় দেখিব। শশিপদ বাবুর তখনও সন্তোষ হইল না, তিনি বিনীতভাবে বলিলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই পত্র পাইয়া কি করেন তাহা আজই আমার জানা দরকার কারণ মোকদ্দমা যদি আলিপুরেই হয় তাহা হইলে দরিদ্র লোকদিগকে কাল বেলা এগারটার সময় আলিপুরে কাছারিতে আসিতে হইবে। ভার্ণার সাহেব সংবাদ পাঠাইয়া দিতে সম্মত হইলেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া শশিপদ বাবু বরাহনগর চলিয়া আসিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর তিনি মিষ্টার ভার্ণারের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে, মোকর্দ্দমার শুনানি বরাহনগরেই হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। শশিপদ বাবু অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হইলেন।

ইহার পর বরাহনগরে তাহাদের মোকর্দ্দমার শুনানি হইল। দারোগা তাহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছিল তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া প্রমাণীকৃত হইল। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ে

পুলিশের দারোগার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিলেন—তিনি দরিদ্র ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছেন এ কথাও রায়ে লিখিলেন।

ইহার পর বিধু বেওয়া পুলিশের দারোগা ও কনষ্টবলের বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক সতীত্বনাশের অভিযোগ আনয়ন করিল। শশিপদ বাবু কলিকাতা হইতে ভাল উকিল আনাইয়া নিযুক্ত করিলেন। এই মোকর্দ্দমারও বরাহনগরে মিষ্টার ভার্ণারের এজলাসে শুনানি হইল। বরাহনগরের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা অনেকেই পুলিশের দারোগার পক্ষ সমর্থন করিলেন। তথাকার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝাইয়া দিলেন যে দারোগা বাবুর বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা; শশিপদ বাবু এই মোকদ্দমা গড়িয়া তুলিয়াছেন—এই সমস্ত লোক শশিপদ বাবুর শ্রমজীবি-সমিতির লোক, তাহারা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে আরও বুঝাইয়া দিল যে, বিধু বেওয়া অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক। ফলে এই মোকদ্দমায় দারোগার সুবিধা হইল। যাহা হউক বিচারক মহাশয় রায়ে একথা প্রকাশ করিলেন যে, দারোগা মদ খাইয়াছিল, সে বিধুর বাড়ী গিয়াছিল, তাহাকে ঘাটে ধরিয়া অনিয়াছিল এবং তাহার উপর অত্যাচারও করিয়াছিল। এ সমস্ত কথা স্বীকৃত হইল, অথচ সতীত্বনাশের (Rape) অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হইল না। কারণ দেখান হইল যে, স্ত্রীলোকটির সম্মতি ছিল।

দারোগার শাস্তি না হওয়ায় বরাহনগরের ভদ্রলোকগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। শশিপদ বাবু স্বয়ং এ ঘটনার তদন্ত করিয়াছিলেন, যখন এই মোকর্দ্দমা হয় তখন বরাহনগরের অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক শশিপদ বাবুকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন এই মোকর্দ্দমায় আর কোনরূপ সাহায্য না করেন। তাঁহারা শশিপদ বাবুকে এইরূপ বুঝাই-

বার চেষ্টা করেন যে দারোগা অন্যায় করিয়াছে বটে কিন্তু সেজন্য সে বিশেষ অনুতপ্ত। শশিপদ বাবু তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্রেরণায় এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। বাহিরের এই সমস্ত লোকের অনুরোধে তিনি অন্তর্যামীর আদেশবাণী পালনেই দৃঢ়সংকল্প হইয়া রহিলেন। এইটুকু শশিপদ বাবুর জীবনের বিশেষত্ব—এজন্য তাঁহাকে এক গুঁয়ে প্রভৃতি অনেক বিশেষণ সাধারণ লোকের নিকট হইতে লাভ করিতে হইয়াছে।

তৎকালীন হাইকোর্টের জজ সার জন্ ফিয়ার শশিপদ বাবুর একজন পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে শশিপদ বাবুর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। তিনি রায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন সমস্তই প্রমাণ হইয়াছে অথচ সতীত্বনাশের অভিযোগ যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। স্ত্রীলোকটী যখন নিজেই বলিতেছে যে তাহার সম্মতি ছিল না, তখন তাহার সম্মতি ছিল ইহা অনুমান করিবার বিচারকের কোনও অধিকার নাই।

আদালতের বিচারে দারোগা নিষ্কৃতি পাইলে পর বিভাগীয় ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী তাহার এই ব্যবহারের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। বরাহনগরের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা পুলিশের দারোগার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সকলে পরামর্শ করিয়া সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ লিখিয়াছিলেন। কৈফিয়ৎ যাওয়ার পর দারোগার বিভাগীয় শাস্তি হইল, বেতন কমিল ও স্থানান্তরে যাইতে হইল।

এ ঘটনা আর লিখিবার প্রয়োজন নাই। দেশে সুশিক্ষার প্রসার হইতেছে, দেশের উন্নতি হইতেছে—দেশের লোকগণ এই ঘটনাটী বিচার করিবেন। সামান্য লোকদিগের সহিত মিশিয়া কাজ করিতে গেলে কত পরিশ্রম করিতে হয় ও কত পরীক্ষায় পড়িতে হয় ইহা হইতে তাহাও বুঝা যাইবে, শশিপদ বাবু এইরূপ সর্ব্ববিধ বিপদ্ হইতেই শ্রম-

জীবিগণ ও অন্যান্য দরিদ্র ব্যক্তিগণকে প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করিতেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে বরাহনগরে কলেরা আরম্ভ হইল—শশিপদ বাবু ঔষধ ও পথ্য বিতরণ আরম্ভ করিলেন—এস্থলে আর একটি কথা বিশেষ রূপেই উল্লেখযোগ্য। দিবসে শশিপদ বাবু কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় থাকিতেন। পূর্ব্বে শশিপদ বাবুর প্রথমা স্ত্রী স্বর্গীয়া রাজকুমারী দেবীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; শশিপদ বাবু যখন দিবসে বাড়ী থাকিতেন না সেই সময়ে তিনি ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিতেন।

শ্রমজীবিগণের ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতির উপরেই যে আমাদের দেশের যথার্থ উন্নতি নির্ভর করিতেছে ইহা দেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে অনুভব করেন এবং এ বিষয়ে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় তিনি কেবল অর্থ দেন নাই, বুদ্ধি দেন নাই, তিনি নিজেকে দিয়াছিলেন। নিজেকে দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর উন্নতিতেই দেশের ভবিষ্যৎ যে নির্ভর করিতেছে ইহা শশিপদ বাবুর পরেও অনেক মনীষী অতীব স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের কৃষকবৃন্দের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে শ্রম সম্বন্ধে কয়েকটি অতি সুন্দর সত্য দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুযুগে এ দেশের অধিবাসিগণ খুব পরিশ্রমী ছিলেন, সকলেই পরিশ্রম করিতেন—শ্রমজীবিগণেরও আদর ছিল। ইংরাজীতে যাহাকে Dignity of Labour বলে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতায় তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। মুসলমান যুগে ক্রমশঃ এই ভাব বদলাইয়া গেল। এই সময়ে নবাবী বা বাবুগিরির বিলাসী ভাব ও ভোগ পরায়ণতা হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করে এবং

উচ্চশ্রেণীর লোকেরা শ্রমবিমুখ হইয়া পড়ে। ইংরাজদের সংসর্গে ও আদর্শে আমাদের যেমন অনেক বিষয়ে কুশিক্ষা হইয়াছে তেমনি অনেক বিষয়ে সুশিক্ষাও হইয়াছে। সুশিক্ষার মধ্যে শ্রমপরায়ণতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এখন আমাদের দেশের ভদ্রলোকগণ ব্যাগের মধ্যে আধমণ ভার লইয়া যাইতে বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করেন না ইহা ইংরাজী আদর্শের সুফল। শ্রমের গৌরব দেশবাসিগণকে না শিখাইলে আমাদের উন্নতি সুদূর পরাহত। শ্রমজীবিগণই সমাজের মেরুদণ্ড এই সমস্ত তত্ত্ব লইয়া শশিপদ বাবুই সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

শ্রমজীবিদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে শশিপদবাবু এ দেশে একটী নূতন ভাব আনয়ন করিয়াছেন; এ দেশে পরিশ্রমকর কর্ম্মকে অনেকে অপমানজনক জ্ঞান করেন, যাহারা শারীরিক শ্রমজনক কাজ করে তাহারা নীচ বলিয়া সমাজে পরিগণিত, লোকের ধন হইলে আর পরিশ্রম করে না, এবং সামান্য লোকের ঘরে চাউল থাকিলে সেদিন সে আর ঘরের বাহির হইতে চায় না; ইহার কারণ এই,—পরিশ্রম নিতান্ত অনাবশ্যক ও নীচকর্ম্ম, সাধারণের এইরূপ ধারণা। "লেবার ইজ অনারেবল" (Labour is honarable) অর্থাৎ পরিশ্রমে সম্মান, পরিশ্রমে মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষ যত পরিশ্রম করিবে তত তাহার গৌরব বাড়িবে, শশিপদবাবু শ্রমজীবীদিগকে এই ভাবে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শ্রমজীবী কাগজ হইতে একটী পদ্যের দুই লাইন এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রম নামে কল্পতরু অতি চমৎকার,
যাহা চাবে, তাহা পাবে নিকটে তাহার।"

"ভারত শ্রমজীবী" নামক শশিপদ বাবু যে সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে—নিম্নশ্রেণীর

জন্য এইরূপ একখানি সুলভ পত্রের প্রকাশ আমাদের দেশে একেবারেই নূতন। এই পত্রের উদ্দেশ্য সেই সময়ে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে বরাহনগর হইতে প্রচারিত একখণ্ড কাগজে নিম্নরূপ পরিদৃষ্ট হয়।

THE BHARAT SRAMAJIBI

or

THE INDIAN WORKMAN.

Under the above title is now published at Barahanagar, in the neighbourhood of Calcutta, a monthly Bengalee Journal of 8 pages 8 vo., with wood-cut illustrations, price 1 pice per number. It is purely an educational paper and its object is to supply a means of improving the moral and intellectual condition of the working classes by short and simple articles on subjects adapted to these ends, such as descriptions of natural phenomena or objects of general interest, accounts of native arts and manufactures and the application of science to the improvement of such arts or other useful purposes as exemplified in more advanced countries, biographical sketches of individuals whose characters or careers may be likely to exercise a benificial influence on the readers, and advice and suggestions on subjects bearing on their own welfare or on their duties to their fellowmen, whether of their own class, or of their employers, or of the community

in general, such as may tend to make or keep them worthy and respectable members of society. It will therefore avoid everything calculated to elicit controversy such as religious or political subjects or such as may be likely to produce ill-feeling between different classes of the community.

A Journal of this kind so inoffensive and so generally useful in its character will, it is hoped, meet with general support. And as there may and probably will be difficulties in obtaining this support, particularly at first, it is suggested that employers of labour and others holding influential positions in society may materially assist in introducing it to and favouring its acceptance by those for whom it is intended, by subscribing for copies for sale or for gratuitous distribution, which on account of the lowness of its price they can easily do at very small expense. Price 1-9 per hundred copies.

Orders for the Bharat Sramajibi will be received by the manager of the North Suburban Press, Barahanagar, Calcutta.

Barahanagar, The 1st. September, 1874 } SASIPADA BANERJEE.

ইহার বঙ্গানুবাদ এই—

"ভারতশ্রমজীবী" নামক এই মাসিকপত্র কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী

বরাহনগর হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা ডিমাই ৮ পৃষ্ঠা, ইহাতে ছবি থাকে, প্রতিখণ্ডের মূল্য এক পয়সা মাত্র। এই কাগজ খানির উদ্দেশ্য শিক্ষাবিস্তার। শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের নৈতিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য—এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল ক্ষুদ্র ও সরল ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাবলী ইহাতে প্রচারিত হয় প্রাকৃতিক বিশেষ ব্যাপারের বর্ণনা সাধারণের পক্ষে আনন্দদায়ক বিষয়, দেশীয় শিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্যের বর্ণনা, বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, বিজ্ঞানের দ্বারা অন্যান্য ব্যাপারেই বা কি সুবিধা হইতে পারে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেই বা এই সমস্ত কার্য্য কিরূপে হইতেছে, সে সমস্তের বর্ণনা; যে সমস্ত লোকের চরিত্র বা জীবনী আলোচনা দ্বারা উপকার হইতে পারে সেই সমস্ত লোকের চরিত্রালোচনা, শ্রমজীবিগণের নিজেদের কিসে উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ে উপদেশ ও উপায় নির্দ্দেশ; পরস্পরের মধ্যে, তাহাদের নিয়োগকর্ত্তাদিগের প্রতি তাহাদের সমাজের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে সে সম্বন্ধে উপায় নির্দ্দেশ করা, যে উপায়ে শ্রমজীবিগণ তাহাদের অবনত অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া সমাজের মধ্যে উপযুক্ত সম্মানার্হ লোক হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য। যে সমস্ত বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হয় এ প্রকারের বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইবে না কারণ এই সমস্ত বিষয় লইয়া সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনা। (সমস্ত অংশের অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন)

এই পত্রের যথেষ্ট প্রচারও হইয়াছিল এবং অনেক সুফল ও ফলিয়াছিল তৎকালীন সংবাদ পত্রাদিতে এ বিষয়ে যে আলোচনা হইত সেই সমস্ত হইতেই এই পত্র যে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এক নূতন কর্ত্তব্যপথ প্রসারিত করিয়াছিল তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদ পত্র পাইওনিয়ারে ও তৎকালীন অন্যান্য দেশীয় ও বিদেশীয়গণ পরিচালিত যাবতীয় সংবাদপত্রে এই পত্রের কথা বিশেষ প্রশংসার সহিত লিখিত হইত। এই পত্রিকার প্রচার যে দেশের সকল প্রকার লোকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এই পত্রিকায় অনেক সুপ্রসিদ্ধ লেখকের রচনা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত। প্রবন্ধগুলি সুন্দর, সরল সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইত। এই পত্রে কি প্রকারের রচনা প্রকাশিত হইত তাহাই দেখাইবার জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(১)

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই !
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারী-নর
ঘুমাবার আর বেলা নাই
উঠ জাগো ডাকিতেছি তাই।

(২)

ঘোর রোল ভারতে উঠিল।
অগ্রসর অগ্রসর
এই রব ঘোরতর
শুনে কর্ণ বধির হইল ;
উঠিতেছে যে যেখানে ছিল।

(৩)

ওই দেখ চলেছে সকলে
মধ্যবিত্ত ভদ্র যারা
সর্ব্বাগ্রেতে ধায় তারা
পায় পায় ধনীরাও চলে,
ছোট বড় ধায় কুতূহলে।

(৪)

জাগিবার বাকী কেবা আর
যাহারা অবলা বলে
বিখ্যাত ধরাতলে,
সেই নারী উঠিছে এবার,
মহানন্দে হয় আগুসার।

(৫)

নব দৃশ্য ভারতে উদয় !
নব রাজ সমাগমে,
নব শক্তি নবোদ্যমে,
পূর্ণ আজি সবারি হৃদয়
আজ দেশ যেন অগ্নিময় !

(৬)

হেনকালে কে ঘুমাতে পারে!
অকর্ম্মণ্য জড় যারা
ঘুমায় ঘুমাক্ তারা।
থাকে থাক্ অজ্ঞান আঁধারে
শ্রমজীবী! ডাকিয়ে তোমারে।

(৭)

সমাজের মূল তোরা ভাই!
কে দেখেছে ধরাতলে।
মূল বিনা তরু চলে
মাথা চলে তাতে লাভ নাই;
যেথাছিল রহিবে তথাই।

(৮)

ওই দেখ সাগরের পারে,
শ্রমজীবীশত শত,
কেমন সংগ্রামে রত।
এই ব্রত—রবেনা আঁধারে
আয় তোরা দেখি যে সবারে।

(৯)

আয় তবে শ্রমজীবিগণ
নবোৎসাহে চলে আয়,
সময় বহিয়ে যায়,
ঘোরতর বাজিয়াছে রণ
যা করিবে সার্থক জীবন।

শ্রমজীবিগণের ও সাধারণ ভাবে নিম্নশ্রেণীর উন্নতি বিধানের চেষ্টা শশিপদ বাবু হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে করিতেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিম্নশ্রেণীর উন্নতি বিষয়ক ইংরাজী পুস্তকে এ বিষয়ে অনেক কথাই দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখে তিনি মুসলমানগণকে একত্র করিয়া তাহাদের প্রয়োজনাদি বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। ঐ বৎসর ২০শে ডিসেম্বর তারিখে মুসলমান বালকদিগের জন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন।

শশিপদ বাবু নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের জন্য যে কেবল বরাহনগরেই কার্য্য করিয়াছেন তাহা নহে। পূর্ব্বে তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন সেই সময়ে দুইটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন—একটি সিটি কলেজে আর একটি কেশব একাডেমিতে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সাধকমণ্ডলী নামক যে কর্ম্মীদল প্রতিষ্ঠিত হয়, শশিপদ বাবু তাহার সম্পাদক ছিলেন

—এই সমিতির অধিবেশন শশিপদ বাবুর বাড়ীতেই হইত। এই সমিতি হইতেই এই দুইটি নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে তিনি তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুরোধে প্রত্যহ সকালে ইডেন বাগানে বেড়াইতে যাইতেন। এই সময়ে তিনি চট্টগ্রামের মাঝিদের এক নৌকায় যাইয়া বসিতেন। এই সমস্ত মাঝি তাঁহার মধুর সরল অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চারিদিকে আসিয়া বসিত, আর তিনি তাহাদিগকে বই পড়িয়া শুনাইতেন ও নানারূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন, ধর্ম্মবিষয়ক গান করিতেন, সময়ে সময়ে তিনি তাহাদের খাবার আনিয়া দিতেন ও একত্রে আহার করিতেন।

তিনি সমস্ত জীবন ধরিয়াই এই প্রকারের নানারূপ কার্য্য করিয়াছেন—তন্মধ্যে একটি ঘটনায় তাঁহার কার্য্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারা যাইবে এবং তিনি যে ভাবের উদ্দীপনায় কার্য্য করেন সেই ভাবটিও বুঝিতে পারা যাইবে।

একবার শশিপদ বাবু স্বাস্থ্যের অনুরোধে কিছুদিন মধুপুরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি দেখিলেন কতকগুলি শ্রমজীবী একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। এই শ্রমজীবীদিগের মধ্যে এক দম্পতি ছিল। শশিপদ বাবু শুনিলেন যে এই শ্রমজীবী-দম্পতির একটি অতি ক্ষুদ্র কয়েক মাসবয়স্ক শিশু আছে তাহারা এই শিশুকে আফিংএর জল খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া আসে। একদিন অসময়ে অর্থাৎ তাহার পিতা মাতার কাজ করিয়া গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে এই ছেলেটির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ছেলেটি খুব কাঁদিতেছে তাহার কান্না শুনিয়া শশিপদ বাবু কুটিরে গেলেন, ছেলেদের কান্না থামাইতে শশিপদ বাবুর বিশেষ পারদর্শিতা আছে—অনেক মা হইতেও এ বিষয়ে তাঁহার পারদর্শিতা খুব অধিক। শশিপদ বাবু ছেলেটিকে শান্ত করিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ স্থানে তাহার

পিতামাতার নিকট লইয়া গেলেন। এই সহৃদয়তার দ্বারাই অপরের হৃদয় বশীভূত করিতে পারা যায়।

শশিপদ বাবুর এই সকল কার্য্যের দ্বারা বরাহনগরের শ্রমজীবিরা কিরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা তাহাদের প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শশিপদ বাবুর বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাহারা শশিপদ বাবুকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করে, তাহাতে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত আছে। আমরা নিম্নে সেই অভিনন্দন পত্র খানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"মহাশয়, আমরা আপনকার বিলাত গমনের কথা শুনিয়া আমাদের মনের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য এই পত্র খানি আপনাকে দিতেছি। আমরা অতিশয় দুঃখী লোক, আমাদের ক্লেশ দূর করে বরাহনগরে এমন লোক কেহই নাই, কেবল আপনি একাকী আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য একান্তমনে যত্ন করিতেছেন। আপনি আমাদের চরিত্র শোধরাইবার জন্য বরাহনগরে শ্রমজীবী সভা স্থাপন করিয়া যে কতদূর উপকার করিয়াছেন, তাহা লিখিয়া জানান অসাধ্য। এতদিন আপনি এই সভার সভাপতি হইয়া নানা রকম হিতোপদেশ দিয়া আমাদের চরিত্র অনেকাংশে ভাল করিয়াছেন। এমন কি কোন কোন ব্যক্তি মদ্য পান প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সুখে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছে। আপনি আমাদের লেখা পড়া শিখাইবার জন্য রাত্রের পাঠশালা প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমাদের যে কত উপকার করিয়াছেন তাহা বলা যায় না, ইতিপূর্ব্বে আমরা কোন পুস্তক পড়িতে পারিতাম না, কিছুমাত্র লিখিতে জানিতাম না; এক্ষণে আমরা সহজ সহজ পুস্তক পড়িতে পারি। সামান্য বিষয় লিখিতে ও অঙ্ক কসিতে শিখিয়াছি। পূর্ব্বে আমরা যে সকল মন্দ কর্ম্ম অনায়াসে করিতাম, এক্ষণে সে সকল কাজ করিতে লজ্জাবোধ হয়। আপনি আমাদিগকে এতদূর স্নেহ

করেন যে, আমাদের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে স্বয়ং তাহার বাটী যাইয়া দেখিয়া আসেন। যাহারা ঔষধ ক্রয় করিতে পারে না, তাহাদিগকে ঔষধ দিয়া থাকেন ; অধিক কি বলিব, আমরা আপনাকে পিতার ন্যায় মান্য করিয়া থাকি। আপনি বিলাত গেলে আমরা পিতৃহীনের ন্যায় থাকিব। আমরা অতি দুঃখী লোক, আপনি আমাদের যে সকল উপকার করিয়াছেন তাহা আমরা এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না ; তবে এই পত্রখানি দিয়া আমাদের মনের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এক্ষণে আপনি ইহা গ্রহণ করিলে চরিতার্থ হইব। পরিশেষে পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, আপনি নির্ব্বিঘ্নে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের মত আমাদের ও দেশের উপকার করুন।"

এই সভায় ডাক্তার ডেভিড় ওয়াল্ডি সাহেব সভাপতি ছিলেন—১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়ান্ 'ডেলিনিউজ' পত্রে এই সভার যে বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহাতে ডাক্তার ওয়াল্ডি সাহেবের মত প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাক্তার ওয়াল্ডি দীর্ঘকাল বরাহনগরে ছিলেন এবং কলিকাতা ও বরাহনগরের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত—তাঁহার উক্তির বিবরণীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

* * * He knew well what Sasipada Babu had done for the Social Improvement Society of this place, what a prominent part he had taken in its original formation and with what untiring industry, attention and perseverance, even under opposition and discouragement, he had laboured to support it. He also remembered what he had

done in establishing a school for girls, which though it might not be so useful as could be wished chiefly on account of the early age at which girls were removed to be married, was still progressing as there was reason to hold that the girls who had now got some education would, when they became mothers themselves, be more willing to give a still better education to their children. He knew what interest Sasi Babu had taken in night schools for the working people, what trouble he had taken in various matters connected with the improvement of the place, and the welfare of the inhabitants, of which the establishment of a Savings Bank was the most recent instance. Indeed, Sasi Babu was always ready and active in every thing that tended to the benifit of the community, and he, the chairman, was very glad to see that the members of the club were sensible of the value of his exertions and desirious of expressing their gratitude and respect. All the world was ready enough to express respect for wealth and power, but there were other things more worthy of regard than these. Sasi Babu could not claim great respect for his wealth, as he had not much of that but his exertion on their behalf entitled him to a high place in their esteem and it was gratifying to find that they appreciate his efforts"

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের অর্থ এই, এই স্থানের সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভার উন্নতি কল্পে শশিপদ বাবু যাহা করিয়াছেন তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। এই সভা যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কি তাঁহার উৎসাহ! কত বাধা ও কত নিরাশার কারণ ঘটিয়াছে কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও কি অক্লান্ত পরিশ্রম, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সহিত তিনি এই সভা রক্ষা করিয়াছেন, তাহাও আমি অবগত আছি। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাও আমার স্মরণ আছে—অবশ্য এই বিদ্যালয় যেরূপ হওয়া উচিত ছিল সেরূপ হয় নাই কারণ বালিকাগণকে বিবাহ দিবার জন্য অতি অল্প বয়সেই বিদ্যালয় ছাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয়—যাহা হউক ইহা সত্ত্বেও এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রত্যহ উন্নতি হইতেছে। ক্রমশঃ এই বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি হইবে। এখন যে সমস্ত বালিকারা কিছু শিক্ষা পাইল তাহারা তাহাদের কন্যাগণকে আরও অধিক শিক্ষা প্রদান করিবে। তাহার পর শ্রমজীবিগণের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাও আমার স্মরণ আছে—এই স্থানের উন্নতি সাধনের জন্য আরও নানারূপ কার্য্যে তিনি যে পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তাহার সমস্তই আমি জানি—সর্ব্বসাধারণেরও কত কল্যাণ তাঁহার চেষ্টায় সাধিত হইয়াছে—তিনি সাধারণের জন্য অনেক কার্য্য করিয়াছেন, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা তাহার মধ্যে সম্প্রতি সাধিত হইয়াছে—সমাজের হিতের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সমস্ত কার্য্যেই শশিপদ বাবু নিত্য তৎপর ও পরিশ্রমী। আজ এই শ্রমজীবি সমিতির সভ্যগণ যে শশিবাবুর এই চেষ্টা উপলব্ধি করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছেন ইহাতে আমি বড়ই আনন্দ বোধ করিতেছি। অর্থ ও শক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে সকলেই প্রস্তুত—কিন্তু ইহা

অপেক্ষা আরও অধিক মূল্যবান বস্তু আছে। অর্থের জন্য শশিপদ বাবু সম্মান দাবী করিতে পারেন না কারণ তাঁহার বিশেষ অর্থ নাই—কিন্তু তিনি এই সমস্ত শ্রমজীবিগণের হিতের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে তিনি শ্রমজীবিগণের হৃদয়ে খুব উচ্চ ও সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়াছেন, শ্রমজীবিগণ যে ইহা বুঝিয়াছে ইহা খুবই সুখের কথা।"

নিম্নশ্রেণীর উন্নতি সাধনের জন্য শশিপদ বাবু যাহা করিয়াছেন সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইল—তাঁহার বিচিত্র জীবনের এই অধ্যায় আজ আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায়ের অতীব ধীরচিত্তে আলোচনা করিতে হইবে। দেশের উন্নতি চাই, জীবন মরণের সমস্যা আজ এই প্রাচীন জাতির অধ্যুষিত পবিত্র দেশে উপস্থিত—স্বার্থ লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। নিজের জন্য মান ও ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিব জীবনের এই আদর্শ দূর করিতে হইবে, যিনি যেখানেই থাকুন না কেন, নিজের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে বসিয়া দেশের কল্যাণ কল্পে সাধ্যমত পরিশ্রম করিতে হইবে। এ কথা দেশের যুবকগণ সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে বুঝিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন কি করিব, আমি সামান্য লোক ও অসহায়, ইচ্ছাতো রহিয়াছে কিন্তু আমি করিতে পারি তেমন কাজ কৈ? এই প্রশ্ন যাঁহাদের মনে জাগিয়াছে তাঁহারা শশিপদ বাবুর জীবন আলোচনা করিবেন। কাজের অভাব কি? আমার বাটীর দুয়ারে শত শত প্রতিবেশী অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে—প্রাচীন কালে চিত্তের যে সরলতা ও পবিত্রতা ছিল, যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভগবদ্‌ভক্তি ছিল, কালধর্ম্মে তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। যুগের প্রভাবে লোকে স্বার্থপর হইয়াছে, পূর্ব্বে প্রতিবাসীর জন্য লোকে যতটুকু অনুভব করিত এখন তাহা করে না, এরূপ অবস্থায় কি দেশের হিত হইবে, না আমরা জাতিরূপে এই সংঘর্ষের

দিন বিশ্বমানবের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারিব? ব্যাসদেব ভবিষ্য পুরাণে বলিয়াছেন—

"জ্ঞানং সংপ্রাপ্য সংসারে যঃ পরেভ্যো ন যচ্ছতি
জ্ঞানরূপী হরিস্তস্মৈ প্রসন্ন ইব নেক্ষতে।"

এই সংসারে জ্ঞানলাভ করিয়া যে ব্যক্তি অপরকে তাহা প্রদান না করেন জ্ঞানরূপী হরি তাঁহার উপর প্রসন্ন হন না।

আমরা যেটুকু সামান্য জ্ঞান পাইয়াছি, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের যেটুকু আদর্শ পাইয়াছি দেশের সর্ব্বসাধারণকে তাহা দিতে হইবে—ইহাই আমাদের মুক্তির পথ। শশিপদ বাবু আজীবন এই পথে বিচরণ করিয়াছেন—যিনি মানবজীবন সফল করিতে চাহেন, তাঁহাকেও আজ এই পথে বিচরণ করিতে হইবে।

পূর্ব্বে "শ্রমজীবি" নামক পত্রের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু এই পত্র হঠাৎ একদিনের চেষ্টার ফলে প্রচার হয় নাই। যাঁহারা যথার্থ কর্ম্মযোগী তাঁহারা সামান্য হইতেই কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রথমে শশিপদ বাবু ছোট ছোট কাগজ ছাপাইয়া বিতরণ করিতেন। এই কাগজে নানারূপ সদুপদেশ সরল ও সুবোধ্য ভাষায় দেওয়া হইত, এক রবিবারে যাহা উপদেশ দেওয়া হইত সেই উপদেশ ও গান পর সপ্তাহে বিতরণ হইত। এই জন্য তিনি একটি কাঠের প্রেস করেন। যাহাদের বর্ণ পরিচয় আছে তাহারা ইহা পড়িত, যাহাদের বর্ণ পরিচয় নাই তাহাদের বর্ণ পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষা হইত। ক্রমে এই সামান্য আরম্ভ হইতে এই কার্য্যের জন্য বরাহনগরে নর্থ সুবার্বন নামক একটি বৃহৎ প্রেস প্রতিষ্ঠিত করেন ও শ্রমজীবি পত্র প্রকাশিত হয়। যাঁহারা সত্যই কার্য্য করেন তাঁহারা এইরূপ সামান্য ভাবেই আরম্ভ করেন। শ্রমজীবি ও নিম্নশ্রেণীর লোকের উন্নতির জন্য দেশে যখনই যেখানে কোন আন্দোলন হইয়াছে শশিপদ বাবু অমনি তাহাতে সাধ্য মত সাহায্য

করিয়াছেন। আজকাল বোম্বাই নগরে এ বিষয়ে বেশ কাজ হইতেছে, শশিপদ বাবু যখন বোম্বাই এর উদ্যমের কথা শুনিলেন তখনই সাধ্য মত অর্থ পাঠাইয়া দিলেন। সেই টাকার সুদে প্রতি বৎসর দুইটি করিয়া পারিতোষিক এখনও দেওয়া হইতেছে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যা কলিকাতা রিভিউ পত্রে হাই-কোর্টের জজ অনরেবল জাষ্টিস সার্ জন ফিয়ার The Problem of Civilisation in India নামক প্রবন্ধে আমাদের জাতীয় জীবনের যাহা প্রকৃত সমস্যা তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত নৈশ বিদ্যালয়ের দ্বারা সেই সমস্ত সমস্যার কিরূপ মীমাংসা হইতেছে তাহা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শশিপদ বাবুর শিক্ষা, সদুপদেশ ও সংসর্গ প্রভাবে শ্রমজীবিগণ মিতব্যয়িতা ও স্বাবলম্বনের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠে। ইহার ফলে শ্রমজীবিগণের অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। অনেকেই ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা বাড়ী করে—কুমারী কার্পেণ্টার মহোদয়া চতুর্থ বার যখন ভারতবর্ষে আসেন শশিপদ বাবু তখন এই সমস্ত বাড়ী তাঁহাকে প্রদর্শন করান। ইহার পূর্ব্বে শ্রমজীবিগণের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহাও স্মরণ করা উচিত। শনিবার দিন তাহারা সাপ্তাহিক বেতন পাইত। এই বেতনের টাকা আর তাহাদিগকে বাড়ী লইয়া যাইতে হইত না, কলের দ্বারদেশে পাওনাদার ও কলের দারওয়ান দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই পাওনা টাকা সুদ সহ লইয়া যাইত; আবার পরদিন হইতে তাহাদের নিকট হইতেই উচ্চ-হারে টাকা ধার করিয়া চালাইতে হইত। এই অবস্থা চাবাগানে ও কলে এখনও আছে। এই অবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া তাহারা সঞ্চয়শীল সংগৃহস্থ হইল—একজন লোক কেবল প্রাণপাত করিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এইরূপ হিত সাধিত হইয়াছে। সে আজ প্রায়

৫০ বৎসরের কথা তাহার পর দেশে স্বদেশ সেবার ভাব ও আত্মোৎসর্গের আদর্শ আরও উজ্জ্বল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই জন্য দেশের যুবক সম্প্রদায়ের সম্মুখে এই মহাপুরুষের কার্য্যাবলী উপস্থাপিত করিতেছি —এই আলোকে তাঁহারা কর্ত্তব্যপথ আশ্রয় করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করুন, সরলচিত্তে কার্য্য আরম্ভ করিলে সফলতা সুনিশ্চিত। বাধা বিঘ্নের মধ্যেও শশিপদ বাবু অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সহানুভূতি পাইয়াছেন ও সফলকাম হইয়াছেন। সত্যের জয় এইরূপেই হয়।

শ্রমজীবি সমিতির ও সাধারণভাবে নিম্নশ্রেণীর উন্নতি কল্পে শশিপদ বাবু প্রাণপাত করিয়া যে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিশ্রমের ফলে যে কার্য্য হইয়াছে তাহা বর্ণিত হইল, আর একটি ঘটনার বিশেষ-রূপে বর্ণনা প্রয়োজন। দল বাঁধিয়া অবসর সময়ে ভ্রমণ (Pleasure Excursion) একটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে পূর্ব্বে ছিল বলিয়া মনে হয় না এবং আরও মনে হয় যে পূর্ব্বে সমাজের এবং দেশের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে ইহার তেমন প্রয়োজনও ছিল না। নগরে কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে আমাদিগকে জীবিকার্জ্জনের জন্য সর্ব্বদাই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, আমাদের চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলি এই তীব্র সংঘর্ষের মধ্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। নগরের বাহিরে নির্জ্জন বনপ্রদেশে ফুল্ল ফুলময়, বিহগ কণ্ঠ মুখরিত ছায়াময় বনস্থলীতে মানুষ মানুষের সঙ্গে যেমন প্রাণের সঙ্গে মিশিতে পারে—প্রকৃতির সহিত ও মানবমণ্ডলীর সহিত যতটা নৈকট্য অনুভব করা যায়, নগরের সংঘর্ষের মধ্যে ততটা হয় না। এই জন্য দুইটি বিষয় প্রয়োজন, ব্যক্তিগত জীবনের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য সময়ে সময়ে নির্জ্জন বাস, প্রকৃতির সহিত যোগস্থাপন আর দলবদ্ধ হইয়া আনন্দ ভ্রমণ। শ্রমজীবিগণের উন্নতি সাধন ব্রতে ব্রতী শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু শ্রমজীবিগণকে লইয়া

এইরূপ ভ্রমণে বাহির হইতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ এই প্রকারের একটি ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণনা করেন

"WORKING MEN'S CLUB—The fourth anniversary of the Barahanagar Working Men's Club was celebrated with some *eclat* on Sunday, the 7th instant. The party assembled early in the morning in the house of their President, Babu Sasipada Banerjee, to sing some Bengalee songs, which were composed for the occasion, after which they went in solemn procession to the river side, with flags in front and rear, where some green boats, decorated with flowers and flags awaited their arrival to take them to Barrackpore Park. The Club are very much obliged to Captain Samuells, the Cantonment Magistrate of Barrackpore, for the arrangements he kindly made there for the reception of the party ; the Park Serjeant, the police,and the teachers of the Government school, all awaited the arrival of the Working Men's Club. After landing, the party walked over the Strand Road to the park, nature and art combining to give a pleasant aspect to the scenery. They then visited the Government school building, where the head master kindly received them. There they had a dinner of *loochees, curries, shondes, &c.*, of which they partook with the greatest delight. The working men sat in long rows headed by Babu Sasipada Banerjee, a scene very interesting to notice. After two songs in loud chorus, which attracted a good number of visitors around, the party went in procession to see the animals, birds &c., the

flags, with the English and Bengalee inscriptions above them, explaining to the other visitors of the park of what the party consisted. The party was taken by the Sergeant of the park to the monument of Lady Canning which all the men saw with deep reverence, Babu Sasipada Banerjee telling them in few words what good the country derived from the rule of Lord Canning promising them a more detailed account at the ordinary meeting of their club. Thence they visited the Government House and the adjoining garden, a privilege which they will never forget. Evening approching, the party sat under a tree and on the grass to hold their anniversary meeting, the good serjeant kindly lending them a light which was hung on the trunk of a tree. The proceedings commenced with singing a thanksgiving song to the Queen, expressing their gratitude for her rule over this country, and for the education which Her Majesty's Government is imparting to the people of this country. The following resolutions, with suitable remarks, were adopted with loud acclamations :—

"'*1st.*—That this meeting deeply regrets to see the spread of the vice of intemperauce among the working men of Barahanagar, and earnestly hopes that friends would help them in carrying out the arduous work which they have undertaken, to improve and elevate the social and moral condition of their co-labourers'

"'*2nd:*—That this meeting expresses their deepest obligations to the Barahanagar Jute Company for the support which they are giving to upwards of six thousand people, and for the good they are generally doing to the town of Barahanagar.'

"'3rd.—That this meeting tenders their best and sincerest thanks to the Bengal Government, for the system of primary education which it has introduced for the masses of this country, and to the friends supporters and well-wishers of mass education in this country, and in England, for the interest they have shown for the true welfare of this great country.'

The proceedings ended with two more songs, and the party came back to Barahanagar at ten o'clock at night."

In inserting the above acount of the annivarsary of the Barahanagar Working Men's Club, the *India Daily News*, in an editorial paragraph, says :—

"We always sympathize with and encourage real work for the elevation of the masses of this country ; and therefore feel it a pleasure to record our satisfaction at the attempts made at Barahanagar, by Babu Sasipada Banerjee for the education and moral elevation of the working people of that manufacturing town. On sunday Barahanagar witnessed a scene such as has not before been seen in any part of the country. The members of the working Men's Club, a society which has been in existence there for the last four years, celebrated their anniversary with earnestness and enthusiasm. The Party, headed by Babu Sasipada Banerjee, undertook an incursion to the Barackpore Park by green boats, decorated with flowers and flags. A solem procession of fifty earnest working men, bent upon self improvement is an insignificant affair at home, but in a country like India, where the masses have been systematically kept

down by the oppression of the zamindars, and the wickedness of the Brahmin priests, it requires considerable strength of mind for any one to indentify himself with the workingmen, for it is an undeniable fact that no one can do real and permanent good to them who does not identify himself with them."

ইহার অর্থ এই।

গত ৭ই তারিখে রবিবারে বরাহনগর শ্রমজীবি সমিতির ৪র্থ বার্ষিক উৎসব বেশ সমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে। সভাগণ দলবদ্ধ হইয়া প্রাতঃকালে সভাপতি শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে সম্মিলিত হইল। এই উপলক্ষে অনেকগুলি সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল সেই গানগুলি গাওয়া হইল। গান গাওয়ার পর তাহারা পতাকা লইয়া সৌম্যভাবে দলবদ্ধ হইয়া নদীতীরে গমন করিল, নদীতে পুষ্প পতাকা শোভিত অনেকগুলি ভাউলে নৌকা পূর্ব্ব হইতে তাহাদিগকে বারাকপুর পার্কে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বারাকপুরের ক্যান্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন সামুয়েল, মহোদয় এই দলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দয়া করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাগানের সৈনিক বিভাগের রক্ষকগণ, সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শ্রমজীবি সমিতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নৌকা হইতে নামিয়া সমিতির সভ্যগণ নদীরতীরের পথ ধরিয়া বাগানে গেলেন—প্রকৃতির ও শিল্পের শোভা মিলিত হইয়া স্থানটিকে অতি সুন্দর করিয়াছে। সভ্যগণ তথা হইতে সরকারী বিদ্যালয়ে গেলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। লুচি, তরকারী, সন্দেশ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল, এই খানে তাঁহারা আনন্দের সহিত আহার কার্য্য সমাধা করিলেন। শ্রমজীবিগণ সারি বাঁধিয়া বসিল, শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু সকলের অগ্রে বসিলেন সে বড় সুন্দর দৃশ্য! জোরে সমস্বরে দুইটি গান হইল; গান শুনিয়া চারিদিক হইতে অনেক লোক আসিয়া পড়িল—তাহারা দলবদ্ধ হইয়া পাখী জন্তু প্রভৃতি দেখিবার জন্য সকলে বাহির হইল, পতাকায় ইংরাজী

ও বাঙ্গালা অক্ষরে পতাকাবাহীদিগের পরিচয় লেখা ছিল, বাগানের সার্জ্জন সাহেব সকলকে লেডি ক্যানিং মহোদয়ায় স্মৃতিস্তম্ভ সমীপে লইয়া গেলেন, সকলে গভীর সম্ভ্রমের সহিত তাহা দর্শন করিলেন। শশিপদ বাবু সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন লর্ড ক্যানিং এর সুশাসনে ভারতের কত উপকার হইয়াছে এবং বলিলেন যে সভার অন্য অধিবেশনে এ বিষয়ে তাঁহাদের বিস্তৃত ভাবে বলা হইবে। সেখান হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস ও তৎসংলগ্ন বাগান পরিদর্শন করা হইল, সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল তখন এক বৃক্ষতলে তৃণের উপর সমিতির বার্ষিক সভার অধিবেশন হইল, বাগানের সার্জ্জণ্ট সাহেব তাঁহাদের একটি আলো দিলেন, আলোটি গাছের শাখায় টাঙ্গান হইল সভার প্রথমে ভারতেশ্বরীকে ধন্যবাদ দিয়া একটি গান করা হইল, তাঁহার শাসনে দেশের হিতসাধিত হইতেছে ও তাঁহার শাসনে দেশে যে শিক্ষা বিস্তার হইতেছে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল, সকলের বিশেষ আনন্দের সহিত নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি গৃহীত হইল—

১। বরাহনগরে শ্রমজীবিগণের মধ্যে সুরাপান বাড়িতেছে তজ্জন্য সমিতি বড়ই দুঃখিত—সভা বিশেষভাবে আশা করেন তাঁহারা তাঁহাদের সহযোগী ভ্রাতৃগণের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধনরূপ যে দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সফল করিবার জন্য বন্ধুগণ তাঁহাদের সাহায্য করিবেন।

২। বরাহনগর জুট্ কোম্পানি ছয় হাজারের অধিক লোককে আশ্রয় ও জীবিকা দান করিয়া তাহাদের ও সাধারণ ভাবে বরাহনগর সহরের যে হিত সাধন করিতেছেন, সভা তজ্জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

৩। বাঙ্গালা রাজসরকার দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিয়া দেশের যে কল্যাণ করিতেছেন

তজ্জন্য সভা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। দেশের ও ইংলণ্ডের যে সমস্ত বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীগণ সাধারণ লোকের শিক্ষাকার্য্যে সহানুভূতি সম্পন্ন এই সভা তাঁহাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

সর্ব্বশেষে আর ও দুটি গান হইলে সভা শেষ হইল—দশটার সময় তাহারা আবার বরাহনগরে ফিরিয়া আসিল।

এই ঘটনাটি একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহার প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। দেশে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা হইতেছে। যাঁহারা কলেজে পড়িয়াছেন তাঁহারা মিলিয়া সভা সমিতি করিয়া কাজ করিতেছেন, তাঁহারা জানেন যথন ইংরাজী পড়িয়াছি তথন এইরূপ করিতে হয়। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক লইয়াই দেশ নহে, দেশের অশিক্ষিত বিপুল জন সাধারণকে এইরূপে একতাবদ্ধ হইয়া নিজেদের ও দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করা শিক্ষা দিতে আমরা কি করিয়াছি, ইহাই প্রশ্ন। ইহার উত্তর এই যে শশিপদ বাবু একেলা নিজের চেষ্টায় যাহা করিয়াছেন এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আর কোথাও তাহা হয় নাই। যাঁহারা বৃদ্ধ, নিজের মত অনুসারে যাঁহারা কাজ করিতেছেন তাঁহারা কোনও নূতন কাজের মর্ম্ম বুঝিবেন না, আর বুঝিলে ও তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থ খানিতে যে এই সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হইতেছে তাহা দেশের যুবক সম্প্রদায়ের জন্য, তাঁহারাই দেশের ভবিষ্যত, তাঁহারা যদি এই সমস্ত কার্য্যের মর্ম্মাবধারণ করিয়া নিজেদের জীবনে এই কর্ম্মবীরের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন তাহা হইলেই দেশের সকল সমস্যার মীমাংসা হইবে।

দরিদ্র ও অশিক্ষিত শ্রমজীবিগণ, দেশে তাহাদের সংখ্যা বড় কম

নহে, নূতন ভাবে শিল্পোন্নতি দেশে যতই বাড়িতে থাকিবে এই সম্প্রদায়ও ততই বাড়িয়া উঠিবে, এই সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়া, আমাদের দেশে যে নূতন আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিয়াছে সেইভাব ও আকাঙ্খার দ্বারাই তাহাদের অনুপ্রাণিত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে তাহাদের কার্য্য নিযুক্ত করা যে একান্ত প্রয়োজন এবং এই কার্য্যের যে একটি খুব বড় ভবিষ্যত আছে তাহা আমাদের দেশের সকল লোকে বুঝিতে পারুন বা না পারুন, বরাহনগর শ্রমজীবি সমিতির এই ভ্রমণ ও সভা করার কথা বিলাতে স্বয়ং ভারতেশ্বরীর কর্ণে উপস্থিত হইয়াছিল।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে বিলাতে "শ্রমজীবি সমিতি" (Working man's union) র সভাপতি শ্রীযুক্ত হড্‌সন্ প্র্যাট, শশিপদ বাবুকে একপত্র লিখিয়া জানান যে "The friends or the working men's movement in England thought the account of the Excursion so very important that they laid it before Her Majesty the Empress." অর্থাৎ বিলাতের শ্রমজীবি আন্দোলনের বন্ধুগণ এই ভ্রমণ এত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন যে এই সংবাদ ভারতেশ্বরীর নিকটও প্রদান করিয়াছেন।

এই হড্‌সন্ প্রাট্, ভারতবর্ষের সিভিল সার্ব্বিসে বহুকাল ছিলেন, তাহার পর দেশে যাইয়া এই কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রকৃত যাহা সৎকার্য্য তাহার মূল্য সঙ্গে সঙ্গে অবধারিত না হইলেও কালে ও উপযুক্ত লোকের নিকট যে তাহার আদর হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ন্যাশান্যাল ইণ্ডিয়ান্ এসোনিয়েসনের মুখ পত্রে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই ঘটনা সম্বন্ধে এক অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রে শশিপদ বাবু বিলাতে আসিয়া ভারতের জন্য বিলাতের মত কারখানা আইন (Factory Act) করিবার জন্য যে প্রস্তাব

করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া শ্রমজীবি মণ্ডলীতে তাহার কার্য্যা-বলীর অশেষ প্রশংসা করেন ও ইণ্ডিয়ান্ ডেলিনিউজ্ পত্র হইতে পূর্ব্বের অংশ মুদ্রিত করেন।

অবশ্য শশিপদ বাবুর জীবনের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে দেশে বা বিদেশে তাঁহার কর্ম্মের এই প্রশংসা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। তাঁহার জীবনের যাহা মূলকেন্দ্র সেই আনন্দময় পরমদেব, তিনি তাঁহারই চরণ সেবার প্রতি চাহিয়া এই সমস্ত কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি

"তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনি সন্তুষ্টঃ যেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ।"

নিম্ন শ্রেণীর লোক ও শ্রমজীবিগণের জন্য শশিপদ বাবু কার্য্য করিতে গিয়া অনেক বিপদে পড়িয়াছেন—একবার দারোগার মোক-দ্দমায় কিরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন ও কিরূপ নির্ভীক ভাবে সত্যের ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে—আর একটি বিপদের কথা বলিতেছি। প্রথমোক্ত ঘটনার সহিত এই ঘটনাটির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অধিক কি প্রথম ঘটনাটির দ্বারা যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছিল এই ঘটনাটি সেই মনোমালিন্য হইতেই উদ্ভূত হয় সুতরাং এই বিপদও শ্রমজীবিগণের উন্নতি সাধন চেষ্টারই একটি আনুষঙ্গিক।

এবার শশিপদ বাবুকে বিশেষরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল—মানহানির মোকদ্দমায় পড়িয়া প্রথমে কারাদণ্ডের আদেশ হয় তাহার পর আপিলে এই কারাদণ্ডের আদেশ রহিত হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতেও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তৎকালীন নৈতিক অবস্থা বেশ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। পুলিশের দারগার মোকর্দ্দমার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই মোকর্দ্দমায় শিক্ষিত

সম্প্রদায় কিরূপ অসত্যের ও দুর্নীতির পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে দুর্নীতির জয় হউক বা না হউক অন্ততঃ পক্ষে দুর্নীতির দণ্ড হয় নাই তাহাও দেখান হইয়াছে। এই ঘটনায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের আরও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাইবে।

'বরাহনগর সমাচার' নামক শশিপদ বাবুর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ছিল—শশিপদ বাবু তখন ডাকবিভাগে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ছিলেন ও বর্দ্ধমানে থাকিতেন। কাগজের ভার তাঁহার ভ্রাতা প্রভৃতির উপর ছিল। স্বর্গীয় কালাচাঁদ উকীল এই পত্রের সম্পাদকের কার্য্য করিতেন।

এই সময়ে বরাহনগরের একজন ভদ্রলোক স্থানীয় সাব্‌রেজিষ্ট্রারের পদ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ভদ্রলোকটির নৈতিক চরিত্র যে অত্যন্ত খারাপ তাহা সকলেই জানিত। 'বরাহনগর সমাচার' এ দেশের নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রায়ই তীব্র আলোচনা বাহির হইত। সুরাপায়ী ও ব্যাভিচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে নিয়মিত ভাবে তীব্র কশাঘাত করা হইত। এই কারণে একদল লোক এই পত্রের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিল। যাহা হউক এই সময়ে 'সমাচার' পত্রে এই সব্‌রেজিষ্ট্রার পদপ্রার্থী ভদ্রলোকটির বিরুদ্ধে একটু আলোচনা হয়। আলোচনা একটু তীব্র হইয়াছিল। এই ভদ্রলোকটি যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সেই সময়ে চৌর্য্যাপরাধে পড়িয়াছিলেন সেই পুরাতন কথা লিখিত লয়। এই লেখাটুকু শশিপদ বাবুর অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়াছিল। যাহা হউক পরবর্ত্তী সংখ্যায় এই লেখার জন্য ক্রটি স্বীকার ও মার্জ্জনাভিক্ষা করা হয়। এইবার সেই ভদ্রলোকটি মানহানির জন্য ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করিলেন।

'বরাহনগর সমাচার' এ অনেক সত্য কথার যথার্থ সমালোচনা হইত—যাহা হউক এই মোকদ্দমা একজন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ ডেপুটি

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হইয়াছিল বিচারে কাগজের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর ৩ মাস জেল ও ৫০০৲ টাকা জরিমানা ও সম্পাদকের ৩ মাস জেল ও ১৫০৲ টাকা জরিমানার আদেশ হয়। পরলোক গত ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ মহাশয় এই মোকদ্দমায় শশিপদ বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কাছারী বসিবার অব্যবহিত পরেই কারাদণ্ডের আদেশ হইল। সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সমস্ত আসামী জেলে যাইবে তাহাদের সমস্ত দিন কাছারীতে রাখিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে একত্রে জেলে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু যে কারণেই হউক সেদিন ব্যাপার অন্যরূপ হইল শশিপদ বাবুর কারাদণ্ডের আদেশ হইবা মাত্র তাঁহাকে ও তাঁহার সম্পাদককে কারাগারে লইয়া গেল। শশিপদ বাবু প্রসন্ন মুখে কারাগারে গেলেন, সেখানে যাইয়া কয়েদী দিগকে আলিঙ্গন করিলেন—ভাবিলেন ভগবানের যদি অভিপ্রায়ই হয় তাহা হইলে প্রসন্ন চিত্তে এই স্থানেই কিছুদিন বাস করিতে হইবে। কারাদণ্ডের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলও তাঁহাকে সস্‌পেণ্ড করিলেন।

এ দিকে হাইকোর্টে সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ আসিল। স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ, স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষ ও স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস এই তিনজনে হাইকোর্টের জজ ও শশিপদ বাবুর বিশেষ বন্ধু জাষ্টিস্ সার্ জন ফিয়ার্ মহোদয়ের সহিত পরামর্শ করিলেন। আপিল করিতে হইবে ও জামিনের জন্য প্রর্থনা করিতে হইবে। তাঁহারা রায়ের নকল চাহিলেন। রায় দীর্ঘ হইবে বলিয়া তখনও লিখিত হয় নাই। তাঁহারা 'ফাইণ্ডিং' গুলির নকল লইলেন। তখন জজ সাহেবের কাছারী শেষ হইয়া গিয়াছে ও জজ সাহেব বাসায় চলিয়া গিয়াছেন। দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সহিত জজ সাহেবের বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি 'ফাইণ্ডিং' গুলি লইয়া জজ সাহেবের বাসায় গেলেন ও জামিন মঞ্জুর করাইয়া আনিলেন।

শশিপদবাবুর কারাদণ্ডের আদেশ শ্রবণমাত্রেই বরাহনগরের তাঁহার বিরোধী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর আনন্দের সীমা নাই। শশিপদবাবুর উপর তাঁহাদের এই যে বিদ্বেষ ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। দারোগার মোকদ্দমার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই মোকদ্দমায় এই সমস্ত লোক দারোগার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। শশিপদবাবু শ্রমজীবিগণের লোক, আর তাঁহারা দারোগার লোক। এই বিরোধের আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। আমাদের দেশের সহিত যাঁহার অনুমাত্রও পরিচয় আছে তিনি অবশ্যই এই কারণটি স্বীকার করিবেন। খুব অল্পসংখ্যক ছাড়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই অত্যন্ত স্বার্থপর। দেশের যাঁহারা প্রাচীন লোক, অথবা যাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক তাহারা পরের জন্য বা দেশের জন্য যতটুকু অনুভব করে শিক্ষিত সম্প্রদায় ততখানি করে না। অথচ শিক্ষিত সম্প্রদায় দেখাইতে চায় তাহারা দেশের ভারি ভক্ত। এই যে তাঁহাদের দেশের প্রতি ভক্তি ইহা অধিকাংশ স্থলেই আর কিছুই নহে, মান সম্ভ্রম লাভ করিবার উপায়। শশিপদবাবু বরাহনগরের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের হিতের জন্য প্রাণপাত করিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন, তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও সাধারণ লোকেরা তাঁহার কৃত এই কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিতেন। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে অংশের কথা হইতেছে ইহারা জানেন লোকে দেশহিতৈষণা করে নিজের মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির জন্য। এই কারণে তাঁহারা শশিপদ বাবুকে যে বিদ্বেষের চক্ষুতে দেখিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

শশিপদবাবুর কারাদণ্ডের আদেশ হইবামাত্রে তাঁহারা দল বাঁধিয়া কালীঘাট গেলেন ও কালীর পূজা দিয়া মহা সমারোহে বরাহনগরে ফিরিয়া আসিলেন ও চীৎকার করিয়া সহরময় মহা উল্লাসে বলিয়া

বেড়াইলেন "শশিকে জেলে দিয়ে এলাম।" তাঁহাদের বরাহনগর আসিবার অব্যবহিত পরেই জামিনে খালাস পাইয়া শশিপদবাবুও বরাহনগর ফিরিলেন—সাধারণ লোকেরা শশিপদবাবুর এই কারা-দণ্ডের সংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিল—শশিপদবাবুকে দেখিয়া তাহারা আনন্দিত হইল।

তাহার পর ২০শে ফেব্রুয়ারী আপিল হইল। আপিলে স্বর্গীয় মনোমোহনবাবু ও স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস শশিপদবাবুর পক্ষে ছিলেন। আপিলে কারাদণ্ড উভয়েরই রহিত হইল। শশিপদবাবুর ১৫০্ টাকা ও সম্পাদকের ৫০্ টাকা জরিমানা হইল। হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় সার জন্ ফিয়ার মহোদয় শশিপদবাবুর জরি-মানার টাকা নিজে হইতে প্রদান করিলেন। এই প্রসঙ্গে মাননীয় সার, জন্ ফিয়ার মহোদয় শশিপদবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

MY DEAR BABU SASIPADA,

I was much grieved and distressed to learn, as I did within an hour of the event, the result of your case at Alipur Mr. Davie's proceedings and the sentence passed by him show how little of true judicial discretion is possessed by some of our most experienced Mofussil Magistrates. The measure of punishment meted out is most extravagant ! you may rely upon it, I think that the imprisonment portion will be entirely set aside by the appeal court and very probably the fine will be reduced to an almost nominal sum. Of course there was the defamation, and conviction was inevitable ; it follows that some punishment must be awarded' and I do not think that you could reasonably expect that

this should be absolutely nominal. But regard being had to your frank avowal of the fault and to your publi shed apology it ought to have been made as nearly so as possible and I shall be greatly surprised if the judge does not take this view. Whatever the fine may be I shall gladly enable you to meet it without embarassment to yourelf, because I think you have behaved honourably and with very proper principle in this unfortunate matter.

ইহার অর্থ এই, বিচার হইয়া যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি আপনার আলিপুরের মোকদ্দমার ফল শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হইলাম। শ্রীযুক্ত ডেবিজ্ সাহেবের রায় ও আপনাকে যে শাস্তি দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে আমাদের মফঃস্বলের অভিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট্দিগের মধ্যে কাহারও কাহারও বিচারনৈপুণ্য কত কম। যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা খুবই বেশী। আপনি একথায় নির্ভর করিতে পারেন যে আপিলে কারাদণ্ড একেবারে রহিত হইবে ও খুব সম্ভবতঃ জরিমানা কমিয়া অতি সামান্যে দাঁড়াইবে। অবশ্য মানহানি হইয়াছে এবং শাস্তি অবশ্যম্ভাবী—কিছু শাস্তি দিতেই হইবে এবং এই শাস্তি যে একেবারে নামমাত্রই হইবে তাহাও নহে। তবে আপনি সরল-ভাবে অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন, কাগজে ক্ষমা-প্রার্থনা প্রকাশ করিয়া-ছেন—সুতরাং শাস্তি যতদূর নামমাত্র হইতে পারে ততদূরই হওয়া উচিত ছিল। আপিলে বিচারক মহাশয় যদি এইভাবে ব্যাপারটি না দেখেন তাহা হইলে আমি বড়ই বিস্মিত হইব। যাহাই জরিমানা হউক না কেন আমি আপনাকে তাহা দিব, আপনি বেশ ভদ্রলোকের

ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারটি যদিও খুবই দুঃখের, তথাপি আপনি ঠিক নীতিরক্ষা করিয়াই কার্য্য করিয়াছেন।

এই প্রকারে শশিপদবাবু তাঁহার কর্ম্মজীবনে যে কতদিক হইতে কত প্রকারের দুঃখ কষ্ট ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি ভগবানের দিকে চাহিয়া এ সমস্ত দুঃখ কষ্টকে গ্রাহ্য করেন নাই—আবার সহায়ও আসিয়াছে। ইহাই কর্ম্মের পথ; তাহা কুসুমাবৃত নহে—সৎকার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইতে চাহেন তাঁহাদের প্রথম হইতেই জানিয়া রাখিতে হইবে "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

সাধনা ও সিদ্ধি।

(শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট্)

সাধারণের জন্য স্থায়ীরূপে কোনও সৎকার্য্য সাধন করা আমাদের দেশে যে কত কঠিন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আবার পল্লীগ্রামে এরূপ কার্য্য আরও কঠিন। সরকারী কর্ম্মচারীগণকে মুখপাত্র করিয়া কার্য্য করিলে একরূপে ব্যয়সাধ্য কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া যায়, অন্ততঃ পক্ষে অর্থের অভাব হয় না। বড় বড় লোকদিগকে অগ্রে একত্র করিয়া তাঁহাদের নাম বা পত্র লইয়া চেষ্টা করিলেও কিছু ফল হইতে পারে। কিন্তু এই উভয় প্রকারের অনুষ্ঠান যতই সৎ বা মহৎ হউক তদ্দারা প্রকৃত কার্য্য কতটুকু হয়, জাতীয় জীবনে যথার্থরূপে কতখানি বলাধান হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

দেশবাসীগণের হৃদয়ের মধ্যে একটি অনুরাগের ভাব স্থায়ীভাবে জাগ্রত করিয়া, সেই অনুরাগের উপর যদি একটি সামান্য সৎকার্য্যের ও বীজ বপন করা যায় তাহা হইলে তাহার একটি বড় ভবিষ্যত আছে। শশিপদ বাবু জীবনে যখন যে কার্য্য করিয়াছেন এই পদ্ধতি অবলম্বনে করিয়াছেন। খাতিরে পড়িয়া বা চতুর লোকের বুদ্ধি কৌশলে পরাজিত হইয়া ধনবান ব্যক্তি একলক্ষ টাকা দান করিলেন, সেই অর্থে এক ধুমধাম করিয়া মস্ত কাজ আরম্ভ হইল, আর একজন গরীব অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়া হৃদয়ের অনুরাগ মাখাইয়া একটি টাকা দিয়া কোন সৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন, সত্যের চক্ষুতে এই দ্বিতীয় কার্য্যটিই কি অধিক সারবান্ নহে? আজ আমাদের দেশে অনেক সৎকার্য্য হইতেছে, নানাস্থানে নানাঅনুষ্ঠান, এই সমস্ত কার্য্যে এই কথাটি সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।
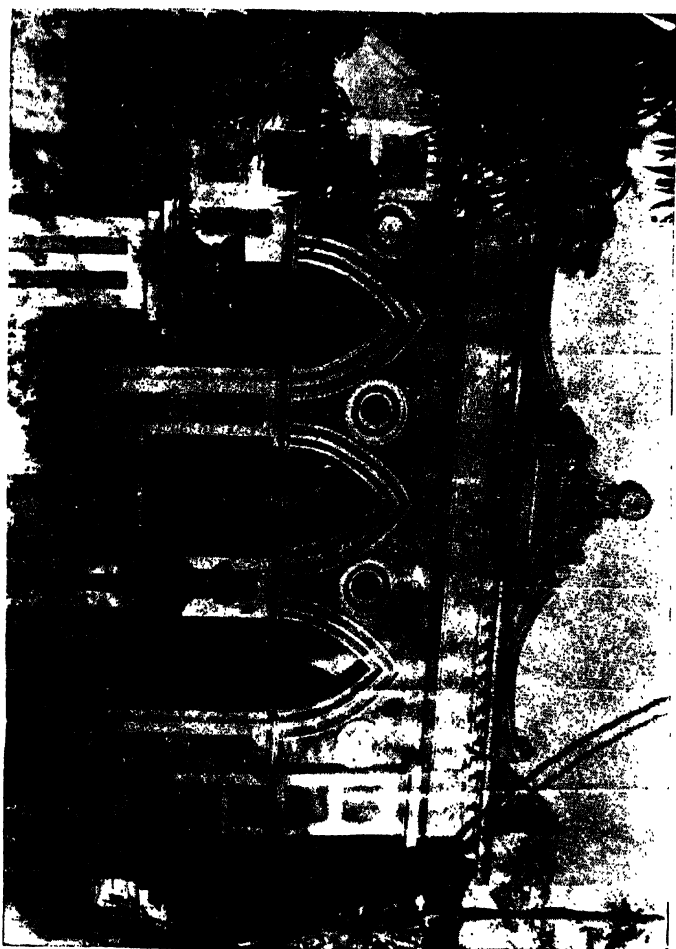
শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ ভবন।

বরাহনগর শশিপদ ইনষ্টিটিউটের নাম দেশে প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন। এ প্রকারের অনুষ্ঠান আমাদের দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতার বাহিরে আর নাই। এই গৃহ নির্ম্মাণের একটি প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে। আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে এই ইতিহাস আলোচনা করিতেছি। আমাদের দেশের অবস্থা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইলেও খুব বেশী যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নহে, এই ইনষ্টিটিউটের ইতিহাস পড়িলে আমরা দেখিতে পাইব, দেশের কল্যাণের জন্য সত্য সত্যই কোন স্থায়ী কার্য্য আরম্ভ করিতে গেলে কত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, কত ধৈর্য্য ও আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। কাজ সফল হয়, মনে যদি বিশ্বাস থাকে, হৃদয়ে যদি বল থাকে আর ধীরভাবে যদি একপ্রাণে ও একমনে লাগিয়া থাকিতে পারা যায় তাহা হইলে এই মঙ্গলময়ের রাজ্যে আমাদের সাধু চেষ্টা কখনই নিষ্ফল হয় না, ইনষ্টিটিউটের এই ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা এই তত্ত্বটুকু বুঝিতে পারিব এবং এই গ্রন্থে যে মহাপুরুষের আদর্শ জীবনের কথা আলোচিত হইতেছে, তাঁহার চরিত্রগত অনেকগুলি বিশেষত্বেরও আমরা পরিচয় পাইব।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবু তাঁহার বাস ভবনের পুরোদেশে এই গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় প্রধানতঃ শশিপদ বাবু স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন, কিছু অর্থ চাঁদা স্বরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এদেশে নহে, বিলাতে, শশিপদ বাবুর বন্ধুগণের মধ্য হইতে। এইস্থানে একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শশিপদ বাবু জীবনে এত সৎকার্য্য করিয়াছেন কিন্তু অর্থ সাহায্যের জন্য তিনি কখনও দেশের কোন ধনী ব্যক্তির দ্বারস্থ হয়েন নাই। ইহাও তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। এটুকুও আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনি যখন এই ইনষ্টিটিউট করেন সেই সময়ে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে

কোন বিশিষ্ট ধনীলোকের নাম করিয়া বলেন যে আপনার টাকার প্রয়োজন, আপনি উহাদের নিকট যান না, সকলেই সেখান হইতে টাকা লইয়া যাইতেছে, আপনি যাইলে অবশ্যই কিছু পাইবেন। বন্ধুর কথার উত্তরে শশিপদ বাবু অসম্মতি প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন "যেখানে বেড়ালের বিবাহে টাকা ব্যয় হয় সেখান হইতে টাকা আনার প্রয়োজন নাই।"

এই ইন্‌ষ্টিটিউট্ গৃহ বরাহনগরের সাধারণ কর্ত্তৃক কল্পিত যাবতীয় সদনুষ্ঠানের আলোচনা স্থান ও কার্য্যক্ষেত্র। বরাহনগরের উন্নতির ইতিহাসে এই গৃহখানি যে প্রধান উপকরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। শশিপদ বাবুর নিজের বৃহৎ পুস্তকাগার ছিল, তিনি দেশবাসী-গণের ব্যবহারের জন্য এই পুস্তকাগার ও তাঁহার নিজের প্রদর্শনী (Meseum) এই ইনিষ্টিটিউটে দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এই সভার কার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে চলে তজ্জন্য তিনি ধনভাণ্ডার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাধারণ বক্তৃতা প্রভৃতি যাবতীয় সদনুষ্ঠানের এই ইন্‌ষ্টিটিউট্ই বরাহনগরে একমাত্র আশ্রয়ভূমি।

এই ইনষ্টিটিউটের অর্পণপত্রে যে সর্ত্ত লিখিত আছে, তাহা দেবালয়ের অর্পণ পত্রের সর্ত্ত সমূহের অনুরূপ। শশিপদ বাবুর জীবনের সমুদয় কার্য্য প্রথম হইতেই সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির ঊর্দ্ধে, বিশ্বমানবের উদার মিলন ভূমির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলীর ইহাই প্রকৃত শিক্ষা ও বিশেষত্ব।

এই ইন্‌ষ্টিটিউটের ইতিহাস অতীব প্রয়োজনীয়, কি ভাবের প্রেরণায় চালিত হইয়া কিরূপ অসুবিধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া শশিপদ বাবু এই গৃহখানি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলে আমাদেরও অনেক শিক্ষা হইবে। মানব সমাজের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠান সমূহের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

শশিপদ বাবুর প্রথম কার্য্য স্ত্রীশিক্ষা, তাহার পর সুরাপান নিবারণ। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে মার্চ্চ তারিখে বরাহনগরে সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরাপান নিবারণী সভার কার্য্য বেশ চলিতে লাগিল, কিন্তু সভা ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য একখানি নির্দ্দিষ্ট গৃহ না থাকায় বড়ই অসুবিধা হইত। বরাহনগরে একটি পাঠশালা ছিল, তাহার অতি সামান্য ঘর; পাঠশালার গুরু মহাশয় তিনকড়ি সরকার দয়া করিয়া এই ঘর খানি ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, সেই ঘরে সুরাপান নিবারণী সভার কার্য্য কোন প্রকারে পরিচালিত হইত। শশিপদ বাবু একখানি উপযুক্ত ঘরের অভাব বড়ই তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছিলেন। প্রসিদ্ধ লোকহিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টার মহোদয়া ইংরাজী ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে দ্বিতীয়বার বরাহনগর যান ও তথায় প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এই সময়ে বরাহনগরে "সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভা" প্রতিষ্টিত হয়। পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতার দিনে একটি বিশেষ অসুবিধার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। শশিপদ বাবু কুমারী কার্পেণ্টার মহোদয়াকে বরাহনগর আসিয়া বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন, তিনি অতীব আনন্দের সহিত এই অনুরোধে সম্মতি প্রদান করিলে পর দিন স্থির হয় ও শশিপদ বাবু ব্যবস্থা করেন যে বরাহনগরে তাঁহার একবন্ধুর বাড়ীর উঠানে এই সভা হইবে। বন্ধু প্রথমে সম্মত হইয়াছিলেন। যে দিন সভা হইবে ঠিক তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সেই বন্ধু আসিয়া শশিপদ বাবুকে খবর দিলেন যে তাঁহার বাড়ীতে সভা হইবে না। শশিপদ বাবু বড়ই বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলেন বরাহনগরে কোনও সাধারণ গৃহ নাই সুতরাং কাল কোথায় বক্তৃতা হয়? কুমারী কার্পেণ্টার মহোদয়া বড় লাট সাহেবের বাড়ীতে ছিলেন, এইরূপ কথা হইয়াছিল যে শশিপদ বাবু

স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া আসিবেন। কিন্তু শশিপদ বাবু তাঁহার কথা রাখিতে পারিলেন না, কারণ সভার জন্য তাঁহাকে নূতন ব্যবস্থা করিতে হইল। তিনি নিজে যাইতে পারিলেন না, কুমারী কার্পেণ্টারকে আনিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা কেদার বাবুকে পত্র লিখিয়া সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া পাঠাইয়া দিলেন ও স্বয়ং সভার স্থান প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। শশিপদ বাবুর উদ্বেগের সীমা ছিল না, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়াই তিনি চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে বাহির হইলেন, পূর্ব্বোক্ত পাঠশালার ঘর খানিই পাওয়া গেল, সেখানে বেঞ্চ বা চেয়ার ছিল না, ছাত্রগণ ছোট ছোট মাদুরের উপর বসিত। সারাদিন এই সভার মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে তাঁহাকে এরূপভাবে পরিশ্রম করিতে হইল যে সে দিন আর তাঁহাব আহার হইল না। বেল তিনটার সময় সমস্ত হইয়া গেলে তিনি সামান্য বিশ্রাম পাইলেন ও সেই সময়ে আহার করিয়া লইলেন। যাহা হউক অপরাহ্ণ কালে কুমারী কার্পেণ্টার মহোদয়া আসিলেন ও সভা হইল। সভার কৃতকার্য্যতা দর্শনে শশিপদ বাবুর আর আনন্দের সীমা নাই। কুমারী কার্পেণ্টার "ভারতে ছয়মাস" (Six Months in India) নামক তৎ প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

"The Meeting did not conclude without passing a resolution proposed by my friend the secretary Babu Sasi Pada Banerji that a Comittee should be formed of English and native gentlemen to consider the formation of a society for the improvement of the working classes This was not a mere formal resolution barren of results. The disinterested zeal of this young man who had already given so much practical proof of his earnestness

and perseverance enlisted the earnest co-operation of some enlightened and benevolent gentlemen; and in the Indian Daily News of July 24. 1867 we find a report of the first half-yearly meeting of the Baranagar Social Improvement Society, Dr. Waldie president in the chair. A Committee was organised, a public library commenced and arrangements made to obtain a room for the proceedings". ইহার অর্থ এই, আমার বন্ধু সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাবটি এই যে দেশীয় ও বিদেশীয় ভদ্রলোক লইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক, এই কমিটি শ্রমজীবিগণের উন্নতি বিধানের জন্য একটি সভাস্থাপনের ভার গ্রহণ করিবেন। এই পরার্থপর যুবক (শশিপদ বাবু) তাঁহার আন্তরিকতা ও অধ্যবসায়ের অনেক প্রমাণ ইতঃপূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে তাঁহার চেষ্টায় অনেক শিক্ষিত ও সদাশয় ভদ্রলোকের সাহায্য পাওয়া গেল এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ পত্রে বরাহনগরে সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভার প্রথম ষান্মাসিক কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় ডাক্তার ওয়াল্‌ডি এই সভার সভাপতি, একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে, একটি সাধারণ পুস্তকাগার আরম্ভ হইয়াছে এবং সভার কার্য্যের জন্য একখানি গৃহ সংগ্রহেরও ব্যবস্থা হইতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে কুমারী কার্পেণ্টার মহোদয়া যৎকালে বরাহনগরে আসেন সেই সময়েই সাধারণের কার্য্যের জন্য একটি গৃহের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। তৎপরে সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পর এই অভাব প্রত্যহই অনুভূত হইতে লাগিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে শশিপদবাবু কুমারী কার্পেণ্টার মহোদয়াকে এক পত্র লেখেন।

সেই পত্রে লিখিত হয় যে একখানি ভাল ঘর ছাড়া আমরা কোনরূপ স্থায়ীকার্য্য করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক শশিপদ বাবুর এই অভিলাষ দীর্ঘকাল অপূর্ণ ছিল না। সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সভার কার্য্যকারী সমিতির অধিবেশনে শশিপদবাবু তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি এই কার্য্যের জন্য অতি সামান্য ২৫০৲ টাকা মাত্র প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সমিতি এই সামান্য অর্থ সংগ্রহের ভারও গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সমিতি বলিলেন যে অর্থ সংগ্রহ অসম্ভব। যাহা হউক শশিপদবাবু নিরাশ হইবার পাত্র নহেন। তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বাসের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে—শশিপদবাবু সমিতির মতের দ্বারা ভগ্নোদ্যম না হইয়া অর্থের জন্য এক প্রার্থনা পত্র ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তৎ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক রূপে বাহির করিলেন। নিবেদন করিলেন যে এই বিদ্যালয়ের জন্য গৃহের প্রয়োজন। অল্পকালের মধ্যে ১৫২ টাকা সংগৃহীত হইল। এইবার সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভার কার্য্যকারী সমিতিকে তিনি জানাই-লেন যে যখন কিছু টাকা সংগৃহীত হইয়াছে তখন গৃহনির্ম্মাণের জন্য এইবার কিছু করা যাইতে পারে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট তারিখে সমিতির নিকট গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব পুনরায় উপস্থাপিত করিলেন—এবারে বলিলেন যে যে বাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয় হইবে সেই বাড়ীতেই সভার কার্য্যও হইতে পারে। এবার সমিতি তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন—কিন্তু কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু হইল না। শশিপদ বাবু অবশ্য কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাব গ্রহণ করাইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি অন্য উপায়ও চিন্তা করিতেছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে তিনি কুমারী কার্পেণ্টার মহোদয়াকে যে পত্র লেখেন তাহা হইতে তিনি অন্য কি উপায় চিন্তা করিতেছিলেন

তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ইংরাজী পত্রখানির এক অংশ এইরূপ

"I made a proposition to Mr. W. Alexander (Son of Dr. Alexander, the Edinburgh divine) of the Broneo Company's Office at Calcutta for opening a school for the working people within the factory and I am glad to inform you that my proposition is about to be carried out. I owe much for the success of my schemes to that kindhearted gentleman. A school house has already been commenced to be built according to the plan which I gave to Mr. Mair the Manager of the mills. The house will be ready in two months' time. How delighted must I be to see a large school for the working class ! The evening school which I have opened for them and which you were pleased to see when you were in this country, will be made over to the factory school. The charge of managing the new amalgamated school will rest on me."

ইহার অর্থ এই এডিন্‌বরার বিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য ডাক্তার আলেকজাণ্ডারের পুত্র শ্রীযুক্ত ডব্লিউ আলেকজাণ্ডার মহাশয় কলিকাতার বর্ণিও কোম্পানীর একজন অংশী। আমি তাঁহার নিকট তাঁহাদের কলবাড়ীর ভিতরে শ্রমজীবিগণের জন্য একটি বিদ্যালয় খুলিতে অনুরোধ করি। সুখের বিষয় আমার প্রস্তাব প্রায়ই কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিয়াছে। আমার এই প্রস্তাবের সফলতা পূর্ব্বোক্ত ভদ্রমহোদয়ের কৃপাতেই সাধিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে—আমি কলের অধ্যক্ষ মেয়ার সাহেবকে যে নক্সা দিয়াছিলাম সেই নক্সা অনুসারেই গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। দুই মাসের মধ্যেই গৃহ-নির্ম্মাণ শেষ হইবে। শ্রমজীবিগণের জন্য একটি বৃহৎ বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মিত হইলে আমি অতীব আনন্দিত হইব। শ্রম-

জীবিগণের জন্য আমি যে সান্ধ্যবিদ্যালয় করিয়াছি, আপনি তাহা দেখিয়া গিয়াছেন—এই বিদ্যালয়ও ঐ কলবাড়ীর ঘরে হইবে। এই দুই বিদ্যালয়েরই পরিচালনাভার আমার হস্তে থাকিবে।"

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে এই বিদ্যালয় কলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মেয়ার সাহেব কর্ত্তৃক যথারীতি উদ্বাটিত হইল—শশিপদবাবু বাঙ্গালা ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। নৈশবিদ্যালয়ও সেই বাড়ীতেই হইতে লাগিল। সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভার অধিবেশনও এই বাড়ীতেই হইতে লাগিল। সকল দিকেই কার্য্যের সুবিধা হইল, শশিপদবাবু ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

এই সুবিধা অধিকদিন থাকিল না, গৃহ উদ্বাটিত হওয়ার ১৩ দিন পরে কলের চিমনি হইতে আগুনের স্ফূলিঙ্গ বাহির হইয়া ঐ ঘরে পতিত হইল (২৭শে জুন ১৮৬৯) ভয়ানক ক্ষতি হইল—নৈশ বিদ্যালয় আবার এক ভাড়ার বাড়িতে নীত হইল—এ বাড়ীতে বিদ্যালয় রাখার সমস্ত ব্যয়ই শশিপদ বাবুকে বহন করিতে হইত। যাহা হউক বোর্ণিও কোম্পানি দয়া করিয়া আবার গৃহ খানি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবারে টিনের ঘর হইল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই হইতে এইঘরে কার্য্য আরম্ভ হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তারিখে সুপ্রসিদ্ধ "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রে এ বিষয়ে এইরূপ লিখিত হয়—

OUR readers may remember that among the recent improvements of the neighbouring town of Barahanagar is a school for native mechanics and working men, the first Institution of the kind in India. The establishment of the giant factories of the Borneo Company at Barahanagar with the thousands of working people they employed, made such a school possible. where else except in a

town could so many people of that kind be got together to suggest or to make such an effort ? But there are, and have been manufacturing towns besides Barahanagar such as Cossipore, Chitpore, Ishrah, Bally, Fort Gloster, even Calcutta, but none of them has ever been disturbed by philanthropic propositions to elevate the working classes engaged in the manufatures. Barahanagar itself, always not only a native manufacturing town, but also the seat of European factories, not only Dutch ones in the last century but English ones in this, never before saw a school for those classes. It was reserved for a very humble native gentleman, himself struggling for bread, to be under God, and the generous assistance of the Borneo Company generally, and of some of its members and servants particularly, the unexpected but efficient instrument for the elevation of the masses of the quarter. So long ago as 1866 Babu Sasipada Banerjee, a progressive Brahmo, who has by his active philanthropy has reduced local bigotry to terms, addressed the working people on the blessings of education, and having succeeded in persuading a small number of them, gave them evening lessons. Babu Sasipada and his brother Kedar Nath were the first teachers. In the course of a year the number of the recipients of instruction increased to 35. At first the school was held in a hired house. But the Borneo Company,the resident members of which always watched these novel proceedings with interest, since built a house for the school which unfortunately was soon after destroyed by fire. The Company again generously built a much more substantial and altogether a

fine house for the school and for other purposes connected with the recreation and improvement of the mechanics and inhabitants. On sunday, the 5 th ultimo, the school was for the first time assembled in its new premises. Mr. Mair, the worthy manager of the Factory formally declared the building open. And really it would have done the heart of every humane man good to behold the gathering. Three hundred workingmen and boys animated by a desire for knowledge were a sight as novel as interesting, and no less important,in its future bearings than novel and interesting. The 35 had in the mean time become nearly hundred, and such a not only orderly but also noiseless set of Bengalis is not to be met with even among the best in the land. On last Sunday Mr. Broadley. the Assistant Magistrate of the Zillah, who by his sympathy with the people has earned more than their golden opinions. their esteem, who with the late Mr, Clarke, Inspector of Schools, Dacca, has been one of the few modern English men, who have truely loved and been loved by the people, visited the school and expressed his enthusiasm at the grave but not painful efforts made by great boys of thirty and forty and the more humble efforts of young boys to master the alphäbet of the spelling and the new and intelligent methods of instruction in vogue. Thus the object is never lost sight of imparting knowledge as quickly and as pleasantly as possible and little remainders of the lives of grown up or middle aged men are not wasted on the intricacies of grammar as grammar, The distinction of thre S's, two of which are
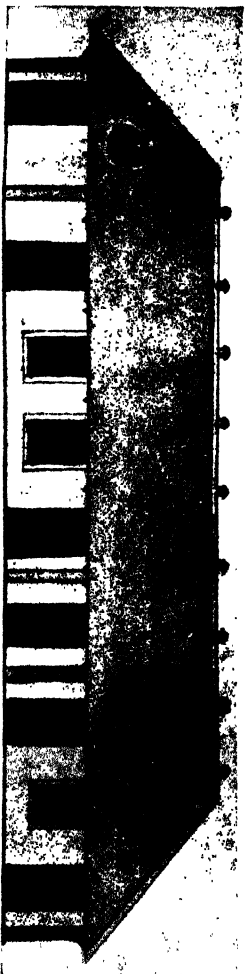
কলবাড়ীর নৈশবিদ্যালয় গৃহ।

foreign to the Bengali, and and for which niceties these big pupils can afford little time, has no place in the school. The time is economised to the utmost to teach things. and teaching is enlivened by music.

So far the effort has been a success, Its continuance and adoption for other places depends upon the interest of the community in general in the cause of improvement. We suggest benevolent reformers of every part to see more closely the undertakings already set on foot within six miles of Government House.

ইহার অর্থ এই "আমাদের পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে পার্শ্ববর্ত্তী বরাহনগর সহরে সম্প্রতি যে সমস্ত উন্নতিকর কার্য্য হইয়াছে তন্মধ্যে দেশীয় শিল্পী ও শ্রমজীবিগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় অন্যতম—এ প্রকারের বিদ্যালয় ভারতবর্ষে এই প্রথম। বরাহনগরে বোর্ণিও কোম্পানির অতি বৃহৎ কারখানায় হাজার হাজার শ্রমজীবি কাজ করে—এই সমস্ত শ্রমজীবি লইয়াই এই বিদ্যালয় সম্ভব হইয়াছে। কারণ এই প্রকারের সহর ব্যতীত এতগুলি লোকই বা কোথায় পাওয়া যায় আর এ প্রকারের একটা কার্য্যের কল্পনাই বা কোথায় হইতে পারে? কিন্তু বরাহনগর ছাড়া আরও অনেকস্থানেই কারখানাও অসংখ্য শ্রমজীবি ত রহিয়াছে, কাশিপুর, চিৎপুর, রিশড়া, বালি, ফোর্টগ্লষ্টার এবং কলিকাতাতেও অনেক কারখানা ও অনেক শ্রমজীবি আছে কিন্তু এই সমস্ত স্থানে কখনও কোনরূপ শ্রমজীবিগণকে উন্নত করিবার জন্য লোক হিতৈষণা মূলক কার্য্যের প্রস্তাব উত্থিত হয় নাই। বরাহনগর চিরদিনই দেশীয় শিল্পের স্থান, ইউরোপীয়দের কারখানা এখানে বহুকালই আছে, গত শতাব্দীতে দিনেমারদের কারখানা ছিল এখন ইংরাজদের কারখানা আছে—কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখনও শ্রমজীবিদিগের জন্য বিদ্যালয় হয় নাই। এই সৎকার্য্য একজন অতি

সামান্য অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে—ইঁহাকে খাটিয়া খাইতে হয়, কিন্তু ভগবানের কৃপায় এবং বোর্ণিও কোম্পানি ও তাহার কয়েকজন অংশীদারের সদাশয়তাপূর্ণ সহায়তায় এই ভদ্রলোকটি এই অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর উন্নতি সাধন ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন উন্নতিশীল ব্রাহ্ম, তিনি তাঁহার দেশহিতৈষণা দ্বারা দেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায়েরও প্রীতিভাজন হইয়াছেন—তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে—শ্রমজীবিগণকে একত্র করিয়া জ্ঞানলাভের উপকারীতা বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে অল্পসংখ্যককে স্বযত্নে আনয়ন করিয়া সন্ধ্যা বেলায় তাহাদের লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। শশিপদবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা কেদারবাবু এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক। এক বৎসরে ছাত্র সংখ্যা ৩৫ জন হইয়াছিল। প্রথমে এক ভাড়ার বাড়ীতে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত। বোর্ণিও কোম্পানির স্থানীয় সভ্যগণ এই দুই ভ্রাতার কার্য্য অতি মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন—এই কোম্পানিই নৈশ বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই বাড়ী পুড়িয়া গেল। আবার এই সদাশয় কোম্পানি একখানি আরও ভাল বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিলেন, এবারকার বাড়ীখানি আরও ভাল ও সুন্দর। এই বাড়ীতে বিদ্যালয় হয়, তাহা ছাড়া শ্রমজীবি ও অন্যান্য লোকদিগের উন্নতিকর অন্যান্য কার্য্যও হইয়া থাকে। গত মাসের ৫ই তারিখে কল বাড়ীতে বিদ্যালয় প্রথম উন্মুক্ত হয়। কলের উপযুক্ত ম্যানেজার মিষ্টার মেয়ার যথারীতি বিদ্যলয় উন্মুক্ত করেন। এই বিদ্যালয়ের দৃশ্য প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিরই উপভোগ্য। তিনশত শ্রমজীবি ও বালক জ্ঞানলাভের জন্য সমবেত হইয়াছে। এ দৃশ্য যেমন নূতন তেমনি চিত্তাকর্ষক, এবং ইহার ভবিষ্যত ভাবিলে তেমনি প্রয়োজনীয়। যখন বিদ্যালয় খোলা হয় তখন ছাত্র ৩৫ হইতে প্রায় ১০০ হইয়াছে—এই

ছাত্রগণ যেমন সুশৃঙ্খলাযুক্ত তেমনি নিঃশব্দে কার্য্যপরায়ণ, খুব ভাল স্থানেও এরূপ অবস্থায় এতগুলি বাঙ্গালী বড় একটা দেখা যায় না। গত রবিবার জেলার সর্ব্বজনপ্রিয় সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ব্রড্‌লি এই বিদ্যালয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয় দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতয় হইয়া গিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে তিরিশ বৎসরের বড় বড় পূর্ণ বয়স্কেরা এবং তাহাদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেরা নূতন পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, এ এক অতি সুন্দর দৃশ্য! এই বিদ্যালয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয় তাহাতে অতি শীঘ্র শীঘ্র ও বেশ আনন্দের সহিত বিদ্যা অর্জ্জিত হয়। যাহাদের বয়স হইয়াছে এই নূতন পদ্ধতিতে তাহাদের ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষায় অকারণ সময় নষ্ট হয় না। বাঙ্গালা বর্ণমালায় তিনটি 'শ' আছে কিন্তু ব্যবহার কেবল একটির। সেই সমস্ত বড় বড় ছেলেদের আর তিনটি শ শেখান হয় না, এই প্রকারে শিক্ষার জটিলতা কমান হইয়াছে। শিক্ষাব্যাপার আনন্দপ্রদ করিবার জন্য আবার সঙ্গীত শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

এ পর্য্যন্ত এই চেষ্টা বেশ সফলতা লাভ করিয়াছে। দেশের উন্নতি সাধনের দিকে আমাদের সমাজের দৃষ্টি যতই পতিত হইবে এই প্রকারের অনুষ্ঠানও দেশে ততই ব্যাপ্তি লাভ করিবে। সদাশয় লোকহিতৈষীগণকে আমরা এই কার্য্যটি অতি মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করি।"

শশিপদবাবুর অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যগুলি এই নূতন বাড়ী পাওয়ার পর বেশ নির্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই বাড়ীখানি শশিপদবাবুর নক্সা অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ঘরখানি অতীব সুন্দর হইয়াছিল। মধ্যে অতি বৃহৎ হল, তথায় স্কুল হইত এবং বক্তৃতা হইত। একখানি লাইব্রেরী ঘর, কমিটি ঘর,

ডিস্‌পেন্‌সারি ঘর। সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভার সম্পর্কে এই গৃহে দেশের তৎকালীন যাবতীয় শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাইয়া বক্তৃতাদি করিতেন। এই বারেই অর্থাৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট তারিখে তিনি অনেকগুলি শ্রমজীবিকে একত্র করিলেন এবং তাহাদিগকে জীবনের কর্ত্তব্য এক বক্তৃতায় বুঝাইয়া দিয়া শ্রমজীবি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন—এই সমিতির সভ্য হইতে হইলে প্রতিজ্ঞা করিয়া সর্ব্ববিধ মাদকদ্রব্য ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বরাহ নগরে সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক খুলিবার জন্য শশিপদবাবু চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ও কন্‌ট্রোলার জেনারেল কর্ত্তৃক অনুমোদিত করাইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রমজীবি স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ এই ব্যাঙ্কে যাহাতে সুবিধামত টাকা জমা দিতে পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল। এখন দেশে সর্ব্বত্রই ডাকঘরের সহিত সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক হইয়াছে, কিন্তু তখন মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা ব্যতীত অন্য কোথায়ও ব্যাঙ্ক ছিল না। কাজেই এ সময়ে বরাহনগরে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা একটি বড় কম কথা নহে। এই সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হইবার বহু পূর্ব্বে শশিপদবাবু তাঁহার নৈশ বিদ্যালয়ের সম্পর্কে আনাসেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রমজীবি সমিতি, নৈশবিদ্যালয়, সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভা প্রভৃতি কার্য্যগুলির জন্য কলবাড়ীর মধ্যে বাড়ী হইল বটে, কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়টির কিছুই হইল না। গৃহের অভাব আবার অনুভূত হইতে লাগিল—এই সময়ে শশিপদ বাবু সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিলেন, সুতরাং এ বিষয়ে এখন আর কিছুই হইল না।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি শশিপদবাবু বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বের কার্য্যগুলি আরও উৎসাহের সহিত চালাইতে লাগিলেন ও আরও অনেকগুলি নূতন সৎকার্য্য আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনুসারে একটী শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে কুটিঘাটায় বরাহনগরের বালিকা-বিদ্যালয়ের একটী শাখা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই শাখা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় তত্রত্য বাবু গোলকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। যদিও তিনি এই বাড়ীর ভাড়া লইতেন তথাপি তাঁহার ন্যায় আনুষ্ঠানিক হিন্দু সমাজের একজন নেতার পক্ষে সেই সময়ে শশিপদ বাবুর কার্য্যে এইরূপ আনুকূল্য করা খুবই প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। এখন বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একখানি গৃহ না হইলেই নয় এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইল। এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল। শশিপদবাবু বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে বোর্ণিয়ো কোম্পানির মনোভাব বরাহনগরের অধিবাসীগণের প্রতি পূর্ব্বে যতটা সদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল এখন আর ততটা নাই। এ মনোমালিন্যের কারণ অনেক। যাহা হউক কোম্পানির বাড়ীতে আর বেশী দিন বিদ্যালয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের কার্য্য চলিবে না ইহা শশিপদ বাবু বুঝিতে পারিলেন। এই সময়ে কোন একটি ব্যাপারে বরাহনগরের অনেকগুলি প্রধান লোক বোর্ণিও কোম্পানির নামে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করেন। কোম্পানির কোন কোন কার্য্যের দ্বারা গ্রামবাসীগণের কিছু কিছু অসুবিধা হইত। গ্রামের ভদ্রমণ্ডলী বন্ধুভাবে কলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিলে অনায়াসেই ইহার নিষ্পত্তি হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। শশিপদ বাবু তখন বরাহনগরে ছিলেন না। তিনি যেরূপ শান্তিসংস্থাপক তাহাতে তিনি থাকিলে এ গোল-যোগ কিছুতেই হইত না, আপোসে ও বন্ধুভাবে সমস্ত ব্যাপারের

মীমাংসা হইয়া যাইত। এই সময় হইতেই কোম্পানির ভাব বদ্‌লাইয়া গেল। ফলে কোম্পানির নৈশবিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেল এবং বিদ্যালয়ের ঘরখানি তাঁহারা অন্য কার্য্যে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই কোম্পানি এই ঘর, লাইব্রেরী ও কমিটির ব্যবহার করার জন্য মাসিক ১৲ টাকা হারে ভাড়া গ্রহণ করিতেছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কোম্পানির পক্ষ হইতে তৎকালীন সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পত্র আসিল যে সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভার কোনও অধিবেশন ঐ ঘরে করিতে হইলে প্রথমে কলের ম্যানেজারের নিকট এক দরখাস্ত করিয়া অনুমতি লইতে হইবে, সভার পত্রে লেখা হইত 'সভার গৃহে অধিবেশন হইবে,এখন হইতে লিখিতে হইবে যে বোর্ণিও কোম্পানির গৃহে সভার অধিবেশন হইবে। তাহার পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নবেম্বর তারিখে নোটিস্ আসিল যে লাইব্রেরী ১৮৮০ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এই নোটিস্ অনুসারে স্বর্গীয় কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের গৃহে লাইব্রেরী সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। ক্রমশঃ সে ঘরে আর চিহ্ন মাত্রও রহিল না। এই প্রকারে অতি কষ্টে অর্জ্জিত গৃহখানি হারাইতে হইল। একটু বুদ্ধি পূর্ব্বক চলিলে এরূপ হইত না। এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের সহিত কোম্পানির যে সহানুভূতি ছিল তাহা আর রহিল না, যাহা হউক শশিপদ বাবু আসিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি আবার কিয়ৎ পরিমাণে জাগ্রত করিলেন। কোম্পানির নৈশবিদ্যালয় উঠিয়া গেলে শশিপদ বাবু নিজের নৈশবিদ্যালয়ের সহিত এই বিদ্যালয় যোগ করিয়া দিলেন এবং শ্রমজীবিগণের উন্নতি বিধানে কোম্পানির আগ্রহ যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। এবারে শশিপদ বাবু বর্দ্ধিত অধ্যবসায় ও উৎ-

সাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। শশিপদ বাবুর চেষ্টা সফল হইল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে শশিপদ বাবু পাট কলের এজেন্ট হেণ্ডারসন, কোম্পানির নিকট হইতে পত্র পাইলেন যে নভেম্বর মাস হইতে কোম্পানি নৈশ বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিবে।

যাহা হউক কলবাড়ীর ঘরখানি যাওয়ার পর হইতে বিদ্যালয়গুলির জন্য ও সাধারণ সভার জন্য স্থায়ী ও নিজস্ব একখানি গৃহের প্রয়োজন শশিপদ বাবু বড়ই ব্যাকুলভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবু এক নিবেদন পত্র বিলাতে ও দেশে তাঁহার বন্ধুগণের নিকট প্রেরণ করিলেন—বরাহনগরে একটি হল নির্ম্মিত হইবে তজ্জন্য অর্থ চাই, ইহাই নিবেদন পত্রের অভিপ্রায়। এই গৃহ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য এইরূপ ভাষায় বিবৃত হয় "To remove the inconveniences so long felt for the want of a school house it has been my earnest endeavour to build a hall which shall be used during the day for the Girls' School and the Infant School and which shall be available in the evenings as a workman's shall where working men can be received for instruction and recreation after their day's labour. The building shall also be used for public meetings for the good of the people. The whole of these works to be called The Baranagar Institute." একখানি বিদ্যালয়ের ঘর না থাকায় অনেক দিন হইতে বড় অভাব বোধ হইতেছে আমি একখানি হল নির্ম্মাণ করিবার জন্য অনেকদিন হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। এই হলটি দিবসে বালিকা বিদ্যালয় ও শিশু বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

সন্ধ্যায় শ্রমজীবিগণ দিবসের পরিশ্রমের পর এই ঘরে শিক্ষালাভ ও নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিবে। সর্ব্বসাধারণের জন্য যে সমস্ত প্রকাশ্য সভা হইবে, এই ঘরে তাহারও অধিবেশন হইবে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য নির্ম্মিত হলটি 'বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট' এই নামে অভিহিত হইবে।

শশিপদ বাবু যৎকালে বিলাতে ছিলেন সেই সময়ে দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন ও এই টাকা ব্রিষ্টল ব্যাঙ্কে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসার পর ডাক্তার ওয়ালডি সাহেব কোষাধ্যক্ষ হয়েন ও এই টাকা আবশ্যক মত বিলাত হইতে আনীত হয়—এই ইন্‌ষ্টিটিউট ভবন নির্ম্মাণের যখন কথা হয় তখন শশিপদ বাবু এই সঞ্চিত অর্থ হইতে ৫০০৲ টাকা এককালীন দান করেন, কুমারীকার্পেণ্টার মহোদয়া স্বয়ং ৫০০৲ টাকা ও তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা, ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন ২৫০৲ সার, জে, বি ফিয়ার ১৫০৲ শ্রীযুক্ত বোফোর্ট সাহেব ১০০৲ পাইকপাড়া রাজবাটী (কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন অংশে) ২০০৲ ও ডাক্তার ওয়ালডি ৫০৲ টাকা শশিপদ বাবু তাঁহার বাসবাটির সম্মুখের তাঁহার একখণ্ড জমি (পোনে ছয় কাঠা) দান করিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে এই ভূমি খণ্ডের উপর ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইল। ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠার বিশেষত্ব পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনার জন্য তিনি কোনও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে আহ্বান করেন নাই। শশিপদবাবু ভাবিলেন যে এই হল যখন সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি তখন সকলকে লইয়াই এইকার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখের ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ এই ঘটনা উপলক্ষে লিখিলেন "The laying of the foundation stone of the Baranagar

Institute took place with some ceremony on sunday the 7th instant. Hymns were sung and prayers offered to God on the occasion with marked enthusiasm and earnestness. The peculiar feature observed in the ceremony was that every one present from the poorest workingmen upwards had a hand in the laying of the stone." অর্থাৎ ৭ই জানুয়ারী তারিখে কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠানের সহিত বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা হয়। কয়েকটি ঈশ্বর বন্দনামূলক সঙ্গীতগীত হইলে পর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হয়—সকলেই উল্লাস ও আন্তরিকতার সহিত যোগদান করেন—এই অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব এই যে দরিদ্র শ্রমজীবি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোক ভিত্তির জন্য এক এক খানি ইষ্টক প্রদান করেন।

প্রত্যেকের এক এক খানি ইষ্টক দেওয়ার অর্থ এই যে এই গৃহ সকলের সম্পত্তি—সকলের একতাই ইহার যথার্থ ভিত্তি, এবং এই গৃহ প্রতিষ্ঠার যাহা উদ্দেশ্য তাহা সফল করিবার দায়ীত্ব সকলেরই সমান—শশিপদবাবু এই ভাবটি সেই স্থানেই সমবেত ব্যক্তিগণের হৃদয়মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেন।

গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইল, কার্য্যও অনেকদূর অগ্রসর হইল, কিন্তু অর্থের অভাব, আর অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া পত্রে নিম্নরূপ বিবরণ প্রকাশিত হয়—

"We would call attention to some particulars that are given in the Epitome of news in reference to the Baranagar Institute. Though the undertaking is a local affair, it may claim the support of the public, the village being

the scene of an energetic endeavour to improve and elevate the factory hands who have become so numerous all along the Hoogly. In no place are there so many hundred employed as at Baranagar. The factory people though they are already important in a numerical point of view,are quite a new class in India,Under the influence of systematic and strennous exertion combined with good wages they are rapidly differentiating for good and evil from use and wont Hindus. At Baranagar there are already three night schools a working men's club and a library. Equally deserving of notice is the publishing office of the Indian workman edited by that true philanthropist Mr. Sasipada Banerji. Every month fifteen thousand copies of the journal are struck off, circulated and eagerly read by the mill people and their neighbours a circumstance full of significance and of happy augury. The Baranagar Institute will probably be the first-working men's hall in India. The building is progressing, but the raising of the wall is not proceeding so rapidly as could be wished, owing to a want of funds. We would bring the case to the notice of the public spirited inhabitants of Calcutta." অর্থাৎ বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট্ একটি স্থানীয় ব্যাপার হইলেও সর্ব্বসাধারণের সাহায্যের উপর ইহার সঙ্গতদাবী আছে। গঙ্গানদীর তীরে কলের শ্রমজীবির সংখ্যা এখন খুবই অধিক—এই সমস্ত শ্রমজীবিগণের উন্নতি কল্পে বরাহ

নগর গ্রামে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বরাহনগরে যত শ্রমজীবি আছে এত আর অন্য কোথাও নাই। এই শ্রমজীবিগণ সংখ্যায় খুব অধিক হইলেও ভারতবর্ষে ইহারা এক নূতন সম্প্রদায়। ইহারা নূতন প্রণালীতে শৃঙ্খলাবদ্ধশ্রমে দীক্ষিত হইয়া অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে ইহা সুখের বিষয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহারা প্রাচীন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এই সম্প্রদায়ের হিতের জন্য কিছু করা দরকার। বরাহনগরে এজন্য তিনটি নৈশ্যবিদ্যালয়, একটি শ্রমজীবি সমিতি ও একটি পুস্তকাগার আছে। ভারত-শ্রমজীবি নামক পত্রের প্রচার ও একটি বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য বিষয়। বিখ্যাত লোকহিতৈষী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পত্রের সম্পাদক। প্রত্যেক মাসে এই পত্র পনরহাজার করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, কলের শ্রমজীবিগণ ও তাহাদের প্রতিবাসীগণ অতীব আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করিয়া থাকে। এই ঘটনা বড় মূল্যনান, ইহারও খুব শুভ ভবিষ্যত আছে। বরাহনগরে ইন্‌ষ্টিটিউট্ হইলে তাহা ভারতবর্ষে শ্রমজীবিগণের সর্ব্বপ্রথম 'হল্' হইবে। গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে, কিন্তু বেশ দ্রুতবেগে কাজ হইতেছে না, কারণ অর্থের অভাব। আমরা কলিকাতার অধিবাসীগণের গোচরে এই অর্থাভাব উপস্থাপিত করিতেছি।

এই নিবেদনপত্রে কোনও ফল হইল না—গৃহনির্ম্মাণের জন্য একটি পয়সাও আসিল না। কুমারী মেরি কার্পেণ্টার মহোদয়া আবার চতুর্থবার ভারতবর্ষে আসিতেছেন—শশিপদবাবুর ইচ্ছা যে এই নবনির্ম্মিতগৃহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। এই সময়ে শশিপদবাবুর আর্থিকঅবস্থা একরূপ স্বচ্ছল ছিল—তিনি অবশিষ্ট টাকা স্বয়ং প্রদান করিয়া এই গৃহনির্ম্মাণ সমাধা করিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে, এই গৃহ উদ্‌ঘাটিত হইল। কুমারী কার্পেণ্টার মহোদয়া সমস্ত দিন

শশিপদবাবুর বাটীতেই রহিলেন—এবং এই গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে যোগদান করিলেন। মধ্যাহ্নে যে উপাসনা হয় সেই উপাসনায় তাঁহার পিতার প্রদত্ত একটি মুদ্রিত উপদেশ পাঠ করিলেন এবং গৃহখানি সজ্জিত করিতে সাহায্য করিলেন। গৃহ উদ্ঘাটন উপলক্ষে যে সভা হয় সার্, জন ফিয়ার সেই সভার সভাপতি ছিলেন, সভায় বহুলোকের সমাগম হয়। সভাপতিমহাশয় যে বক্তৃতা করেন তাহার এক অংশ এইরূপ।

"It is a peculiar satisfaction to me to occupy the chair, to which I have had the honour of being called this afternoon. For many Years—I cannot at the moment reckon how many—I have been a witness of Babu Sasi Pada Banerji's unceasing and untiring efforts to promote the education and social improvement of the poor people of this place. In spite of every obstacle, with those turned against him who ought to have been the first to give him countenance and help, he has never halted in his course. I will not stay to describe to you his difficulties, nor his persecution, you know all this as well as I do. This is the occasion of the annual distribution of prizes to the girls of his school, which alone would have been to most of us sufficient attration to bring us here and sufficient cause for our rejoicing with him over his success. But more than this we have to congratulate him and the people of this neighbourhood upon his having today attained an end towards which he has long been earnestly working. By unremitting exertion with the pecuniary support afforded him by a few sympathising friends, of whom Miss Carpenter is the chief, he has at last completed the building in

which we now are, and he dedicates it to the use of his fellow-countrymen as the Baranagar Institute. The Hall will be used during the day as the school-room for one of his girls school-In the evening classes will be maintained in it for the instruction of working men, and it will be a place wherein meetings may be held to promote objects of local improvement and advantage, and to the advance of the cause of religion and morals.

ইহার অর্থ, আজ আমি বিশেষ সন্তোষের সহিত এই সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি। বহুবর্ষ ধরিয়া—কত বর্ষ তাহা এখন ঠিক গণিয়া বলিতে পারি না—আমি এই স্থানের নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোকদিগের শিক্ষার ও সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনকল্পে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। সকল প্রকার বাধা তাঁহার পথে উপস্থিত হইয়াছে, যাহাদের তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত ছিল তাহারা প্রতিকূলাচরণ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার উদ্যম কিছুতেই প্রতিহত হয় নাই। তাঁহার ক্লেশস্বীকার ও তাঁহার প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার হইয়াছে তাহা বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই, আমিও তাহা জানি আপনারা সকলেও তাহা জানেন। আজ বালিকাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণের দিন এই উদ্দেশ্যেই আজ আমাদের এখানে আসিয়া শশিপদবাবুর কৃতকার্য্যতায় আনন্দ করিবার দিন। কিন্তু আরও কথা আছে আজ তাঁহার একটি উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে; সেজন্য আমাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত—এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বহুদিন ধরিয়া একান্তভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে ও কয়েকজন সহানুভূতিসম্পন্ন বন্ধুর, বিশেষ করিয়া কুমারী কার্পেণ্টার মহোদয়ার আর্থিক সাহায্যে, তিনি এই গৃহ নির্ম্মাণ সমাধা

করিতে পারিয়াছেন—এই গৃহ বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট্, তিনি স্বদেশ-বাসীগণকে এই গৃহ দান করিয়াছেন। তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় গুলির মধ্যে দিবসে একটির কার্য্য এই গৃহে হইবে। সন্ধ্যা-কালে শ্রমজীবিগণকে শিক্ষা দেওয়া হইবে, স্থানীয় যাবতীয় উন্নতি-কর সংকার্য্যের জন্য এই স্থানে প্রকাশ্য সভা হইবে এবং ধর্ম্ম ও নৈতিকবিষয়ে উন্নতির জন্য চেষ্টা হইবে।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শশিপদবাবু অতিশয় তীব্রভাবে যে অভাব অনুভব করিতেছিলেন, এতদিনে সেই অভাব দূরীভূত হইল। তাঁহার এই কার্য্য কতদিক হইতে যে কতদূর বাধা পাইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শশিপদবাবু যৎকালে বিলাতে তাঁহার বন্ধু-গণের নিকট আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেই সময়ে আমা-দের দেশের কোনও সুবিখ্যাত ব্যক্তি ও শশিপদবাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু, বিলাতে ছিলেন। একদিন কোনও ভদ্রলোকের গৃহে অনেকগুলি বন্ধুর সম্মিলন হইয়াছে, শশিপদ বাবুর সাহায্য প্রার্থনার কথা সেই সম্মিলনীতে উত্থিত হইলে আমাদের দেশের সেই বড়লোকটি বলিয়াছিলেন "His house is big enough for all his institutions." এই উক্তিতে তিনি একটু বিদ্রূপ করিয়া এই কথা বলি-লেন "ভারিতো তাঁর কাজ, এই সব কাজ তাঁর বাড়ীতেই হইতে পারে।" এই উক্তির দ্বারা তিনি বিলাতে যাহাতে টাকাকড়ি কিছু না উঠে সেজন্য চেষ্টা করিলেন। শশিপদবাবু বিলাতে কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। ইন্‌ষ্টিটিউট্ গৃহ হইয়া যাওয়ার অনেক দিন পরে একদিন শশিপদবাবু এই ভদ্র লোককে লইয়া গাড়ী করিয়া ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা করাইতে লইয়া যাইতেছিলেন, পথে অতীব বিনীতভাবে ও সম্ভ্রমের সহিত তিনি তাঁহাকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের এই এক ভাব। সৎকার্য্যের সফলতার জন্য উৎসুক লোক, নামজাদা লোকের মধ্যে বেশী আছেন কিনা বলা যায় না, তাঁহাদের নামেসৎকার্য্য হউক তাহাতে তাঁহারা আছেন। আপনি প্রাণপাত করিয়া দেশের হিত করিতেছেন বলিয়াই যে দেশের প্রধান লোকেরা আপনাকে সাহায্য করিবেন, এ আশা যদি আপনি করিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। দেশের হিতের জন্য আমাদের দেশে যাহারা কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের নাম বড় কেহ জানেন না, অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা যে প্রত্যহ বাড়িতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁহাদের নামে নিত্য ঢক্কা মুখরিত হয় তাহারা অনেকে দেশহিতৈষণার ব্যবসায়ী মাত্র, দেশের যাঁহারা কল্যাণকামী তাঁহারা এটুকু জানিয়া রাখুন।

হল প্রস্তুত হইলে পর বরাহনগরের যাবতীয় লোকহিতকর অনুষ্ঠানের কার্য্য সেই হলে হইতে লাগিল। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য এতদিন স্থান ছিল না। নিজের ঘর হওয়ায় কাজগুলিও বেশ সুচারুরূপে ও বিশেষ উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল।

এই গৃহ নির্ম্মিত হওয়ার পূর্ব্বেই সাধারণ ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাধারণ ধর্ম্মসভার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহ নির্ম্মিত হওয়ার পর সাধারণ ধর্ম্মসভার কার্য্য সেই গৃহেই হইতে লাগিল।

'দেবালয়' এর উদার আদর্শের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সামান্যমাত্র আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে 'দেবালয়' এর উদার আদর্শ ক্রমে ক্রমে জগতের সমস্ত সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিতেছেন। শশিপদবাবু এই আদর্শ কাহারও নিকট পাইয়াছিলেন তাহা নহে তিনি জীবনের প্রথম হইতেই এই আদর্শ অনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট ঠিক এই 'দেবালয়' এর আদর্শে

প্রতিষ্ঠিত হয় ও তদনুসারে পরিচালিত হইত। এখানে কথকতা হইত, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই তথায় ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে 'চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ড' এর পক্ষ হইতে রেভারেণ্ড জে, ডব্লিউ, হল, আর, ক্লিফোর্ড, স্বদেশপ্রাণ সুধী রেভারেণ্ড কালিচরণ ব্যানার্জি এবং খৃষ্টীয় প্রচারকগণ এই ইন্‌ষ্টিটিউটে ক্রমান্বয়ে কতকগুলি খ্রীষ্ট ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করেন।

যাহা কিছু সত্য ও মঙ্গলকর সকল বিষয়েরই অসম্প্রদায়িকভাবে আলোচনা হইত। কেবলমাত্র কেহ অপর কাহারও নিন্দা করিতে পারিতেন না। দেবালয়, সাধারণ ধর্ম্মসভা ও ইন্‌ষ্টিটিউট্ একই ভাবের তিনটি প্রকাশমাত্র। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া শশিপদ বাবুর জীবনের আদর্শ ও সাধনা দেশবাসীর নিকট প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখে স্বনামধন্য অনারেবল, কে, জি, গুপ্ত আই, সি, এস্, সি, আই, ই মহাশয় বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিদর্শন করেন—তিনি পরিদর্শকের মন্তব্য পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন

"Visited Baranagar Institute, the gift of Mr. Sasipada Banerjee to his townspeople. The building consists of a commodious hall with a couple of side rooms. There is a library which is open to readers in the mornings and evenings and a girls school is held in the middle of the day. Mr. Sasipada Banerjee has always taken the deepest interest in the working classes and a night school and a club are attached to the Institute for the special benefit of the working people. The generous donor has not only given a fine building but has also

endowed the various Institutions located in it with practically all that he possesses. I examined some of the girls and was satisfied with their answers.

Altogether the Institute is unique in many respects and it is to be hoped that similar Institutions will more largely be opened in other parts of the country."

"শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার স্বনগরবাসী-গণকে যে ইন্‌ষ্টিটিউট্ দান করিয়াছেন অদ্য তাহা পরিদর্শন করিলাম। ঘরখানিতে একটি খুব বৃহৎ প্রকোষ্ঠ, ও দুখানি পাশের ঘর আছে। একটি পুস্তকাগার আছে, সকাল ও সন্ধ্যায় সকলে এই পুস্তকাগারে পুস্তক পাঠ করিতে পারেন—দ্বিপ্রহরে এই স্থানে বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থ শশিপদবাবু আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন—এই সমস্ত শ্রমজীবিগণের জন্য এই ইন্‌ষ্টিটিউটে একটি নৈশ বিদ্যালয় ও সমিতি আছে। এই গৃহের সদাশয় প্রতিষ্ঠাতা যে কেবল একখানি সুন্দর গৃহ দিয়াছেন তাহা নহে—তাঁহার যাহা কিছু ছিল এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী ভাবে কাজ চালাইবার জন্য তাহার সমস্তই দিয়াছেন। আমি কয়েকটি বালিকার পরীক্ষা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম।

অনেক বিষয়ে এই ভবন একটি অসাধারণ বস্তু। দেশের অন্যান্য স্থানে এই প্রকারের গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইলে বড়ই কল্যাণ হয়।"

বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠিত হইল—বহুচিন্তা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া এই গৃহখানি নির্ম্মিত ও পুস্তকালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইলে শশিপদবাবু তাঁহার উদার আদর্শ অনুসারে স্বদেশের ও স্বজাতির সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী করিতে

হইত। এই ভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল, এই সময়ের ঘটনাগুলি বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। ক্রমে শশিপদবাবুর বয়স হইল, স্বাস্থ্য ও যৌবনের উদ্যমও ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল, এখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন এই ইনষ্টিটিউটের স্থায়ীত্ব বিধান করা যায় কিরূপে? এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার উদার আদর্শানুযায়ী এই ইনষ্টিটিউটের কার্য্য চলিতে পারে। ট্রাষ্টি নিয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু এই লোকহিতকর কার্য্য প্রকৃত অনুরাগের সহিত করিতে পারেন এরূপ লোকের সংখ্যা খুব বিরল, তিনি সহসা সেরূপ লোক পাইলেন না। কি করেন? চিন্তার পর স্থির করিলেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে এই নষ্টিটিউটের পরিচালনভার সমর্পণ করাই নিরাপদ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এবিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকারীসভায় তিনি এক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। স্বনামধন্য সুধী শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সে সময়ে সভাপতি ছিলেন—এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল, অকৃত্রিম স্বদেশসেবক সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি. এ মহাশয় এই প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করেন এবং অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে সমাজের তিনজন প্রসিদ্ধ সভ্য (তাঁহারা অবশ্য সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন না) এক পত্র লিখিয়া এই প্রস্তাবে আপত্তি করেন—কেবল আপত্তি নহে তাঁহাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক পত্র লেখেন, যখন ইনষ্টিটিউট্ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তখন আমি আর ঐ সমাজের সভ্য থাকিতে পারিব না। অতএব আমি এই পত্রের দ্বারা সভ্যপদ পরিত্যাগ করিলাম। যে সমস্ত সর্ত্ত করিয়া শশিপদবাবু বরাহনগর ইনষ্টিটিউট্ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলেই তাঁহাদের

আপত্তি কেন হইল মোটামুটি বুঝিতে পারা যাইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকরী সভায় তিনি এই সর্ত্তগুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছিলেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঐ গৃহে তাঁহাদের কার্য্য যাহা কিছু সমস্তই করিতে পারিবেন, তাহাতে দাতার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি সর্ত্ত ছিল—তাহা এই। সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোক এই গৃহে স্বাধীনভাবে ধর্ম্মালোচনা ও বক্তৃতা করিতে পারিবেন—যাঁহার যাহা মত তাহা ব্যক্ত করিবেন, কেবল অপর কোন মতের বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা বা কোনরূপ নিন্দা করিবেন না। ইন্‌ষ্টিটিউটের ভার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভবন রক্ষার জন্য এককালীন চারিহাজার টাকাও তিনি ব্রাহ্মসমাজের হস্তে দিতে প্রস্তুত ছিলেন—পূর্ব্বে বলিয়াছি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের এই কার্য্যে খুব সহানুভূতি ছিল—ও তিনি শশিপদবাবুকে পত্রের দ্বারা এই সহানুভূতি জানাইয়া বলেন যে তাঁহার বিশ্বাস এই প্রস্তাব তিনি কমিটিকে গ্রহণ করাইতে পারিবেন।

এইবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সভ্যগণ যাঁহারা এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন ও যাঁহাদের আপত্তির ফলে ইন্‌ষ্টিটিউটের গৃহ লওয়া হইল না তাঁহারা কেন আপত্তি করিয়াছিলেন তাহাও সামান্য মাত্র চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। গীতায় আছে—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং" অর্থাৎ সাধারণ অজ্ঞ লোকের বুদ্ধিভেদ ঘটান উচিত নহে। নানা প্রকার মতের কথা শুনিলে, নানারূপ পরস্পর বিরোধী আলোচনার ঘুর্ণাবর্ত্তে পতিত হইলে সাধারণ লোকের নিষ্ঠার ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে এবং তাহারা অনেক সময়ে কর্ত্তব্যপথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। হিন্দু স্মৃতিতে এবং মহম্মদীয়, খৃষ্টিয় প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের অনুশাসনে এই বুদ্ধিভেদের হস্ত হইতে

লোককে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সমস্ত সভ্য আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহারা এইরূপ ভাবের প্রেরণায় সাধুভাবে আপত্তি করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করাই সঙ্গত।

ইঁহাদের আপত্তি এই যে বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউটে এমন সব বিষয়ের আলোচনা হয় যাহার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতি থাকা উচিত নয়। আপন আপন মত অনুসারে কার্য্য করাই তপস্যা, তবে সদ্ভাবে করিতে হইবে—সুতরাং যাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহারা সরলচিত্তে আপন বিশ্বাসানুযায়ীই করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহাদের অপ্রশংসার কিছুই নাই। যাহা হউক এই আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ইন্‌ষ্টিটিউটের ভার গ্রহণ করিতে আর পারিলেন না।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যকারী সভার সর্ব্বশেষ কথা এই। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ ইন্‌ষ্টিটিউটে ধর্ম্মালোচনা ও বক্তৃতা করুন তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু তাঁহারা একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে (Theistic Basis) দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবেন। এ এক বড় সমস্যার কথা, একটু চিন্তা করিলেই সমস্যাটি কিরূপ কঠিন বুঝিতে পারা যাইবে। “একেশ্বর বাদের ভিত্তি” বলিতে কি জগতে সকল জাতি একই জিনিষ বুঝিয়া থাকেন? ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মচিন্তার অভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে আজ কাল বেশ বোঝা যায় যে একেশ্বর বাদ বলিতে সকলে মূলতঃ এক জিনিস বুঝিলেও ঠিক এক জিনিস বোঝেন না। ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যকারী সভা- যখন একেশ্বরবাদের ভিত্তির কথা তুলিলেন, তখন তাঁহারা এই কথায় যাহা বোঝেন এবং এই কথাটিকে আদর্শ করিয়া তাঁহারা যে ভাবে কার্য্য করিতেছেন সেই ভাবটিই বুঝিলেন কিন্তু ইহাতে শশিপদ বাবুর মত হইল না।

একেশ্বরবাদই যে ধর্ম্মের প্রাণ তাহা কে অস্বীকার করিবে? ধর্ম্মবিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিগণের মধ্যে এই একেশ্বরবাদ না থাকিতে পারে (এ কথাতেও কিন্তু আজ কাল অনেক পণ্ডিত আপত্তি করিতেছেন।) কিন্তু ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ একটি নূতন জিনিস নহে। একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে একটি কথা ভাবিবার আছে। প্রত্যেক জাতির অভিব্যক্তির ইতিহাস ঠিক একরূপ নহে—মূল নীতিগুলিতে প্রভেদ না থাকিতে পারে কিন্তু বাহ্যপ্রকৃতির সহিত অভিব্যক্তিশীল জাতীয় চিত্তের যে সংস্পর্শজ প্রকাশ, তাহা একরূপ নহে। "এক ঈশ্বর, তিনিই একমাত্র উপাস্য" এই বাক্যটি বলা যত সহজ কার্য্যতঃ সকলের পক্ষে তত সহজ নহে। হিন্দু সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বা হিন্দু সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা এ বিষয়ে যে কথাগুলি পাইব তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা এস্থলে অসম্ভব। সংক্ষেপে দিক্‌দর্শন মাত্র করা যাইতেছে। দেবতত্ত্ব হিন্দু সাধনার একটি অতীব জটিল তত্ত্ব, এ বিষয়ে প্রাচীনকাল হইতেই চিরদিন মত ভেদ আছে। প্রাকৃতিক শক্তির কাল্পনিক বর্ণনা, ঈশ্বরের বিভূতি এই দুইভাবে দেবতত্ত্ব প্রাচীনকালেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ কালেও হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আর একটি মত এই যে যেমন এই দৃশ্যমান জগৎ, তেমনি স্থূক্ষ্ম অদৃশ্য জগৎ আছে। এই সমস্ত জগতে বা লোকে শক্তিশালী সত্ত্বা আছেন, তাঁহারা দেবতা, গন্ধর্ব্ব, প্রভৃতি। এ জগতে মানুষ যেমন বড়লোককে কোনরূপে কৌশলে বা তোষামোদ করিয়া তুষ্ট করিয়া সহজে স্বার্থসিদ্ধি করে, সেইরূপ এই সমস্ত দেবতাকে তুষ্ট করিয়া আয়ু, আরোগ্য, রূপ, ধন প্রভৃতি পাওয়া যায়। সংসারে একদল লোক এই প্রকারেই চলিতেছে। ইহারা দেবপূজক। এই সমস্ত লোক কামকামী। ইহারা সুখ চায়, ঐশ্বর্য্য চায়, সম্ভ্রম চায়। ইহারা অহঙ্কারের ভূমিতে দাঁড়াইয়া সংসারের প্রতিযোগী-

তায় রত। জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ইহাদের আদর্শ। কিন্তু সংসারে এ প্রকারের লোক সকলেই নহে, যাঁহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে তাঁহারা ত্যাগের মধ্যে, সেবার মধ্যে নিজের জীবনের সার্থকতা দর্শন করেন, ইঁহারা দেবপূজক নহেন ইহারা একেশ্বরের উপাসক। তাঁহারা ভাগবতের ভাষায় হয় অকাম, সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম এবং তাঁহারা উদার বুদ্ধি সম্পন্ন। এই সকল গুণমণ্ডিত না হইলে মুখে যাহাই বলিনা কেন একেশ্বরের উপাসনা হয় না ?

জগৎ এই প্রকারে দেবপূজক। কিন্তু তাহাদিগকে একেশ্বর-বাদের ভূমিতে লইয়া যাইতে হইবে, ইহাই আদর্শ—ইহাই জাতীয় সাধনা। মহাপুরুষগণ যুগে যুগে এই কার্য্য করিতেছেন। এইবার প্রণালী।

গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শক্তি ও শিব এই পঞ্চ দেবতা লইয়া বঙ্গদেশে পঞ্চ সম্প্রদায়। এই সমস্ত দেবপূজা প্রথম কি ভাবে হইল তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। সুতরাং আলোচনা নিস্প্রয়োজন। কিন্তু এই যে দেবতা, তাঁহার ধারণা চিরদিন একরূপ নহে—গণেশ উপাসক যেমন নিজের দেবতাকে তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর, সৃজন পালন লয় তোমা হইতেই হয়, তুমি প্রাণস্বরূপ এই কথা বলিতে ছেন, তেমনি অন্যান্য উপাসকেরাও সেই উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মের লক্ষণ নিজ নিজ ইষ্টদেবে আরোপ করিতেছেন। এই ভাবটি আজ হইতেছে তাহা নহে—ক্রমবিকাশের এই প্রণালী চলিয়া আসিতেছে—ইহাই আমাদের জাতীয় সাধনার পথ। দেশীয় ভাবকে কেবল নিন্দা করিয়া এবং পশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতানুসারে এ দেশে একেশ্বরবাদ (Theism) ছিলনা, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিলে বিরোধ ও বিদ্বেষ যতখানি হইবে কার্য্য ততখানি হইবে

না। নূতন জাগরণ দিবার সময় হয়তবা নিন্দার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন আর নিন্দার দিন নাই, এ কথা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে। হিন্দু সমাজের পুরোদেশে কি একেশ্বর-বাদের আদর্শ নাই, না হিন্দু সমাজ নিজ পথে সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে না? এই যে দেশে শিক্ষা বিস্তার, বৈদেশিক শিক্ষা ও সাধনার সহিত পরিচয়, এত ধর্ম্মান্দোলন এ সমস্ত কি কোনই সুফল প্রসব করিতেছেন না? এখন সকল ধর্ম্মেরই পুনরুত্থান জগতে দেখা যাইতেছে—এই পুনরুত্থানের অর্থ পিছাইয়া যাওয়া, ইহা যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা বিষয়টি অপক্ষপাতে আলোচনা করেন নাই। কাজেই এখন "একেশ্বরবাদ" এর একটা নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ আদর্শের দ্বারা সকল সম্প্রদায়কে নিয়মিত করিবার চেষ্টা করা দেশের পক্ষে ও মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর নহে এবং সত্যের অনুসরণও নহে।

'দেবালয়'এর প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কমিটির হস্তে কেন ইন্‌ষ্টিটিউট্ দিতে পারিলেন না, এ বিষয়ে তাঁহার মত আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন। শশিপদ বাবু জীবনের প্রথম হইতেই ব্রাহ্মসমাজের একজন অত্যন্ত উৎসাহী সভ্য। ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় উন্নতিমুখী কার্য্যে তিনি সম্পূর্ণ-রূপে আত্মনিয়োগ করিয়া যাহা করিয়াছেন তদপেক্ষা অধিক কার্য্য অধিক লোকের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি যখন ব্রাহ্ম তখন তিনি এই "একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে" সম্মত হইলেন না ইহার কারণ কি?

শশিপদ বাবু এই দেশের ও এই জাতির সেবায় চিরদিন রত, দেশের সহিত তাঁহার যতখানি যোগ ও পরিচয়, তিনি যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত দেশের সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করিয়াছেন ততখানি আর বেশী কেহ করেন নাই। জাতীয় ভাবের যেটুকু উৎকৃষ্ট সেটুকুকে

তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। 'দেবালয়' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শশিপদ বাবুর সহিত হিন্দুসমাজের একজন বিশিষ্ট ভদ্র লোকের নিম্নরূপ কথোপকথন হইয়াছিল। আনুষ্ঠানিক হিন্দু সমাজের ভদ্র লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি 'দেবালয়'এ সকল সম্প্রদায়কে যখন সমান আদরে স্থান দিয়াছেন তখন উপাসনাটি ব্রাহ্মমতে রাখিলেন কেন? এ বিষয়ে আপনি তো ব্যবস্থা করিতে পারিতেন যে একদিন শিব পূজা হইবে, একদিন কালী পূজা হইবে একদিন খৃষ্টীয় মতে উপাসনা হইবে ইত্যাদি।"

এই প্রশ্নের উত্তরে শশিপদ বাবু বলিলেন "আমি বিশ্বাস করি যে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিয়া এই যে ব্রহ্ম উপাসনা ইহা একান্ত প্রয়োজন। এই উপাসনাই হিন্দুসাধনার সার জিনিস। এই উপাসনার দ্বারাই দেশের যথার্থ মিলন হইবে এবং সকল সম্প্রদায়ই ক্রমে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইবে।"

শশিপদ বাবুর ধর্ম্মজীবন আলোচনায় একথা বলা হইয়াছে যে তিনি সকল সম্প্রদায়ের উপাসনাতেই যোগদান করিয়াছেন, তিনি বলেন যে উপাসনার প্রণালীতে ভেদ থাকিতে পারে এবং এই ভেদ থাকাও অবশ্যম্ভাবী এই ভেদের মধ্য দিয়াই যিনি এক ও অভেদ তিনি ক্রিয়া করিতেছেন—এই সমস্ত উপাসনায় যেটুকু প্রেম ও ভক্তির ভাব উপাসকগণের চিত্তে জাগরিত হইয়া তাহাদিগকে যাহা কিছু সীমাবদ্ধ ও স্বার্থমূলক তাহার উর্দ্ধে অসীমের চিন্ময় রাজ্যে লইয়া যায় সেটুকু তো সকলের। জড়জগতে একই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন নাম লইয়া ক্রিয়া করিতেছে এবং প্রয়োজন ভেদে সমস্ত শক্তিই আবশ্যক। এস্থলে যেমন একটি শক্তিকে গ্রহণ করিতে গিয়া অপর শক্তিকে উপেক্ষা করা হয় না এও তেমনি। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতেও একই শক্তি। মহারাণীর পুত্রস্নেহও যেমন

দরিদ্রারও তেমনি। মানুষের প্রভেদ বাহিরের ত্বকের বর্ণে কিন্তু এই ত্বকের ভিতরে যাইলে আর প্রভেদ নাই, সবই একরূপ, এইভাবে শশিপদ বাবু আজীবন চিন্তা করেন। তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন আলস্যহীন সাধনার দ্বারা এই মহামিলনের বার্ত্তা দেশবাসীগণের নিকট ঘোষণা করিতেছেন। এই আদর্শ তাঁহার আত্মা। এই আদর্শ বর্জ্জন করিলে তাঁহার আত্মহত্যা হয়।

এই কারণেই তিনি ইন্‌ষ্টিটিউট্ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে দিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার ভক্তি ও সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ, কিন্তু বিরোধপরায়ণ সাম্প্রদায়িকতায় তিনি বদ্ধ নহেন, তিনি ব্রাহ্ম-সমাজকেও জাতীয়ভাবে আনয়ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত চেষ্টারও কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি কি চাহিয়াছেন? ইহার একটি উত্তর এই, হিন্দু ব্রহ্মবাদের বা আমাদের জাতীয় প্রেমভক্তির ভিত্তির উপর তিনি ভারতবর্ষের মহাজাতিকে গড়িয়া তুলিতে চাহেন, ইহাই তাঁহার প্রাণের একমাত্র কামনা। তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যম এই কেন্দ্রের চারিদিকে ভ্রাম্যমাণ, তাঁহার জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে এই তত্ত্বটিই স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম, সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম না হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষের জাতীয় ধর্ম্ম হয় শশিপদ বাবু তজ্জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বাস যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের সর্ব্বসম্প্রদায়ের মিলন ভূমি হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক উৎসবে সাধারণ সমাজের উপাসনা মন্দিরে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন (২৬শে জানুয়ারী ১৯০৪) এই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে সেই সময় প্রচারিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটির নাম "How to make Brahmoism the national religion

of the country !" ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিরূপে দেশের জাতীয় ধর্ম্ম করা যাইতে পারে? এই প্রবন্ধটির পূর্ব্বে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্র ইণ্ডিয়ান্ মেসেন্জারে এ বিষয়ে আর একটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি উপায় নির্দ্ধারণ করেন, এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম একদিন জাতীয় ধর্ম্ম হইতে পারিবে। তিনি বলেন সর্ব্বপ্রথম আমাদের নিজেদের স্বধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস চাই, বিশ্বাস ছাড়া কিছুই হইবে না—আর বিশ্বাসের দ্বারাই সমস্ত হইবে। তাহার পর একতা—একতা ছাড়া আমাদের বিপদ হইবে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। তৃতীয়তঃ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও ঋষিদিগের সহিত আমাদের যোগ রক্ষা করিতে হইবে। চতুর্থতঃ সর্ব্বসাধারণের উপযোগী সাহিত্য চাই। এখন যে সাহিত্য আছে তাহা সাধারণ লোকের উপযোগী নহে। এই যে লোক সাহিত্য, ইহাতে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের নীতিগুলি বুঝান হইবে তেমনি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা কি কার্য্য হইতেছে, কত জগাই মাধাই এই ধর্ম্মের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া নানাবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন—এই সমস্ত ইতিহাস বিশেষভাবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া উচিত। পঞ্চমতঃ স্ত্রীশিক্ষার দিকে আমাদিগকে আরও মনোযোগী হইতে হইবে। আমরা এতদিন তাঁহাদিগকে সাধারণ বিষয়েরই শিক্ষা দিয়াছি, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান বিষয়ে আমাদিগকে এখন বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। রীতিমত ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন এরূপ স্ত্রীলোক আমাদের সমাজে একজনও নাই। বৈষ্ণব সমাজে প্রথম হইতেই স্ত্রীলোকেরা রীতিমত ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। নগর সংকীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। অবশ্য সঙ্কীর্ত্তনে উৎসাহ ও জীবন

থাকা চাই। আর একটি কথা এই যে সাধারণ লোকের বিশেষ যোগ ছাড়া জগতে কোন আন্দোলনই কেবলমাত্র শিক্ষিত কয়েকজন লোককে লইয়া জগতে সফলতা লাভ করে নাই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাধারণ লোককে আনিতে হইলে দেশের লোকশিক্ষার ভার বিস্তৃততররূপে ব্রাহ্মসমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশ মধ্যে নৈশবিদ্যালয় সকল-স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সমস্ত নৈশবিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ছাড়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই স্থলে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। শশিপদ বাবু কেবল কথা কহিয়া নিরস্ত থাকিবার লোক নহেন। তিনি কর্ম্মী লোক। পূর্ব্বে যে সমস্ত উপায় তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই সমস্ত উপায় নিজের জীবনে তিনি আশ্রয়ও করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনের কথা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কমিটির নিকট তিনি উত্থাপন করিলে তাঁহারা প্রথমে এই উপায় গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তাহার পর শশিপদ বাবু 'দেবালয়'এ প্রতি রবিবারে নিয়মিত সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করাইলেন। 'দেবালয়'এর এই সঙ্কীর্ত্তন ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে স্থানান্তরিত হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপাসনার পর 'দেবালয়'এর সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন, সেই হইতে রবিবারে উপাসনার পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ত্তন চলিয়া আসিতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকারী সভা ইন্‌ষ্টিটিউটের ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন শশিপদ বাবু বরাহনগর মিউনিসিপ্যালি-টিকে ইন্‌ষ্টিটিউটের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত পি, সি, লায়ন আই, সি, এস, মহোদয় তৎকালে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমি-শনার ছিলেন, তিনি আসিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট্ ভবন দেখিয়া গেলেন, তিনি পূর্ব্ব হইতেই শশিপদ বাবুকে খুব ভালরূপ জানিতেন। এই কাথাবার্ত্তা

বহুদূর অগ্রসর হইল। সরকারী ইন্‌জিনিয়ার আসিয়া এই ঘরের উপর দ্বিতল নির্ম্মাণ করিতে পারা যাইবে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া গেলেন—স্থির হইল দ্বিতল হইবে না। শশিপদ বাবু এই ভবন ব্যতীত উহার পুরোদেশের ভূমিখণ্ড ক্রয় করিবার মূল্য মিউনিসিপ্যালিটিকে দিতে চাহিলেন। সমস্তই স্থির হইয়া গেল। মিউনিসিপ্যাল আপিস ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্মুখে হইবে, এই স্থানটিই বরাহনগরের কেন্দ্রস্থান হইবে, রাস্তা প্রশস্ত হইবে, চারিদিকে এইরূপ আন্দোলন চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে লায়ন সাহেব বদ্‌লি হইয়া গেলেন, অন্য কমিশনর আসিলেন। কলের একজন সাহেব মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা মিউনিসিপ্যাল আপিস তাঁহাদের নিকটে থাকে। নূতন কমিশনার আসিলে চেয়ারম্যান সাহেবের সহিত তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইল, আর মিউনিসিপ্যালিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

দুইটি চেষ্টা বিফল হইয়া গেল, শশিপদ বাবু আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন কি করা যায়? বরাহনগরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, তাহার নাম ভিক্টোরিয়া স্কুল, এই বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত। শশিপদ বাবু ভাবিলেন এই বিদ্যালয়টি যখন থাকিবেই, তখন এই বিদ্যালয়ের সহিত ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করাই সঙ্গত। এই অভিপ্রায়ে তিনি এই ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের ট্রাষ্টিগণ ব্যতীত নিজের পরিবারের তিনজনকে ট্রাষ্টি করিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর অর্পণ পত্র রেজিষ্টারি করিয়া দিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ট্রাষ্টি হইলেন জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, অবকাশপ্রাপ্ত সব জজ রায় বাহাদুর কেদারনাথ মজুমদার ও বরাহ-নগর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলকমিটির এই চারিজন ট্রাষ্টি,

ইহাছাড়া শশিপদ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট, শশিপদ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত এল্‌বিয়ান্ রাজ-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই সি এস্ মান্দ্রাজ, শশিপদ বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান মন্মথনাথ দত্ত এম্, এ, এস, আর এস্ (মন্মথ বাবুর পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন মহাশয় তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন।)

এই প্রকারে 'ইন্‌ষ্টিটিউট্' এর ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়া গেল শশিপদ বাবুর প্রার্থনা, কমিটি দেশের সদাশয় ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থাপিত করিলেন, সে প্রার্থনাটি প্রতিষ্ঠাতার ভাষার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"I can not sufficiently express my thankfulness to the Trustees of the Institute for the relief they have granted me in my old age by taking over from my shoulders the responsibilities of the Institute and to the members of the Committee who have been earnestly executing its works since then. I am glad and grateful to find that your noble President Ray Yatindranath Chowdhuri, amidst his multifarious public and private engagements, is taking such a keen interest in the Institute and could, as he did, so zealously attend to its affairs. This is indeed a real relief to me though an anxious solicitude still lingers in my heart. I was called forth to the works of the Institute in my youth, to the youth, I wouid before all strongly appeal to take the rudder in their hands and with the guidance of your eminent president helped by such an efficient committee

as you represent multiply the usefulness of the Institute. May you all, the wisdom, culture, heart and energy of Baranagar find a loving engagement in the Institute and may it grow in usefulness under your fostering care, ever remains to be my earnest solicitude.

And may God help us all."

ইন্‌ষ্টিটিউটের ট্রাষ্টি মহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া ইন্‌ষ্টিটিউটের ভার ও দায়িত্ব আমার স্কন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কমিটির সভ্যগণ তদবধি ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্য আন্তরিকতার সহিত করিয়া আসিতেছেন—তাঁহারা এই ভার লওয়ায় আমি বৃদ্ধ বয়সে যে শান্তি ও নিশ্চিন্ততা পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমাদের সদাশয় সভাপতি রায় যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সাধারণ কাজ ও নিজের কাজ অনেক, এ সকল সত্ত্বেও তিনি এই ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য যেরূপ আগ্রহের সহিত কার্য্য করিতেছেন তাহাতে আমি আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। এই আমার পক্ষে এক প্রকৃত সান্ত্বনা— তবে আমার হৃদয়ে এখনও এক দারুণ উদ্বেগ রহিয়াছে। যৌবন কালেই আমি এই ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম—আজ আমি দেশের যুবকগণকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আসিয়া এই কার্য্যের কর্ণধার হউন—আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ সভাপতি মহাশয়ের পরিচালনায় এবং আপনাদের ন্যায় উপযুক্ত কমিটির নেতৃত্বাধীনে যুবক-গণ কার্য্য করিলে এই ইন্‌ষ্টিটিউটের উপযোগীতা প্রত্যহই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। আপনারা সকলে বরাহনগরের জ্ঞান, সভ্যতা, হৃদয় ও শক্তি, প্রার্থনা করি আপনারা এই ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রেমসম্পন্ন হউন এবং আপনাদের স্নেহযুক্ত প্রতিপালনে এই ইন্‌ষ্টিটিউটের উপযোগীতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা—ভগবান আমাদের সকলকে সাহায্য করুন।"

সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কার্য্যের ভার দেশের যুবকগণ গ্রহণ করুন, তিনি দেশের যুবকগণের উপর এই সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যুবকগণকে ইন্‌ষ্টিটিউটে একত্র করিবার জন্য তিনি ছাত্র সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করেন—এইজন্য তিনি যে টাকা দিয়াছেন তাহার সুদ হইতে এই ছাত্র সম্মিলনীতে পুরস্কারাদি দেওয়া হয়।

• কি ভাবের প্রেরণায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, কি সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে এবং কোথায় আসিয়া তাহার সমাপ্তি হইল, বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউটের ইতিহাসে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে দেশের যাহা প্রয়োজন এই ইন্‌ষ্টিটিউট্ তাহার সাধন ক্ষেত্র। কেবল মাত্র একজন দরিদ্র লোকের আন্তরিক চেষ্টায় এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে। কেবলমাত্র দৃঢ় ও অবিচলিত চিত্তে ভগবানের করুণায় বিশ্বাস করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াই এই কার্য্যটি হইয়াছে—বিরোধী শক্তি চিরদিনই জগতে আছে—তাহারা কার্য্যে বাধা দেয়, অতিকষ্টে আমরা যাহা উপার্জ্জন করি সে তাহা কাড়িয়া লয়—এই প্রকারে বিরোধী শক্তির সহিত দ্বন্দ্ব করিতে করিতে জীবনের পথে সকলকেই অগ্রসর হইতে হয়—শশিপদ বাবুর সমস্ত জীবন এই দেবাসুরের মহাযুদ্ধে পরিপূর্ণ। কিন্তু বিরোধী শক্তি তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই—কারণ আর কিছুই নহে তিনি ভগবানের করুণা অতিশয় দৃঢ়ভাবে হৃদয় দিয়া চিরকাল ধরিয়াছিলেন—শেষে দেবশক্তিরই জয় হইল। দেবশক্তির পরিচয় মিলনে—ইন্‌ষ্টিটিউট্ এই মিলনের ক্ষেত্র এবং সেবাব্রত শশিপদ বাবুর জীবন যুদ্ধের বিজয় পতাকা স্বরূপ—এই পতাকায় সেই আনন্দময় পরম পুরুষের নাম অমর অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে।

দেশের যুবকগণের প্রাণ আজ দেশের জন্য কাঁদিয়াছে—এই দুঃখ দুর্দ্দশার দিনে ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা ও আশা। যুবকগণ এই পতাকার নিম্নে সম্মিলিত হউন। এই পতাকার ভিত্তি মূলে শত সহস্র বাধাবিঘ্ন আজ পর্য্যুদস্ত হইয়া নীরবে অবস্থান করিতেছে, যুবকগণ পতাকায় অঙ্কিত সেই আনন্দময়ের নিত্য উৎসাহদায়ী স্বরূপ হৃদয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করুন, তাহা হইলেই সেবাব্রত মহাশয়ের কার্য্যের ভার তাঁহারা মস্তকে লইয়া মাতৃভূমিকে বৈভবে ও গৌরবে মণ্ডিত করিতে পারিবেন। এই যে নবযুগের সাধনা ইহা যুবকদিগেরই জন্য।

সেবাব্রত শশিপদ

(৬০ বৎসর বয়সে)

দশম পরিচ্ছেদ।

চরিত্র বল।

(সুরাপান নিবারণের চেষ্টা।)

সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম্মজীবন আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরাপান কিরূপ প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা বলা হইয়াছে এবং তিনিই বা কিরূপে একবার অসৎ সংসর্গে পতিত হইয়াছিলেন, সে কথাও বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর শোক ও পীড়ার মধ্য দিয়া ভগবানের করুণহস্তের স্পর্শ অনুভব করিয়া তিনি নবজীবন লাভ করিলেন, তাহাও সেই স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুরার হস্ত হইতে ভগবানের বিশেষ কৃপায় তিনি স্বয়ং অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু সুরাপান নিবন্ধন দেশের যে শোচনীয় দুর্গতি হইতেছিল তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন বরাহনগরের অধিকাংশ স্থলেই ধনী দরিদ্র সুরাপানে বিভোর। এই ভীষণ বিষপানে কত অকালমৃত্যু ঘটিতেছে, কত পরিবার দারিদ্র্য, পাপ ও দুর্নীতির গহ্বরে ডুবিয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই।

বিলাতী শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদিগকে যেমন অনেক ভাল জিনিস দিয়াছে, তেমনি অনেক খারাপ জিনিসও দিয়াছে। আমরা যদ্যপি

২৫২ পৃষ্ঠায় বরাহনগরে ভিক্টোরিয়া স্কুলের ট্রাষ্টিগণের মধ্যে অনবধানতা বশতঃ অবসর প্রাপ্ত সব জজ শ্রীযুক্ত রায় গিরিশচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুরের নাম মুদ্রিত হয় নাই। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই নামটি যথাস্থানে সংযোগ করিয়া লইবেন।

এই ভাল জিনিসগুলিকে গ্রহণ করিয়া, মন্দগুলিকে পরিহার করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের যথার্থ উন্নতি সাধিত হইবে।

বিলাতের নিকট হইতে আমরা যে সমস্ত মন্দ জিনিস পাইয়াছি, তন্মধ্যে সুরাপান একটি প্রধান। প্রাচীন ভারতে সুরাপান যে অত্যন্ত অল্প ছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই। আজকাল শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে এই পাপ কিছু কিছু কমিতেছে এবং অনেক ভদ্রসমাজেই সুরাপান নিন্দিত হইতেছে; কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত সমাজে সুরাপান একটি 'ফ্যাসান' হইয়া পড়িয়াছিল। শশিপদবাবু তাঁহার গ্রামবাসীগণের মধ্যে এই পাপের প্রাবল্য দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং সুরাপান নিবারণকল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তারিখে, বরাহনগরে এক সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। শশিপদ বাবুর জ্ঞাতি-পিতৃব্য রায় ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈটকখানায় অনুষ্ঠান সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কোন সাহেব বা কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিকে সভাপতি পদে বরণ করা হয় নাই। শশিপদবাবুদের ভট্টপল্লী নিবাসী গুরুবংশের তৎকালীন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ স্বর্গীয় শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শশিপদ বাবুর জেঠতুত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে বনহুগলির জমিদার স্বর্গীয় নিমচাঁদ মৈত্রেয় মহাশয়, (এখন অবসর প্রাপ্ত) সবজজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীযুক্ত শশিপদবাবুকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

শশিপদ বাবু প্রথম হইতেই তাঁহার কার্য্যে কিরূপে জাতীয় ভাবের অনুবর্ত্তন করিতেন তাহা এই সভাপতি নির্ব্বাচন হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আবার এই ঘটনার বহু পরে যখন কেইন সাহেব বরাহ-

নগর আসেন, তখন শশিপদ বাবু বড় বড় সাহেব মহলে খুব মিশিতেন, কিন্তু কেইন্ সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য বরাহনগরে যে সভা করেন, তাহাতে তাঁহার গুরু স্বর্গীয় কৃষ্ণহরি শিরোমণি মহাশয়কে সভাপতি করিয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয় কেইন সাহেবের গলদেশে মাল্যদান করিয়াছিলেন। দেশকে লইয়া যথার্থভাবে কাজ করিতে হইলে এই জাতীয় ভাবের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে।

আমাদের দেশে অনেক শুভানুষ্ঠান হইয়াছে এবং হইতেছে এবং ভবিষ্যতে বিস্তৃততররূপে আরও অসংখ্য প্রকার শুভানুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত সৎকার্য্য কিভাবে সাধন করিলে, আমরা প্রকৃত সুফল প্রাপ্ত হইব তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যে, অনেক অনুষ্ঠান প্রথমে যতখানি আগ্রহ ও আড়ম্বরের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয়, কার্য্যক্ষেত্রে ততখানি ফল পাওয়া যায় না। ইহা একটা বড় নিরাশা ও দুঃখের বিষয়। আসল কথা এই যে, কেবলমাত্র সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিয়া, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া, সভার প্রকাণ্ড আফিস খুলিয়া, জেনারেল কমিটি, সব কমিটি, অধ্যক্ষ কমিটি, চাঁদা তোলা, আফিসার, কেরাণী, ভলান্টিয়ার, প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া, চেয়ার টেবিল বেঞ্চি, রীম রীম কাগজ, বস্তাদরুণে লাল ফিতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করাই সফলতার সদুপায় নহে, ইহা ছাড়া আর একটি খুব বৃহৎ বস্তুর প্রয়োজন তাহা আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্র! এইটুকু ব্যতীত, যে কার্য্যই করা যাউক না কেন, তাহা প্রাণহীন দেহমাত্র।

শশিপদবাবু জীবনে অনেক কার্য্যই করিয়াছেন—তাঁহার সকল কার্য্যেই বিশেষরূপ সুফলও ফলিয়াছে—তাহার একমাত্র কারণই এই যে, তিনি যখন যে কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন তখনই আপনাকে, আপনার সমগ্র হৃদয় ও সমগ্র প্রাণ সেই কার্য্যে ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং

এই আত্মসমর্পণ তাঁহার একান্ত ভগবদ্ভক্তি ও অবিশ্রাম প্রার্থনা-শীলতাদ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে। একেবারে আত্মহারা হওয়া ও সেই কার্য্যের সহিত সর্ব্বতোভাবে একাত্মতা অনুভব করাই শশিপদবাবুর যাবতীয় কার্য্যের বিশেষত্ব।

সুরাপান নিবরেণের জন্য সভা প্রতিষ্ঠা করা হইয়া গেলে মাসে মাসে যথারীতি তাহার অধিবেশন হইতে লাগিল। দুএকটি অধি-বেশনের পর একটি অধিবেশনে গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন ও প্রার্থনার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। মানুষ নানা স্থানে নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকে এবং নানারূপ মানসিক চঞ্চলতা লইয়া সভা-সমিতির কার্য্যে আসিয়া থাকে তাহাতে কার্য্যে সকল সময়ে বেশ মনঃসংযমও হয় না, শ্রদ্ধার সহিত সকলে সকলের কথার মর্ম্মাবধারণও করিতে পারে না। কার্য্যের প্রথমে প্রার্থনা করিলে চিত্তের শান্তি বিহিত হয় এবং কার্য্যে মনঃসংযমও হয়। সেদিন প্রার্থনার পর সভার কার্য্য আরব্ধ হইলে এইরূপ প্রার্থনার সুফল সকলেই অনুভব করিলেন। সভাস্থ সকলে সভার পর স্থির করিলেন যে এই প্রকারে প্রার্থনার পর সভার কার্য্য আরম্ভ করাই সঙ্গত। সেই দিন হইতে এইরূপ ব্যবস্থা হইল। এই সম্মিলিত প্রার্থনা হইতে বরাহনগর ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব হইল। একটি সৎকার্য্য আর একটি সৎকার্য্য উৎপন্ন করে, তাহা আবার অন্য সৎকার্য্যে লইয়া যায়, ইহারও প্রমাণ এই ঘটনা হইতে পাওয়া যাইতেছে।

তিনি সুরাপাননিবারণী সভা স্থাপন করিয়া স্বয়ং সুরাপায়ীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। দিন রাত্রি আর বিশ্রাম নাই, অন্য চিন্তা নাই। সুরাপায়ীগণ নিজেদের আড্ডায় বসিয়া সুরাপান করিতেছে, নানারূপ হল্লা করিতেছে, এমন সময়ে, শশিপদবাবু, তথায়

গিয়া উপস্থিত হইলেন। যেখানে যান, সেইখানেই এই কথা, বেশ অন্তরের সহিত সুরাপানের দোষ কীর্ত্তন করিয়া, সুরাপানকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়াও সুরাপায়ীগণকে প্রেমের দ্বারা বশীভূত করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে "আশা সমিতি" (Band of hope) নামক এক সম্প্রদায় গঠন করিলেন। এই সম্প্রদায়ের সদস্যগণ শশিপদ বাবুর সহিত আন্তরিকতার সহিত সুরাপান নিবারণ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এ প্রকারের কার্য্য কখনও বিফল হয় না। বড়ই আশ্চর্য্য রকমের ফল ফলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুরাপান নিবারণের ও শশিপদবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টার কথা সহরের সর্ব্বত্রই আলোচিত হইতে লাগিল।

সুরাপান নিবারণের জন্য শশিপদ বাবু নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সুরাপানের দোষ বর্ণনা করিয়া অনেক সঙ্গীত রচিত হয়, এই সঙ্গীত রচনায় শশিপদ বাবু স্বর্গীয় গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই সমস্ত সঙ্গীত চারিদিকে গান করান হইত এবং এই সমস্ত গান ও অন্যান্য উপদেশ ছোট ছোট কাগজে ছাপাইয়া বিতরণ করা হইত। সুরাপান নিবারণ বিষয়ক অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরাপানের অপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য বালকগণকে পারি-তোষিক দানের ব্যবস্থা করা হয়।

সুরাপায়ীগণ একে একে সুরাপান ছাড়িতে লাগিলেন; শুধু ইহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আসিয়া শশিপদবাবুর কার্য্যে যোগদান করিলেন। এই সময়ের Bengal Harkara ও Friend of India নামক ইংরাজপরিচালিত সংবাদ পত্রদ্বয় অতি প্রচণ্ডভাবে সুরাপান নিবারণকল্পে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের কার্য্যাবলীকে আক্রমণ

করিল। The Friend of India অর্থাৎ ভারতবন্ধু, (?) তাঁহার ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট তারিখের কাগজে লিখিলেন।

"Temperance is one thing, total abstinence another. And if there is a country to which the latter doubtful virtue is ill adapted, it is in India. Here the enervation of mind and body induced by the climate imperatively demand stimulants, and taken in moderation, they are decidedly beneficial. The advocacy of the doctrine of abstinence should be made penal within the tropics."

অর্থাৎ পরিমিতভাবে মদ্যপান এক কথা, আর একেবারে মদ্যপান না করা আর এক কথা। ভারতবর্ষে একেবারে মদ না খাওয়া একেবারে অসঙ্গত, ইহা কখনই সদ্‌গুণ নহে। এদেশের জলবায়ুতে শরীর ও মনের এমন একটা অবসাদ আসে যে, উত্তেজকের প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে মদ্যাদি পান নিশ্চয়ই এদেশে উপকারী, সুতরাং যাহারা মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা করিতেছে, আইন করিয়া তাহাদিগকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করা উচিত।

এখনকার দিনে অবশ্য কোনও দেশহিতকারী ব্যক্তি এ প্রকারের কথা বলিবেন না। এই উক্তি হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, শশিপদবাবু যখন সুরাপান নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতে ছিলেন, সে সময়ে, তাঁহাকে কিরূপ প্রচণ্ডপ্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এই সময়ের অন্যান্য সংবাদ পত্রেও ইহার বিস্তৃত আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। দেখিতে দেখিতে যেখানে যেখানে সুরাপায়ীগণের আড্ডা ছিল, সেই সেই স্থানে এক একটি পাঠাগার স্থাপিত হইল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শশিপদবাবু যখন বরাহনগরে শ্রমজীবী সমিতি স্থাপন করেন, তখন ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে

হইলে, সুরাপান একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম ছিল। এই প্রকারে সুরাপান নিবারণ ও শ্রমজীবিগণের উন্নতি সাধন কার্য্য এক সঙ্গে চলিতে লাগিল। প্রত্যেক সভায় নূতন নূতন লোক আসিয়া অনুতাপ করিয়া সভার সভ্য হইতে লাগিল।

এই সংস্কার কার্য্যে শশিপদবাবুর ব্যক্তিগত চরিত্রের একটি আখ্যান বর্ণনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। বরাহনগরের একজন শিক্ষক অত্যন্ত সুরাপায়ী ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে, শশিপদ বাবু স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসের প্রেরণায়, রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেছেন। এই স্থানে বসিয়া সুরাপানের দোষ ও তাহা নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করার উপযোগীতা সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময় রোগীর একজন বন্ধু বলিলেন যে, যিনি নিবারণ করিবেন, তিনিই যখন তাঁহার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন না, তখন অন্যে কি প্রকারে সুরাপান ছাড়িবে? শশিপদবাবু তখন তামাকু সেবন করিতেছিলেন। বক্তা এই অভ্যাসকে লক্ষ্য করিয়াই কথাটা বলিলেন। শ্রবণমাত্র শশিপদবাবু হুঁকাটি নামাইয়া রাখিলেন, তাহার পর, আর, তিনি জীবনে কখনও তামাকু সেবন করেন নাই।

যাহারা সুরাপায়ী এবং সুরাপানের প্রসার বৃদ্ধির সহিত যাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, তাহারা শশিপদবাবুর কার্য্যের কিরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, শশিপদবাবু কিরূপ প্রবল শত্রুতার বিরুদ্ধে বীরের মত কর্ত্তব্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সুরাপায়ীগণ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিবিধ কটুবাক্যে শশিপদবাবুকে নানারূপ গালাগালি করিতে লাগিলেন। কতলোক কত প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল এবং তাঁহার জীবনের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। একদিন শশিপদবাবুর সুরাপাননিবারণী

সভার অধিবেশন হইতেছে, এমন সময়ে একজন সুরাপায়ী মুন্সেফ, মদ্যপানে পাগল হইয়া জোরপূর্ব্বক সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন ও নানারূপে হর্‌রা আরম্ভ করিয়া দিলেন। আর একদিন সভার অধিবেশনের প্রারম্ভে একজন মদ্যবিক্রেতা আসিয়া সভার কার্য্যে বাধা দিয়া বলিল, যে, যে সমস্ত লোক মদ্যপান ছাড়িয়াছে, তাহারা তাহাদের নিকট প্রাপ্য টাকা আগে পরিশোধ করিয়া দিউক। এই প্রকারের বাধা, কত দিন যে, কত রকমে সংঘটিত হইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আর একটি কঠিন রকমের ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। একদিন শশিপদবাবু কলিকাতায়, আপিসের কর্ম্ম করিয়া বরাহনগরে ফিরিতেছিলেন। পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের নৌকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই নৌকায় তিনি ও তাঁহার সহচর অপর কয়েকজন ভদ্রলোক আরোহণ করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, বরাহনগরের এক মদ্যবিক্রেতার এক ভৃত্য এক ভার মদ লইয়া পূর্ব্ব হইতেই নৌকায় উঠিয়া বসিয়া রহিয়াছে! শশিপদ বাবুর লোকটীকে একত্রে লইয়া যাইতে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু এই মদ্যসহ তিনি যাইতে চাহিলেন না, লোকটি অগত্যা বাধ্য হইয়া নৌকা হইতে নামিয়া গেল। লোকটি গাড়ী করিয়া নৌকা পঁহুছিবার পূর্ব্বেই বরাহনগরে গিয়া পঁহুছিল ও তাহার প্রভুকে সমস্ত কথা বলিল। শশিপদবাবুরা যখন ঘাটে আসিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করেন, তখন দেখেন, সেই মদ্য বিক্রেতা দলবল লইয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সহিত তাঁহাদের অনেক কথান্তর হইল। তাহার পর ঐ মদ্য বিক্রেতা থানায় গিয়া শশিপদ বাবু ও তাঁহার বন্ধুগণের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, তাঁহারা তাহার ভৃত্যকে মদ সহিত গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়াছেন। এই অভিযোগের ফলে

শশিপদ বাবু ও তাঁহার বন্ধুগণকে এক রাত্রি হাজতে বাস করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, পরদিন সেই ভৃত্যটিকে উপস্থিত করায় গোলযোগ মিটিয়া গেল। শশিপদ বাবুর বন্ধুগণ এই মদ্য ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করার জন্য অভিযোগ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু শশিপদ বাবুর জন্য তাঁহারা অপকারীর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শশিপদ বাবু চিরজীবন এইভাবে চলিয়াছেন। আততায়ীর উপর কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই।

আরও কত রকমের বিঘ্ন, তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা বর্ত্তমান প্রস্তাবে অসম্ভব। কত সময়ে কত দেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধুগণের সম্মিলনে মদ্যপান করিবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তিনি কখনই সঙ্কল্পভ্রষ্ট হন নাই। এই প্রকারে সহস্রবিধ বিঘ্ন পদদলিত করিয়া, সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়া এক ঐকান্তিকতা ও যথার্থ প্রেমের দ্বারা, তিনি সুরাপান নিবারণ বিষয়ে যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনির্ব্বচনীয়। এ পাপ এখনও দেশে পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে আমাদের সমাজশক্তি পূর্ব্বে যতটা জাগ্রত ছিল, এখন আর যেন ততটা নহে বলিয়া মনে হইতেছে। আমাদের দেশের হিতকামী ব্যক্তিগণ শশিপদ বাবুর আদর্শ অনুসরণ না করিলে এ সমস্যার মীমাংসা করিবার উপায়ান্তর নাই।

সুরাপান নিবারণকার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর এই কার্য্যের যথার্থ স্থায়িত্বের বিষয় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার দৃষ্টি সুকুমারমতি বালকবৃন্দের উপর বিশেষভাবে পতিত হইল। এই বালকেরাই দেশের ভবিষ্যত, ইহাদের কোমলচিত্তে যে ভাবের বীজ রোপন করা যাইবে ভবিষ্যতে তাহাই বৃক্ষে পরিণত হইবে।

যে সময়ে শ্রীযুক্ত শশিপদবাবু সুরাপান নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন সেই সময়কার সমগ্র অবস্থাটুকু আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার। হরকরা কাগজে এই চেষ্টার বিরুদ্ধে যাহা লেখা হইয়াছিল তাহা বর্ণিত হইয়াছে, কেবল যে মধ্যে মধ্যে এই প্রকারে ইংরাজ-সম্পাদিত কাগজে লিখিয়া এই উদ্যম বিফল করিবার চেষ্টা করা হইত তাহা নহে—সেই সময়ে একটি বৃহৎ সভা ছিল, তাহার নাম (Social Science Association) এই সভা অবশ্য প্রথম বিলাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিলাতে এখনও সে সভা আছে। কলিকাতানগরীতে তাহার একটি শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিমিতভাবে মদ্যপান করায় উপকার আছে—এই কথা এই সভার কোন অধিবেশনে আলোচিত হয়। এই সভায় অনেক বড় বড় পদস্থ সাহেব ও দেশীয় ভদ্রলোক ছিলেন। এই সে সময়ের অবস্থা, সুতরাং সুরাপান নিবারণ যে কত কঠিন ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন দেশের ও জগতের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ইহা ছড়া আরও বহু বিঘ্ন ছিল ; শশিপদবাবুর হস্তে দেশহিতকর অনেকগুলি কার্য্যের ভার ছিল, এই সমস্তকার্য্য তাঁহার জীবনস্বরূপ, এই সমস্ত কার্য্যের জন্য তাঁহাকে নানা লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইত। এই সমস্ত লোকের মধ্যে অনেকেই খুব ভাললোক, কিন্তু অনেকেরই মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। বিশেষতঃ সাহেবদিগের মধ্যে সুরাপান একটি রীতি—শশিপদবাবুকে সাহেবদিগের সহিতও খুব মিশিতে হইত। মদের গ্লাস অনেক সময়েই তাঁহাকে দেওয়া হইত, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা এত অধিক যে কোন অনুরোধে কখনও তাঁহার চরিত্রে দুর্ব্বলতা আসিতে পারে নাই এবং কখনও তিনি সুরাপান করেন নাই। এই প্রকারের দুই একটি ঘটনা বর্ণনা করিলে অবস্থাটি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। ইংরাজী ১৮৬৮ খৃঃ,

শশিপদবাবু তখন একাউন্‌ট্যাণ্ট জেনারেলের আপিসে কর্ম্ম করেন। বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির অবৈতনিক সম্পাদকের কার্য্যও তখন তিনি করিতেন। বরাহনগরে তখন তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র খুব বিস্তৃত, নানারূপ সদনুষ্ঠানে ও সদালোচনায় বরাহনগরকে তিনি তোলা-পাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত এ, স্মিথ, সাহেব তখন ২৪পরগনার ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং তিনি বরাহনগর মিউনিসিপ্যালটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য একদিন শশিপদবাবু আলিপুরে এই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। আলিপুর গিয়া সংবাদ পাইলেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ববাহনগর গিয়াছেন ও সেই থানেই আছেন। শশিপদবাবু ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বরাহনগর ফিরিলেন। স্বর্গীয় প্রাণনাথ চৌধুরী মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত গোপীবাবুর বৈটকখানায় সাহেবের ক্যাম্প হইয়াছে। শশিপদবাবু ক্যাম্পে আসিয়া মাজিষ্টেট্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব বাহাদুর একাকী ক্যাম্পে আছেন কাজেই তখন অবসর অধিক, আর সে অবস্থায় লোকজনের সহিত আলাপ করিবার আকাঙ্ক্ষাও স্বভাবতঃ খুব অধিক হইয়া থাকে। শশিপদবাবু আসিয়া বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত কথা, পথঘাট নর্দ্দামা প্রভৃতি, অতিশয় নিপুণভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সাহেব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন শশিপদবাবু খুব কর্ম্মদক্ষ। সাহেবের সহিত খুব ঘনিষ্ঠতাও ছিল, সাহেব তাঁহাকে কোথায় চাকুরী করেন, কত বেতন পান এই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শশিপদবাবু তখন মাসিক পঞ্চাশটাকা বেতন পাইতেন। এই বেতনের কথা শুনিয়া সাহেব তাঁহাকে বলিলেন আপনি আমার আপিসে কর্ম্ম করিবেন? সেই সময়ে ম্যাজিষ্টেটের হেডক্লার্কের পদ থালি ছিল, বেতন ১২০্ টাকা টাকা, শশিপদবাবু সম্মত হইলেন।

এইরূপ সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠতা, তাহার পর সাহেব তাঁহাকে অনুগৃহীতও করিলেন। এইরূপ অবস্থায় সাহেব তাঁহার সহিত তাঁহাকে কিছু খাইতে অনুরোধ করিলেন। সে অনুরোধে শশিপদবাবু সম্মত হইলেন—সাহেব তাঁহাকে মদ দিলেন, কিন্তু শশিপদবাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তা বলে, উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

হাইকোর্টের সুবিখ্যাত বিচারপতি সার্ জন ফিয়ার সাহেবের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। শশিপদ বাবুর সহিত তাঁহার কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। একবার সার্, জন্ ফিয়ার শশিপদ বাবুর বাটীতে আগমন করেন। সে অনেক দিনের কথা, তখন বরাহনগরে বরফ সোডাওয়াটার প্রভৃতি পাওয়া যাইত না। শশিপদ বাবু স্থানীয় ইংরাজবন্ধু পূর্ব্বকথিত আলেক্জান্দার সাহেবের নিকট কিছু বরফ ও সোডা চাহিয়া পাঠান। সাহেব শশিপদ বাবুকে অনুগৃহীত করিবার জন্য ও ফিয়ার সাহেবের প্রয়োজন বলিয়া, এই সঙ্গে কয়েক বোতল সেরি, স্যাম্পেন আদি ভাল মদ্য পাঠাইয়া দেন। ফিয়ার সাহেব অবশ্য মদ্য পান করিতেন, আর পূর্ব্বোক্ত সাহেব বন্ধুটি মদ্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে নিজেও খাইতে হইবে না, মূল্যও দিতে হইবে না। এ অবস্থায় সাধারণ লোকে বিশেষ আপত্তি করে না। কিন্তু এ বিষয়ে শশিপদ বাবুর জীবনের নীতি অত্যন্ত দৃঢ়। তিনি মদের বোতল গুলি সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন।

১৩১৯ সালের ভাদ্র মাসের "নব্যভারত" পত্রিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত লেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"১৮৬৪ খৃঃ শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাদক নিবারণ

সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুরাসেবনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কেবল সভা প্রতিষ্ঠা, বক্তৃতা ও মাদক সেবনের অপকারীতা বিষয়ে সহজবোধ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিতরণ করায় তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি সুরাসেবিগণের মজলিসে গিয়া তাহাদের প্রতি আত্মীয়তা ও স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সুরা-সেবনে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়া অনেক স্থানেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং এরূপভাবে তাঁহার কর্তৃক সুরা সেবনে বিরত অনেক শ্রমজীবি ও ভদ্র সন্তানদিগকে আমরা সেকালে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই সম্বন্ধে কেইন্ সাহেব লিখিয়াছেন—During the first year of the Society's existence upwards of twenty men were rescued from intemperance and vice. Gradually most of the known drunkards gave up their habits and many of them joined a Reading club formed by Mr. Banerji on the very site where there was formerly a drinking club."

এই মাদক সেবন নিবারণ বিষয়ে যদি কোনও ব্যক্তি বিবিধ ক্লেশ-ভোগ করিয়া থাকেন, তবে শশিপদ বাবু সেজন্য কৃতজ্ঞতার পাত্র। এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আবাল্য নিরামিষাশী এবং মাদক সেবন বিরোধী। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে সুরাপানের স্রোত খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সে সময়ের শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে মদের ব্যবসায়ী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি তাঁহাদের ব্যবসায় পরিত্যাগ করাইতে পারেন নাই, তাঁহাদের সম্পাদিত (ইণ্ডিয়ান্ মিরার) পত্রিকার প্রাচীন ফাইল অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন, মদের বিজ্ঞাপন বাহির হইত।"

ইহার পর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গুম্‌খুনের অভি-যোগে পড়িয়া শশিপদ বাবু যে হাজত বাস করিয়াছিলেন সে কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রে এই মদের বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার অযৌক্তিকতার কথা মহাত্মা শ্রীযুক্ত কেশব-চন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট শশিপদ বাবু বর্ণনা করেন, কেশব বাবু সঙ্গে সঙ্গেই এই বিজ্ঞাপন তুলিয়া দেন।

শশিপদ বাবুর অনেক খেজুর গাছ ছিল—এই সমস্ত খেজুর গাছ 'শিউলি'রা আসিয়া মাসিক ভাড়া দিয়া গ্রহণ করে ও খেজুরের রসে তাড়ি প্রস্তুত করে। শশিপদ বাবু তাড়ি প্রস্তুত করার জন্য খেজুর গাছ কখন ও জমা দিতেন না।

সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিরূপ ধীরতার সহিত এই সুরাপান নিবারণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইল। তাঁহার চেষ্টা সে সময়ে দেশে একটি বিশেষরূপ আলোচনা জাগ্রত করিয়াছিল, তাহা তৎকালীন সংবাদ-পত্রাদি অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালা ১২৭১ সালের ২৫শে মাঘ তারিখের সুবিখ্যাত "সোম প্রকাশ" পত্রে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল—

"বরাহনগরে একটি সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় দুই শত ভদ্রলোক এই সভার সভ্য হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে ইঁহাদের মধ্যে অনেকই অগ্রে সুরার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার সম্পাদক বাবু শশিপদ বঁন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় যত্ন সহকারে যতদুর দেশের উন্নতি সাধন করিতে হয়, তাহা করিতে-ছেন। অধিক কি বলিব তিনি প্রতি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভদ্রলোকদিগের রীতিনীতি দর্শন করিয়া সংশোধন করিতেছেন।"

পরলোক গত শ্রদ্ধাস্পদ প্যারিচরণ সরকার মহাশয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "Well Wisher" পত্রে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর সুরাপান নিবারণ কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন—

"Many drinking parties have been turned into reading clubs and places of innocent amusement. Seldom do we meet with youngmen in the streets disturbing the peace of the village under influence of drink."

ইহার অর্থ এই যে পূর্ব্বে যাহারা দল বাঁধিয়া সুরাপান করিত, এখন তাহারা পড়াশুনা করিবার জন্য সমিতি করিয়াছে এবং সেই সমস্ত স্থান নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের স্থান হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে। যুবকগণ মদ খাইয়া গ্রামের পথে দাঁড়াইয়া শান্তিভঙ্গ করিতেছে এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় না।

একজন লোকের দ্বারা এত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও এরূপ কার্য্য হইল, ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। এই কার্য্যের সুফল যখন দেশবাসীগণের শ্রবণ গোচর হইল, তখন দেশে কিরূপ এক নূতন আশা ও নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইল তাহা অবর্ণনীয়। বড়লোকে বা শক্তিশালী লোকে কোন বড় কার্য্য করিতেছে, অর্থ ও প্রতিপত্তি তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতেছে, এ প্রকারের ঘটনা শুনিলে সাধারণ লোকের মনে খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয় না, কারণ তাহারা মনে করে তাহাদের যখন শক্তি ও প্রতিপত্তি নাই, তখন তাহাদের পক্ষে এ সমস্ত কার্য্য করা সর্ব্বৈব অসম্ভব। কিন্তু শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার শক্তিও ছিল না, বিশেষ কিছু প্রতিপত্তিও ছিল না, অথচ তাঁহার কৃতকার্য্যতা অতুলনীয়।

কি প্রকারে তিনি এই কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন ইহাই প্রশ্ন। তাঁহার কৃতকার্য্যতার রহস্যটুকু অবগত হইলে আমরাও কর্ম্মজীবনে

সফলতার সদুপায় কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিব। তাঁহার বলের মধ্যে কেবল একটি বল—চরিত্রবল। এই বলে বলীয়ান বলিয়াই তিনি এই সফলতা লাভ করিয়াছেন। চরিত্রবল সকল দিক হইতেই শশিপদ বাবুতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই চরিত্র বলের প্রথম কথা দৃঢ়া-নীতি। বর্জ্জনের উপর জীবন চলিতে পারে না. সকলের সহিত মিশিতে হইবে, প্রয়োজন মত সকলের সাহায্যও লইতে হইবে, কিন্তু দেখিতে হইবে নিজের যাহা জীবনের দৃঢ়ানীতি তাহা যেন কখনও কিছুতে ভঙ্গ না হয়। শশিপদবাবু কিভাবে তাঁহার নিজের জীবনের যাহা নীতি তাহা অটুটভাবে রক্ষা করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে সকলেই লাভবান হইবেন।

একবার শশিপদ বাবু খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে আফিং খাইতে পরামর্শ দিলেন, বলিলেন আপনার যে বয়স হইয়াছে তাহাতে আফিং খাইলে আপনার শরীরের খুব উন্নতি হইবে। শশিপদ বাবু সেই অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক কেদার বাবুকে বলিয়াছিলেন "No Kedar I can't die an opium-eater." অর্থাৎ আমি আর শেষ বয়সে আফিং খোর হইয়া মরিতে পারি না। এই ঘটনা তিরিশ বৎসরের ও পূর্ব্বের। জীবনের যাহা নীতি, সত্য বলিয়া ধরিয়া যাহা আশ্রয় করিয়াছি, রোগে শোকে তাপে, অভাবে সকল সময়ে তাহা ধরিয়া থাকার শক্তি মুখে বলিতে খুব সহজ কিন্তু কার্য্যতঃ কয়জন লোকের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়? এই শক্তি যদি একজন লোকের চরিত্রে ও থাকে, আর তিনি যদি সমস্ত জগতের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তাঁহারই জয় হইবে, বিরোধী জগৎ অবনত মস্তকে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।

আজ দেশের যুবকগণের মধ্যে সাধু সঙ্কল্পের ও নবীন উৎসাহের

সঞ্চার হইয়াছে। জীবনের আদর্শ বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, দেশের ও সমাজের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা অনেকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন। আজ এই সমস্ত যুবকের অন্তর্মুখী হইয়া আত্মপরীক্ষা করা প্রয়োজন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এই চরিত্রবল তাঁহাদের আছে কি না, এইভাবে দৃঢ়নীতি আশ্রয় করিয়া সত্যের চরণে তাঁহারা আত্ম-সমর্পন করিতে পারিয়াছেন কিনা। যদি এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সকল বিভাগেই সফল হইবেন। আজ তাঁহার কার্য্যের সিদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হউক বা না হউক, অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাহার ফল অন্তঃসলিলা ফল্গুর প্রবাহের মত বহিয়া যাইতেছে।

আর একটি কথা, বিশ্বাস। আমি যখন সত্যকে আশ্রয় করিয়াছি, আমি যখন নিজের মান যশঃ নহে, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা বা অর্থ প্রতিপত্তি নহে, আমি যখন ভগবানের প্রতি চাহিয়া এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছি তখন আমার এই চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে।

আর এক কথা সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি। আমরা অনেক সময় বড় বড় উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ছোট কার্য্যগুলি ভুলিয়া যাই। অতি সামান্য বিষয়ে ত্রুটি, সেও সামান্য নহে—এই সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টির অনুশীলন ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সাধন করা যায় না। প্রধানতঃ এই সমস্ত কারণেই শশিপদ বাবুর সমস্ত চেষ্টা সফলতার রত্ন-মুকুটে অলঙ্কৃত হইয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পারিবারিক সমস্যা।

(স্ত্রীশিক্ষা)

স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতিসাধন নবযুগের সাধনার একটি অতি বিশিষ্ট অঙ্গ। এক সম্প্রদায় লোক যে ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা একেবারে অতিশয় মন্দ বলিয়া উপহাস ও তীব্র সমালোচনার বিষবাণ বর্ষণ করিয়া গৌরব বোধ করেন, তাহা ঠিক নহে। হিন্দুসমাজে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চিরকালই আছে, তবে শিক্ষার প্রণালী চিরকালই একরূপ নহে। এ কালে ছাপা পুস্তক খুব বেশী হইয়াছে, সমাজের অবস্থা ও প্রয়োজন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, কাজেই এ সময়ে শিক্ষাদানের প্রণালীও অন্যরূপ না হইয়া পারে না। কিন্তু সেকালে অক্ষরপরিচয় বা পুস্তকগত বিদ্যাদানের ব্যবস্থা না থাকিলেও গার্হস্থ্যনীতি, শিক্ষানীতি, সহজচিকিৎসা, পৌরাণিক আখ্যানাদি ও ধর্ম্মাচরণ ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষা করিতেন। এ সমস্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি না থাকিলে নিন্দা হইত। এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য বিদ্যালয়ে যাইতে হইত না! দেশে জীবনসংগ্রাম তখন এত প্রবল ছিলনা, লোকে বৃহৎ যৌথপরিবারে বাস করিত, বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব, বারমাসে তের পার্ব্বন হইত, প্রাচীনারা বালিকা ও নবীনাদিগকে শিক্ষাদান করিতেন, এই প্রকারে শিক্ষার স্রোত অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। স্ত্রীলোকেরা অনেকেই নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু মূর্খ ছিলেন না। আবার মধ্যে মধ্যে অনেক বিদুষী বহুশাস্ত্রও আলোচনা করিতেন, এমন কি শাস্ত্র ব্যাখ্যাদিও করিতেন।

সে কালে যেরূপ জীবন ছিল, পুরুষদের শিক্ষার যেরূপ আদর্শ

ছিল, স্ত্রীলোকদিগেরও ঠিক তদনুরূপ ছিল। এখন জীবনপদ্ধতি একেবারে বদলাইয়া গেল, আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, ঠিক প্রাচীনভাবে জীবন যাপন অসম্ভব। তাহার পর শিক্ষা সংসর্গ প্রভৃতির দ্বারা পুরুষদিগেরও জীবনের আদর্শ বদলাইয়া গিয়াছে এ অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষারও নূতন ব্যবস্থা প্রয়োজন। স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা কেবলমাত্র বালিকাদিগের জন্য থাকিলেই যে কাজ হইয়া গেল তাহা নহে, বয়স্থা রমণী ও বিধবাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না ও পারিবারিক জীবন সুশৃঙ্খল হইতে পারে না। কারণ বালিকাগণের অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়া যায়। উচ্চজাতিগণের মধ্যে নানা কারণে বিবাহের বয়স অল্প দিনের মধ্যে খুব বাড়িয়া গেলেও বাল্য বিবাহ যে দেশ হইতে শীঘ্র যাইবে তাহার সম্ভাবনা নাই।

এ কালের পদ্ধতি অনুসারে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল এবং এই চেষ্টা কিরূপে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান আকারে আসিয়া উপস্থিত হইল এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে ও সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি। ইংরাজী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে—"মহাত্মা ডেভিড হেয়ার" কর্ত্তৃক "স্কুল সোসাইটি" কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, মহাত্মা হেয়ার ও স্বর্গীয় সার রাধাকান্ত দেব মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন, দেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তার করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম যখন বালকদিগের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বালিকাগণও এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইত। বালিকাদিগের জন্য সার রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের গৃহে পুরস্কার বিতরণ করা হইত। ক্রমশঃ মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় বালকগণের বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের পড়িতে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

"স্কুল সোসাইটি"র অধীনে বালিকাগণের সাধারণ ভাবে শিক্ষাদানের

ব্যবস্থা এই প্রকারে প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর কিছুদিন আর এ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বিশেষ আলোচনা হয় নাই। এই সময়ে বিলাতে একটি সভা গঠিত হয় তাহার নাম "দি ব্রিটিশ এণ্ড, ফরেন্ স্কুল সোসাইটি।" এই সভা কলিকাতার স্কুল সোসাইটির লণ্ডনের প্রতিনিধি (Agent) ও শ্রীরামপুরের বিখ্যাত মিশনারী মিষ্টার ওয়ার্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন ও ভারতবর্ষীয় মহিলাগণকে শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া কার্য্য করার পদ্ধতি শিখাইবার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ করেন। এই সভা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই কুমারী কুক ১৮২১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিলাত হইতে কলিকাতা আসিলেন। কিন্তু কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, কুমারী কুক'এর ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না, ফলে "চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটি" নামক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকগণের সভা কুমারী কুককে তাঁহাদের অধীনে নিযুক্ত করিলেন। অবশ্য কুমারী কুক যখন এদেশে আসিলেন তখন যে স্ত্রীলোকেরা কেহই লেখা পড়া জানিতেন না তাহা নহে, তবে সাধারণ ভাবে স্ত্রীশিক্ষা দিবার কল্পনা তখনও দেশবাসীগণের মনে উদিত হয় নাই। কুমারী কুক কত প্রকারে বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে আকর্ষণ করিতে ও অভিভাবকগণকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টায় বিশেষ কিছু হইল না। মিস্ কুক পরবর্ত্তী সময়ে বিবাহের পর শ্রীমতী উইলসন্ নামে পরিচিতা হন, শেষে তাঁহাকে এই প্রকারে হিন্দু সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয় অনাথ বালক বালিকাগণের শিক্ষা কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হয়। তিনি সার্কুলার রোডে অবস্থিত এক অনাথাশ্রমের ভার গ্রহণ করেন।

অবশ্য কুমারী কুকের এই পরিশ্রমের ফলে যে কোনই কার্য্য হয়

নাই তাহা নহে। তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কুমারী কুকের তত্ত্বাবধানে ২৪টি বালিকা বিদ্যালয়ে ৪০০ বালিকা সংগৃহীত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কুমারী কুক চার্চ্চ মিশন সোসাইটির অধীনে কার্য্য করিতেছিলেন, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে চার্চ্চ মিশন সোসাইটি স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য "লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন"এর হস্তে অর্পণ করেন। দূরদূরান্ত মফঃস্বলে যে সমস্ত সাহেব মেম থাকিতেন তাঁহারা এই সভার সভ্য হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে দেশীয় বালিকাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সভার দ্বারা এক সময়ে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ৩০ টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৬০০ শত বালিকা অধ্যয়ন করিত। এই প্রকারে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী না হইয়া এই সভা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে একটি বড় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে এই বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ী প্রস্তুত হয়। তৎকালীন কলিকাতার এক বিখ্যাত ধনী রাজা বৈদ্যনাথ এই বিদ্যালয়ের জন্য কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণীর বালিকাগণই প্রধানতঃ বিদ্যাশিক্ষা করিত, এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে প্রধানতঃ খৃষ্টান ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইত।

'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রথমে বালিকা শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশীয় ও ইউরোপীয় সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় এই সভা বালিকা শিক্ষার কার্য্য পরিত্যাগ করেন। সভা বালিকা শিক্ষার ভার পরিত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু এই সভার কতকগুলি সভ্য ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "ফিমেল জ্যুভেনাইল সোসাইটি" নাম দিয়া এক সমিতি গঠন পূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে এই কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সমিতির চেষ্টায় উচ্চশ্রেণীর বালিকাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার আদৌ কোনরূপ হয় নাই।

ভদ্রঘরের বালিকাগণের জন্য প্রথম বিদ্যালয় ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বারাসতে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার মহাশয় তৎকালে বারাসত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তিনি তত্রত্য নবীনকৃষ্ণ মিত্র ও কালীকৃষ্ণ মিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহার পরই "হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সহিত মহাত্মা বেথুনের নাম বিশেষ ভাবে বিজড়িত। মহাত্মা বেথুন সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যৎকালে সতীদাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন সেই সময়ে এই বেথুন সাহেব বিলাতে এ দেশের সতীদাহসমর্থনকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে টাকা লইয়া ওকালতী করিয়াছিলেন। পরে বেথুন সাহেব এ দেশে যখন আইনসচিব হইয়া আগমন করেন তৎকালে তাঁহার মনে দারুণ অনুতাপের উদয় হয় এবং এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার-কল্পে জীবন সমর্পণ করেন। তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুকালে উইল করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কল্পে প্রদান করিয়া তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যের যেন প্রায়শ্চিত্ত করেন। এই বেথুন সাহেব ও স্বর্গীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে এই "হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়" ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির মধ্যে হিন্দু সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে সময়ে বিদ্যালয়ের জন্য বালিকা সংগ্রহ করা বড় সহজ কার্য্য ছিলনা। হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত, প্রথম দেশীয় বিখ্যাত বক্তা স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, বিখ্যাত কবি ও গ্রন্থকার পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়গণ এই বিদ্যালয়ের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে সমাজের অবস্থা এইরূপ ছিল যে স্ত্রীশিক্ষার পোষকতা করার

জন্য তাঁহাদিগকেও সমাজের হস্তে নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল। আপন কন্যাকে বিদ্যালয়ে দেওয়ার জন্য তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সমাজে পতিত হইতে হইয়াছিল।

এই হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কাল হইতেই হিন্দু সমাজে ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কিছু দিন স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের কার্য্য করেন সেই সময়ে তিনি অনেক স্থানে বালিকা বিদ্যালয় করিয়া নিজ ব্যয়ে তৎসমুদয় রক্ষা করেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় একশত। পরে সরকার বাহাদুর এই সমস্ত বিদ্যালয়ের ব্যয় মঞ্জুর করিলেন না। ডাইরেক্টারের সহিত মতভেদ হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় পদত্যাগ করিলেন, ফলে এই সমস্ত বিদ্যালয় পরিচালনার ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর পতিত হইল।

'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' এরই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া উত্তরকালে 'বেথুন স্কুল' এ পরিণত হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সহিত দেশে স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু কার্য্য অধিক জোরে অগ্রসর হয় নাই। এই বিদ্যালয়ের যাঁহারা কার্য্যকারী সভার সভ্য তাঁহারা পর্য্যন্ত নিজ নিজ বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে ভয় পাইতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এগার বৎসর পরে বিদ্যালয়ে মাত্র ৭০টি বালিকা ছিল।

শশিপদ বাবু যৎকালে স্ত্রীশিক্ষার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন সে সময়ে দেশে স্ত্রীশিক্ষার এই অবস্থা। এতদিন দেশের অনেক মহাত্মার চিত্তেই স্ত্রীশিক্ষার উপযোগীতার কথা জাগ্রত হইয়াছিল। ভারতের হিতকামী অনেক ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা এ জন্য অনেক কার্য্য করিয়াছেন। স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব, মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার ও স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি দেশের চিরপূজনীয় মহাত্মাগণ এজন্য অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার যথেষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্য

যে ভাবে আরম্ভ হয় শশিপদ বাবু ঠিক সে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন না। তাঁহার পদ্ধতি অন্যরূপ। তিনি প্রথমে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা চিন্তা করিলেন, দেখিলেন যে বালিকাদিগকে দু এক বৎসর বা চারি পাঁচ বৎসর বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া লিখিতে ও পড়াইতে শিখানই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা-দান নহে। শিক্ষার দ্বারা স্ত্রীজাতির চিত্তবৃত্তির অনুশীলন করাইতে হইবে সুতরাং শিক্ষা কেবল বালিকাদিগের জন্য নহে, সকল স্ত্রীলোকের জন্যই প্রয়োজন। তিনি অনুষ্ঠান পত্র ছাপাইলেন না, সভা ডাকিলেন না, চাঁদা তুলিলেন না, তিনি নিজের স্ত্রীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। শশিপদ বাবুর এই কার্য্য আরম্ভ করার বিশিষ্ট-তার মধ্যেই তাঁহার জীবনের বিশিষ্টতা নিহিত রহিয়াছে তাহা আমরা সকলকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বতোমুখী উন্নতি ও বিস্তার কল্পে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু সমস্ত জীবন উদ্যোগী। এ বিষয়ে দেশে স্মরণীয় যাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছে, তাহার সকলগুলির সহিত শশিপদ বাবুর বিশেষ যোগ ছিল। বেথুন স্কুলের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা ইহার প্রথম প্রমাণ পাইব। ১৮৪৯খৃষ্টাব্দে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোট ছোট বালিকাগণকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করাই তখন এই স্কুলের কার্য্য ছিল। এই বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ভদ্রলোক এই বিদ্যালয়কে উন্নত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু অন্যান্য শিক্ষিত ও পদস্থ সভ্যগণের আপত্তি নিবন্ধন কিছুই করিতে পারেন নাই। বিদ্যালয়টিকে উন্নত করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে হাইকোর্টের বিচারপতি সার্ জন ফিয়ার মহোদয় অন্যতম। ১৮৭৩খৃষ্টাব্দে কুমারী এনি একরইড্ নামক একজন জন-হিতৈষিনী ইংরাজ মহিলা ভারতবর্ষে আসিয়া সার্ জন ফিয়ার' মহোদয়ের গৃহে অতিথি হইলেন। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন বিলাতে ছিলেন তখন এই কুমারী একরইডের সহিত

তাঁহার আলাপ হয় এবং কুমারী একরইড যে ভারতবর্ষে আসিয়া স্ত্রী-জাতির শিক্ষার উন্নতি বিধানকল্পে কিছু করিতে চাহেন, একথাও তিনি সেই সময়ে শশিপদ বাবুকে বলেন। কুমারী একরইডের তত্ত্বাবধানে সার জন ফিয়ার ও তাঁহার পত্নীকর্তৃক বালিগঞ্জে 'হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয়' নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্ জন ফিয়ার্ এই বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সভাপতি ও তাঁহার পত্নী ইহার সম্পাদিকা ছিলেন। বয়স্থা স্ত্রীলোকদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের এদেশে ইহাই প্রথম চেষ্টা। ইহার পূর্ব্বে অবশ্য আর একবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এই চেষ্টাটির মূল হেতু কুমারী মেরি কার্পেণ্টার। তিনি এদেশে পর্য্যটন করিয়া সমস্ত অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া কতকগুলি "ফিমেল নর্ম্ম্যাল স্কুল" দেশ মধ্যে যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সে জন্য সরকার বাহাদুরকে ও বিলাত যাইয়া ষ্টেট্ সেক্রেটারীকে বিশেষ অনুরোধ করেন। এই সমস্ত বিদ্যালয় করার উদ্দেশ্য স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যের উপযুক্ত করা। ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হাউসে একপরামর্শ সভা(conference)হইয়াছিল। সেই সভাকর্তৃক নিয়োজিত এক কমিটির উপর এই প্রস্তাবের ভার রহিল। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু এই কমিটির একজন বিশেষ উদ্যোগী সভ্য ছিলেন, লর্ড লরেন্স সে সময়ে ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন এই কার্য্যে তাঁহারও অশেষ সহানুভূতি ছিল। তিনি বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রত্যেক প্রদেশের জন্য এই কার্য্যে মাসিক এক হাজার টাকা করিয়া মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কলিকাতা সম্বন্ধে এইরূপ প্রস্তাব করা হয় যে বেথুন স্কুলের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া এই 'নর্ম্ম্যাল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হইবে। একখানি মহিলাপঠিত কাগজে ছাত্রীগণকে বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়া এক বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত বাহির হইল। ছাত্রীগণকে

আহ্বান করা হইল বটে, কিন্তু কোনরূপ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইল না। এদিকে এই বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ উত্থিত হইল। বেথুন কলেজের কার্য্যকরী সমিতিও আপত্তি করিলেন। ফলে এই হইল যে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে নর্ম্ম্যাল স্কুল হইয়া গেল কিন্তু বঙ্গদেশে হইল না।

যাহা হউক সার্ জন্ ফিয়ার্ ও তাঁহার পত্নীকর্ত্তৃক কুমারী একর-ইডের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত মহিলা বিদ্যালয়'ই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম সফল চেষ্টা। এই বিদ্যালয়েও হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গ যোগদান করিলেন না। কোন প্রকারে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য কয়েক বৎসর চলিল, তাহার পর সার্ জন ফিয়ার্ তাঁহার হাইকোর্টের কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলে এই বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেল। ভারত-মহিলা-বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতিতে শশিপদ বাবু একজন সভ্য ছিলেন এবং কুমারী একরইডের যাবতীয় পরীক্ষা ও কষ্টের মধ্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার দুইবৎসর কাল ৫০ পাউণ্ড করিয়া এই বিদ্যালয়কে দিয়া ছিলেন, এই টাকা হইতে যে সমস্ত বিধবা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবার জন্য লেখাপড়া শিখিতে চাহেন তাঁহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইত। কাহাকে বৃত্তি দেওয়া হইবে তাহা নির্ব্বাচন করিবার ভার শশিপদ বাবুর উপরে ছিল। হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে কিছু দিন আর এ বিষয়ে কোন কার্য্য হয় নাই, তাহার পর ইংরাজী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস ও আনন্দমোহন বসু মহোদয়দ্বয়ের চেষ্টাতে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের সহিত শশিপদ বাবুর বিশেষ যোগ ছিল।

ইংরাজী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় ও বেথুন স্কুলের সম্মিলন সাধিত হয়, এই সম্মিলন হইতেই এদেশে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা

লাভের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে "বেথুন স্কুল" ছোট ছোট বালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বড়লাট লর্ড লীটন্ বাহাদুরের মহিষী মহোদয়া এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল" ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও তাঁহার স্বপক্ষীয়গণ বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় ও বেথুন স্কুলের সংমিশ্রণে আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি ফলোপধায়ী হয় নাই। তাহার পর বেথুন স্কুল ক্রমে তাহার বর্ত্তমান আকারে আসিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, যাহা আলোচিত হইল তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি কল্পে সাধারণ ভাবে যত কিছু আন্দোলন হইয়াছে তাহার সমস্তগুলির সহিতই অতীব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্ব্বে অর্থাৎ ভারতমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে যখন বেথুন স্কুলে বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ করার ও বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের প্রস্তাব হয় তখন গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত ফিয়ারসাহেবকে এই সমস্ত প্রস্তাব যথারীতি গঠন করিতে অনুরোধ করেন। সার্ জন্ ফিয়ার মহোদয় শশিপদ বাবুকেই এই সমস্ত প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিতে বলেন। এই প্রকারে সাধারণ বা প্রকাশ্য আন্দোলনাদির সহিত একযোগে কাজ করাতেই শশিপদবাবুর শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই, ইহা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তৎপ্রণীত ইংরাজী পুস্তিকায় এই বিষয়ে যথার্থই বলিয়াছেন—

"It will thus be seen that Babu Sasipada Banerji did not go out of his way, like many so called reformer of latter days, to seek and find out his work. His life-work, on the contrary, itself sought him out. It arose at first out of a private and personal necessity, and then, by slow degrees, growing both in volume and velocity, it became first the centre of reforming activities in a large family, then in course of time it included within its operations a small town and finally, in the fulness of the purposes of a benign providence, whose hand has been clear in it all along, it was embodied in a recognised and useful institution of a large and enlightened province."

Social Reform in Bengal Page 50.

অর্থাৎ ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরবর্ত্তীকালের তথা:-কথিত অনেক সংস্কারকের মত নিজের যাহা যথার্থ কর্ম্মভূমি তাহা পরিত্যাগ করিয়া কাজ খুঁজিয়া বাহির করিতে যান নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার যাহা জীবনের কার্য্য সেই কার্য্যই তাঁহাকে বরণ করিয়াছিল। প্রথমতঃ তাঁহার এই কার্য্য নিজের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত হয়। তৎপরে ধীরে ধীরে তাহার আয়তন ও বেগ বর্দ্ধিত হয় এবং প্রথমে একটি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে সংস্কারমূলক কার্য্যের কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া এই কার্য্য একটি ক্ষুদ্র সহরকে ব্যাপ্ত করে পরিশেষে বিধাতার করুণ উদ্দেশ্য যাহা প্রথমাবধিই এই কার্য্যে পরিদৃষ্ট হইয়াছে তাহা একটি বৃহৎ ও উন্নত প্রদেশের একটি সুপরিচিত ও আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করে।

শশিপদ বাবুই অন্তঃপুর শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি যে সময়ে

স্বর্গীয়া রাজকুমারী দেবী।

(শশীপদ বাবুর প্রথমা পত্নী।)

এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন (১৮৬১ খৃঃ) সে সময়ে খ্রীষ্টীয় সমাজও অন্তঃপুর শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এখন অবশ্য এ বিষয়ে দেশে নানারূপ কার্য্য হইতেছে। সরকার বাহাদুরও অন্তঃপুর শিক্ষার ভার আংশিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক অন্তঃপুর শিক্ষা আরদ্ধ হওয়ার দুই বৎসর পরে ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবন্ধু সভায় অন্তঃপুর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।*

শশিপদবাবু আজীবন জাতীয় ভাবে স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও সার্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য পূর্ব্বে অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—আমরা এস্থলে তাঁহার কার্য্যের বিশেষত্বগুলি বর্ণনা করিতেছি। তাঁহার কার্য্যের প্রথম বিশেষত্ব গৃহে বসিয়াই যাহাতে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যালোচনা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা। এজন্য তিনি নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের যাহা প্রণালী এখানেও ঠিক সেই প্রণালীই অবলম্বন করিলেন।

তাঁহার প্রথম কার্য্য আপন স্ত্রীকে শিক্ষাদান করা—ক্রমে পারিবারিক বিদ্যালয়। এই যে কার্য্য ইহা একটি আদর্শরূপে আমাদের দেশের সকলের সমক্ষে তিনি সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত করেন। যাঁহারা বাস্তবিকই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী, তাঁহারা এই প্রকারে নিজ নিজ গৃহে আপন আদর্শ মত কার্য্য আরম্ভ করিলে সহজেই কার্য্য অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইতে পারে। স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে শশিপদ বাবুর যাহা ধারণা তাহা তিনি একস্থানে অতি সুন্দর ও সহজ কথায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। শশিপদ বাবু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর বরাহনগরের যুবকগণকে লইয়া "আত্মোন্নতি-বিধায়িনী সভা" নামক একটি সভা করেন। এই সভার কথা পরে বর্ণিত হইবে। এই সভার এক

* প্রবাসী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু যুবকগণকে নিজ নিজ পত্নী ও পরিবারের অন্যান্য মহিলাগণকে সুশিক্ষা দানের জন্য উৎসাহদান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ভাল স্ত্রী, যিনি স্বামীর মনোবৃত্তি ও যাবতীয় কার্য্যের ঠিক মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, অর্থাৎ যিনি স্বামীর শিক্ষার অনুরূপ কিছু শিক্ষা পাইয়াছেন, তিনি মাছধরা জালের সোলার মত। সোলা যেমন জালকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখে, সে স্ত্রীও তেমনি সংসারের যাবতীয় অবসাদ, নিরাশা ও প্রলোভনের ঊর্দ্ধে স্বামীকে রক্ষা করেন, আর ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন স্ত্রী, মাছধরা জালের লোহার মত; লোহা যেমন জালকে জলের নীচে টানিয়া ডুবাইয়া রাখে, তাঁহারাও সেইরূপ স্বামীকে অবসাদ, নিরাশা ও স্বার্থপরতার মধ্যে ডুবাইয়া রাখে।

শশিপদ বাবুর স্ত্রীশিক্ষার প্রণালীটুকু আলোচনা করিলেও আমরা অনেক শিক্ষা পাইব। আপন গৃহ ও পরিবার তাঁহার প্রথম কর্ম্মক্ষেত্র ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রথম ছাত্রী। শশিপদ বাবুদের বৃহৎ পরিবার, পুত্র, পৌত্র, ও কন্যা দৌহিত্র ক্রমে সাতপুরুষ একত্রে বাস করিত। এই বৃহৎ পরিবারের সমস্ত স্ত্রীপুরুষের উপহাস ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে তিনি আপন স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর দেখাদেখি তাঁহার ভ্রাতার স্ত্রী, তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী, এই প্রকারে বাড়ীর সমস্ত স্ত্রীলোক এমন কি প্রবীণা পিসিমাতাগণ পর্য্যন্ত শ্লেট পেন্সিল ও পুস্তক হাতে লইলেন, সে এক অতি মনোহর দৃশ্য সন্দেহ নাই। আগে পরিবারের মধ্যে এই প্রকারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া তাহার পর বাহিরে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। উত্তরকালে শশিপদ বাবু বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধবাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন—কিন্তু এই কার্য্যের সূত্রপাতও এই সময়েই হয়। কারণ এই শিক্ষাব্যবস্থায়ও বিধবাগণকে

শিক্ষা দান করা হইত। এই পারিবারিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ইংরাজী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হয়, তাহার পূর্ব্বে বা সে সময়ে এরূপ চেষ্টা আর হয় নাই। তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পুস্তক প্রচারের জন্য এক পুস্তকাগার (Female Circulating Library) প্রতিষ্ঠা করেন। বালিকারা সকলে বাড়ীতে পড়িবে তাহার পর তাহাদের পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে এজন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই যে বীজ তিনি বপন করিলেন, ইহা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার এই কার্য্যের সমস্তগুলিই অল্পাধিক পরিমাণে দেশ গ্রহণ করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে সর্ব্বতোভাবেই গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা হয়, ইহা আমরা সামান্য আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব।

ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল ও অন্যান্য অনুষ্ঠান।

আমাদের স্ত্রীজাতির শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে সমস্ত চেষ্টা হইতেছে তন্মধ্যে "ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল" এর কার্য্য বিশেষরূপে স্মরণীয়। "ভারত-স্ত্রীমহামণ্ডল" জাতীয়ভাবে অন্তঃপুরশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমতী সরলাদেবী এই "মহামণ্ডল" এর স্থাপয়িত্রী। দুই বৎসর পূর্ণ হইল "ভারত-স্ত্রীমহামণ্ডল" এর শাখা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরলোকগত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস মহোদয়া এই সৎকার্য্যের জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন। হিন্দু পরিবারের অনেক মহিলাই এই সৎকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহামণ্ডল এই বৎসরে ২২ জন শিক্ষয়িত্রী দ্বারা ১২৫ জন ছাত্রীকে অন্তঃপুরে শিক্ষাদান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মহামণ্ডল বালিকা শিক্ষারও ভার গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছেন।

বালিকাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদের পুরস্কারাদি দ্বারা উৎসাহিত করার কার্য্য শ্রীহট্টসমিতি (Syehet union) কর্ত্তৃক প্রায় ছত্রিশ বৎসরকাল চলিতেছে। তাহার ফলে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে শ্রীহট্টের অবস্থা কিছু উন্নত। ত্রিপুরা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ অনুষ্ঠান আছে। উত্তরপাড়া হিতকরীসভাও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে এইরূপ কার্য্য করিতেছেন।

এখন অবশ্য বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যাঁহার যেরূপ আদর্শ তিনি তদনুসারে এই কার্য্য করিতেছেন—ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়, মহাকালী পাঠশালা, জগৎপুর আশ্রম সকলেই নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় যে এ বিষয়ে দেশে একটা উন্নতির সুবাতাস বহিতেছে। কিন্তু আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে এখনও কার্য্য অনেক বাকী—প্রত্যেক পরিবারে বা প্রত্যেক পল্লীতে স্ত্রীলোকেরা যাহাতে অবসর সময়ে একত্রে মিলিত হইয়া জ্ঞানগর্ভ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা, সৎগ্রন্থাদি পাঠ ও উপদেশাদি শ্রবণ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি খুব দুঃখের কথা আছে। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের অবাধে যতটা মিশিতে পারিতেন—পল্লী নষ্ট হইয়া নূতন নূতন সহরের উদ্ভব নিবন্ধন এখন আর ততটা পারেন না। এ বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

শশিপদ বাবু আর একটি কার্য্যে বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য যাহাতে করিতে পারেন এরূপভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এই একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্য। সম্প্রতি 'ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল' এর এক অধিবেশনে লাহোরের ভূতপূর্ব্ব জজ্ সার প্রতুলচন্দ্র চট্টো-

পাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি তাঁহার বাটীর পার্শ্বে একটি বিধবাশ্রম খুলিবেন। তথায় নিরাশ্রয়া ভদ্র বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্যানুসারে জীবনযাপন করিয়া নিজ নিজ উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন। তিনি এই আশ্রমে ২৫ জন অসহায়া ও সন্তান-হীনা বিধবার ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। এ এক অতীব সুসংবাদ সন্দেহ নাই। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন করিতে হইলে এমন শিক্ষয়িত্রী চাই, যাঁহারা আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা হইয়া দেশের স্ত্রীজাতির শিক্ষার উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন। এই বিধবাশ্রমে যদি এই প্রকারের শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে দেশের একটি প্রকৃত অভাব দূরীভূত হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শিক্ষার দ্বারা স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন করিতেই হইবে। ইহা একটি অত্যাবশ্যকীয় জাতীয়-সমস্যা। এই কার্য্য দেশে আরম্ভও হইয়াছে—আদর্শ লইয়া মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। যাঁহার যেরূপ আদর্শ তিনি তদনুসারে কার্য্য করুন, ইহাই সদুপায়। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু যে আদর্শ অনুসারে স্ত্রীশিক্ষা দান করিতেন, তাহাও অতি মনোযোগের সহিত আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। জাতীয়ভাব তাঁহার জীবনে শৈশব হইতে কত প্রবল, তাহা আমরা তাঁহার অন্যান্য কার্য্যের আলোচনায় বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করিয়াছি। এই স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়েও এই জাতীয়ভাব তিনি কিরূপ মনোযোগের সহিত রক্ষা করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ ভাবে আলোচ্য। তাহার পর, তাঁহার এই সংরক্ষণ, উন্নতিমুখী। দু একটি কথা বলিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

স্ত্রী-জীবনের আদর্শ মাতৃত্ব—তাঁহারা গৃহলক্ষ্মী হইয়া পরিবারে

আনন্দময়ের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন, স্বর্গের ফুলের মত পুত্র কন্যাগুলি তাঁহাদের দৃষ্টিতলে বিকশিত হইয়া উঠিবে, ইহাই সমাজে তাঁহাদের মুখ্য কার্য্য। হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিলে ও হিন্দুপরিবারের বিষয় শ্রদ্ধান্বিত ভাবে আলোচনা করিলে, এই তত্ত্বটুকু বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। শশিপদ বাবু স্ত্রীশিক্ষার পুরোদেশে এই মাতৃত্বের আদর্শ, এই গৃহলক্ষ্মীর আদর্শ, এই পতিপ্রাণতা, সন্তান-বাৎসল্য, অতিথিসেবা প্রভৃতির আদর্শ, অতীব মনোযোগের সহিত প্রথম হইতেই শিক্ষাপদ্ধতি, উপদেশ, পুরস্কার দান, নিজের পারিবারিক জীবনের আদর্শ প্রভৃতির দ্বারা আজীবন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। আজকাল অনেকটা বোধ হয় ইউরোপের অনুকরণে, আর অনেকটা বোধ হয় নিরুপায় হইয়া, অনেক পিতা মাতা কন্যাগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় যশস্বিনী করিবার জন্য ব্যাকুল, তাহাদের বিবাহাদির চিন্তা যেন আর মনে স্থান দেন না—মেয়েরা ছেলেদের মত চাকুরী করিবে—এইরূপ লক্ষ্য লইয়া স্ত্রীশিক্ষা দানে অগ্রসর হইয়াছেন—শশিপদ বাবু চিরকালই ইহার বিরোধী। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শক্তির যাহাতে, বিকাশ হয় তাহা করিতেই হইবে—কিন্তু এই শক্তি ব্যক্তিতন্ত্র অনধীনতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে, পারিবারিক জীবনের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত না হয়, ইহা শশিপদবাবুর অভিপ্রেত নহে।

স্ত্রীলোকদিগকে প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে যতই প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়, ততই মঙ্গল, ইহা শশিপদ বাবুর আর একটি মত। এই মত আলোচনা করিতে হইলে হিন্দু সভ্যতার একটি মৌলিক বিশিষ্টতা অনুধাবন করা দরকার—প্রতিযোগীতা (competition) পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র। জীবনসংগ্রাম (struggle for existence) ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest)

পাশ্চাত্য সভ্যতার পতাকার উপর স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। সম্মিলিত কার্য্য (co-operation) হিন্দু সভ্যতার মূলনীতি—আত্মত্যাগ ও সেবা (sacrifice) হিন্দু সমাজের সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হাক্সলি (Huxley) বলিয়াছেন struggle for existence is the law of evolution in the brutes, sacrifice is the law of evolution in man—জীবন-সংগ্রাম পশুর অভিব্যক্তির নিয়ম, ত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ মানবের অভিব্যক্তির নিয়ম। এইটি হিন্দুগণ নিজেদের কথা বলিয়া গ্রহণ করিবেন। শশিপদ বাবুর জীবনবৃত্ত আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি, এই হিন্দুভাব তাঁহার জীবনের সমস্ত কার্য্যের মধ্য দিয়া কিরূপে সুবিকশিত হইয়াছে—হিন্দুর দেশে এই যে আদর্শ ইহা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই অধিক বিকশিত, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই কারণেই অনেক তন্ত্রে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে খুব স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে যে ধর্ম্মে স্ত্রীলোকের অধিকার উচ্চ। বৈষ্ণবশাস্ত্র এমন কথা বলেন যে, ভক্তি সাধনার যেগুলি উচ্চতম ভাব সেগুলি স্ত্রীপ্রকৃতি সুলভ। এইজন্য পুরুষজাতি যদি সেই উচ্চতায় আরোহণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে রমণীহৃদয়ের এই কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিতে হইবে। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগী পরীক্ষা—ছেলেদের এ পরীক্ষায় অগত্যা অগ্রসর হইতেই হইবে, কারণ জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করার জন্য ও উদরান্নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি অনেকটা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যহানি করিয়াও বৎসর বৎসর হাজার হাজার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে—কি করে? অন্য উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবার মত স্বাধীনচিত্ততা তাহাদের নাই।

কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে এই প্রতিযোগীতার মধ্যে আনয়ন করার বিশেষ প্রয়োজন নাই—বিশেষতঃ মাতৃত্ব ও গৃহলক্ষ্মীত্ব যদি আদর্শ হয়,

তাহা হইলে প্রতিযোগীতার সমরক্ষেত্রে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ও চিত্তের স্বাভাবিকী কোমলবৃত্তি গুলি অন্ততঃ-পক্ষে কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্বী-কৃত করার প্রয়োজন কি? অবশ্য উচ্চতম জ্ঞানের দ্বার স্ত্রীলোকদিগের পুরোদেশে উন্মুক্ত থাকিবে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিভাগে তাঁহারা যাহাতে উচ্চ-তম জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, কেবল জ্ঞানলাভ করা নহে, এই জ্ঞান লাভ করিয়া সাহিত্যের দ্বারাই হউক আর উপদেশের দ্বারাই হউক, এই জ্ঞানালোক যাহাতে দেশমধ্যে বিকীর্ণ করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু এই জ্ঞানান্বেষণে তাঁহাদের একটা স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার নিস্পেষণে তাঁহাদের পেষণ না করিলেই দেশের মঙ্গল। এই মতটি শশিপদ বাবু নিজের জীবনে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন তাহা তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা অন্তঃপুরসম্পাদিকা স্বর্গীয়া বনলতা দেবীর বিষয় আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণা নহেন, কিন্তু বি, এ, পরীক্ষার ইংরাজী সাহিত্য ও সংস্কৃত তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কিছু কিছু বদ্‌লাইতেছে—এবং এজন্য মান্যবর বিচারপতি ভারতের ও বঙ্গের অদ্বিতীয় গৌরবরবি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সমস্ত দেশ যে কি পরিমাণে কৃতজ্ঞ তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তথাপি মোটের মাথায় একথা বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না যে, এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদিগের বিদেশীয় শিক্ষা, সভ্যতা, সাহিত্য ও সাধনার সহিত যতটা ঘনিষ্ট পরিচয় সাধন করে, দেশের ও দেশের শাস্ত্র, সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতির সহিত ততটা পরিচয় সাধন করে না। এই যে আমাদের উন্নতিশীল বাঙ্গালা সাহিত্য, যাহার অপেক্ষা আমাদের অধিকতর

স্বর্গীয়া বনলতা দেবী।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস।

গৌরবের বিষয় আর কিছু নাই—সেই বাঙ্গালা সাহিত্য অতি অল্পদিন হইল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিয়াছে—বাঙ্গালা লেখকগণও যে মনীষি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইবার যোগ্য, বিশ্ববিদ্যালয় তাহা অতি অল্পদিন হইল স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্ববিস্থালয়ের শিক্ষা ছেলেদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে—কিন্তু দেশের প্রতি শ্রদ্ধার ও পরিচয়ের বিশেষ অনুশীলনে সহায়তা করে না—এ প্রকারের শিক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে প্রদান করা হয় কেন? সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যাদির শিক্ষা স্ত্রীলোকদিগের অধিক প্রয়োজন।

দেশের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত সকল দিক হইতে শশিপদ বাবু এই প্রকারে কেবল যে দার্শনিক পণ্ডিতের মত চিন্তা করিয়াছেন বা কবির মত কল্পনা করিয়াছেন তাহা নহে, নিজের মতগুলি আজীবন কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। এই পুস্তকে শশিপদ বাবুর কন্যাদিগের কথা প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার কন্যাদিগের শিক্ষাদান বিষয়ে নিজের আদর্শের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষাদানের কার্য্য এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে হাতে কলমে করিতে হয়—সেই প্রথম যৌবনে আপন স্ত্রী ও পরিবারের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পর কত বালিকা বিদ্যালয়, বিধবাশ্রম প্রভৃতি ও নিজের কন্যাদিগের শিক্ষাবিধান, সমস্ত জীবন ধরিয়া তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছে।

শশিপদ বাবুর জীবনের রহস্য তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বিশিষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত একথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই ধর্ম্ম-জীবনের পরেই তাঁহার জাতীয়ভাব বা স্বদেশপ্রেম সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই স্বদেশপ্রেম তাঁহার সমস্ত জীবন ধরিয়া কিরূপভাবে কার্য্য করিয়াছে তাহা বিশদরূপে আলোচনা করিলে এই জাতীয় আন্দোলনের দিনে আমাদের যে কত কল্যাণ হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সেবাব্রত শশিপদ বাবুর যেমন ধর্ম্মজীবন, তেমনি জাতীয় ভাব, এই দুইটি সর্ব্বদা মনে রাখিয়া তাঁহার জীবনবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই দুইটির সহিত পরিচয় না থাকিলে তাঁহার কোন কার্য্যেরই প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিতে পারা যাইবে না।

শশিপদ বাবু স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বা দেশের স্ত্রীজাতির উন্নতি বিধানের জন্য, আরও অনেকরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেগুলিও আলোচনা করা প্রয়োজন। বিধবাগণের অধীনে ভদ্রলোকের বাড়ীতে পাড়ার বয়স্থা রমণী ও বালিকাদিগের জন্য শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা শশিপদ বাবুর আর একটি কার্য্য। তিনি বরাহনগরে ও তাহার চারিদিকে এই প্রকারের ১৪টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। দুপুর বেলায় ভদ্র গৃহস্থ রমণীগণের প্রায়ই অবসর থাকে এবং এই সময়ে তাঁহারা প্রায়ই পাড়ার কোন লোকের বাড়ীতে একত্র হইয়া, হয় তাস খেলেন নতুবা অলস গল্পে কাল কর্ত্তন করেন, কোন কোন স্থানে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীদাসের মহাভারতাদি পড়া হয়। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে প্রবীণাদের অনুরাগ থাকে, নবীনাদের বিশেষ অনুরাগ থাকে না। শশিপদ বাবুর মহিলা বিদ্যালয়ে, আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে যেমন শ্রেণীবিভাগ বা ক্লাস থাকে, শশিপদ বাবুর বিদ্যালয়ে সেরূপ ক্লাশ বিভাগ ছিল না। যে, যে বিষয়ে যাহা পড়িতে সক্ষম তাহাকে সে বিষয়ে তাহাই পড়ান হইত। দৈনিক পাঠ্যতালিকা বা রুটিন এমন ভাবে করা হইত যে কোন ছাত্রী হয়ত উচ্চ শ্রেণীতে সাহিত্য পড়ে আবার নিম্নশ্রেণীতে গণিত পড়ে, তাহাতে কোন অসুবিধা হইত না। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার যথার্থ উন্নতি চাহেন তাঁহারা ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন এই উপায়টি কত সুন্দর।

দেশের সহিত যথার্থ পরিচয় ও তৎপ্রতি যথার্থ অনুরাগ থাকিলে, সৎকার্য্য সকল করিবার কিরূপ নূতন নূতন উপায় পাওয়া যায়, এইবার

শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর জীবনবৃত্ত হইতে তাহাই আলোচনা করা যাউক।

নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা প্রায়ই অল্পবেতনে কর্ম্ম করিয়া অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; শশিপদ বাবু যৎকালে বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যের জন্য শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিয়া, দেশের একটি অতি জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার দৃষ্টি অল্পবেতনের শিক্ষকদিগের উপর পতিত হইল। তিনি ভাবিলেন কোনও প্রকারে ইঁহাদের অবস্থার সচ্ছলতা সাধন করিতে পারা যায় কিনা? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহাদের পত্নীদিগের মহিলাশ্রমে শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন, এই বিশেষ বৃত্তি লইয়া তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া থাকিতেন ও দুই বৎসরে যেটুকু শিক্ষালাভ করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের স্বামীর নিকট থাকিয়া বিদ্যালয়ে অথবা বাড়ীতে বালিকাগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই প্রকারে অনেক ভদ্রমহিলা এই বৃত্তির সাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া উত্তর কালে স্বামীর সহিত একত্রে শিক্ষা-দান ব্রতে ব্রতী হইয়া দেশের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, অর্থার্জ্জন দ্বারা স্বামীকে সাহায্য করিয়াছেন এবং 'সহধর্ম্মিণী' এই নামও সার্থক করিয়াছেন। শশিপদ বাবু দেশহিতকল্পে ব্রতী হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই এখন অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে মনে হয় যে এই ভাবে দরিদ্র শিক্ষকদিগের জন্য বিশেষ কার্য্য কিছুই হয় নাই।

আর একদিকে শশিপদ বাবুর দৃষ্টি পতিত হইল। সমাজে এমন ঘটে যে, স্বামী দুশ্চরিত্র হইয়া যায় স্ত্রীর প্রতি আদৌ দৃষ্টি থাকে না। সে অবস্থায় স্ত্রীর কি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা! অনাহারে কষ্ট পায়, হয় ত দু একটি শিশু সন্তানও অনাহারে পড়িয়া থাকে। স্ত্রীলোকটি একেবারে অসহায়, এ

অবস্থায় তাহার উপায় কি? পূর্ব্বে যখন সম্মিলিত পরিবার ছিল, দেশে এত তীব্র অন্নকষ্ট উপস্থিত না হওয়ায়, দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করিবার শক্তি ও ইচ্ছা সকলেরই ছিল, সে সময়ের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এখন এই প্রকারে কত ভদ্ররমণী যে নীরবে দিন রাত্রি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। শশিপদ বাবু সন্ধান করিয়া এই প্রকার রমণীদিগের জন্যও বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই বৃত্তির সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়া এই প্রকারের অনেক রমণীও সম্মানিত জীবিকার পথ পাইয়াছেন ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশেরও হিতসাধন করিয়াছেন।

তাহার পর কুলিন কন্যাদিগের জন্যও এই ব্যবস্থা করিলেন। বহু বিবাহের ফলে অনেক কুলিন কন্যার বিবাহ হয় বটে, কিন্তু স্বামীর আশ্রয় বা সঙ্গ তাঁহাদের জীবনে আর ঘটিয়া উঠে না। এই সমস্ত রমণীর কি ভীষণ দুর্দ্দশা! পিত্রালয়ে গঞ্জনার মধ্যে তাঁহারা যে কি কষ্টে জীবন যাপন করেন তাহা বর্ণতাতীত। শশিপদ বাবু খোঁজ করিয়া এই প্রকারের কুলিন কন্যাকেও বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদেরও শিক্ষয়িত্রী করিয়াছেন।

এই প্রকারে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি কি করা যাইতে পারে, তাহা শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু দেশবাসীকে দেখাইলেন। নিজের দেশের প্রকৃত অবস্থার সহিত যাঁহার পরিচয় আছে ও হৃদয়গত যোগ আছে, তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে এইরূপই হইয়া থাকে। একটি কার্য্যের দ্বারা অনেকগুলি করিয়া সমস্যার ক্রমে ক্রমে মীমাংসা হইয়া যায়।

শিক্ষাদান পদ্ধতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শশিপদ বাবুর ব্যবস্থামত যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহার প্রথম বিশেষত্ব জাতীয়ভাব। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তৎপরে প্রতিযোগীতাবর্জ্জন। প্রকৃত কথা এই যে মনের মধ্যে উচ্চ আদর্শ জাগ্রত করিয়া তাহা সজীব রাখিতে হইবে

এবং সেই আদর্শের দ্বারা আমাদের যাবতীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও কর্ম্মকে নিয়মিত করিতে হইবে, ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমরা আমাদের জীবনকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখি। স্বার্থই একমাত্র সত্য। কিন্তু আর একটি জিনিস আমাদের প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। মানবজীবনের একটি প্রসারতার দিক আছে—সেই প্রসারতার দিক আমাদের মানসদৃষ্টির পুরোদেশে একবার বিকশিত হইলে আমাদের শিক্ষা সার্থক হইবে।

এই জন্য শিক্ষার্থীকে উচ্চ ও উদার আশা ও কল্পনায় উদ্দীপিত করিতে হয়। বিধবাগণের দ্বারা শশিপদ বাবু "দীনহিতৈষিনী" (Sisters of the poor) প্রভৃতি মণ্ডলী গঠন করাইতেন। এই সমস্ত মণ্ডলীর দ্বারা এই উচ্চ ও উদার ভাব সকলেরই চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মাতৃত্ব ও গৃহলক্ষ্মীত্বই শশিপদ বাবুর স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ। শশিপদ বাবু বালিকাগণকে শিক্ষাদানের সময় গৃহস্থালীর কার্য্য বিশেষভাবে শিখাইতেন। রন্ধনাদি কার্য্য তাঁহার শিক্ষার একটি বিশেষ বিষয় ছিল। এখন অনেক বিদ্যালয়ে বালিকাগণকে রন্ধন কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু শশিপদ বাবু যখন এই প্রথা প্রবর্ত্তন করেন, তখন ইহা একেবারে নূতন। অধিক কি অনেকে শশিপদ বাবুকে বলিয়াছিলেন, এই রাঁধিবার ব্যবস্থা আবার কেন? এ ব্যবস্থা তুলিয়া দিন। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া শশিপদ বাবু বলিয়াছিলেন যে বিদ্যালয় তুলিয়া দিতে পারি, কিন্তু রন্ধনব্যবস্থা তুলিয়া দিতে পারি না।

শশিপদ বাবুর জীবনের এক একটি কার্য্য লইয়া তাহার মধ্যে যাহা শিক্ষণীয় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই এক এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তিনি জীবনে কতদিকে যে কত

কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। এই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিতে হইলে, বিলাতের

ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। ইংরাজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জনহিতৈষিনী শ্রীমতী কুমারী কার্পেণ্টার মহোদয়া কর্ত্তৃক এই সমিতি বিলাতে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় তৎকালে বিলাতে ছিলেন এবং এই সমিতির প্রতিষ্ঠাবিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সভার প্রথমে যাহা উদ্দেশ্য ছিল, তাহার কিছু কিছু এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এখনও ঠিক আছে। ভারতবর্ষে সামাজিক ও স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক উন্নতি চেষ্টাকে সাহায্য করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এতদর্থে তাঁহারা ইংলণ্ডের অধিবাসীগণ যাহাতে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সম্যক্ ও স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, ভারতের প্রকৃত অবস্থার সহিত তাঁহাদের যাহাতে পরিচয় হয় তাহার ব্যবস্থা করেন ও ভারতবর্ষে যাঁহারা সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন।

এই সভা বিলাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁহাদের দৃষ্টি শশিপদ বাবু ও তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রতি পতিত হইল। এই সমিতি অনুষ্ঠান পত্রেই শশিপদ বাবুর ও তাঁহার কার্য্যের নিম্নরূপ উল্লেখ করেন "A Brahmin gentleman of very narrow means, having been excommunicated by his people, has lately commenced a workmen's school and institute near Calcutta, —the first of the kind in India—in connection with a large factory ; he had already, during the last four years, established and chiefly maintained a girl's school, classes

for workmen, a Social Improvement Society for educated youngmen, a public library, a dispensary, besides in other ways contributing to the improvement of the neighbourhood." ইত্যাদি।

ইংরাজী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে এই ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটির এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল ও শশিপদ বাবু "করেস্‌পণ্ডিং সেক্রেটারী" হইলেন। সার্ রিচার্ড টেম্পল্ সভাপতি ও পরলোকগত স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ মহাশয় এই শাখার সম্পাদক ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়, এই সভার যোগে শশিপদ বাবু যে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা, তৎপ্রণীত 'বঙ্গে সমাজ সংস্কার' বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। এই শাখায় শশিপদ বাবুই প্রধান কর্ম্মী ছিলেন, শাখাসভার নিয়ম ও কার্য্যপ্রণালী শশিপদ বাবু কর্ত্তৃকই সঙ্কলিত ও নির্দ্ধারিত হয়। শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম কিছুদিন কার্য্য বেশ জোরে চলে নাই, শশিপদ বাবু সে সময়ে কলিকাতায় ছিলেন না। ডাক বিভাগের কার্য্যে কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। তাহার পর ইংরাজী ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এই সভার কার্য্যে এক নবজীবন সঞ্চার করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই উদ্দেশ্যে এই সভার একটি অধিবেশনে শশিপদ বাবু একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (২৫ শে এপ্রিল ১৮৭৮) এই প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি বিষয়ে সভাকে মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রস্তাবগুলির মধ্যে তিনটি প্রস্তাব সভা কর্ত্তৃক গৃহীত ও তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে প্রথম কার্য্য এই যে দুই জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা যাইয়া বাড়ী বাড়ী অন্তঃপুর-বাসিনীগণকে অসাম্প্রদায়িক ভাবে শিক্ষাদান করিতেন। দ্বিতীয়

কার্য্যটি স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকরচনা। আজকাল অবশ্য দেশে স্ত্রীপাঠ্য ভাল পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু সে সময়ে এই প্রকার পুস্তকের বিলক্ষণ অভাব ছিল। "মেরি কার্পেণ্টার সিরিজ্" নামে এই পুস্তকগুলি খ্যাতনামা ও শক্তিশালী লেখকগণের দ্বারা রচনা করাইয়া লওয়া হয় ও গ্রন্থকারগণকে এ জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "মেজ বৌ", স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের "সুরুচির কুটির" এবং স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের "প্রবন্ধ কুসুম" এই প্রস্তাব অনুসারে রচিত ও প্রচারিত হয়। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর তৃতীয় প্রস্তাব অনুসারে কয়েক জন মহিলা ও ভদ্রলোককে লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়—এই কমিটির সদস্যগণ বালিকা বিদ্যালয় ও অন্তঃপুর শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন পূর্ব্বক পুরস্কার ও বৃত্তিদান করিয়া ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। কুমারী মেরীকার্পেণ্টার এই সভার স্থাপয়িত্রী ও আজীবন এই সভার সম্পাদিকা ও সর্ব্বস্ব ছিলেন। তিনি চারিবার এদেশে আসিয়াছিলেন। দেশের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি, কারাগার সংস্কার প্রভৃতি নানা কার্য্যেই তিনি আমাদের চির কৃতজ্ঞতার পাত্রী। কুমারী কার্পেণ্টারের মৃত্যুর পর কুমারী ম্যানিং এই সভার সম্পাদিকা হয়েন। তিনিও এই সভার জন্য অনেক কার্য্য করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বাংশেই কুমারী কার্পেণ্টারের উপযুক্তা উত্তরাধিকারিণী। তিনিও এদেশে আসিয়াছিলেন এবং সভাকে তিনি চল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা দিয়া গিয়াছেন। এই টাকায় সভার অশেষ উপকার হইতেছে। কুমারী ম্যানিং এর পর সুপরিচিতা কুমারী বেক্ সম্পাদিকা হইয়াছেন। বিলাতপ্রবাসী শিক্ষার্থী ভারতীয় যুবকগণের জন্য তিনি বিলাতে যথেষ্ট কার্য্য করেন।

এই গেল পূর্ব্বোক্ত এসোসিয়েসনের সহিত সংশিষ্ট ভাবে শশিপদ বাবুর কার্য। ইহাছাড়া তিনি দেশমধ্যে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানকল্পে

পুরস্কার ঘোষণা করিলেন, যে সমস্ত মহিলা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন তাঁহারা এই পু'স্কার পাইবেন। এই সমস্ত প্রবন্ধের নাম হইতেই আমরা শশিপদ বাবুর স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ কি তাহার পরিচয় পাই। এই প্রকারের একটি প্রবন্ধের নাম "আদর্শ গৃহিণী" ১৮০২ শকাব্দায় এই প্রবন্ধটির জন্য ২০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা হয়।

'ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়' আজকাল কলিকাতায় একটি অতীব সুপরিচিত বালিকাশিক্ষার কেন্দ্র। এই বিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহিত শশিপদ বাবু অতীব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই বিদ্যালয় সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মপল্লীর মধ্যে অতীব ক্ষুদ্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৮৩ খৃঃ)। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী স্বর্গীয়া গিরিজাকুমারী ও শ্রীমতী ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সমস্ত জীবন ধরিয়া শশিপদ বাবু যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা অবশ্য এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তিনি যে প্রেরণা দ্বারা চালিত হইয়াছেন সেই প্রেরণাটুকু আমরা শৈশব হইতেই তাঁহার জীবনে অতি স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই। তিনি সাজিয়া গুজিয়া দশজনের মধ্যে একজন হইবার জন্য এই দেশ হিতৈষণাব্রত গ্রহণ করেন নাই—স্বভাবের প্রেরণা ও ব্যক্তিগত অভাববুদ্ধি আজীবন তাঁহাকে চালনা করিয়াছে। আমরা তাঁহার প্রথম জীবনের কর্ম্মপদ্ধতি হইতে তাহা সুন্দর রূপেই বুঝিতে পারিব!

অনুরাগীর কর্ম্মপদ্ধতি।

'স্ত্রীজাতির অবস্থা' যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের উন্নতির একটি বিশেষ অন্তরায়, তাহা বলাই বাহুল্য। শশিপদ বাবু বিবাহের পর হইতেই, সেকালের সম্মিলিত পরিবারের বিবিধ উপহাস ও অসুবিধা

সত্ত্বেও, কি প্রকারে আপনার বালিকা স্ত্রীকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন, সেকথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রকারে ব্যক্তিগত অভাবের প্রেরণায় শিক্ষাদান কার্য্য আরব্ধ হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরিবারে কি প্রকারে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাও বর্ণনা করা গিয়াছে।

পারিবারিক স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াই শশিপদ বাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন না, স্ত্রীজাতির অবস্থা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগিত। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে মার্চ্চ তারিখে তিনি বরাহনগরের স্বর্গীয় দীননাথ নন্দী মহাশয়ের পূজার দালানে এক সাধারণ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিদ্যালয়ের জন্য কিছু কিছু উপকরণ ক্রয় করা হইল অবশ্য কেহ কেহ কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন; একজন পণ্ডিত ও একজন দাসী নিযুক্ত করা হইল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু সে সময়ে দেশের লোকের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি কোনরূপ আগ্রহ ছিল না, কাজেই অর্থ সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িল। তাঁহার নিজের অবস্থা তখন কিন্তু এইরূপ যে কোন প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কারণ পরে দেখা যাইবে যে শশিপদ বাবু যে কার্য্যে হাত দিয়াছেন, সেই কার্য্যের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব দানে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। আজ কাল দেখিতে পাই অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ লোহার সিন্ধুকে রাখিয়া দেশের দুঃখে কাঁদিয়া দেশ-বাসীগণকে অগ্নিময়ী ভাষায় স্বার্থত্যাগের বক্তৃতায় উত্তেজিত করিয়া চাঁদার খাতা বাহির করিতেছেন ও টাকার অভাবে কার্য্য হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। শশিপদ বাবু এ প্রকারের ব্যবসায়ী দেশহিতৈষী নহেন, এই জন্যই আমরা তাঁহার জীবনবৃত্ত দেশবাসীগণের পুরোদেশে উপস্থাপিত করিবার প্রয়াসী। যাহা হউক এই প্রকারের অভাবের দ্বারা শশিবাবু জীবনে কখনও ভগ্নমনোরথ হইতেন না।

সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে একজন আর্মেনীয়ান্ সওদাগর বাস করিতেন, তাঁহার নাম ওয়েস্‌কিন্‌স্। তিনি পাটের কাজ করিতেন, দক্ষিণেশ্বরে স্বর্গীয়া রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর পার্শ্বে রাজবাড়ীর মত তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী। তিনি প্রত্যহ বৃহৎ জুরিতে চড়িয়া বাহির হইতেন। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পর শশিপদ বাবুর মনে এক অদমনীয় ও বিপুল কর্ম্মস্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি সর্ব্বদা দেখিতেছেন কত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে—তাঁহার মন ছট্‌ফট্ করিতেছে, সর্ব্বদাই চিন্তা, কি করিয়া কি করা যায়! যাঁহার সহিত আলাপ হয়, তাঁহাকেই দেশের অভাব ও প্রয়োজনের কথা, কি করিয়া সেই অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ হয় সে কথা, কাতর ভাবে বলেন। কিন্তু তাঁহার সে কথায় কেহই সাড়া দেয় না, সকলেই নিজ নিজ ভাবনা লইয়া ব্যস্ত, মনে মনে হয়ত অনেকে উপহাস করে। কিন্তু এই ব্যাকুলতায় তিনি ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন।

মহাজনগণ যে পথেই কর্ম্ম করুন না কেন, এই প্রকারের ব্যাকুলতা তাঁহাদের জীবনে একদিন অতীব তীব্রভাবে আসিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই 'পূর্ব্বরাগ' এর প্রেরণাতেই বলিয়াছিলেন

"অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্য জন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণ সখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবারে॥"

অধিক কি যাঁহারা অন্তরঙ্গ বন্ধু, যাঁহাদের নিকট তিনি তাঁহার হৃদয়ের এই তীব্র কামনা অকপটে আনুপূর্ব্বিক বলেন, তাঁহারাও বলেন যে এ সমস্ত কার্য্যে তো করা দরকার, শিক্ষা বিস্তারও করিতে হইবে, দুঃস্থ অসহায়ের সেবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এ সমস্ত না করিলে

আমরা জাতীয়ভাবে বাঁচিতেই পারিব না, এ সমস্ত তো অতি যথার্থ কথা। কিন্তু এ কাজ করা কি সম্ভব ?

যাহার ভাব আসে, কেবল তিনিই জানেন এই প্রেরণা কি ভয়ানক ! ধৈর্য্য ধরিবার সামর্থ্য সে সময় থাকে না। "এই প্রেমা যার মনে, এর বিক্রম সেই জানে।"

এই ব্যাকুলতা লইয়া সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি সে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের কথা। এখন স্ত্রীশিক্ষা বা অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্যে যতটা অনুরাগ দেশের লোকের চিত্তে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার কিছুই জাগে নাই। এই অবস্থায় তাঁহার ঐ ওয়েস্‌কিন্‌স্‌ সাহেবের কথা মনে হইল। সে ব্যক্তি বিদেশীয় ও ধনবান ব্যক্তি, সে সাহায্য করিবে, কি না করিবে তাহা ভাবিবার আর তখন সামর্থ্য নাই। এই অবস্থায় সাহেব গাড়ী করিয়া যাইতেছেন, পথের মধ্যে বিদ্যালয়ের সম্মুখে শশিপদ বাবু সাহেবের জুরি আটক করিলেন, হস্তে একখানি নিবেদন পত্র দিলেন। সাহেব গাড়ী হইতে নামিয়া স্কুলে গেলেন. শশিপদ বাবু সাহেবকে সমস্ত কথা বলিলেন—সাহেব বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন।

"মাসিক পাঁচটাকা"! এখনকার দিনে অনেকে হয়ত ভাবিবেন, পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিল—এত ব্যাকুলতা, এত উদ্যোগ, মাসিক পাঁচটাকায় পর্য্যবসিত হইল ! আজ কাল খবরের কাগজ পড়িলে আমরা দেখিতে পাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দেশের সদাশয় ধনীব্যক্তিগণ প্রত্যহ দান করিতেছেন। কিন্তু এ প্রণালীতে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে না। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা জানেন এবং তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারা যায় যে এখনও এই দান-শৌণ্ডতার দিনে অনেক নিরীহ ও শক্তিশালী লোক সামান্য আনুকূল্যের অভাবে যেকার্য্য করিতে পারিতেছেন না, সেই কার্য্যের নাম করিয়া

কত চতুর জোগাড়ের জোরে লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতেছেন, কাজতো নষ্ট হইতেছেই। ইহার উদাহরণ অসংখ্য, এই গেল প্রথম কথা। তাহার পরে ভাবিতে হইবে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক পল্লীযুবক একটি সৎকার্য্য করিতেছে—তাহাকে দান করিলে কি হইবে? জগতে কেহই জানিতে পারিবে না যে দান করিয়াছি।—যাহা হউক এই পাঁচটি টাকা মাসিক সাহায্যে শশিপদ বাবু যে সান্ত্বনা ও সবলতা পাইলেন, আজ কাল এই প্রকারের কার্য্যে পাঁচহাজার টাকাতেও অনেকে সে সাহস পান না। এই মাসিক পাঁচ টাকা অর্থ সাহায্যে তাঁহার উৎসাহ শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। একদল লোক কেবল অভাব দেখেন, কারণ তাঁহাদের আত্মশক্তির উৎস, যাহা হৃদয়মধ্যে অক্ষয়-ভাবে বিরাজমান, তাহার উপর দৃষ্টি পড়ে নাই। তাঁহাদের নিরাশার গান আজ কাল সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা কেবলই টাকা তুলিতেছেন, আর ব্যয় করিতেছেন, আর বলিতেছেন যে দেশে বদান্যতা নাই। কিন্তু যাঁহারা হৃদয় মধ্যে সর্ব্বশক্তিমানের করুণার অমলজ্যোতি নিত্য প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা অন্যরূপ চিন্তা করেন—আশা, সাহস ও উদ্যম তাঁহাদের কখনই পরিত্যাগ করে না।

কোনও সৎকার্য্যে যখন যথার্থ উন্মাদনা আসে, তখন মানুষ কিরূপ ভাবে কার্য্য করে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শশিপদ বাবু নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া বরাহনগরে কি প্রকারে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ওয়েস্‌কিন্‌স্‌ সাহেবের নিকট তিনি কি প্রকারে কিঞ্চিৎ সাহায্য সংগ্রহ করিলেন, সেকথা বলা হইল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বৎসর পরে বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট সার্‌, সেসিল, বিডেন্‌, চব্বিশ পরগণা জেলার জজ শ্রীযুক্ত বোফোর্ট সাহেব, ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে তিনি নিমন্ত্রণ করিলেন। শশিপদ বাবুর সহিত এই সব বড় বড়

সাহেবদের কাহারও আলাপ ছিল না। নিজে দেখা করিয়াও নিমন্ত্রণ করিলেন না, যেমন দশজনের নিকট নিমন্ত্রণপত্র গেল তেমনি তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অবশ্য বিদ্যালয়ের অবস্থা তখন এমন কিছু নয় যে লাট সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু শশিপদ বাবুর তখন বাহিরের অবস্থা দেখিয়া বস্তুর মূল্য নিরূপণ করার সময় নহে, তিনি তাঁহার নিজের হৃদয়ের ব্যাকুলতার দ্বারাই সমস্ত ব্যাপারের মূল্য নিরূপণ করিতেছিলেন। পারিতোষিক বিতরণ সভায় এই প্রকারের নিমন্ত্রণ করার এই ফল দাঁড়াইল। ছোটলাট বাহাদুরের নিকট হইতে তাঁহার এডিকংএর স্বাক্ষরযুক্ত নিম্নরূপ পত্র আসিল।

Belvedere
23rd February
1867

Sir,

In reply to your letter dated the 22nd Inst. to the address of the Lt. Governor I am desired to forward herewith Rs. (16) sixteen in aid of the Baranagar Girls' school. I am also to say that Sir Cecil is very sorry that he and Lady Beadon are unable to visit the school owing to other engagements.

অর্থাৎ বিদ্যালয়ের সাহায্যে তিনি ষোলটী টাকা পাঠাইয়া দিলেন তবে অন্যান্য কাজের জন্য স্কুলে আসিতে পারিলেন না, সেজন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত।

জেলার জজ শ্রীযুক্ত বোফোর্ট সাহেব এই নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তরে এক অতি সহানুভূতিপূর্ণ পত্র লিখিলেন ও জানাইলেন, যে রবিবার দিন বিশ্রাম দিন, সেদিন তিনি কোথাও বাহির হয়েন না, নতুবা তিনি বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ সভায় নিশ্চয়ই আসিতেন। এই যে

বোফোর্ট সাহেবের সহিত পরিচয়, ইহা শশিপদ বাবুর জীবনে একটি আবশ্যকীয় ঘটনা। অতঃপর শশিপদ বাবু বোফোর্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তিনি অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। এই যে পরিচয় হইল ইহার ফলে বোফোর্ট সাহেব ক্রমে শশিপদ বাবুর একজন বিশেষ বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন ও বরাবর শশিপদ বাবুর কার্য্যে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন।

শশিপদ বাবু যেরূপ অবস্থার মধ্যে সে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শশিপদ বাবুর কথা এই যে বিশ্বাস হইতে কার্য্যে ঐকান্তিকতা জন্মে, ঐকান্তিকতা দ্বারা বন্ধুলাভ হয়, বন্ধুরা অর্থ সাহায্য করেন—এবং কার্য্যও হইয়া যায় অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস থাকিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। কোথা হইতে সহায় ও শক্তি আসে তাহা আমরা পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে শশিপদ বাবুর কার্য্যের আর একজন অনাহুত বন্ধুর নামোল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার্ জন্ ফিয়ার্‌ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২০ শে এপ্রিল তারিখে ইনি শশিপদ বাবুকে যে একখানি পত্র লেখেন, সেই পত্র হইতেই শশিপদ বাবুর কার্য্যের সহিত তাঁহার সহানুভূতির ভাব বুঝিতে পারা যাইবে—

My dear Sir,

Inclosed I send you a ten rupee note in discharge of my subscription (you have just accepted) for the present and the ensuing month—you remark upon my having offered you this small assistance unsolicited ; I did it, simply because I have watched you now for some

time and am convinced that you are working most unselfishly and earnestly, under difficult circumstances—your objects are excellent, your efforts sound and well-directed, and I feel I ought not any longer to stand by, without tendering you both my hearty sympathy with what you are doing for your countrymen and showing you that you ought not to be left to bear your burden alone. Of course I do not desire the fact of my subscribing towards your literary and educational purposes to be made a secret, but I should greatly prefer that it should not become in any way matter of public comment and eulogy."

ইহার মর্ম্ম এই, এই সঙ্গে আমার বর্ত্তমান মাসের ও পরবর্ত্তী মাসের চাঁদা দশটি টাকা পাঠাইলাম। আপনি আমার নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই, অথচ আমি অযাচিতভাবে অর্থ সাহায্য করিতেছি, আপনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি যে অর্থ সাহায্য করিয়াছি তাহার কারণ এই, আমি কিছুদিন ধরিয়া আপনার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে আপনি একেবারে নিঃস্বার্থভাবে ও আন্তরিকতার সহিত অনেক অসুবিধাকর অবস্থার মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। আপনার উদ্দেশ্য অতীব মহৎ, আপনার চেষ্টা সুন্দর ও সুপরিচালিত এবং আমি অনুভব করি যে আপনি আপনার স্বদেশবাসীগণের জন্য যাহা করিতেছেন, তাহাতে আমার আন্তরিক সহানুভূতি না জানাইয়া এবং এই কার্য্যের ভার আপনাকে একাই বহন করিতে হইবে না, এটুকু না প্রমাণ করিয়া, আমার দূরে দাঁড়াইয়া থাকা সঙ্গত নহে। অবশ্য

আমার এই সাহায্য দানের কথা যে একেবারেই গোপনে রাখিতে হইবে তাহা নহে, তবে এ বিষয়ে সাধারণভাবে বেশী আলোচনা হয়, ইহা আমি ইচ্ছা করিনা।

এই প্রকারে অতি সামান্য অবস্থার মধ্য হইতে অশেষ বিঘ্ন ও বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক শশিপদ বাবু তাঁহার স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য বরাহনগরে আরম্ভ করিলেন। বাধা বিপত্তি যে কত দিক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও আর্ম্মেনীয় সওদাগরের দিকট হইতে মাসিক পাঁচটাকা সাহায্য সংগ্রহের কিছু দিন পরে শশিপদ বাবু প্রকাশ্য-ভাবে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জুলাই তারিখে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সিঁদুরিয়া পটির পরলোক গত গোপাল মল্লিকের গৃহে এক বক্তৃতা করেন। শশিপদ বাবু এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন। অবশ্য ব্রাহ্ম সমাজ যে সমস্ত সত্যের দিকে দেশের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সমস্ত সত্য তাহার পূর্ব্বেই শশিপদ বাবুর জীবনে বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং তদনুসারে তিনি স্বকীয় জীবনও পরিচালনা করিতেছিলেন।

সে সময়ে যাঁহারা এই প্রকারে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের নিকট যে কি প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। শশিপদবাবুকেও অনেক সহ্য করিতে হইল। সে সমস্ত কথা এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। শশিপদবাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করায়, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের দারুণ ক্ষতি হইল। বালিকাগণ বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করিয়া দিল, তাহাদের পুস্তকসমূহ ছিঁড়িয়া ফেলিল। বরাহনগরের ভদ্রলোকগণ এই প্রকারে নিজ নিজ বালিকা-

দিগের বিদ্যালয়ে আসিতে না দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহারা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বর্গীয় কৃষ্ণধন সেনগুপ্ত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তুমি যদি বালিকা বিদ্যালয়ের সংশ্রব পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমাকে সমাজে পতিত করা হইবে। সমাজে পতিত হওয়া বড় সহজ কথা নহে, নিরীহ পণ্ডিত মহাশয় সমস্ত কথা শশিপদবাবুকে জানাইলে, শশিপদবাবু তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় দান করিলেন।

তখন শশিপদবাবুর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ও বনহুগলীনিবাসী স্বর্গীয় দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী ব্যতীত, অন্য কোন ছাত্রীই বিদ্যালয়ে আসিত না, কিন্তু শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়ের কার্য্য একদিনের জন্যও বন্ধ ছিল না; শশিপদবাবু কলিকাতা হইতে সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন শিক্ষক লইয়া আসিলেন।

বিপক্ষীয়গণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, তখন তাঁহারা অন্য এক উপায় অবলম্বন করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, একজন স্থানীয় ভদ্রলোকের পূজাদালানে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত। বিপক্ষীয়গণ গৃহস্বামিনীকে বলিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। শশিপদবাবু ইহাতেও নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি বাড়ীর জন্য বিশেষ অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে এক বিধবা স্ত্রীলোকের বাড়ীতে একটি স্থান স্থির করিলেন ; তিনি জানিতেন যে বিপক্ষীয়গণ এখানেও আসিবে এবং এখান হইতেও বিদ্যালয়টি উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিবে। এইজন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া শশিপদবাবু ঐ রমণীর নিকট এক বৎসরের জন্য ঐ ঘরখানি লেখাপড়া করিয়া লইলেন। এইরূপ সর্ত্ত হইল যে এক বৎসরের মধ্যে ঐ মহিলা তাঁহার ঘর হইতে বিদ্যালয় উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। এই নূতন স্থানে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বিপক্ষীয়গণ এই স্থান হইতেও

বিদ্যালয় তুলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে বিদ্যালয় তুলিয়া দিবার চেষ্টা সফল হইল না। স্থানীয় জমিদার গৃহস্বামিনীকে ডাকিয়া তাহার বাড়ী হইতে বিদ্যালয় তুলিয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন। গৃহস্বামিনী করজোরে বলিলেন উপায় নাই, লেখাপড়া হইয়া গিয়াছে।

এই প্রকারে নানারূপ বিপক্ষতাচরণ ও ষড়যন্ত্র অতিক্রম করিয়া ভগবানের কৃপায় শশিপদ বাবু গৃহ সংগ্রহ করিলেন বটে, কিন্তু এখন ছাত্রী পাওয়া যায় কিরূপে তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। বিপক্ষীয়-গণ অবশ্য লোকের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া অভিভাবকগণ যাহাতে বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করেন, সেজন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শশিপদ বাবু লোকের বাড়ী বাড়ী দাসী পাঠাইতে লাগিলেন, যে সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়ে আসিবে তাহাদের জন্য নানারূপ পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এইবার দু একটি করিয়া বালিকা আসিতে লাগিল। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিষ্টার জেম্‌স্ উইল্‌সন তৎপ্রণীত বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা নামক পুস্তিকায় এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন " He (Sasi pada Banerji) made presents to them of dolls, sweets, books, slates and even of Dacca clothes, and they had their effect, for without the permission of the masters of houses the maid servant could pursuade the mothers to send their girls to the school. who themselves were eager to come not for the education which was imparted but for the presents they received."

অর্থাৎ শশিপদ বাবু বালিকাদিগকে পুতুল, সন্দেশ, বই, শ্লেট্, এমন কি ঢাকাই কাপড় পর্য্যন্ত পারিতোষিক দিতে আরম্ভ করিলেন, ইহার ফল ফলিতে লাগিল। দাসী কর্ত্তাদের অগোচরে গৃহিনীদিগকে

প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, তাঁহারা শিক্ষার জন্য যতটা হউক বা না হউক পারিতোষিকের জন্য বালিকাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন, বালিকাগণও খুব আনন্দের সহিত আসিতে লাগিল।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করায় বিদ্যালয়ের বালিকা সংখ্যা প্রত্যহ বাড়িতে লাগিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর রবিবার বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রথম পারিতোষিক দানের সভা হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক লব, সাহেব এই সভার সভাপতি ছিলেন। সেবারকার রিপোর্টে দেখা যায় বিদ্যালয়ে ৫৭টি বালিকা হইয়াছে, চারিটি শ্রেণীতে (class) তাহারা অধ্যয়ন করে।

ক্রমে ক্রমে এই বালিকা বিদ্যালয়ের বেশ উন্নতি হইতে লাগিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই বিদ্যালয়ে এক অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল। লর্ড নর্থব্রুক তৎকালে ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন। তিনি বিপত্নীক ছিলেন, লাটপত্নীর যত কিছু সমাজিক কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহার কন্যা মাননীয়া শ্রীমতী বেয়ারিং করিতেন। উক্ত তারিখে শ্রীমতী বেয়ারিং বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে শশিপদ বাবু ও তাঁহার পত্নীর সহিত শ্রীমতী বেয়ারিং এর বেশ আত্মীয়তাও হয়,তিনি তাঁহার নিজের ও তাঁহার পিতা লর্ড নর্থব্রুকের হস্তলিপি (autograph) ও ফটোগ্রাফ উপহার দিয়া যান। যে অবস্থার মধ্যে শশিপদ বাবু এই বিদ্যালয় আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া ইহার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে বিদ্যালয়টির এই রূপ উন্নতির কথা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি ?

বিদ্যালয়ের ক্রমিক উন্নতিই হইতে লাগিল বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি হইল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই

ডিসেম্বর তারিখে এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় বঙ্গের তৎকালীন লোটলাট শ্রীযুক্ত সার রিচার্ড টেম্পল্ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মাননীয়া শ্রীমতী বেয়ারিং এর আগমন ও বঙ্গের ছোটলাট সার্ রিচার্ড টেম্পল্ এর সভাপতির আসন গ্রহণ, এই দুইটি ব্যাপারে বরাহনগরে খুব কার্য্য হইল। বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতি ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা শশিপদ বাবুর প্রতি এত দিন লোকের যে বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। দেশের সাধারণ লোকের বিচারণার যাহা পদ্ধতি, সেই পদ্ধতির মধ্য দিয়া শশিপদ বাবু এই প্রকারে তাঁহার বালিকাবিদ্যালয়কে সুপ্রতিষ্ঠ করিলেন। সার্ রিচার্ড টেম্পল্ এর পর অন্যান্য প্রায় সমস্ত ছোটলাটই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছেন।

আমরা যাহাকে সম্মান বলি, তাহা প্রায়শঃ অসার হইলেও, যদি সে দিক হইতেও বিচার করা যায়, তাহা হইলে সে দিকেও শশিপদ বাবু লাভবান হইলেন, তাহা আমরা এই সব ঘটনায় দেখিতে পাইতেছি। একদিন যিনি প্রাণের ব্যাকুলতায় মাসিক পাঁচটি টাকা সাহেয্যের জন্য পথের মধ্যে সাহেবের জুরি আটক করিয়াছিলেন, এই ঘটনার দশ বার বৎসর পরে তিনি যখন ছোটলাট বাহাদুরকে লইয়া একগাড়ীতে বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণসভায় গমন করিলেন, তখন ব্যাপারটি পরমার্থতঃ যাহাই হউক, সাধারণ লোকের খুব একটা বড় রকমের চমক লাগিয়া গেল। যে ব্যক্তি মান চাহে না, সেবা চাহে ভগবান এই প্রকারে তাহাকে ঐহিক সম্মানও প্রদান করিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব বুঝিয়াই সাধক প্রবর রামপ্রসাদ উপদেশদিয়া গিয়াছেন "মন করোনা সুখের আশা, যদি অভয় পদে লবে বাসা।" ইংরাজী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিলেন

তদুপলক্ষে ১লা জানুয়ারী যে দরবার হয়, সেই দরবারে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লোকহিতকর কার্য্যাবলীর জন্য সম্মান পত্র (Certificate of honour) প্রাপ্ত হইলেন।

এই সব ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সরলচিত্তে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কোনও সৎকার্য্য আরম্ভ করিলে ভগবানের করুণায় এই প্রকারেই বন্ধুগণ আসিয়া সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়েন। এই তত্ত্বটুকু সকলেরই উপলব্ধি করা দরকার। তাহা হইলে অনেক নৈরাশ্য ও ভীতি দূরীভূত হইবে—এবং দেশহিতকর অনেক সদনুষ্ঠান দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবে।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু যাহা করিয়াছেন, তন্মধ্যে আর একটি দিক বিশেষভাবে আলোচ্য। ব্রাহ্মসমাজের লোকের পক্ষে বালিকা ও যুবতীগণকে শিক্ষাদান করা একান্ত প্রয়োজন। ভালরূপ শিক্ষা ব্যতিরেকে বিবাহ হওয়াই কঠিন। এরূপ অবস্থায় যাঁহাদের তেমন সঙ্গতি নাই, যাহারা মফঃস্বলের লোক তাঁহারা কি করেন? বেথুন কলেজ 'বোর্ডিং'এ অনেকে থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহা বহু ব্যয়সাধ্য। সকলের পক্ষে সেখানে রাখিয়া বালিকা বা যুবতীগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা একেবারে অসম্ভব। অন্যান্য সমস্যাগুলিও যেমন আপনা হইতে আসিয়া শশিপদ বাবুর নিকট উপস্থিত হয়, এই প্রশ্নটিও ঠিক তেমনিভাবে আসিয়া শশিপদ বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, সেখানকার কোনও একটি ব্রাহ্মমহিলা পূর্ব্ব হইতেই শশিপদ বাবুর নাম শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহী বন্ধু বলিয়া জানিতেন। এই মহিলাটি আসিয়া তাঁহার একটি যুবতী কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন যে ইহার বিদ্যাশিক্ষার কি ব্যবস্থা করা যায়? এই সময়েই এই সমস্যাটি শশিপদ বাবুর মনে সর্ব্বপ্রথম উদিত হয়, তিনি সেই বালিকাটিকে লইয়া আসিলেন ও নিজে তাহাকে

পরিবারে রাখিয়া তাঁহার নিজের বালিকা বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শিখাইতে লাগিলেন। ক্রমে এই বালিকা বিদ্যালয় 'বোর্ডিং' স্কুল ও বিধবাশ্রমে পরিণতি লাভ করিতে লাগিল। তখন ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয় বর্ত্তমান আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অনেক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক বালিকা শশিপদ বাবুর নিকট আসিয়াছেন, অনেকে বিনা ব্যয়ে থাকিতেন, কেহ কেহ সামান্য নামমাত্র কিছু কিছু দিতেন, অবশিষ্ট ব্যয়ভার শশিপদ বাবু স্বয়ং বহন করিতেন। এই প্রকারে ব্রাহ্ম সমাজের অনেক ভদ্রমহিলা বিদ্যালাভ করিয়া এখন সক্ষম হইয়াছেন। কেহ ডাক্তার হইয়াছেন, কেহ শিক্ষকতা করিতেছেন, তাঁহারা চক্ষুর সমক্ষেই রহিয়াছেন। শশিপদ বাবু যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, সে কার্য্যের এখনও প্রয়োজন আছে। যাঁহারা এই প্রকারে জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন আজ যদি তাঁহারা প্রত্যেকে এইপ্রকারের অন্ততঃ পক্ষে একটি করিয়া বালিকারও ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতে যে আদর্শের সফলতা সন্দর্শন করিয়া শশিপদ বাবু আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, দেশ ক্ষিপ্রগতিতে সেই আদর্শের অভিমুখে অনায়াসে অগ্রসর হইতে পারে, এবং তাঁহাদেরও একটি অবশ্যপাল্য কর্ত্তব্য প্রতিপালন করা হয়।

বালিকা ও যুবতীগণকে আনিয়া এই যে শিক্ষাদান, এই কার্য্য শশিপদ বাবুর পরে পণ্ডিতা রমাবাই আরম্ভ করেন। পুনা "সারদাসদন" সেই চেষ্টার ফল। তিনি সারদা নাম্নী একটি কুমারী বালিকাকে লইয়া এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, বলিয়াই এই অনুষ্ঠানটির এইরূপ নাম-করণ হইয়াছে। শশিপদ বাবুর স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে কৃত এই সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধে পণ্ডিতা রমাবাই ইংরাজী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট তারিখে নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করেন

"I have read the account of your wonderful work through, and was deeply impressed and interested. You deserve most hearty thanks of Hindu womanhood for all that you have suffered and done for us: I hope your efforts to elevate and enlighten our country woman will meet with perpetually increasing success."

অর্থাৎ আমি আপনার আশ্চর্য্য কার্য্যাবলীর বিবরণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গভীরভাবে তাহার মর্ম্মোপলব্ধি করিলাম ও আনন্দিত হইলাম। আমাদের জন্য আপনি ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক যাহা করিয়াছেন তাহাতে আপনি হিন্দু রমণীমাত্রেরই বিশেষ আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। আমি আশা করি যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধনে ও তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে আপনার কৃত এই চেষ্টা উত্তরোত্তর অধিক হইতে অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে।

স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আর একপ্রকার আবশ্যকীয় চেষ্টার উল্লেখ একান্তভাবে প্রয়োজন। বামাবোধিনী সভা ও বামা-বোধিনী পত্রিকাকর্ত্তৃক এই চেষ্টা সর্ব্বপ্রথম আরব্ধ হয়। ইংরাজী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ত্রীজাতির মধ্যে সাহিত্যচর্চ্চার প্রসারবৃদ্ধিই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। বামবোধিনী পত্রিকা এখনও চলিতেছে। স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক এই কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু প্রথম হইতেই বামাবোধিনী পত্রিকাকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ গাঙ্গুলি মহাশয় কর্ত্তৃক ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অবলাবান্ধব প্রচারিত হয় এই পত্র অল্পকালস্থায়ী হইলেও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহার পর স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রচারিত "মহিলা"। তৎপরে শশিপদবাবু কর্ত্তৃক অন্তঃপুর নামক মাসিক পত্র প্রচারিত হয়। এই পত্র পর পর তাঁহার

দুই কন্যা উষাবালা ও বনলতা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। এই পত্রখানির বিশেষত্ব এই যে ইহা আদ্যাপান্ত মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইত। শশিপদবাবুর কন্যা বনলতা দেবীর মৃত্যুর পর শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী চৌধুরাণী কর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত হইত। নানা কারণে অন্তঃপুর উঠিয়া যায়, তাহার পর শশিপদ বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা গৃহলক্ষ্মী প্রকাশ করেন। অন্তঃপুর পত্রের ন্যায় এই পত্রিকারও এই বিশেষত্ব ছিল যে ইহার আদ্যোপান্ত স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা লিখিত হইত। এক্ষণে দেবালয় পত্রে মহিলাগণের রচনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

সংসারে মানুষকে কিরূপ কর্ত্তব্য শঙ্কটে পড়িতে হয় তাহা শশিপদ বাবু তাঁহার কন্যাদ্বয়ের সাহায্যে যখন অন্তঃপুর মাসিকপত্র প্রচার করেন সেই সময়ে একটি ঘটনায় বিশেষ ভাবেই পরিদৃষ্ট হয়। অন্তঃপুর পত্রিকা ইংরাজী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই অন্তঃপুর পত্র প্রচারের কথা পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের পুস্তকে আভাসে নিম্নরূপ লিখিত হইয়াছে—"The Antahpur, the latest Bengali journal for women, also deserves to be mentioned here. It was started after some trouble, by Babu Sasipada Banerji and was successively under the editorial charge of his daughters Ushabala and Banalata. Its peculiar feature is that it is written exclusively by ladlies. It is now edited by Mrs. Hemanta Kumari Choudhuri of Sylhet and published in calcutta by Babu Sasi Bhushon Chakravarti who has managed it ever since its editorial charge was taken by his lamented wife Banalata Devi." (Social Reform in Bengal pages 69 & 70)

এই অংশটুকু যখন লিখিতে হয় তখনও অন্তঃপুর পত্র বাহির হইত,

কিন্তু এখন আর অন্তঃপুর নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে সংক্ষেপে কেবল এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে কিছু অসুবিধার মধ্য দিয়া এই পত্রখানি প্রচারিত হয়। এই অসুবিধা কি, তাহা বর্ণনা করা প্রয়োজন। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কার্য্যে শশিপদ বাবু প্রথম জীবনেই হস্তক্ষেপ করেন, তাহার পর আপন আদর্শ অনুসারে আপন কন্যাগণকে লেখা পড়া শেখান। বর্ত্তমান সময়ে ভাল পত্রিকা প্রচার শিক্ষা বিস্তারের একটি বিশেষ সদুপায় (অবশ্য যদি পত্রিকা ভাল হয়, নতুবা তাহার বিপরীত) এই জন্য শশিপদ বাবু মহিলাগণ পরিচালিত মাসিক পত্র, যাহাতে সকল বিষয় স্ত্রীলোকদের দিক হইতে আলোচিত (from the woman's point of view) হয়, এই প্রকারেব একখানি মাসিকপত্র প্রচার করার ইচ্ছা তাঁহার মনে অনেকদিন হইতেই জাগ্রত ছিল। তাঁহার কন্যা স্বর্গীয়া বনলতাদেবীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহাকে কিরূপ লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন সে কথাও বর্ণিত হইয়াছে।

বনলতা দেবীর বিবাহের পর শশিপদ বাবু তাঁহার পূর্ব্বসংকল্পিত সাময়িক পত্র সম্পাদিকা হইয়া বাহির করিবার জন্য বনলতাদেবীর নিকট স্বকীয় ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথম দিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন আবার দু তিন দিন পরে যখন তিনি পুনরায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন বনলতা মুখ অবনত করিয়া চহিয়া রহিলেন ও তাঁহার চক্ষুদিয়া জলধারা বহিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া শশিপদ বাবু বুঝিলেন যে সম্পাদিকা হইয়া সাময়িক পত্র প্রচার করা তাঁহার স্বামীর মনঃপুত নহে। অবশ্য বনলতাদেবী স্বয়ং এ কথা তাঁহার পিতাকে বলেন নাই, শশিপদ বাবু ভাবগতিকে ইহা অনুমান করিয়া লইলেন। এক দারুণ কর্ত্তব্য-শঙ্কট! একদিকে পিতা আর একদিকে স্বামী। তাঁহার পিতা যে তাঁহাকে এই প্রবৃত্তি দিতেছেন ইহা তাঁহার চিত্তের একটা সাময়িক ভাব মাত্র নহে, বহুদিন হইতে এই প্রকারের কল্পনা

তিনি চিত্ত মধ্যে পোষণ করিতেছেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য বহুদিন হইতে আবশ্যকীয় ব্যবস্থাও করিয়া আসিতেছেন। বনলতা দেবীও তাহা জানেন এবং পিতার এই ইচ্ছার সহিত তাঁহার হৃদয়গত সহানুভূতি রহিয়াছে। কিন্তু অপর দিকে স্বামী, সর্ব্বতোভাবে স্বামী-সেবা নারীজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সুতরাং এই কর্ত্তব্য-শঙ্কট বড় সহজ নহে। কয়েকদিন সমস্ত পরিবার বড়ই অশান্ত ভাবে দিন যাপন করিল। অনেক চিন্তার পর শশিপদ বাবু বনলতাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাগজে প্রবন্ধ লিখিতে আপত্তি নাই ত?" প্রবন্ধ লিখিতে কোন রূপ অমত ছিল না।

অন্তঃপুর প্রকাশিত হইল। শশিপদ বাবুর অবিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী উষাবালা দেবী সম্পাদিকা হইলেন। বনলতা দেবী নিয়মিত ভাবে লিখিতে লাগিলেন। কাগজ বাহির হওয়ার ছয়মাস পরে উষা বালা দেবীর বিবাহ হইয়া গেল। তখন বনলতা দেবী আপনা হইতে সম্পাদিকা হইলেন। আপনা হইতেই সময়ের প্রভাবে ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা সেই কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলেন। বনলতাদেবীর অকালমৃত্যুর পর হেমন্ত কুমারী চৌধুরাণী এই পত্র সম্পাদন করেন।

এখন অবশ্য মহিলাদিগের পরিচালিত অনেক গুলি সাময়িক পত্র হইয়াছে। ভারতী ও বামাবোধিনী অবশ্য বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী। এক্ষণে সুপ্রভাত, ভারতমহিলা মহিলা-পরিচালিত।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে শশিপদ বাবু আপন পরিবারে সুভীষণ প্রতি-বন্ধকতার মধ্যে স্বকীয় বালিকা স্ত্রীর শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করিয়া কি ভাবে আজীবন এই পুণ্যব্রত পালন করিয়াছেন, তাহা বর্ণিত হইল, সে দিন আর এ দিন! স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আর পূর্ব্বের সে বাধা নাই। এখনও আদর্শ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে, আবার এই মতভেদ কেবল যে এ দেশে, তাহা নহে ইউরোপেরও পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার

আদর্শ ও প্রণালী লইয়া নানারূপ আলোচনা চলিতেছে। আদর্শ লইয়া মতভেদ থাকুক, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে লেখা পড়া যে শিখাইতেই হইবে সে বিষয়ে মতভেদ নাই। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে জীবন পন করিয়া নানা অসুবিধা ও অত্যাচারের মধ্যে দিয়া এই মহাসাধনার পবিত্র বীজ যাঁহারা বপন করিয়াছিলেন,আজীবন জীবনের একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা সেই বীজ পালন করিয়াছেন, আজ তাঁহারা তাঁহাদের সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত দেখিতেছেন। আজ গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি,সংস্কৃত শাস্ত্রের উচ্চতম উপাধি মহিলাগণ লাভ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক বিষয়েই মহিলাগণের লেখনী সুপ্রশংসার সহিত পরিচালিত হইতেছে। এখনও কার্য্য অনেক বাকি থাকিলেও স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার যে হইতেছে তাঁহাতে সন্দেহ নাই।

বলা হইল যে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ও প্রণালী লইয়া ইউরোপেও দারুণ মতভেদ উপস্থিত। পূর্ব্বে শশিপদ বাবুর যাহা আজীবনপোষিত আদর্শ তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। শশিপদ বাবুর আদর্শ প্রাচীন হিন্দুভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথাও বলা হইয়াছে। আমাদের দেশের যাঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শের অনুবর্ত্তনে স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য লইয়া সবেগে ধাবমান, এখন এমন একটা দিন আসিয়াছে যখন তাঁহাদিগকে একটু দাঁড়াইয়া স্থির হইয়া ভাবিতে হইবে। এবং শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ পরবর্ত্তী যুগের পাশ্চাত্য মনীষার দ্বারাও ক্রমে দৃঢ়ীকৃত হইতেছে ই হাও তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। নিম্নে একটি অতিশয় নূতন কথা যাহা আমাদের এই পরিচ্ছেদ লিখিত হওয়ার পরে এ দেশে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা গেল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে আগষ্ট তারিখের দৈনিক বেঙ্গলি হইতে নিম্নের অংশটুকু পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

VERDICT OF A GREAT BIOLOGIST.

London July 11.

A vigorous challenge, says the Daily Mail, to higher education of women is flung down by Dr. M. S. Pembrey, the well-known biologist and lecturer in Physiology at Guy's Hospital, London, in the new number of 'Science Progress." The oldfashioned view of women's Place in Nature, he declares, is the one supported by biological knowledge. The slur cast upon our Victorian mothers has not been properly resented. It is true that they did not glory in competing in mental and physical contests with men, but they could and did bear large and healthy families.

"The possession of a baby," he says, "is of more value to the State than a first-class certificate in classics or a silver trophy for sport." As the result of the higher education of women and their employment in posts which might be filled with men, we have late marriages, which are bad for the health and morals of both sexes, and bad for the State as the family will be smaller and less vigorous.

MARRIAGE—WOMAN'S REAL SPHERE.

The so-called higher education of women," he asserts "is not a good ideal for either woman, man or the State. Education at a university for three or four years makes

a considerable demand upon the bcdily, mental, and pecuniary resources of the woman, and there is little doubt that these would be more useful to all concerned, if they were devoted to or reserved for marriage.

"There is no evidence that the middle-aged intellectual woman makes a better wife or mother—the indications are all the other way. The woman who is married for her services as a cheap secretary or assistant in her husband's intellectual pursuits is as much degraded as the wife who is valued only as a cheap housekeeper and cook."

In fine, marriage is the true vocation of woman, and this iconoclastic professor bids those for whom there are not husbands in England because of the disproportion of the sexes, take their share in building up the Empire by emigration to the Dominons, where there is a superfluity of men.

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে স্ত্রীশিক্ষাদানের ভ্রান্তি সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত প্রাণ-তত্ত্ববিদের মত প্রদত্ত হইয়াছে। ডাক্তার এম, এস, পেমব্রে একজন সুবিখ্যাত প্রাণতত্ত্ববিৎ এবং লণ্ডনের গাই হাঁসপাতালের শারীর-বিদ্যার বক্তা। তিনি সায়ান্স প্রোগ্রেস, নামক পত্রের নূতন সংখ্যায় স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে এক অতি প্রবল যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে প্রকৃতিরাজ্যে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে যে প্রাচীন ধারণা, প্রাণতত্ত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা তাহাই সমর্থিত হয়। ভিক্টোরিয়া যুগের মাতৃগণের বা প্রসূতিগণের সম্বন্ধে যে নিন্দা

করা হইয়াছে তাহার উচিত-মত প্রতিবাদ করা হয় নাই। তাঁহারা অর্থাৎ ভিক্টোরিয় যুগের প্রসূতি জননীগণ পুরুষদিগের সহিত মানসিক ও শারীরিক প্রতিযোগীতায় দাঁড়াইয়া নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের বৃহৎ, সুন্দর ও সুস্থ পরিবারের ভার বহনের সামর্থ্য ছিল এবং সেই সামর্থ্যানুযায়ী কার্য্যও করিতেন।

লেখক বলেন যে স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রাচীন ভাষায় অভিজ্ঞতার প্রথম শ্রেণীর নিদর্শন পত্র অথবা ক্রীড়ায় রৌপ্যপদক লাভ করা অপেক্ষা, একটি শিশুর জননী হওয়া সমাজের পক্ষে অধিকতর মূল্যবান। স্ত্রীলোকগণ উচ্চশিক্ষা পাওয়ায় ও যে সমস্ত পদে পুরুষেরা কার্য্য করিতে পারিতেন, সেই সমস্ত পদে স্ত্রীলোকেরা নিযুক্ত হওয়ায়—অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে। অধিক বয়সে বিবাহ হওয়া স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েরই স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবনের পক্ষে অহিতকর, রাজ্যের পক্ষেও ইহা অহিতকর, কারণ ইহাতে যে সব শিশু সন্তান জন্মে তাহাদের সংখ্যা কম হয় এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলও হয়।

বিবাহই স্ত্রীলোকের যথার্থ স্থান। কি স্ত্রীলোকের পক্ষে, কি পুরুষের পক্ষে, কি রাজ্যের পক্ষে স্ত্রীলোকদিগের তথাকথিত উচ্চশিক্ষা বেশ ভাল আদর্শ নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর কি চারি বৎসর অধ্যয়ন স্ত্রীলোকদিগের দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক ত্রিবিধ প্রকার ক্ষতিই সাধন করে। এই শরীর মন ও অর্থ যদ্যপি বিবাহিত জীবনের জন্য রক্ষা করা হইত তাহা হইলে সকল পক্ষেরই সুবিধা হইত।

মধ্যবয়স্কা বেশী লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোক যে ভাল স্ত্রী বা ভাল মা হয় তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং ইহার বিপরীত দিকেই প্রমাণ রহিয়াছে। সস্তায় স্বামীর লেখাপড়ার কাজের সেক্রেটারি বা সহকারী হইবে এই জন্য যে স্ত্রীলোক বিবাহিত হয়, সেও যেমন অধঃপতিত, সস্তায়

বাড়ীর কাজ ও পাচিকার কাজের জন্য যে স্ত্রীলোক বিবাহিত হয় সেও তদ্রূপ।

শেষ কথা এই যে বিবাহই স্ত্রীলোকের ঠিক কার্য্য। এই বলিয়া লেখক বলেন যে দেশে অর্থাৎ ইংলণ্ডে পুরুষের সংখ্যা কম বলিয়া এখানে যাঁহাদের বিবাহ হইতেছেনা, তাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য দেশে যাইয়া স্বামী সংগ্রহে চেষ্টা করুন তদ্দ্বারা সাম্রাজ্যের হিত সাধিত হইবে।

নারীজীবনের আদর্শ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে শশিপদ বাবুর মত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত অবিবাহিতা স্ত্রীলোকগণের দেশে যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এজন্য তিনি অত্যন্ত ব্যথিত। তাঁহার বিশ্বাস এতদ্দ্বারা দেশের বিশেষ অকল্যাণ হইবে এবং এজন্য তিনি বিশেষ চিন্তিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিধবা সমস্যা।

(সেকাল ও একাল)

স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার পর শশিপদ বাবু শিক্ষয়িত্রীর অভাব বড়ই তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। বিধবাগণের অবস্থার কথাও সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল। হিন্দু-বিধবার দুঃখে মহাত্মা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর্দ্র হৃদয় হইতে যে করুণার উৎস নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহার তরঙ্গ দেশের অনেকেরই হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, শশিপদ বাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান।

বিধবাসমস্যা এক্ষণে হিন্দু সমাজে যতটা ভীষণ আকার গ্রহণ করিয়াছে, চিরকাল ততটা ছিলনা। পূর্ব্বে হিন্দু পরিবারের গঠন এইরূপ ছিল যে বিধবাগণ নিরাপদে বাস করিয়া সম্মানের সহিত সমাজের ও পরিবারের হিতসাধন করিতেন। বড় বড় পরিবারে পারিবারিক বিগ্রহের পূজার বা দেব সেবার একটা করিয়া ব্যবস্থা ছিল, এই ব্যবস্থা এখনও অনেক স্থানে আছে, তবে পূর্ব্ব যতটা সুব্যবস্থা ছিল এখন আর ততটা নাই। কেবল নিজের বাড়ীর নহে, যাহাদের অবস্থা কিছু ভাল তাহাদের বাড়ীতে অনেক দূরসম্পর্কীয়া ও নিঃসম্পর্কীয়া বিধবা আসিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইত। দেব-সেবার ব্যবস্থা উচ্চবর্ণের হিন্দু গৃহস্থের গৃহে প্রধানতঃ বিধবাগণের উপরেই ন্যস্ত থাকিত। তাঁহারা প্রাতঃকালে স্নান করিতেন—আপন আপন পূজা করিতেন, তাহার পর দেব-সেবার ব্যবস্থা করিতেন। পূজা ও ভোগের পর অতিথি অভ্যাগত আসিয়া খাইতে পাইত। এই সমস্ত পারিবারিক দেবালয়ে কথকতা, কীর্ত্তন, পাঁচালী প্রভৃতি হইত। এই সকলের দ্বারা

ধর্ম্মশিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। বিধবাগণ নানাতীর্থে পর্য্যটন করিতেন। দেশের বহুকাল সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার তাঁহাদের অধিকারে থাকিত। সন্ধ্যার পর বাড়ীর ও পাড়ার বালক বালিকাগণ এই সমস্ত বিধবা দিদিমা, ঠাকুরমা, পিসিমা, প্রভৃতির কাছে গিয়া বসিত। নিস্তব্ধ পল্লীগ্রামের সন্ধ্যার ক্ষীণ তারালোকে বসিয়া ঝিল্লীমন্ত্রের মধ্যে এই সব প্রবীণা বিধবাগণ বালকবালিকাগণকে উপদেশ দিতেন। রাজপুত্রের সাতসমুদ্র তেরনদী পারে যাইয়া সোণার কাঠি ও রূপার কাঠির সাহায্যে রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহাকে বিবাহ করা হইতে আরম্ভ করিয়া, ভীষ্মের কথা শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরের কথা সমস্তই বালক বালিকাগণ এইখানে বসিয়া শ্রবণ করিত। যাঁহারা প্রাচীন হিন্দু পরিবারে জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সকলেই রামায়ণ মহাভারতের সমস্ত উপাখ্যান অক্ষর পরিচয়ের পূর্ব্বে আয়ত্ত শিক্ষা করিতেন, বালিকাগণ ব্রতকথা প্রভৃতি শিখিত, বিধবাগণের এই প্রকারে প্রাচীন হিন্দু পরিবারে বেশ সম্মানিত ও আবশ্যকীয় স্থান ছিল। তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া সমাজের হিতসাধন করিতেন। আর এককথা, তখন দেশে অন্যরূপ আদর্শ উপস্থিত না হওয়ায় বিধবাগণ অন্যরূপ ভাবিতে পারিতনা। মনে করুন একটি ভদ্র মহিলা অকালে বিধবা হইলেন, তিনি ও তাহার পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজন যতই শোকার্ত্ত ও কাতর হউন না কেন পুনরায় বিবাহ দেওয়ার কথা সেকালে তাঁহাদের মনে উদয় হইতেই পারিত না। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন ও বুঝিতেন যে কর্ম্মফল অলঙ্ঘ্য, ভগবানের ইচ্ছায় যাহা হইয়াছে তাহার অন্যরূপ হইতেই পারেনা, সুতরাং যে প্রকারেই হউক বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেই হইবে। এখন কিন্তু অন্য প্রকারের চিন্তা সম্ভব হইয়াছে ও স্বভাবতঃই মনের মধ্যে জাগ্রতও হয়। একটি বালিকা বিধবা হইল। দারুণ শোকের প্রথম তুফান যখন আসিল

তখন কাতরহৃদয়ে পিতামাতা বলিতে লাগিলেন যে সমাজ হইতে তাড়িত হইব সেও ভাল, কিন্তু এই কন্যার পুনরায় বিবাহ দিতেই হইবে। যতক্ষণ শোক নূতন ও প্রচণ্ড, ততক্ষণ এই কল্পনা চলিতে লাগিল। হয়ত বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে যত কিছু যুক্তি সমস্তগুলি আলোচনাও হইল—অবোধ বালিকা সব কথা শুনিল। শুনিল অমুক পণ্ডিত বিধবা বিবহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, অমুক বিধবা বিবাহ করিয়া কত সুখী হইয়াছে, আজ সে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বরী ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব চিন্তা ও কল্পনা বালিকা বিধবার চিত্তে একেবারে মুদ্রিত হইয়া থাকিয়া গেল। শোকের বেগ থামিলে পিতা মাতা নিজ নিজ জীবন-সংগ্রামে নিযুক্ত হইলেন, বালিকার কথা আর ভাবিলেন না। তাঁহারা যাহাই করুন না কেন, বালিকার মনে এই চিন্তা চিরকালের মত থাকিয়া গেল, সন্তোষহীন দুর্ব্বিসহ জীবন চিতানলের মত, নিরাশা উপেক্ষা ও অনাদর তাহার হৃদয়ে সমস্ত জীবন ধরিয়াই ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল।

পূর্ব্বে দেশে এত বিলাসীতা ছিল না। স্বচ্ছন্দভাবে অলস হইয়া কেবল আরাম ভোগ করা গৃহস্থ পরিবারে একেবারে অজ্ঞাত ছিল। বিলাসের উপকরণও এত বেশী ছিল না, আর লোককে খাটিতেও হইত বেশী। এখন বিধবাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ কেবল কোন শ্রেণীবিশেষের জন্য নহে। ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ সকল নর-নারীকেই আপন পুরোদেশে রাখিতে হইবে, হিন্দু শাস্ত্রের ইহাই উপদেশ। এই উপদেশ কেবল যে শাস্ত্র বাক্যেই লিপিবদ্ধ মাত্র ছিল, তাহা নহে, হিন্দু সমাজ এই ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শের দ্বারাই নিয়মিত হইত। একালে মানুষ বড় লোক হয় নিজের ভোগ সুখের জন্য—একালে টাকা থাকিলেই লোকে সম্মানিত হয়, প্রতিবাসীর সর্ব্বস্ব ছলে বলে কৌশলে অপহরণ

করা যাঁহাদের জীবনের এক মাত্র কার্য্য, বুদ্ধি থাকিলে তিনিও রাজা, মহারাজা হইয়া বিপুল সম্মান ভোগ করিতে পারেন। আগে দেশে সম্মানিত হইতে হইলে দেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত, ক্রিয়া কলাপ, অতিথি সৎকার, মন্দির নির্ম্মাণ, কূপ পুষ্করিণী খনন, এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রয়োজন হইত, কিন্তু আজ কাল আর তাহা হয় না, কাজেই প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ যাহা সমাজের সকল ব্যক্তিরই জীবন অল্প বিস্তর পরিমাণে নিয়মিত করিত, আজ কাল আর তাহা নাই। সেকালে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল সত্য, কিন্তু এই বহুবিবাহ যাঁহারা করিতেন তাঁহারা নিজের ভোগের জন্য করিতেন না, তাঁহাদের এইরূপ ধারণাই ছিল যে কুলমর্য্যাদা লইয়া তাঁহারা জন্মাইয়াছেন সেই কুলমর্য্যাদার একটি আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্যই এই যে বিবাহ করিয়া অন্যের কুল রক্ষা করিতে হইবে। বহু বিবাহ অবশ্য কুপ্রথা ছিল সন্দেহ নাই. কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ বা একটি সযত্ন রক্ষিত সংযমের ভাব যে সমস্ত দেশে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন সেকালে আমরা জাতীয় হিসাবে দরিদ্র ছিলাম এবং ভোগের উপকরণ অধিক ছিল না। এ কথা সত্য নহে। এখনও দেশে এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা সহস্র সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া দোল দুর্গোৎসব পিতৃশ্রাদ্ধ মাতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে অজস্র ব্যয় করেন, বহু সংখ্যক কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করেন, কিন্তু নিজের আহার বিহার নিতান্ত দরিদ্র লোকের মত, ইঁহাই প্রাচীন কালের আদর্শ। আর একালের আদর্শ ঠিক ইহার বিপরীত, একালে যে ব্যক্তি মাসে পঞ্চাশ টাকা উপার্জ্জন করে, তাহার জুতা, মোজা, জামা-কাপড়, সাবান, পান, চুরুট, চা, গাড়ীভাড়া, বোতাম, ছড়ি প্রভৃতিতে ব্যয় কত এবং ইহা ছাড়া স্ত্রীর পোষাক ও অলঙ্কার, কাজেই আর প্রাচীন ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখা অসম্ভব। প্রাচীন পদ্ধতি ভাল কি নূতন পদ্ধতি ভাল, তাহা লইয়া

বিচার করিতে বসিলে শীঘ্র যে কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারা যাইবে, তাহার আশা নাই। তবে এটুকু ঠিক যে প্রাচীন কালের সংযম ও পরার্থ-পরতা, নিজের অর্জ্জনের দ্বারা নিজের বা নিজের স্ত্রী পুত্রেরই কেবল মাত্র ভরণ পোষণ না করিয়া, ক্রিয়া কলাপ তীর্থযাত্রা প্রভৃতি উপলক্ষে অন্য লোকের, শাস্ত্র ব্যবসায়ীর ও পরিবারের অন্য ব্যক্তিকে সাহায্য করা, সে কালের অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন যে একালে মূল-ধনীদের উদ্ভব বর্ত্তমান ইউরোপ আমেরিকার একটি প্রকাণ্ড সামাজিক অভিশাপ। প্রাচীন হিন্দুজীবনের যে আদর্শ বর্ণনা করা হইল, তাহা যদি মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে এই অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাচীন কথা, চিন্তা করিবার কথা, ধ্যান করিবার কথা, চেষ্টা করিয়া তাহার যেটুকু উৎকৃষ্ট, তাহা যাহাতে নষ্ট না হয় তাহাই আমাদের করিতে হইবে। কিন্তু দেশে প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়াছে। আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেরূপ ইচ্ছা স্বপ্ন দেখিনা কেন, এই ঝড়ে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পারিবারিক জীবন যে রূপ ছিল, আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল এখন আর তাহা নাই।

আর এককথা অন্নসমস্যা। বাহিরের চাকচিক্যের দ্বারা আমরা অনেক সময়ে মুগ্ধ হইয়া থাকি, বড় বড় সহরে প্রকাণ্ড সুসজ্জিত বাস ভবন ও অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া দেখিয়া আমাদের চোখে যতই ধাঁধা লাগুক না কেন, আমাদের দারিদ্র্য ও অভাব যে প্রত্যহ বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পারিবারিক জীবনের এই পরিবর্ত্তন, এই দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও নূতন আদর্শের আবির্ভাব, এই সমস্ত কারণে বিধবা সমস্যা দেশে অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। এই বিধবা সমস্যা পারিবারিক সমস্যার ও

সামাজিক সমস্যার একটি অতিশয় বিশিষ্ট অঙ্গ। এই সমস্যা সম্বন্ধে কোনও মত প্রচার করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, এই সমস্যাটি লইয়া কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি করিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য। বিধবা সমস্যা যে একটি প্রবল সমস্যা এবং যে দিক হইতেই হউক ইহার মীমাংসার প্রতি আমাদিগকে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে, তাহাতে মতভেদ নাই। বিধবা সমস্যা সম্বন্ধে আর একটি কথা ভাবিবার আছে। যুগধর্ম্ম (Spirit or the age) বলিয়া একটা জিনিষ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিগত অনধীনতা (Individualistic liberty) একালের একটি প্রধান লক্ষণ। সকলেই এই ভাবের দ্বারা আক্রান্ত। ইহার ভালর দিকও আছে, মন্দের দিকও আছে। সে কথা এখানে আলোচ্য নহে। বিধবাগণ আজকাল আর দেবরের ব ভাইয়ের স্ত্রীর অধীনে থাকিতে চাহে না। কেন চাহে না তাহা সমাজতত্ত্ববিৎ ও মনস্তত্ত্ববিৎগণ আলোচনা করিতে পারেন। কিন্তু কথাটা যে সত্য ইহা অস্বীকার করা যায় না।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে এ দেশে একবার সামান্য পরিমাণে বিধবা বিবাহের আন্দোলন হইয়াছিল। অবশ্য সে আন্দোলনে বিশেষ কিছু হয় নাই তাহার পর সতীদাহ নিবারিত হইলে এ বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা আরম্ভ হইল। যাঁহাদের বালিকা কন্যা বিধবা হয় তাঁহাদের মধ্যে এই আলোচনা একটু ভাল করিয়াই হইত। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সময় শ্যামাচরণ দাস নামক একব্যক্তি তাহার অল্পবয়স্কা এক কন্যার বৈধব্যে ব্যথিত হইয়া তাহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যাকুল হয় ও পণ্ডিত দিগের মধ্যে এই ব্যবস্থা চায় যে শূদ্র, তাহার অতি অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যা' যে স্বামী কি তাহা জানেনা পুনরায় তাহার

বিবাহ দিতে পারে কি না। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের গৃহে পণ্ডিতদিগের এক সভা হয়। সেই সভায় এই প্রশ্ন উপস্থাপিত হইলে পণ্ডিতেরা কেবল মাত্র শূদ্র বর্ণের বিধবা দিগের জন্য পাঁতি দিলেন। পণ্ডিতেরা মত দিলেন বটে, কিন্তু বিবাহ হইল না।

এই ঘটনার পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্দোলন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন আমাদের দেশের সকলেই জানেন সুতরাং সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। বালিকা বিধবাগণের করুণ ক্রন্দন রোলে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় বিগলিত হইল এবং তাঁহার কোমল প্রাণা মাতাঠাকুরাণীর প্রেরণায় তিনি শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরাশর সংহিতার ব্যবস্থা পাইলেন ও সেই ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহার প্রথম পুস্তিকা প্রচার করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তিকা প্রচারিত হইবামাত্র দেশে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। যে সমস্ত পণ্ডিতেরা শ্যামাচরণ দাস মহাশয়ের কন্যার বিবাহে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তিকার অতিতীব্র প্রতিবাদ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরবর্ত্তী কার্য্য বিধবা বিবাহের আইন পাশ করান। এই আইন না হইলে যাঁহারা বিধবা বিবাহ করিবেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ জারজ বলিয়া পরিচিত হইবে। উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীরা অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানিতেন এবং বিশেষ শ্রদ্ধাও করিতেন। আইন পাশ করিয়া হিন্দু মতে বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ৯৮৪ জন ভদ্রলোক কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত এক দরখাস্ত বড়লাট বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইল, এই দরখাস্তকারীগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামই সকলের উপরে ছিল—এই দরখাস্তের সহিত আইনের পাণ্ডুলিপিও দেওয়া হইয়াছিল, অন্যান্য স্থান হইতেও

দরখাস্ত আসিল, যাঁহারা আইন চাহেন তাঁহাদের ৫৩০২ জন সর্ব্ব-সমেত নামসহি করিলেন —এই আইন পাশে বাধা দিবার জন্য যে সমস্ত দরখাস্ত আসে তাহাতে ৫৬০০০ লোক নাম সহি করেন। যাহা হউক সাহেবদের সহানুভূতি থাকায় প্রতিবাদ সত্বেও আইন পাশ হইয়া গেল। একাল হইলে এত সহজে আইন পাশ হইত কিনা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে জুলাই তারিখে এই আইন পাশ হয় ও সাত দিন পরে বড়লাট সাহেবের সম্মতি লাভ করে। আইন পাশ হওয়ার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ দিতে আরম্ভ করিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বয়ং একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং মুর্শিদাবাদ বিভাগের জজ পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে ও তাঁহারই উদ্যোগে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করেন। যে বিধবার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় তিনি ও উচ্চ বংশ সম্ভূতা—নদীয়ার রাজাদিগের তিনি গুরু-বংশের কন্যা। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে ২৫টি বিবাহ হইয়া গেল। এই পঁচিশটির মধ্যে অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের পুত্রেরও বিধবা বিবাহ দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আন্দোলনের একটি বিশেষ দুর্ব্বলতা ছিল, সেই দুর্ব্বলতা এই যে তাঁহার মতানুসারে যাঁহারা বিধবা বিবাহ করিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিতেন, অর্থ দান করিতেন এমন কি অনেক সময়ে তঁহাদের কাজ কর্ম্মের সুবিধা করিয়া দিতেন। এইটি দুর্ব্বলতা; টাকার লোভ দেখাইয়া যে দলের পুষ্টি হয় সে দল স্থায়িত্ব লাভ করে না। তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা সমস্যাটিকে সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও নহে। বিবাহের আইন প্রনয়ণ করিয়াছিলেন, তাহা যে খুব কঠিন কার্য্য তাহা

ও নহে। অবশ্য এ সমস্ত কথার দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ব বা মর্য্যাদা হানি হইতেছেনা। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা, যত দিন বাঙ্গালী জাতি ততদিন এই ত্যাগশীল তেজস্বী ও কর্ম্মবীর ব্রাহ্মণ প্রত্যেক বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক পূজিত হইবেন। বিধবার দুঃখে যে আমাদের দুঃখিত হইতে হইবে এবং জাগ্রত হইয়া তাহাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই ভাবের সঞ্চার যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমেই হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত।

বিধবাবিবাহের আইন পাশ হওয়ার তিন বৎসর পরে তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় এই আন্দোলনে হস্ত ক্ষেপ করিলেন। তিনি এ বিষয়ে এক নাটক রচনা করিলেন, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সেই নাটকের অভিনয় হইল। হিন্দু বিধবার দারুণ দুঃখ ও অসহায় অবস্থা এবং পরে প্রলোভনে পড়িয়া তাহার শোচনীয় পরিণাম অতীব উজ্জল ও করুণ ভাষায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই নাটক খানির অভিনয়ে ব্রাহ্মসমাজে খুব কাজ হইল এবং হিন্দু সমাজে যাহাতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়, সে বিষয়ে সাহায্য ও চেষ্টা করা ব্রাহ্ম সমাজের একটি বিশেষ কার্য্য বলিয়া গৃহীত হইল। ব্রাহ্মসমাজ যে সমস্ত বিধবার বিবাহ দিলেন তাহার প্রত্যেকটির ঘটনা এক একখানি উপন্যাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু সমাজ হইতে বিধবাদের লইয়া আসিতে কত গোলযোগ হইয়াছে—অনেক স্থানে একরূপ 'চুরি' করিয়া আনা হইয়াছে।

বিধবা সমস্যা লইয়া এ পর্য্যন্ত আমাদের নব্য-সমাজ এই টুকু করিয়াছিলেন। সমস্যা কঠিন এবং তাহার মীমাংসা চাই, এটুকু স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মীমাংসার জন্য মাত্র একটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন, বিধবাদিগের বিবাহ দেওয়া হউক ইহাই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট উপায়। এই উপায় সফল করিবার জন্য

সরকার বাহাদুরকে ধরিয়া আইন পাস ও করান হইয়াছিল। কিন্তু সমস্যাটির ইহা সম্পূর্ণ মীমাংসা নহে—ইহার আরও অনেক দিক আছে।

এই বার শশিপদ বাবুর চিত্তে এই বিধবা সমস্যা কি প্রকারে উদিত হইল এবং তিনি কিপ্রকারে ইহার মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন তাহা আলোচনা করা হউক।

হিন্দু বিধবাগণের দুরবস্থা অতি বাল্যকালেই শশিপদবাবুর চিত্তে একটি বিশেষ ঘটনার দ্বারা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। তখন শশিপদ বাবুর বয়স আট কি নয়, শশিপদ বাবুর আত্মীয় এক বালবিধবা বিপথ-গামিনী হয়। পরিবারের যুবকগণ তাহাকে বাড়ীতে ধরিয়া আনিয়া এক ঘরে পুরিয়া রাখে এবং তাহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া নিশীথ কালে অতীব প্রচণ্ড ভাবে প্রহার করিতে থাকে, ফলে তৃতীয় রাত্রিতেই হতভাগিনীর মৃত্যু হয়। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই রমণীর মৃতদেহ দাহ হইল এবং এইরূপ রাষ্ট্র করা হইল যে সে গলায় দাড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই আসুরিক ব্যাপারে শশিপদবাবুর চিত্তে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ক্রমশঃ জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা তিন প্রত্যক্ষভাবে অবগত হইলেন যে, সমাজে বিধবা-দিগের এই শোচনীয় দুরবস্থা, একটি দুইটি নয়, সহস্র সহস্র সংঘটিত হইতেছে। এই ধারণা কেবল শশিপদ বাবুর নহে, করুণ হৃদয়ে সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলকেই এই মতে উপস্থিত হইতে হইবে।

বিধবা সমস্যার সহিত হৃদয়ের আন্তরিক যোগ ও ইহার মীমাংসার প্রতি সযত্ন দৃষ্ট প্রথম হইতেই শশিপদ বাবুর চিত্তে সর্ব্বদাই জাগরিত ছিল। বিধবা বিবাহের আইন যখন পাশ হইল তখন শশিপদ বাবুর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর। আইন পাশ হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিলনা। বিদ্যাসাগর মহা-শয়ের মতে প্রথম বিধবা-বিবাহ যখন হয়, তখন শশিপদ বাবু তাঁহার কয়েক জন বালকসঙ্গীর

সহিত বিবাহ দেখিবার জন্য বরাহনগর হইতে কলিকাতা আসেন। সুকিয়াস ষ্ট্রীট্‌ স্থিত যে বাড়ীতে এই বিবাহ হয় তথায় ভয়ঙ্কর জনতা হইয়াছে, শশিপদবাবু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না বটে কিন্তু এই ব্যাপারের উৎসাহ ও উল্লাসে হৃদয় পূর্ণ করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

বিধবা বিবাহে হস্তক্ষেপ ও ভীষণ পরীক্ষা।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবু তাঁহার বিধবা ভাগিনেয়ী (জেঠতুত ভগ্নীর কন্যা) কুসুমকুমারীর বিবাহ দেন, কুসুমকুমারী শশিপদবাবুদের বাড়ীতেই থাকিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবু সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বালিকা স্ত্রীকে বাড়ীতে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন।—প্রথমে ইহা লইয়া খুব হৈ চৈ হইল বটে, কিন্তু শেষে শশিপদবাবুরই জয় হইল এবং অল্পদিন মধ্যে পরিবারের বয়ঃস্থারমণী বিধবা ও বালিকাগণ লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিল। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কুসুমকুমারীর বিবাহ হয় এবং বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। কুসুমকুমারী ও তাহার মাতা বিধুমুখী এই পারিবারিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতেন। কুসুম-কুমারীর বিবাহের ঘটনা উপন্যাসের মত কৌতুকাবহ। ইণ্ডিয়ান্‌ ডেলি নিউজ পত্রের সম্পাদক জেমস্‌ উইলসন্‌ বরাহনগরে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। এই পুস্তিকায় তিনি কুসুমকুমারীর বিবাহের, কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

কুসুমকুমারীর মাতা বিধুমুখীর মনে ইচ্ছা হয় যে কন্যাটির বিবাহ দিই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবু যখন পৈতৃক বাসভবন পবিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হয়েন, তখন বিধুমুখী তাঁহাদের সহিত যাইয়া তাঁহাদের নিকটেই থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শশিপদ বাবুর তখন অবস্থাও খুব ভাল নহে, আর চারিদিকে ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন,

তখন তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, কোথায় যাইয়া থাকিবেন তাহারও বেশ স্থিরতা নাই, এ অবস্থায় তিনি বিধুমুখী ও কুসুমকুমারীর ভার লইতে পারিলেন না। তবে এইরূপ কথা হইল যে নিজের বাড়ী হইলেই তিনি তাঁহাদের ভার লইবেন। ইংরাজী ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পৈতৃক বাস-ভবন ত্যাগের দুই বৎসরের মধ্যে শশিপদ বাবু নিজের একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন ও বিধুমুখীকে তাঁহার কন্যাসহ তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া থাকিবার জন্য আহ্বান করিলেন। এই আহ্বান অনুসারে তাঁহারা মাতা ও কন্যা শশিপদ বাবুর গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহার পর কুসুমকুমারীর বিবাহ, কিন্তু এই বিবাহ সহজে সাধিত হয় নাই। উইলসন্ সাহেবও বিবাহের সমস্ত বিবরণ প্রদান করেন নাই, আমরা পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের "Social Reform in Bengal নামক গ্রন্থ হইতে সেই বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে প্রদান করিলাম।

শশিপদ বাবু পৈতা ফেলিয়া দিয়াছেন, ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া আদিব্রাহ্ম সমাজে গিয়াছেন, এই সব কারণে পরিবারের সকলে তাঁহার উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করে এবং এই অত্যা-চারের ফলেই তিনি নিজে আর স্বত্বরক্ষার জন্য কোন গোলযোগ না করিয়া, ভাল মানুষের মত পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া নূতন বাড়ী করিলেন। সে সময়ে ও তাঁহার উপর ভীষণ অত্যাচার চলিতেছে। ধোপা বন্ধ নাপিত বন্ধ, হইয়াছে। এইরূপ যখন অবস্থা তখন বিধুমুখী তাহার কন্যা কুসুমকুমারীর সহিত ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে শশিপদ বাবুর নূতন বাড়ীতে আসিলেন। পুরাতন বাড়ীর দুই একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বিধুমুখীকে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিল। শশিপদ বাবুর কনিষ্ঠভ্রাতা কেদার আসিল—তিনি ও বিধুমুখীকে অনেক অনুরোধ করিলেন। এই প্রকারে তিন দিন চলিয়া

গেল। ২৯শে জুন রবিবার সকাল বেলায় বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা। শশিপদ বাবুই এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য। তিনি উপাসনা করিলেন, এই উপাসনা কালে তিনি বিধুমুখী ও কুসুমকুমারীর তাঁহার বাড়ীতে চলিয়া আসার কথা উল্লেখ করিলেন। সেই উপাসনার পর ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল যে অদ্য, অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় তাঁহার বাড়ীতে পুনরায় উপাসনা হইবে। তাঁহার যে আত্মীয়াগণ সাহসের সহিত তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াছেন তাঁহাদের জন্য বিশেষভাবে ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া হইবে। শশিপদ বাবু তখন একাউনট্যাণ্ট জেনারেলের আপিসে কর্ম্ম করিতেন—অন্য দিন স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে পারিতেন না। রবিবার দিনই তিনি এই বিদ্যালয় দেখিবেন বলিয়া বিদ্যালয় খোলা হইত। বেলা বারটার সময় তিনি বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে গেলেন, বাড়ীর স্ত্রীলোকদের বলিয়া গেলেন যেন বাড়ীর সদর দরজা খোলা না থাকে। শশিপদ বাবুর পৈতৃক বাড়ীর পুরুষদিগের মধ্যে অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্র হইতেছিল। বালিকা বিদ্যালয়ে যাইবার পথ তাঁহার পৈতৃক বাটীর সম্মুখ দিয়া, শশিপদ বাবু বালিকা বিদ্যালয়ে গেলেন, তাঁহার পুরাতন বাটীর লোকেরা দেখিলেন ও দল বাঁধিয়া এক বাগানের ভিতর দিয়া তাঁহার নূতন বাড়ীতে আসিয়া লুকাইয়া রহিলেন। একজন বালক তাহাদের শিক্ষামত বিধুমুখীকে ডাকিয়া একটি চাবির কথা জিজ্ঞাসা করিল। বিধুমুখী সাদাসিদে লোক এত কিছু বুঝিতে পারেন নাই, ডাক শুনিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন, অমনি সেই দল আসিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বিধুমুখীর সহোদর ভ্রাতা, তিনি তখন জনাই স্কুলের হেডমাষ্টার; সর্ব্বাগ্রে তিনি আসিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বিধুমুখীকে সেখান হইতে কন্যাটিকে লইয়া চলিয়া আসিতে বলিলেন। বিধুমুখী সম্মত না হওয়ায় জোর আরম্ভ হইল। প্রথমেই জনকতক

কুসুমকুমারীকে ধরিয়া একেবারে তুলিয়া লইয়া গেল। বিধুমুখীকেও ছাড়িল না। বিধুমুখী আশা করিতেছিলেন শশিপদ বাবু এখনি সংবাদ পাইয়া বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু কে সংবাদ দেয়? শশিপদ বাবুর বাড়ীতে ঝি চাকর ছিল না। এই অবস্থায় বিধুমুখী পরাজিতা হইলেন, তাঁহার আত্মীয়গণ অশেষ কষ্ট দিয়া জোর পূর্ব্বক কুসুমকুমারীর সহিত তাঁহাকেও তাহাদের গৃহে লইয়া গেল।

বিদ্যালয়ে বালিকাগণের পরীক্ষাদি শেষ করিয়া বেলা তিনটার সময় শশিপদ বাবু বাড়ী ফিরিলেন। ৪টার সময় বাড়ীতে উপাসনা, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাড়ী আসিয়াই সমস্ত কথা শুনিলেন, তাঁহার মনে অনেক চিন্তার উদয় হইল, ভাবিতে লাগিলেন বিধুমুখী ও কুসুম-কুমারীকে পৈতৃক বাড়ীতে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগকে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট ও যন্ত্রণা দিতেছে! হইলও তাহাই, বিধুমুখী ও কুসুমকুমারীকে বাড়ী লইয়া গিয়া এক ঘরের মধ্যে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখা হইল এবং ধান খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। (বিধুমুখীর নিকট হইতে একথা পরে প্রকাশ হইয়াছিল।) যদিও পৈতৃক বাড়ী শশিপদ বাবুর নূতন বাড়ী হইতে অধিক দূর নহে, তথাপি বিধুমুখী ও কুসুমকুমারী কি ভাবে সেখানে আছে, তাহার খবর শশিপদ বাবু কিছুই পাইলেন না। শশিপদ বাবুদের পরিবারের প্রতিপত্তি বরাহনগরে খুব অধিক, কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহাদের কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে। তাহার পর সমস্ত সহরই একরূপ শশিপদ বাবুর বিরোধী। প্রথম কয়দিন শশিপদ বাবু বিধুমুখী ও কুসুমকুমারীর কোন সংবাদই পাইলেন না। শশিপদ বাবুর যাঁহারা বন্ধু তাঁহারা বেলা ৪টার সময় উপাসনার জন্য আসিলেন, তাঁহারা আসিয়া শশিপদ বাবুকে অনধিকার প্রবেশের দাবীতে মোকদ্দমা করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ভগবানের

ভগবদইচ্ছার উপর নির্ভরের ভাব বশতঃ তিনি ঐরূপ করিতে প্রস্তুত হইলেন না।

যাহা হউক বিধুমুখী ও তাঁহার বিধবা কন্যা কুসুমকুমারীকে অধিক দিন পরিবারে রাখা হইল না। প্রশ্ন উঠিল যে তাহাদিগকে আবার পরিবারে গ্রহণ করিতে হইলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। তাহারা তিন দিন ব্রাহ্মের বাড়ীতে কাটাইয়াছে ও সেই খানেই খাইয়াছে, এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাহাদিগের কিছুদিন তীর্থে বাস করিতে হইবে। কয়েক সপ্তাহ এইরূপ আলোচনা চলিল। সেই সময়ে এক জন পাণ্ডা বরাহনগরে আসিয়াছিল—এই পাণ্ডার সহিত বিধুমুখী ও কুসুমকুমারীকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহারা যে কোথায় গেল, শশিপদ বাবু তাহার খবর পাইলেন না। যাহা হউক শশিপদ বাবুও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া তিনি কিছু-দিন পরে সংবাদ পাইলেন যে তাহাদিগকে কাশী পাঠান হইয়াছে ও তাহারা তথায় কালিদাস মৈত্র নামক বরাহনগর নিবাসী এক প্রাচীন ব্যক্তির পরিবারে বাস করিতেছে। পরে শশিপদ বাবু কাশীস্থ ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়কে এক পত্র লিখিলেন, তাহারা সত্যই সেখানে আছে কি না, আর তিনি যদি যান তাহা হইলে দেখা হইতে পারে কি না। উত্তরে জানিলেন তাহারা সেখানে আছে এবং যাইলেই দেখা হইবে। তাহার পর দুইমাস শশিপদ বাবু আর কিছুই করেন নাই, ডাক্তার লোকনাথ বাবুকে আর পত্রাদিও লেখেন নাই, কারণ তিনি তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন, এ কথা প্রকাশ হইলে বিধুমুখী ও কুসুমকুমারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। সে সময়ে তিনি আপিসে ছুটি লইয়া কাশী যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না, কারণ আপিসে ছুটি লইলেই কেন ছুটি লইয়াছে ইত্যাদি

সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারে এবং তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার গতিবিধি সম্বন্ধে সামান্য মাত্র সন্দেহ করিলেই তাঁহার কার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতে পারে। ক্রমশঃ পূজার ছুটি আসিল। পূজার ছুটিতে তিনি কাশী যাইবেন। কিন্তু এ কার্য্যও অতি সতর্ক ভাবে করিতে হইবে। বরাহনগর হইতে জিনিস পত্র গুছাইয়া লইয়া যদি যাত্রা করেন তাহা হইলেই সন্দেহ হইবে। তাঁহার আত্মীয়গণ অতিশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এই জন্য ছুটির কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শশিপদ বাবু দু একটি করিয়া জিনিস কলিকাতায় গোপনে আনিতে লাগিলেন। আপিস বন্ধ হইলে কলিকাতা হইতেই রাত্রির গাড়ীতে কাশী যাত্রা করিলেন (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর) তখন গাড়ী এত বেগে যাইত না, ২১শে দ্বিপ্রহরের সময় তিনি কাশী পঁহুছিলেন মধ্যে পথে জামালপুরে বিশ্রাম করিয়া গেলেন। তাঁহার এই ভয় হইল যে কাশীতে তাঁহাকে জানে এমন কোন লোক যদি তাঁহাকে দেখিতে পায় ও তিনি কাশী আসিয়াছেন এই কথা যদি কালিদাস মৈত্র মহাশয় শুনিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার যে উদ্দেশ্য তাহা কিছুতেই সফল হইবে না। এই জন্য তিনি ষ্টেশনে নামিয়া যে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন সেই গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন ও এইভাবে বরাবর ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। বিধুমুখী ও তাঁহার কন্যা কাশীতে আনীত হইয়া অত্যন্ত কষ্টে আছেন ও শশিপদ বাবুর সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন। শশিপদ বাবুর গাড়ী লোকনাথ বাবুর বাড়ী পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বিধুমুখী ও তাঁহার কন্যা শশিপদ বাবু সম্বন্ধে সংবাদ লইবার জন্য লোকনাথ বাবুর বাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সময়ে শশিপদ বাবুর সম্বন্ধে কথা হইতেছিল, এমন সময়ে একেবারে অপ্রত্যাশিত রূপে শশিপদ বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া

সাতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে স্ত্রী-লোকেরা অনেকটা স্বাধীনভাবে এদিক ওদিক বেড়াইতে পায়। বিধুমুখী ও তাঁহার কন্যা কালিদাস মৈত্র মহাশয়ের বাড়ী গেলেন ও অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে নিজেদের সামান্য যাহা কিছু জিনিসপত্র তাহা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের লইয়া শশিপদ বাবু কাশী হইতে রওনা হইলেন, কলিকাতার দিকে আসিলেন না এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন। প্রয়াগে ইহাদের দুইজনকে জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়া শশিপদ বাবু পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া গেলেন, দিল্লী আগরা ঘুরিয়া ছুটি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসি-তেছে তখন তাহাদিগকে লইয়া মুঙ্গের আসিলেন। মুঙ্গের সেই সময়ে ব্রাহ্মদিগের একটি অতি প্রধান কেন্দ্র। শশিপদ বাবু বিধুমুখী ও কুসুমকুমারীকে মুঙ্গেরে রাখিয়া কলিকাতা আসিলেন—সুরতি বাগানে এক বাড়ী ভাড়া করিলেন ও বরাহ নগর হইতে তাঁহার পরিবারবর্গকে কলিকাতায় আনিয়া সেই ভাড়ার বাড়ীতে রাখিলেন—তাহার পরে জগদ্ধাত্রী পূজার আপিসের ছুটিতে তিনি মুঙ্গের গেলেন ও তথা হইতে বিধুমুখী ও কুসুম কুমারীকে কলিকাতা লইয়া আসিলেন। তিন মাস দশ দিন নানারূপ কষ্টভোগ করার পর বিধুমুখী ও কুসুম-কুমারী পুনরায় শশিপদ বাবুর পরিবারবর্গের সহিত সম্মিলিত হইল।

বরাহনগর নিবাসী চন্দ্রনাথ চৌধুরী তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং অল্পবয়সে বিপত্নীক হইয়াছিলেন—উভয় পক্ষেরই সম্মতি অনুসারে শশিপদ বাবু কুসুমকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কলেজ ষ্ট্রীটের এক ভাড়ার বাড়ীতে এই বিবাহ হয়—বিবাহ সভায় দেশীয় অনেক ভদ্রলোক ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ ও ইংরাজ মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন, দেশীয় বিখ্যাত বারিষ্টার পরলোক গত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া-

ছিলেন। সীতানাথ বাবুর পুস্তকে এই পত্রখানির উল্লেখ নাই বলিয়া আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"I fully sympathise with you on this grand movement I can not call it anything but grand : and though not present in body I shall be with you in spirit. May all your enlightened efforts be crowned with all the success they deserve." 28th NOV. 1868.

এই বিবাহ যে নির্ব্বিবাদে হইয়াছিল তাহা নহে। প্রথমে ঐই বিবাহের জন্য মানিকতলা ষ্ট্রীটের একটি বাগান বাড়ী স্থির করা হইয়াছিল। যাঁহার বাগান তিনি বাগান দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই বাগান বাড়ীর ঠিকানায় বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়া গেল। এমন সময়ে গৃহস্বামী জানাইলেন যে উক্ত বাগানবাড়ী দেওয়া হইবে না। এই ব্যাপারের পশ্চাতে যে প্রতিপক্ষীয়গণের চক্রান্ত কার্য্য করিতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বাগান বাড়ী পাওয়া যাইবে না শুনিয়া শশিপদবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিবাহ এক সপ্তাহের জন্য পিছাইয়া দিতে হইল। তাহার পর কলেজষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

বিবাহ সময়েও তাঁহার বিপক্ষীয়গণ রাস্তা হইতে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিয়া এই কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়াছিল। কিরূপ ভীষণ প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ও কিরূপ অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া শশিপদ বাবু তাঁহার বালবিধবা ভাগিনেয়ীর বিবাহ দিয়াছিলেন এ পুস্তকে সে সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনার আবশ্যকতা নাই, বিশেষ বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের 'বঙ্গেসমাজ সংস্কার' নামক পুস্তকে (Social Reform in Bengal) দেখিবেন। কোনও নূতন কার্য্য করিতে গেলে সকল দেশেই এইরূপ বাধা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

বিধবা-সমস্যা হউক আর যে সমস্যাই হউক সমগ্র হৃদয়ের সহিত কোনও সমস্যার মীমাংসায় আত্মনিয়োগ করিলে পর যেরূপ নব নব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন আমাদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, দূর হইতে দেখিলে সেই সব প্রয়োজনের অস্তিত্বই বুঝিতে পারা যায় না। 'বিধবার ব্রহ্মচর্য্য' আদর্শটি খুবই ভাল—বিধবা বিবাহ বা বিধবাদিগের অন্নসংস্থানের উপায় সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা উপস্থিত হইলে আমরা অনেক সময়েই ব্রহ্মচর্য্যের সেই উন্নত আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হইয়া বড় বড় কথা, মানবজীবনের আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ ও সংযমের কথা অনর্গল বলিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তব জীবনের সহিত আন্তরিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ এই সব বড় বড় কথার স্বপ্নের মোহ লইয়া কাল কাটাইতে পারে না।

বিধবা-সমস্যাটির উদ্ভব কি প্রকারে শশিপদ বাবুর চিত্তে অতি শৈশবেই উদিত হইয়াছিল, সে কথা বলা হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভ করিয়া বিধবাদিগের শিক্ষার ভার স্বভাবতঃই কি প্রকারে তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়িল, তাহার পর প্রয়োজনের তাড়নায় বিবিধ অসুবিধা ও ক্লেশের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার ভাগিনেয়ীর বিবাহ দিলেন সে কথা বর্ণিত হইল। এই বিবাহের পর অনেক লোকে তাঁহার উপর এরূপ খড়্গহস্ত হইল যে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এদিকে গোপনে আর এক কাণ্ড ঘটিল। তাঁহার ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেওয়ার পর একটি একটি করিয়া অনেক বিধবা আসিয়া শশিপদ বাবুর শরণাপন্ন হইতে লাগিল। এইবার তিনি কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

তিনি বুঝিলেন যে বিবাহ ব্যবস্থাই বিধবা-সমস্যার একমাত্র মীমাংসা নহে; সকল ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ সম্ভবও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। এই জন্য তিনি শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা বিধবাগণের যাহাতে উন্নতি হয়, সেজন্য

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত বিধবা ধর্ম্মপ্রাণতা ও পতিভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত যথার্থভাবে পালন করেন, তাঁহারা সকলের পূজনীয়া, বিশ্বের রমণীমণ্ডলীর আদর্শ স্বরূপা হিন্দু-পরিবারে মূর্ত্তিমতী দেবী স্বরূপা। শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধবা-শ্রমের ব্যবস্থায় এই আদর্শ সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যাহা হউক দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধ্যমত অনেক বিধবাকে পালন ও শিক্ষাদান করার পর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বরাহ নগরে হিন্দু বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। শশিপদ বাবু জীবনে চেষ্টা করিয়া প্রায় ৪০টি বিধবার বিবাহ দিয়াছেন, তাঁহার প্রথমা পত্নীর লোকান্তর হওয়ার পর যদিও বেশ ভাল ঘরের কুমারী পাত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব হয়, তথাপি তিনি যে মতের পোষক ও যে সত্যে বিশ্বাসবান, সেই মত ও সেই সত্যের অনুসরণ করিয়া নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিধবা বিবাহ করেন।

বিধবাদিগের জন্য এই প্রকারের অনুষ্ঠান বর্ত্তমান সময়ে দেশে অনেকগুলি হইয়াছে—তাহার প্রায় সকলগুলিই বরাহনগরের এই আদি আশ্রমের অনুবর্ত্তনে প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালী নব্যভারতের জাতীয় উদ্যমের প্রায় সকল বিভাগেরই পথপ্রদর্শক। পুনা বিধবাশ্রম বরাহ-নগরের এই আশ্রমের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তনে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক কার্ভি শশিপদ বাবুর নিকট হইতে বিধবাশ্রমের ভাব ও কার্য্যপ্রণালী প্রাপ্ত হয়েন। মহীশূরে রাজার সাহায্যে যে বৃহৎ বিধবাশ্রম হইয়াছে তাহাও এই বরাহনগরের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত।

বরাহনগর "হিন্দু বিধবাশ্রম" এখন আর নাই। আমাদের জাতীয় জীবনে একটি প্রধান দোষ হইয়াছে এই, যে কি চিন্তাক্ষেত্রে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা বেশ পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছি না। বরাহনগর বিধবাশ্রমের দ্বারা দেশের ও সমাজের

কিরূপ মহৎ হিত সাধিত হইয়াছে তাহা পরে বলিতেছি—দেশের অনেকেই তাহা জানেন--কিন্তু সেই প্রকারের অনুষ্ঠানের কার্য্য যাহাতে অব্যাহত ভাবে চলে ও আমাদের এক দীর্ঘকালব্যাপী জাতীয় সাধনার পুণ্যস্মৃতিস্তম্ভরূপে উত্তর পুরুষের চিত্তকে উচ্চ ও উদার চিন্তায় উদ্দীপিত করে তাহার ব্যবস্থা আমরা করিতে পারিলাম না। দেশে যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান নাই তাহা নহে—কিন্তু কার্য্যগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। আমাদের চেষ্টা সমূহের একটি ক্রমানুবর্ত্তীতা নাই। ক্রমানুবর্ত্তীতার অভাব যে জাতীয় জীবনের পুষ্টির ব্যাঘাতক তাহা বুঝিতে বোধ হয় আমাদের এখনও বিলম্ব আছে।

এইবার বরাহনগরের হিন্দু বিধবাশ্রমের কার্য্য কি ভাবে চলিত সে সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইহার ব্যবস্থাদি আলোচনা করিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে ইহা একটি ধর্ম্মনাশকর বিজাতীয় ব্যাপার। "দি ইণ্ডিয়ান্ সোসিয়্যাল রিফর্ম্মার" নামক পত্রে এই আশ্রমের পরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধে খুব বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন আমরা তাহা হইতে অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম।

* * "It was strictly orthodox on the one side, while on the other there was a separate department where Hindu guardians of advanced ideas could put their wards and whose caste rules were not so strictly observ-ed. All the boarders were no doubt lodged in the same building, but with regard to food and drink the rules of Hindu orthodoxy were scrupulously observed by the Hindu widows living in the orthodox style since then, however with the growth of the institution addi-tions have been made to the building, and with the increase in the number of orthodox boarders an al-

together separate building has been bought and added to the old premises where these orthodox widows are lodged and fed, each caste according to their own ideas. Hindu orthodoxy has been receiving so much respect, in this institution, that even leaders of Brahmanic thought in Bengal having inspected the Home have freely recommended it to all classes of Hindus. Pandit Krishna Hari Srimoni, one of the old leaders of Brahminism in west Bengal, recorded his opinions thus :

"I was much pleased with the Hindu widow's Home of Mr. S. Banurji, Hindu wldows can live here keeping in tact their prescribed rules of conduct and their religion, and I was glad to find some living here in this manner. I observed the purity and excellent arrangements made for their food and board. Blessed is he who is so kind to helpless women. I now pray for the steady improvement of this worthy institution." Pandit Sasadhar Tarkaratna, another orthodox Hindu Pandit, also recorded a similar opinion."

"এই বিধবাশ্রমের এক অংশ আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থানুযায়ী পরিচালিত, আর এক অংশের ব্যবস্থা কিছু অন্যরূপ। যে সমস্ত বিধবার অভিভাবক হিন্দু আনুষ্ঠানিকতার সমস্ত বিচার রাখিতে না চাহেন তাঁহাদের প্রেরিত বিধবাদিগের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা আছে। অবশ্য সকলেই এক বাড়ীতে বাস করিত বটে, কিন্তু আহার ও পান সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থা হিন্দুভাবে যে সব বিধবারা থাকিতেন তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইত। তাহার পর এই আশ্র-

মের উন্নতি হইতে লাগিল আনুষ্ঠানিক হিন্দুমতাবলম্বী বিধবার সংখ্যা বাড়ীতে লাগিল, ফলে নূতন বাড়ী কিনিয়া আশ্রমের আয়তন বাড়ান হইয়াছে এবং আনুষ্ঠানিক হিন্দুমতে যে সমস্ত বিধবা থাকিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা হইয়াছে পৃথক পৃথক জাতির বিধবাগণ পৃথক ভাবে নিজেদের মতানুসারে থাকেন। সেই সময়ের হিন্দুসমাজের যাঁহারা নেতা তাঁহারাও এই আশ্রম পরিদর্শন করিয়া এই মত দিয়াছেন যে সকল শ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ অনায়াসেই এই আশ্রমে থাকিতে পারেন। পণ্ডিত কৃষ্ণহরি শিরোমণি মহাশয় লিখিয়াছেন—"শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বিধবাশ্রম দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি—হিন্দুবিধবাগণ স্বধর্ম্মানুমোদিত সমস্ত ব্যবস্থা যথারীতি পালন পূর্ব্বক এই আশ্রমে থাকিতে পারেন। এই ভাবে সদাচারে অনেক বিধবা এখানে রহিয়াছেন। তাঁহাদের আহার ও বাসস্থান ব্যবস্থা সুন্দর—শাস্ত্র ও দেশাচার সম্মত। অসহায় স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যিনি এত দয়ালু তিনি ধন্য। এই আবশ্যকীয় সদনুষ্ঠানটির শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হউক ইহাই আমার কামনা।" হিন্দুসমাজের অপর একজন প্রাচীন নেতা শশধর তর্করত্ন মহাশয়ও এইরূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী বাঙ্গালা ১২৯৭ সালের ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই বিধবাশ্রম পরিদর্শন করেন ও নিম্নরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন—

"সে দিন শশিবাবুর প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর মহিলাশ্রম দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিয়াছি। শশিবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী স্কুলের বালিকাগণকে যেরূপ কন্যাবৎ যত্নে প্রতিপালন এবং বিদ্যানীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করেন তাহা এই আশ্রমের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত পথ। উক্তরূপ সাধারণ শিক্ষার সহিত স্ত্রীলোকের অবশ্য-

কর্ত্তব্য রন্ধন প্রভৃতি গৃহস্থালী কার্য্যও এখানে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া—এই আশ্রমের আরো একটি এই প্রধান গুণ দেখিলাম—ইহা কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় নহে। কয়েকটি হিন্দু বিধবা হিন্দু আচার রক্ষা করিয়া এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। এতদিন আমাদের দেশে অনাথাদিগের এরূপ আশ্রয় স্থানের অভাব ছিল; শশিবাবুর উদারতায় এবং অবিশ্রাম যত্নে সে অভাব দূর হইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত এই বিদ্যালয়ের মঙ্গল কামনা করি।" সার, কে জি, গুপ্ত মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রসন্ন তারা গুপ্ত ইংরাজী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে এই আশ্রম দর্শন করিয়া নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"গত কল্য আমরা বরাহনগর গিয়াছিলাম। তথায় শশিবাবুর বোর্ডিং স্কুলটি দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। বিশেষতঃ Mr. & Mrs. Banurjiর স্কুলের মেয়েদের উপর সন্তানবৎ স্নেহ দেখিয়া আমরা খুব প্রীত হইয়াছি। বাস্তবিক এরূপ উপায় দ্বারা যেরূপ শিক্ষা হইতে পারে, অন্য কোন উপায়েই সেরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। এরূপ একটি স্কুল থাকা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব ইহাতে আমাদের সকলেরই সহানুভূতি দেখান কর্ত্তব্য। এই স্কুল দরিদ্র মেয়েদের পক্ষে খুব উপযুক্ত এখানে তাহাদের অবস্থানুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা হয়, অতএব ভবিষ্যতে তাহাদের আর কোন কষ্ট হইবার সম্ভব নহে।

বরাহনগর বিধবাশ্রমের আদর্শের অনুবর্ত্তনে মহীশূরে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে মহীশূরের মহারাজা কলিকাতায় ছিলেন, তিনি বরাহনগর বিধবাশ্রমের কথা পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী এই আশ্রম পরিদর্শন করিয়া নিম্নরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

"It gave me very great pleasure to visit Sasipada Banurji's Institution for promoting female education. That his boarding school should be utilised hy native ladies is itself a great step gained, but the successful management of the widows Home attached to it, is in my opiniou pregnant with greater benefits to the country, and speaks volumes for the tact, good sensc and eulogy with which the affairs of this Institution are managed, The difficult problem of the female education will be solved, in my belief, when our widows who are the natural teachers are educators of our fair sex in this country come forward to educate themselves on a large scale, As we all know, our religion and tradition has prescribed for the high caste Hindu widows a high spiritual ideal and rigorous rules of conduct to enable them to attain that ideal. Their dress, meals and other details of daily life are rigidly regulated to render them sit for self-sacrificing pious devotion. They would therefore serve as our appropriate agency, if they would come forward to assist us in disseminating the blessings of education among their sisters. Their freedom from family cares would ensure them a noble and life-long, career of practical usefulness. Viewed in the above light, we cannot too highly appreciate the good work which Sasipada Banurji is doing for his country.

I have unbounded faith in female education as the surest road to our national greatness, and the present home and similar ones at Poonah and elsewhere are centres of a new power in aid thereof which will in the near future bring about the regenoration of the country,

As a pioneer and a successful poioneer in this truly noble unselfish wcrk S. P. Banurji is entitled to the gratitude of the present generation and of posterity : and I wish him every success in his attempts and unceasing and useful career for the Institution he has founded." 5th June 63.

পূর্ব্বোদ্ধৃত ইংরেজী অংশের যাহা মর্ম্ম তাহা আমরা অন্যান্য স্থানে বলিয়াছি সুতরাং ইহার আর অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

বরাহনগর হিন্দুবিধবাশ্রম ও মহিলা বোর্ডিং পরিচালনার আরও এমন কতকগুলি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল—যাহার সহিত পরিচিত হওয়া আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। ঠিক ৫॥ ঘটিকার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে জাগাইয়া দেওয়া হইত। ৬টার সময় সকলে একত্রে সমবেত হইত—দু একটি ভজন গান গাওয়া হইত, একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা হইত, তাহার পর চরিত্র গঠন বা জীবনের কর্ত্তব্যপালন এই প্রকারের কোন আবশ্যকীয় বিষয়ে কিছু উপদেশ দেওয়া হইত। প্রার্থনা ও উপদেশ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িকভাবে হইত। সকল মতাবলম্বীই তাহাতে যোগ দিতে পারিতেন। এই প্রকারের সাধারণ সমন্বয়ের ভূমি হইতে বাস্তব জীবনে উপকার হয় এ প্রকারের ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা হইত। এই ব্যবস্থায় আশ্রমবাসিনী-গণের জীবনে যে উপকার হইতেছে তাহা বুঝিতেও পারা যাইত। যাঁহারা আনুষ্ঠানিক হিন্দুমতে থাকিতেন তাঁহারা এই প্রার্থনা ও উপাসনা ব্যতীত নিজেদের যাহা কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান তাহা নির্ব্বিবাদে করিতেন, আশ্রম হইতে সেই কার্য্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করা হইত। সকাল ৭টার সময় বালিকাদের কিছু খাইতে দেওয়া হইত! আনুষ্ঠানিক সম্প্রদায়ের বালিকাগণ পৃথক ভাবে নিজ নিজ স্থানে আহার করিত। তাহার পর ৮॥০ পর্য্যন্ত সকলে পড়া শুনা

করিয়া, আশ্রমের মধ্যে পুষ্করিণী তাহাতে স্নান করিত। ৯টার সময় প্রাতর্ভোজন। ১০॥০ হইতে চারিটা পর্য্যন্ত ইস্কুল, মধ্যে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম। সন্ধ্যার খাদ্য গ্রীষ্মকালে ৫॥টা, আর শীতকালে পাঁচটার সময় দেওয়া হইত। তাহার পর বাগানে কিছুক্ষণ তাহারা বেড়াইত আবার ৭টা হইতে পড়াশুনা করিয়া ৯॥ টার সময় শয়ন। অল্পবয়স্কা বালিকারা তাহার পূর্ব্বেই শয়ন করিত।

বিদ্যালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়ান হইত, তাহা ছাড়া, বিজ্ঞান, বড়লোকের জীবনী, গার্হস্থ্য নীতি, গার্হস্থ্য চিকিৎসা, বাগান করা প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়ে মধ্যে মধ্যে উপদেশ দেওয়া হইত, সেলাই করা প্রভৃতি স্ত্রীলোকদের অন্যান্য কার্য্যও শেখান হইত। প্রত্যেক শনিবারে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে উপদেশ দেওয়া হইত।

ইহা ছাড়া প্রত্যেক আশ্রমবাসিনীর উপর আশ্রমের কিছু কিছু কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকিত। বেতন দিয়া পাচক রাখা হইত না, বালিকারা পালা করিয়া রন্ধন করিত। একজন ভাণ্ডার রক্ষা করিত, দুজন পরিবেশন করিত, কেহ রাঁধিত এই প্রকারের পালা অনুসারে কার্য্য চলিত। সকলেরই যাহাতে দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলানুবর্ত্তীতা শিক্ষা হয় এই সব কার্য্যের ভারার্পনের দ্বারা তাহারই ব্যবস্থা হইত।

উদ্যানরক্ষা শিখাইবার জন্য শশিপদ বাবু তাঁহার নিজের বাগানটি আশ্রমবাসিনীদের হস্তে রাখিয়াছিলেন। এই বাগানে কাজ করিয়া তাহারা তরকারী উৎপাদন করিত, বাগানে ফল কুড়াইত, শশিপদ বাবুই পয়সা দিয়া তাহাদের নিকট এই তরকারী ও ফল কিনিয়া লইতেন। এই তরকারী ও ফল আশ্রমেই ব্যবহৃত হইত। পাঁচ জন পাঁচ জন করিয়া পরিচালনার জন্য যে

শ্রেণী হইত, সেই শ্রেণীর মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা তাঁহার একখানি খাতা থাকিত, কে কিরূপ কার্য্য করিতেছে, কাহার কি ত্রুটি হইল এই সব কথা সেই খাতায় লেখা হইত। আশ্রমবাসিনীগণ ফল ও তরকারী বিক্রয় করিয়া যাহা পাইত তাহার হিসাব ছিল। এই পয়সা তাহারা সৎকার্য্যে ব্যয় করিত। অসুখের সময় রোগীর পরিচর্য্যা বিষয়ে আশ্রমবাসিনীগণকে মনোযোগী হইতে হইত। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছ যে বিধাতার বিধানে সমাজে ও পরিবারে স্ত্রীলোকের যাহা কাজ তাহার সমস্তগুলি সুচারুরূপে সাধন করিবার শক্তি আশ্রমবাসিনীগণের যাহাতে জন্মে সেইরূপ এই আশ্রমে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন সকলে তাহাদের নিজ নিজ উন্নতি ও মঙ্গল বিষয়ে মিলিত হইয়া আলোচনা হইত।

বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের পরিচালন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এই পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব ইহা কত সুন্দর

এইবার বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিধবাশ্রম করার পর কি করিলেন, তাহাই আলোচনা করা যাউক। অনেক লোকে সখ করিয়া কখন কখন দেশহিতকর কোনও কার্য্য করে; শশিপদ বাবু যে কার্য্যই করিয়াছেন এরূপ গৌণভাবে তাহাতে আত্মনিয়োগ করেন নাই।

শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর জীবনের চিরকালের যাহা মূলমন্ত্র তাঁহার নিজের দুইটি অতি সুন্দর ও সারগর্ভ বাক্যে আমরা তাহার পরিচয় পাই। সেই দুইটি বাক্য এই "Work is the breath of life" এবং "goodwork is the breath of healthy life" অর্থাৎ কর্ম্ম জীবনের নিশ্বাস-স্বরূপ অর্থাৎ জীবন থাকিলেই কর্ম্ম থাকিবে। আর সৎকর্ম্ম সুস্থ জীবনের নিশ্বাস স্বরূপ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মত ঠিক ইহাই।

তিনি বিধবাদিগের জন্য অতি শৈশবেই কাতর হইয়াছিলেন, তাহার পর অনেক বিধবার বিবাহ দিয়াছেন, তাহাতেও সমস্যার মীমাংসা হয় নাই ; ফলে হিন্দু-বিধবাশ্রম করিলেন ও চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে এই বিধবাশ্রমের আদর্শ গ্রহণ করিয়া দেশ মধ্যে যদি এই প্রকারের অনুষ্ঠান বিস্তৃতরূপে হয়, তাহা হইলে এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে এবং জাতীয় মঙ্গলের জন্য যাহা চাই, এই বিধবাশ্রম একদিক হইতে তাহা সাধন করিবে। তিনি এখন তাঁহার মনের এই ভাবটুকু সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। কাগজ লিখিয়া, বই লিখিয়া তেমন কিছু হয় না। তিনি সমগ্রভারতের অনেক স্থানে পর্য্যটন করিয়া যাঁহারা দেশের কথা, দেশের স্ত্রীজাতির কথা, বিশেষ করিয়া সহায়হীনা বিধবাদিগের কথা চিন্তা করেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া এই চিন্তা ও সাধনার বীজ যাহাতে ছড়াইয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু এই ভ্রমণ ব্যয়-সাধ্য। বিধবাশ্রমের এমন কিছু আয় নাই যে তাহার অর্থসাহায্যে এই কার্য্য হয়। অথচ ইহা প্রচার করিতেই হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় এই সময়ে আর একদিক হইতে এক সুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইল। যাঁহারা সরলচিত্তে ভগবানের প্রতি চাহিয়া কোন সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন, এই প্রকারের সুবিধা তাঁহাদের জীবনে সর্ব্বদাই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, এই গ্রন্থেই আমরা তাহার পরিচয় অনেকবার পাইয়াছি।

শশিপদ বাবু যখন বালক, তখন বরাহনগরে একবার খুব শৃগালের দৌরাত্ম্য হয়। ক্ষিপ্ত শৃগালে ২১ জন লোককে দংশন করে। এই একুশজনের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই জলাতঙ্ক রোগে প্রাণত্যাগ করে। শশিপদ বাবুদের বাড়ীর একটি পরিচারিকার কন্যাকেও শৃগালে কামড়ায়। তাহার জলাতঙ্ক রোগ উপস্থিত হইলে

শ্মশানে গঙ্গাযাত্রীদের ঘরের জানালায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হয়, সেইখানেই সে মরিয়া যায়। এই বালিকার মৃত্যু শশিপদ বাবু স্বচক্ষে দর্শন করেন। কি সে বিকট দৃশ্য! আর কি সে ভীষণ যন্ত্রণা! এই দৃশ্যটিও পূর্ব্ব-বর্ণিত বিধবার হত্যার ব্যাপারের মত শৈশবেই শশিপদ বাবুর চিত্তে একেবারে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়। ক্ষিপ্ত শৃগালের ও ক্ষিপ্ত কুকুরের এইরূপ দৌরাত্ম্য পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই হইত। এই জলাতঙ্ক রোগের জন্য কিছু করা যায় কিনা এই চিন্তা শশিপদ বাবুর চিত্তে অনেক সময়েই জাগিত। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন পঞ্চাশের অধিক সেই সময়ে একদিন কোন বিলাতী সংবাদ পত্রে ফরাশী ডাক্তার বুইসন্ সাহেবের আবিষ্কৃত জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা প্রণালীর বিবরণ পাঠ করিলেন। এইটুকু পাঠ করিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে বাল্যকালের সেই চিত্রটি আবার জাগিয়া উঠিল। এই বাষ্পীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি কি প্রকারে এদেশে প্রবর্ত্তিত করা যায় তজ্জন্য তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরে শশিপদ বাবু বিলাতে এক মহিলাকে ভারতবর্ষে এই অভিনব বাষ্পীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করার একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে এক পত্র লেখেন, এই মহিলার নাম কুমারী য়্যান্ মার্সটন্। এই মহিলা অতি সদাশয়া ও পরহিত ব্রতাবলম্বিনী। তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিলাতে এই নূতন চিকিৎসা প্রচলনে যত্ন ও প্রভূত অর্থব্যয় করিতেছিলেন। শশিপদ বাবুর পত্র পাইয়া এই মহিলা অনুভব করিলেন যে ভারতবর্ষে এই যন্ত্র বিতরণ করিয়া যদি এই চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে পারা যায় তাহা হইলে অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। এই মহিলার অর্থে ভারতবর্ষে বিতরণের জন্য অনেকগুলি কল ক্রীত হইল। শশিপদ বাবু এই কল স্থানে স্থানে রাখিয়া এই চিকিৎসা পদ্ধতি যাহাতে এ দেশে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। শশিপদ বাবু সমস্ত ভারতবর্ষেরই

ভার লইয়াছিলেন, শশিপদ বাবুর বহুদিনের বন্ধু বিখ্যাত মিষ্টার মালাবারি বোম্বাই প্রদেশের জন্য এই কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা হইতে শশিপদ বাবুর সকল স্থানে ভ্রমণ করিবার সুবিধা হইল। জম্মু হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের অনেক প্রধান প্রধান স্থানে শশিপদ বাবু ভ্রমণ করিলেন। এই ফল ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত স্থানসমূহে রক্ষিত হইল; বরাহনগর; কলিকাতা, কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর, ময়মনসিং, বাঁকিপুর, কাশী, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, বালেশ্বর, নাগপুর, হাইদ্রাবাদ, মান্দ্রাজ, ত্রিপ্লিকেন, মাদুরা, ত্রিবিক্রম, কোচিন, কয়মুঠার, বাঙ্গালোর। জলাতঙ্ক রোগের এই চিকিৎসা-পদ্ধতি শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক এ দেশে প্রচারিত হয়। এই সময়ে শশিপদ বাবু অনেক স্থানে ডাক্তার নামে অভিহিত হয়েন, কত দেশ বিদেশ হইতে লোক তাঁহার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিত। তিন দিন এই বাষ্পীয় স্নান প্রদান করার ব্যবস্থা।

যাহা হউক, এই জলাতঙ্ক রোগের বাষ্পীয় স্নানের পদ্ধতি প্রচলন জন্য শশিপদ বাবু যখন সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিলেন, তখন তিনি এক সঙ্গে দুইটি অতি আবশ্যকীয় কার্য্য করিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিধবাশ্রমের ভাবও দেশে প্রচারিত হইল। এ স্থলে ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই কুমারী অ্যান মাসটন্ ইহার পর হইতে শশিপদ বাবুর কার্য্যের একজন বিশেষ হিতৈষিণী হইয়া পড়িলেন। শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সমুদায় সৎকার্য্যেই তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

এই প্রকারে সমস্ত ভারতবর্ষে বিধবাশ্রমের ভাব তিনি প্রচার করিলেন। এই প্রচার যে ব্যর্থ হয় নাই, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। এইবার বরাহনগর আশ্রমে কিরূপ কার্য্য হইল তাহাই আলোচ্য।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের লণ্ডনের ন্যাশানাল, ইণ্ডিয়ান, এসোসিয়েসনের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতে এই বিধবাশ্রমের দ্বারা কি কার্য্য হইয়াছে তাহার নিম্নলিখিতরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। "বরাহ-নগর হিন্দুবিধবাশ্রম ও স্ত্রীবোর্ডিং বিদ্যালয়ের একাদশ বর্ষ হইয়া গেল। বরিশাল জেলা হইতে আগত একটিমাত্র বালিকাকে লইয়া এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। সেই বালিকাটি এই বিদ্যালয়ে পড়ার পর ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়িতে যায়—তিনি এখন চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া একটি হাঁসপাতালের তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা আছেন। এই এগার বৎসরে এই আশ্রমে ৫১ জন বিধবা শিক্ষালাভ করিয়া সমাজের প্রয়োজনীয় কার্য্যসাধনের উপযুক্তা হইয়া বাহির হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ছয় জন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন, ৫ জন ধাত্রী ও হাঁসপাতালের চিকিৎসক, চারিজন পরিবারে সাহায্য-কারিণী, ২ জন দেশীয় রাজ্যে নাবালকের অভিভাবিকা, ১ জন কলিকাতা-ব্রাহ্ম-বালিকাদিগের বোর্ডিং স্কুলে সহকারিণী, ১৬ জন আপন পরিবারে ফিরিয়া গিয়াছেন ও তথায় আবশ্যকীয় কার্য্য করিতেছেন। ১৭ জন আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পরে বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সম্মান ও গৌরবের সহিত ভদ্রসমাজে বাস করিতেছেন। একটি বিধবা এই বিদ্যালয়ে অক্ষর পরিচয় আরম্ভ করিয়া বালিকা পরীক্ষার ১ম মান উত্তীর্ণ হইয়া এই বিদ্যালয়েরই বৃত্তির সাহায্যে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে।

এই সমস্ত বিধবা ব্যতীত কতকগুলি বালিকাও এই বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জীবনে উন্নতিকর কার্য্য করিতেছে। * * * এই আশ্রমে তিন জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-বালিকা আছে—তন্মধ্যে একটী বিধবা। নেপাল দেশের বালিকাও এই আশ্রমে আছে।"

ইংরাজী ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায় বি, এ মহাশয়

— বরাহনগর শশিবাবুর বাসভবন ও হিন্দু বিধবাশ্রম।

এই বিধবাশ্রম সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লেখেন। ইনি পূর্ব্বে এক সময়ে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন—এক্ষণে বোলপুর শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁহার পুস্তিকার কয়েকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে—ইহা হইতে বিধবাশ্রমের পরিচালন-পদ্ধতি আরও সুন্দর রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

"ইহার স্থাপনের পর কিছু দিনের জন্য মেয়ে জুটে নাই। পরে বিধবার সংখ্যা আরো অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখন ছাত্রীসংখ্যা ৩০, তন্মধ্যে ১৫টি বিধবা। শশিবাবুর স্ত্রী তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করেন। ছোট বড় সকল মেয়েই তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে সত্যই যেন সকলে মায়ের নিকট আছে। শুনিয়াছি একটি ছোট মেয়ে তাহার অভিভাবকের নিকট হইতে আসিবার সময় অনেক কান্দিয়াছিল—এখন সে কোথাও যাইতে চাহে না। শশিবাবুকে সকলেই বাবা বলিয়া ডাকে—সকল কথাই তাহাদের বাবার নিকট বলিতে হইবে, ইহাতে তাহাদের পরম আহ্লাদ। তাহাদিগের সকল আবদার না শুনিলে শশিবাবুর তৃপ্তি হয় না—যেন সকলি একই পরিবারের লোক।

* * *

স্কুলের অধ্যাপনারও এখানে স্বতন্ত্র রীতি। কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ নাই, কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্তও নির্দ্দিষ্ট পুস্তক সকল পড়িতেই হইবে এমত নহে। যে বিষয়ে তিনি যত শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহাকে সেইরূপ সুবিধা প্রদান করা হয়। গণিতে অভিজ্ঞতা কম, এই জন্য কাহারও সাহিত্যের উন্নতির ব্যাঘাত করিয়া একটি বালিকার সামান্য সময় অনর্থক নষ্ট করা শশিবাবুর অভিপ্রেত নহে। এখানে একটি মেয়ে দুই বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ হইতে চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ ও ইংরেজি বর্ণপরিচয় হইতে Royal Reader

No 4 পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ অল্প সময়ের মধ্যে এই উন্নতি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্কুলের বালিকাগণ যে তাহাদের সমাধ্যায়ী বালকগণ হইতে অধিক উন্নত, ইহা স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। নিয়মিত পাঠ ভিন্ন বিজ্ঞান, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বিখ্যাত নরনারীর জীবন চরিত, সামান্য সামান্য ঔষধ ও কৃষিসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হয়। শশিবাবু স্বয়ং ইতিহাস ও কৃষি-শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। Londonএর Great fireএর পোড়া কাষ্ঠ, রোমানদের সময়ের দালানের মেজের ইট, মহাত্মা রামমোহন রায়ের চুল ও পৈতা লইয়া এমন সুন্দর ভাবের সহিত ও সহজে ইতিহাস পাঠের উপকারিতা বুঝাইয়াছিলেন, যে যাঁহারা তাঁহাকে বলিতে দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনই তাহা ভুলিবেন না। কৃষি সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া কৃষি শিক্ষায় মেয়েদের আশ্চর্য্য আগ্রহ হইয়াছিল"।

বাঙ্গালা ১২৯৯ সালের ফাল্গুন মাসে "নব্যভারত" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের জন্য লিখিত "হেলেনা" কাব্য প্রণেতা স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত "বিধবার আশা" নামক পুস্তিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে যাঁহা বলিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—"বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আশ্রমের (বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের) প্রাণস্বরূপ। ইনি বাল্যকাল হইতে এ প্রদেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য খাটিতেছেন। এজন্য কত অর্থ তিনি ব্যয় করিয়াছেন, কত শরীরের রক্ত জল করিয়াছেন, কেহ তাহার ইতিহাস লেখে নাই; কিন্তু স্বদেশবাসীদিগের নিকট তৎপরিবর্ত্তে কেবল সর্ব্বজন-সুলভ নিন্দা, ঘৃণা, নিরুৎসাহ পাইয়াছেন। ইংলণ্ড মহৎ ব্যক্তির মহত্ব বুঝে, সুতরাং ইংলণ্ডের কতিপয় সদাশয় ব্যক্তি ইহার পৃষ্ঠ-পোষক।

তাঁহাদের সহায়তার এবং বিধাতার কৃপায়, এই বাঙ্গালা দেশে বিধবার উন্নতির এক কঠিন সমস্যা পূরণ করিতেছেন, এই একমাত্র ব্যক্তি—মহাত্মা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্য্যক্ষেত্রে বঙ্গপ্রদেশ চিরনিদ্রিত, বক্তৃতা ক্ষেত্রে বা ধর্ম্মসমাজে ভাবপ্রধান বাঙ্গালীর মত তেজীয়ান-লোক আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কথা অনেকেই বলে, কিন্তু কাজ করে, এ দেশের কই কোন্ লোক, আমরা জানি না। ব্রাহ্ম-সমাজ এক সময়ে এদেশের খুব সেবা করিয়াছিলেন, এখন ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তীব্র আলোচনার ফলে গত বৎসর হইতে কুষ্ঠাশ্রম, অনাথাশ্রম ও দাসাশ্রমের কথা শুনা যাইতেছে বটে, কিন্তু এ উৎসাহও কত দিন স্থায়ী হইবে, বিধাতাই জানেন। দেখিয়াছি—কত উৎসাহপূর্ণ প্রতিজ্ঞা অপ্রতিপালিত অবস্থায়ই নিবিয়া গিয়াছে! লোকেরা উৎসাহ দিতেছেন ভালই; কিন্তু সেবাব্রতের অযথা প্রশংসা-লালসায় পাছে সর্ব্বনাশ ঘটে, আমাদের মনে এই আশঙ্কা হইতেছে। প্রশংসা-নিরপেক্ষভাবে চিরকাল সমানভাবে ব্রাহ্মসমাজের এক মহাবীর কাজ করিতেছেন, তিনি এই শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কে তাঁহার সহায়? কে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে? লজ্জার কথা, এদেশের অতি অল্প লোক!! একাজে সেকাজে কত মহৎ-ব্যক্তি অকাতরে কত অর্থ ঢালিয়া দেয়, কিন্তু এই মহাত্মার দিকে ভ্রমেও কেহ তাকায় না? প্রকৃত ধার্ম্মিক, প্রকৃত বীর, প্রকৃত সৎকর্ম্মী, এইরূপে এদেশে উপেক্ষিত হইতেছেন। এ দুঃখ আমাদের রাখিবার ঠাঁই নাই। আমরা জানি না, ইহার ন্যায় আর দ্বিতীয় কর্ম্মী, দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি এদেশে আছেন কি না? বিধাতা ইহার সহায় আছেন বলিয়া আজও ইনি কার্য্য করিতে পারিতেছেন, কিন্তু শরীর ভগ্ন হইয়াছে—আর কতদিন এরূপ পারিবেন? শুনিয়াছি, তাঁহার বরাহ-নগরের বাড়ী তিনি বিধবাশ্রমের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, কে

উদ্যোগী হইয়া তাহার বন্দোবস্ত করে? এমন সৎকাজ এরূপভাবে উপেক্ষিত হইতে দেখিলে কাহার না প্রাণে লাগে? কিন্তু হায়—আমরা বক্তৃতাবাগীশ—আমরা মৃত। বিধবার আশা পুস্তক খানি পড়িলে এই মহাত্মার যত্ন ও চেষ্টার কতক পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা যৎসামান্য। যে সাধু ইচ্ছা ইহার স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রবাহিত, আমরা জানি, তাহা কোন পুস্তক লিপিবদ্ধ হইবার নহে।"

দেশের যাবতীয় সংবাদ পত্রেই এই হিন্দু বিধবাশ্রমের সমীচীনতা সম্বন্ধে অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সে সমুদয় আলোচনা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে বিধবাশ্রমের আদর্শ দেশবাসী সর্ব্ব-সাধারণ কর্ত্তৃক অতীব উল্লাস ও আনন্দের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। বরাহনগরের এই হিন্দু বিধবাশ্রম সম্বন্ধে লিখিত এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে ইংরাজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে সুপ্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান, মিরর পত্রে প্রকাশিত একটি অতীব সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ এই পরি-চ্ছেদের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হইল। প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগ সহ-কারে পঠনীয়। দেশের সমস্যা কি এবং বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রম কিভাবে সেই সমস্যার মীমাংসা করিতেছে এই প্রবন্ধে তাহার অতীব সুন্দর বর্ণনা আছে, আমরা এই প্রবন্ধটির উপসংহার অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

"বিস্তৃত ভাবে এই প্রসঙ্গ (বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যা) আলোচনার পর এই দারুণ সমস্যার মীমাংসা কল্পে যে উপায় হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে পারি। দরিদ্র ও সম্ভ্রান্ত বিধবাদিগের জন্য গত ছয় বৎসর বরাহনগরে একটি আশ্রম রহিয়াছে—এই আশ্রমে রাখিয়া তাহাদিগকে (বিধবাদিগকে) পালন করা হয় এবং এ প্রকারের শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা পরে আবশ্যকীয় ও স্বাধীন কার্য্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে পারে। এই আশ্রমের যাহা গঠন ও ব্যবস্থা তাহাতে ইহা

সর্ব্বতোভাবেই হিন্দু ভাবাপন্ন। এই আশ্রমের মূলে যে ভাবটি রহিয়াছে তাহা এই যে এই বিধবাগণ যদ্যপি নিজ নিজ গৃহে যে ভাবে থাকে সে ভাবে থাকিতে সন্তুষ্ট না হয় এবং যদি তাহাদের অভিভাবক গণ তাহাদের ভার লইয়া অভাবাদি না দেখেন, তাহা হইলে তাহারা যেন যত্ন বা আশ্রয়ের অভাবে কলঙ্কের পথের পথিক হইতে বাধ্য না হয়। আজকাল দেশে একটা স্বাধীনতার ভাব আসিয়াছে—এ কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, এই স্বাধীনতার ভাবটি যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিপদগ্রস্ত না হয় এবং সংযম ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করে এই আশ্রম তাহাই করিতেছেন। হিন্দু সমাজ যাহা কিছু প্রিয় বলিয়া বিবেচনা করেন, এই আশ্রমে তাহা যত্নে রক্ষা করা হয়, যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হিন্দু সমাজের রীতি পদ্ধতির সম্পূর্ণ অনুকূল—যে পদ্ধতিতে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই আশ্রম পরিচালনা করেন, আমাদের মতে তাহা খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, হিন্দুধর্ম্ম-সঙ্গত নহে, এমন কোন কল্যাণ যদ্যপি দেশকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কল্যাণকেও দেশ সন্দেহের চক্ষেই দেখিবে। এই প্রবন্ধে যে সামাজিক সমস্যার কথা বলা হইল, তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং দেশের নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অতি মনোযোগের সহিত এই সমস্যা আলোচনা করা উচিত। ইহার মধ্যে অনেক জটিলতা আছে। সকলেই জানেন যে আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহকে বিজাতীয় ভাবাপন্ন করিবার জন্য অনেক শক্তিই ক্রিয়া করিতেছে—কাজেই আমাদের সংস্কার-মূলক কার্য্য সমুহ যাহাতে হিন্দু সংস্কার ও ধারণার অনুকূল হয়, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবেই যত্নশীল হইতে হইবে। আমরা বড়ই আনন্দিত যে বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমে এই মৌলিক সত্যটুকু বিশেষভাবেই রক্ষিত হয়।"

ইণ্ডিয়ান্ মিরর পত্রের এই মন্তব্যটুকু বিশেষ মূল্যবান।

জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া দেশের হিতসাধন চেষ্টা, ইহাই এ যুগের প্রথম কথা। সকলেই আজকাল তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছেন, বলিতেছেন যাহাই করি না কেন, আমাদের যাহা আত্মপ্রকৃতি তাহার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আত্মপ্রকৃতির ভিত্তি স্থির রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই নবযুগের সাধনা—এবং যাঁহার জীবনকথা কীর্ত্তন করা যাইতেছে, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে এই ভাবটি অতি সুন্দর ভাবে অনুসৃত হইয়াছে। স্বদেশ সেবায় রত হইয়া যাঁহারা জীবন ধন্য করিতে চাহেন, তাঁহারা এই আলোকের অনুসরণ করুন।

হিন্দুসমাজের উদারতা।

এই বিধবাশ্রমের প্রতি দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের বিশেষ সহানুভূতি-পূর্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে এতৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনাও হইয়াছিল। সেই সময়কার কাগজ পত্রের অভিমতগুলি যদ্যপি এখন আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেশে উদার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বিধবাদিগের হিতের জন্য কোনও সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে দেশের অধিকাংশ লোকই সামর্থ্য-মত তাহার আনুকূল্য করেন। বিধবাগণ বিবাহ করিবেন, কি ব্রহ্মচর্য্য করিবেন—এ বিষয়ে দেশে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, সদাচার ও সদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে রাখিয়া ধর্ম্মের সহিত বিধবাগণকে সুশিক্ষা প্রদান করায় মতভেদ নাই—বরাহনগর বিধবাশ্রম সংক্রান্ত আলোচনা হইতে এই কথাটুকু অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর জীবনের এই প্রধান শিক্ষাটুকু আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলীর দ্বারা এই টুকু প্রতিপাদন করিয়াছেন যে মতভেদ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিবার আমাদের সময় নাই। যাঁহারা সুখে আছেন

তাঁহারা এই সব কার্য্য করিবেন। আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সরলচিত্তে ভগবানের প্রতি চাহিয়া যদি দেশহিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলে মতভেদের দ্বারা কোনই ব্যাঘাত হইবে না! আমরা যে মুখ্যরূপে কর্ম্ম চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠা চাই এই জন্যই মতভেদ হইয়া কার্য্য ভাঙ্গিয়া যায়। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর জীবন-বৃত্ত আমরা আলোচনা করিয়াছি, তিনি জাতিভেদের বন্ধন ছিঁড়িয়াছেন, তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, তিনি বিধবা বিবাহ করিয়াছেন, কন্যা ও পুত্রের অসবর্ণ বিবাহ দিয়াছেন—সাধারণ লোকে মনে করিতে পারেন যে এই প্রকারের একজন লোক কর্ত্তৃক চালিত বিধবাশ্রম আনুষ্ঠানিক হিন্দুসমাজের আনুকূল্য ও সহানুভূতি কি প্রকারে পাইতে পারে? কিন্তু তিনি সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। কলিকাতার কেবলমাত্র একজন দুইজন নহে, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট কেন্দ্রের অধিবাসী রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় পদস্থ ব্যক্তিগণও এই বিধবাশ্রমকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পত্রিকাদিতে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদিও লিখিত হইত এবং ঢাকা সারস্বত পত্র প্রভৃতির ন্যায় পত্রেও আশ্রমের বিজ্ঞাপন বাহির হইত। যাঁহারা হিন্দুসমাজকে অনুদার ও সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি বলেন, আশা করি এই ঘটনা হইতে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে যাঁহারা সংস্কারক, তাঁহারা যদি সহৃদয় ভাবে সত্যের অনুসরণ করেন এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি না খুঁজিয়া যদি সত্য সত্যই কায়মনোবাক্যে সমাজের মঙ্গল অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় হিন্দুসমাজ প্রাচীন এবং জগতের অন্যান্য সমাজের ন্যায় স্বভাবতঃ রক্ষণশীল হইলেও অনুদার নহে।

হিন্দুসমাজের সহিত,—প্রাচীন ও নবীন উভয় সম্প্রদায়েরই সহিত, কর্ম্মবীর শশিপদ বাবুকে নানাপ্রকারের কর্ম্মসূত্রে যতটা ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে, আজকালকার শিক্ষিত এবং বিশেষ করিয়া বিলাত-

ফেরত স্বদেশহিতৈষীগণকে ততটা আসিতে হয় না। শশিপদ বাবু যদ্যপি গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া থাকিতেন ও দলে আসিয়া মিশিয়া যাইতেন, গ্রামের সহিত কোনরূপ বিশেষ ভাবের যোগ রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে সমাজের একটা দিকের সহিতই তাঁহার পরিচয় হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই পরিবর্ত্তনযুগের সমাজের সমস্ত বিভাগগুলিকেই আপনার করিয়া সকল দলের সহিতই তিনি মিশিয়াছেন, সুতরাং সমাজ সম্বন্ধীয় তাঁহার অভিজ্ঞতা অতি মূল্যবান বস্তু—তিনি যাহা দেখিয়াছেন ও যাহা বুঝিয়াছেন, দেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ইচ্ছুক সমস্ত লোকেরই তাহা অবহিত কর্ণে শ্রবণ করা উচিত। এইজন্য আমরা দু একটি মাত্র বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। প্রথম প্রাচীন হিন্দুসমাজের উদরতার কথা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তিনি চিরকালই কথকতা শ্রবণের একজন অনুরক্ত ভক্ত। একবার বরাহনগর আলমবাজারে বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশস্ত বৈঠকখানায় কথকতা হইতেছে—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোকের জন্য বসিবার ভিন্ন ভিন্ন আসন হইয়াছে। শশিপদ বাবু তখন বিলাত পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিয়াছেন। কথকতা হইতেছে শুনিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। স্থানটি সুসজ্জিত, কথক মহাশয় যথাবেশে যথাস্থানে উপবিষ্ট, সম্মুখে নারায়ণ, নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে ব্রাহ্মণ শূদ্রগণ বসিয়া আছেন। শশিপদ বাবু সেই সভাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যাইবার মাত্র ব্রাহ্মণগণ আদর করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক নিজেদের আসনে বসিতে দিলেন। শশিপদ বাবু যাইয়া ব্রাহ্মণদিগের আসনে উপবেশন করিলেন। কথক মহাশয় বেদী হইতে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে করিতে বহু প্রসঙ্গের পর বলিলেন, বহু সহস্র জন্মের পর মানবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ইহা শুনিয়া শশিপদ বাবু বলিলেন মহাশয় যদি অনুমতি

করেন আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। সকলেই অতি আনন্দের সহিত তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি স্বয়ং সে সময়ে এই 'বহুজন্ম পর' কথাটি যে ভাবে বুঝিতেন, সেই ভাবটি বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন এই একজন্মের মধ্যেই মানুষের বহুজন্ম হইয়া যায়। প্রত্যেক পাপই আমাদের মৃত্যুতে আনয়ন করে, সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইলে পুনর্জন্ম হয়, এই উত্থান পতন রূপ বহুজন্মের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। আপনি বলিলেন বহুজন্মের পর ব্রহ্মজ্ঞান, এই বহুজন্ম কি এই প্রকারের বহুজন্ম অথবা দৈহিক পুনর্জন্ম? এই ঘটনাটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়, ইহাতে অনেক বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে—শশিপদ বাবু প্রচীনকালের অনেক জিনিস পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের সেই প্রাচীনকালের যে হৃদয়ভাব সেটি ঠিক রাখিয়াছেন তাই সেই পাশ্চাত্যানুসরণবিভোরতার দিনেও 'বিলাতফের্ত্তা পৈতা ফেলা' তিনি, কথকতার আসরে যাইতে পারিয়াছিলেন।

কথকতা

কথকতা জিনিসটি কি তাহা একালে অনেকেই জানেন না। ইহা একাধারে সব। ইহাতে ধর্ম্মশিক্ষা আছে, ভগবন্মহিমা, ভক্তের নিষ্ঠাচিন্তনে উচ্ছ্বসিত নয়নের অশ্রুবিসর্জ্জন আছে, সঙ্গীত আছে, আবার সামাজিক কৌতুককলা আছে। আজকাল আর প্রাচীন কালের কথক নাই। পূর্ব্বে যেরূপ পরিশ্রমের সহিত গুরুগৃহে আসিয়া লোকে কথকতা শিক্ষা করিত এখন আর তাহা নাই। কথক হইতে হইলে একাধারে নবরসের অভিনয় করিতে হইত, সে বড় সহজ শক্তি নহে! লোকে অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িতেছে অমনি কথক মহাশয় এমন ব্যাপার আরম্ভ করিলেন যে কাহারও

সাধ্য নাই যে অন্যমনস্ক হয়। অনেকেই জানেন সেকালে একবার শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে কথকতা হইতেছে, লক্ষণের শক্তিশেল—কথক মহাশয় বলিতেছেন যে, শ্রীরামচন্দ্র বানরগণকে বলিতেছেন "ওহে তোমাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার বানর যাইয়া সাগর বাঁধিয়াছে, এখন কেহ চিকিৎসক বানর আছে? এই বিপদে রক্ষা করিতে পার? এমন সময়ে কলিকাতার কোনো বিখ্যাত কবিরাজ কথকতা শুনিবার জন্য সভায় আসিতেছেন! কথক মহাশয় দূর হইতেই তাঁহাকে দেখিয়াছেন—একটু অপেক্ষা করিলেন, যেমন কবিরাজ মহাশয় সভায় আসিয়াছেন, অমনি কথকমহাশয় যেন তাঁহাকেই অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন "এস এস কবিরাজ বানর" সভা একেবারে কলহাস্য মুখরিত হইয়া উঠিল—আর কথক মহাশয় রাগিণী টানিয়া ধরিয়া দিলেন "বৃদ্ধ সুষেণ আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক জোড়হস্তে দণ্ডায়মান থাকিলেন।" এই প্রকারে সামাজিক কৌতুক ও সরল পরিহাস সে কালের সমাজকে এক নিত্য আনন্দরসে পূর্ণ করিয়া রাখিত, এখন আর আমাদের যেন চিত্তের সে প্রসার নাই, আমরা যেন আর তেমন ভাবে সকলের সহিত মিশিতে পারি না, তেমন প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে না। কথকতার কলাকৌশল এক অবর্ণনীয় ব্যাপার! মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড শক্তি, একাধারে মনোরঞ্জন ও লোকশিক্ষা, ইহা দেশ হইতে চলিয়া গেল। অনুশীলন নাই, বর্ত্তমানকালের যাঁহারা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁহারা দেশহিতের ও লোকশিক্ষার নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন, কিন্তু এই 'কথকতা'র বিষয়ে তাঁহারা কিছুই জানেন না। লোক সব বসিয়া আছে কথক মহাশয় হয়ত প্রদীপের প্রতি চাহিয়া বলিলেন 'ওহে তেল নেই যে প্রদীপে!" এক জনের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াই বলিলেন, তুমি একবার ওঠ একটু তেল দাও" সে ব্যক্তি হয়ত সত্যই উঠিল, কিন্তু শেষে কথক মহাশয় হয়ত প্রসঙ্গ উঠাই-

লেন, বনমধ্যে নির্জ্জন কুটীরে সত্যবান সাবিত্রীকে এই কথাটি বলিতে-ছেন। এই কথাটি কথকতারই অঙ্গ! যে ব্যক্তি তেল আনিতে উঠিয়াছিলেন, তিনি অপ্রস্তুত, আর সভা সুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিলেন।

যাহা হউক শশিপদ বাবুর প্রকৃতি বদলায় নাই প্রাচীন কালের আমাদের যে দেশী ভাব, যে সামাজিক সহৃদয়তা—সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিবার শক্তি, যাহা বর্ত্তমান কালের শিক্ষার দ্বারা আমাদের নষ্ট হইয়া যাইতেছে, শশিপদ বাবুর প্রকৃতি হইতে তাহা বিচ্যুত হয় নাই। তিনি বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেরই সহিত সমান ভাবে মিশিতেন। এই জন্য যদিও তিনি সমাজে সকল দিকেই বিদ্রোহের আগুণ জ্বলিয়াছিলেন তথাপি প্রাচীন সমাজ কখনও তাঁহাকে অবজ্ঞা করেন নাই। এই প্রাচীন সহৃদয়তা ও সরল চিত্ততার ফলে তিনি কি বালক কি বৃদ্ধ সকলকেই সুন্দর রূপে আপনার করিতে পারেন। হিন্দু সমাজের এই ব্যবহার একদিকে শশিপদ বাবুর চরিত্রগত বিশেষত্ব আর একদিকে প্রাচীন সমাজের উদারতার পরিচয় স্থল।

এই প্রসঙ্গে শশিপদ বাবুর জীবনের এক শ্রেণীর বিষাদ-জনক অভিজ্ঞতার মধ্যে একটী মাত্র বর্ণনা করিতেছি। তিনি যখন ব্রাহ্ম-সমাজে প্রথম প্রবেশ করিয়াছেন, তখন একদিন তাঁহাদের প্রতিবাসী সে কালের একজন নামজাদা ইংরাজীনবিস, যিনি নিজে একদিকে ইংরাজী লেখক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন অপর দিকে সে সময়ের ইংরাজী-নবিসগণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত কদভ্যাস লাভ করিত, তাহাও পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন—এক দিন তিনি শশিপদ বাবু তাঁহাদের বিছানায় আসিয়া বসিলে হুঁকার জল ফেলিয়া দিয়া শশিপদ বাবুর প্রতি তাঁহার যে উৎকট ঘৃণা তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই দুইটি ঘটনা পর পর প্রদত্ত হইল, সকলে চিন্তা করিয়া নিরূপণ করুন উদারতা কোথায়—যাঁহারা প্রাচীন ভাবে আছেন তাঁহাদের মধ্যে

কিম্বা যাঁহারা নব্য শিক্ষার আলোকে সভ্য হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ?

প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে শশিপদ বাবুর ধারণা কি তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। কুসুমকুমারীর বিবাহের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, এই বিবাহে কুসুমকুমারী, তাহার মাতা ও শশিপদ বাবুর বিরুদ্ধে যে ভীষণ অত্যাচার ও চক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার কথা কিছু কিছু বলা হইয়াছে। শশিপদ বাবু সমাজের এই ব্যবহারের জন্য কখনও মনে করেন না, যে প্রাচীন সমাজের ইহাতে দোষ আছে। সমাজে প্রত্যেক প্রাচীন ও সম্রান্ত পরিবারই নিজের পারিবারিক সম্রম ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সকল দেশে ও সকল যুগে অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই সম্রম ও মর্য্যাদার ধারণা অবশ্য সকল দেশে ও সকল সম্প্রদায়ে এক প্রকারের নহে। কিন্তু এই সম্রম ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সকল প্রকারের চেষ্টাই মানব করিয়াছে এবং মানব প্রকৃতিতে তাহা স্বাভাবিক. সুতরাং প্রাচীন সমাজকে শশিপদ বাবু কখনও দোষী মনে করেন না এবং তিনি, আমাদের সমাজ অজ্ঞ, উন্নতিকর বিষয়ে পশ্চাৎপদ এ প্রকারের চিন্তা ও কখন করেন না। ইংলণ্ড বা আমেরিকা যাহাকে আমাদের দেশের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় সকল বিষয়ে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, সেখানেও একটি সামান্য রকমের সংস্কার সাধন করিতে কত কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হয়! একটি সামান্য সংস্কার, মৃত দেহ দাহ করা—তাহা করিতে যখন আমেরিকার ন্যায় উন্নতি পথে ক্ষিপ্রগতি ও অতীতের সংস্কারের ভারবিহীন দেশে ভয়ানক মারামারি হয়, তখন আমাদের এই অতি প্রাচীন দেশে ও সমাজে শীঘ্র শীঘ্র সংস্কারের কার্য্য হইতেছে না বলিয়া যাঁহারা অস্থির হইয়া পড়েন ও অসহিষ্ণু হইয়া সমাজের উপর দোষারোপ করেন, মানব জগতের ও মানব প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের ভালরূপ পরিচয় নাই বলিলেই হয়। শশিপদ বাবুর

আর একটি ধারণার কথা এখানে বলা প্রয়োজন, তিনি বলেন সমাজের বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন-মত চিরকালই চলিয়াছে এবং চিরকালই চলিবে। আজ কাল একদল লোক, 'সংস্কারক' এই আখ্যা লইয়া দল বাঁধিয়াছেন এবং নিজেদের 'সংস্কার' করা অপেক্ষা পরকে সংস্কৃত করিতে তাঁহাদের চেষ্টা অধিক, কার্য্য যতটা করেন, প্রচারের আস্ফালন তাহার উপর দশগুণ; এই সব কারণে দেশে এত বেশী বিরোধের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। সংস্কার-মূলক কার্য্যে যিনি হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন, তাঁহাকে খুব সহিষ্ণু ও অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইতে হইবে।

শশিপদ বাবুর পূর্ব্বতন পরিবারের লোকেরা যাঁহারা কুসুমের বিবাহ উপলক্ষে শশিপদ বাবুর বিরুদ্ধতাচরণ করিয়াছিলেন—শেষে আবার তাঁহারা সেই বিরোধ ভুলিলেন, আবার শশিপদ বাবুর সহিত তাঁহাদের ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল—ইহাতে শশিপদ বাবুর চরিত্রগত এমন একটি বিশেষত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা এই পরিবর্ত্তনের যুগে আমাদের থাকা নিতান্ত দরকার। যিনি বিরোধী ও বিপক্ষ, তাঁহার মধ্যে সত্য আছে, ঠিক তাঁহার জায়গায় দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকের সত্যটুকু মানুষ যদি উপলব্ধি করিতে অভ্যাস করে, তাহা হইলে জগতের অনেক বিরোধ ও অনেক বিদ্বেষ তিরোহিত হয় এবং মানবের দেশে প্রেম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই শক্তিটুকু কয়জনের আছে?

আগে এই প্রকারের শক্তি-সম্পন্ন হওয়া দরকার। শশিপদ বাবুর নিজের মত বা নিজের ধর্ম্মের দ্বারা তিনি প্রাচীন সমাজের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হন নাই, ইহা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা এবং দেশের সহিত কোনরূপ পরিচয় লাভ না করিয়াই যাঁহারা দেশ সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ মত অসঙ্কোচে প্রচার করেন, তাঁহারা শশিপদ বাবুর জীবনের এই দিকটা অলোচনা করিলে নিজেরাও লাভবান হইবেন—দেশের ও হিত হইবে।

পূর্ব্বে এই গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে কেবল সংস্কারক বা দেশহিতৈষী রূপে শশিপদ বাবুকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাকে আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। সাধারণতঃ সংস্কারক বা দেশহিতৈষী বলিতে আমরা যেরূপ মনে করি, ইনি ঠিক সে ভাবের লোক নহেন। আদৌ তিনি একজন সাধক—হিন্দু-সাধক ও ভক্ত—আনন্দব্রহ্মের উপাসক। তাঁহার এই কার্য্যগুলি তাঁহার সেই ধর্ম্মজীবনের বহির্ব্বিকাশ মাত্র।

আমাদের হিন্দুসাধনায় অন্তর্মুখী হইয়া চিন্তা করিবার অভ্যাসই সর্ব্বপ্রথম সাধ্য বিষয়। এই কুসুমকুমারীর বিবাহের ব্যাপার, যাহা হইল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা গিয়াছে, এই বর্ণনা হইতে যাঁহার যেরূপ মনে হয় সেইরূপ উপপত্তিতে গিয়া উপস্থিত হইবেন। একজন এক পক্ষকে, অন্যে অন্য পক্ষকে দোষ দিবেন। সে বিষয়ে যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপ অভিমত দিবেন। শশিপদ বাবু স্বয়ং এই ব্যাপারটি কি ভাবে চিন্তা করেন, সেইটিই আমরা বর্ণনা করিতে চাই। সেই ভাবটি এই। তিনি ধর্ম্মবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় যাহা করিয়াছিলেন তাহা যে নিতান্ত সঙ্গত হইয়াছিল, ইহা তিনি চিরজীবনই বিশ্বাস ও অনুভব করেন। কিন্তু তাই বলিয়া অপর পক্ষের যাহা হৃদয়ভাব, তাঁহারা এই ঘটনাটি যে ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন নহেন। অপর-পক্ষীয়গণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন পরিবারবর্গকে যে ভাবে কষ্ট দিয়াছেন, যে ভীষণ অপমান ও কলঙ্ক তাঁহাদের মাথার উপর চড়াইয়া দিয়াছেন, যদি তাঁহারা কেহ তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে তিনি নিজে আজীবন আর তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে, এমন কি মুখদর্শন করিতেও পারিতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সহিত আবার সদ্ভাব করিয়াছেন, বাড়ীতে লইয়া গিয়া আদর যত্ন করিয়াছেন—ইহা বড় কম কথা নহে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করিলে সংস্কারক শশিপদ বাবুর চরিত্রগত বিশিষ্টতা বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু তাঁহার কুলগুরু মহাশয়কে চিরকাল কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষে অসবর্ণা বিধবা বিবাহ করার পর শশিপদ বাবু তাঁহাদের পূর্ব্বতন বৃহৎ পরিবারে একদিন গুরুঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা করিলেন। বৃহৎ পরিবার, বহু লোকের বাস, গুরুদেবের সেবা উপলক্ষে শশিপদ বাবু সেদিন বাড়ীর সকলেরই ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। সে দিনের মধুর স্মৃতি শশিপদ বাবু অশেষ প্রীতির সহিত চিরকাল বহন করিতেছেন। শশিপদ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে গুরুঠাকুর অতীব যত্নপূর্ব্বক স্বযং দাঁড়াইয়া আহার করাইলেন, তিনি যে বিলাত-ফেরত অথবা অসবর্ণা বিধবা বিবাহ করিয়াছেন, এ সমুদয় যেন তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই পূর্ব্বের সরল আত্মীয়তা ও একবদ্ধতা যেন পুনরায় ফিরিয়া আসিল। (শশিপদ বাবুর এই দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর নাম শ্রীমতী গিরিজা কুমারী। ইনি সার কে, জি গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আত্মীয়া—সম্পর্কে ভগিনী। বরিশাল হইতে সার, কে, জি গুপ্ত মহাশয় বিধবা হওয়ার পর তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া আসেন ও তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। শশিপদ বাবুর পুত্র এলবিয়ন্, রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সার্, কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।)

এইবার হিন্দু-বিধবাশ্রম কেন উঠিয়া গেল তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রম উঠিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যে ভাবের প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই ভাবের স্ফুলিঙ্গ দেশ মধ্যে

ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এখনও খুব ব্যাপক ভাবে তাঁহার আদর্শ অবলম্বিত না হইলেও, যাহা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে ক্রমশঃ শশিপদ বাবু যে পথ আশ্রয় করিয়া বিধবা সমস্যার মীমাংসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই পথ ও সেই মীমাংসা আমাদিগের জাতীয় জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবে।

পণ্ডিতা রমাবাই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সারদাসদন,' অবশ্য এখন খৃষ্টীয় ভাবে চালিত হইতেছে, কিন্তু প্রথম যখন ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হিন্দুমতেই ইহা চালিত হইত। জাষ্টিস্ রানাডে প্রভৃতি তখন ইহার পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। শেষে পরিচালক সমিতির সহিত রমাবাইএর মতের মিল না হওয়ায়, পরিচালক সমিতির সভ্যগণ পদ-ত্যাগ করিলেন ও পণ্ডিতা রমাবাই নিজের মতানুসারে ইহা চালাইতে লাগিলেন। পণ্ডিতা রমাবাইএর হস্তে এই আশ্রম থাকায় তাঁহার এখন শক্তি কত! নাগপুরের দুর্ভিক্ষের সময় একদিনে তিনি পাঁচশত বালক বালিকা লইয়া আসিয়া তাহাদের আশ্রয় দিলেন ও একদিনে তাহাদের খৃষ্টান করিলেন। এই প্রকারে খৃষ্টীয় সমাজের শক্তি এই সমস্ত কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ায় প্রত্যহই আমাদের অশেষ ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু এই তত্ত্বটুকু সম্পূর্ণরূপ জাতীয় ভাবে উপলব্ধি করিয়া যাহাতে এই স্রোত নিবারিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা এক শশিপদ বাবু ব্যতীত অন্য কাহারও জীবনে বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিদৃষ্ট হয় না। বরাহনগর হিন্দুবিধবাশ্রমের কাগজপত্র পাঠ করিয়া পণ্ডিতা রমাবাই শশিপদ বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল। শশিপদ বাবু ও তাঁহার এই কার্য্য সম্বন্ধে পণ্ডিতা রামাবাইএর এই মতের অবশ্য বিশেষ মূল্য আছে।

"I have read the account of your wonderful work through and was deeply impressed and intersted. You deserve most hearty

thanks of Hindu womanhood for all that you have suffered and done for us : I hope your efforts to elevate and enlighten our countrywomen will meet with perpetually increaing suscess."

বঙ্গের ছোট লাট Sir Stuart Bayley এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে শশিপদ বাবুকে নিজহস্তে ১৮৯০ ইংরাজীর ২৭শে নবেম্বর যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"The good work you have done for the education of your country-women especially of widows, needs no commendation from me. Nevertheless, I should like to assure you, before I leave, of the earnest sympathy, I feel in your labours, of my hearty admiration for your self-sacrificing exertions, and my great satisfaction at hearing of the daily multiplication of the successful results attending them."

সুপ্রসিদ্ধ ভারতবন্ধু কেইন সাহেব ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর বরাহনগর বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া তাঁহার আবকারী নামক পত্রে শশিপদ বাবুর যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন তাহাতে বলেন—

"There is no doubt, that by their widows home. Mr and Mrs. Banerji are helping to solve one of the great social problems of India."

অর্থাৎ বিধবাশ্রম স্থাপনের দ্বারা ভারতের একটী মহান্ সমস্যা মীমাংসিত হইতেছে।

ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক মিষ্টার কার্ভি ও তাঁহার স্ত্রী, ডাক্তার ভাণ্ডারকর মহাশয়ের সাহায্যে যে বিধবাশ্রম করিয়াছেন তাহাও শশিপদ বাবুর জীবনব্যাপী সাধনার একটি তরঙ্গ। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবু পুনা গিয়াছিলেন এবং তত্রত্য সমাজসেবকগণের সহিত তাঁহার শিক্ষাসমস্যা ও বিধবাশ্রম বিষয়ে অনেক কথোপকথন হয়—এই কথোপকথনের ফলে সেখানে ক্রমে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং

মিঃ কার্ভি তাঁহার স্ত্রীকে শশিপদ বাবুর আশ্রমে রাখিয়া যাহাতে আশ্রম পরিচালনায় তাঁহার অভিজ্ঞতা হয় তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। পুনা বিধবাশ্রমের স্থায়ীধন ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু পাঁচশত টাকা প্রদান করেন।*

শশিপদ বাবুর আদর্শ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহা কুমারী ম্যানিং কর্ত্তৃক শশিপদ বাবুকে লিখিত একখানি পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি। কুমারী ম্যানিং বিলাত যাইবার সময় বোম্বাই হইতে এই পত্রখানি লেখেন। পত্রখানির এক অংশ এইরূপ "At Poona I saw the widows' Home started on

* পুনা হিন্দু বিধবাশ্রমের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতে নিম্নের অংশটুকু উদ্ধৃত হইল।

"The second donation comes from a will-known Bengalee gentleman who has laboured all his life in the cause of female education genarally and widow's education particulary, Babu Sasipada Banerji was the founder of the first widows' Home in India, conducted by an Indian which was started at Baranagar near Calcutta in 1887. It was he who proved for the first time that the idea of a widow's home for high caste Hindu widows was practicable. It is but in the fitness of things that the name of the pioneer in the cause, should thus be permanently connected with this institution. As his contribution to the endowment Fund of the Home Mr Banerji has sent a sum of Rs 500 the interest on which is to cover two prizes, called Sasipada Banerji prizes, to be awarded to two deserving widow students of the Home. Bengale 26—10—66

a small scale by a few Hindu gentlemen. Mr. Karvi and his wife look after the widows, who mostly go to the High School at Poona by day. Mr. Karvi is a man of very great devotedenss. Dr. Bhandarkar also assists. I think your widows Home has done great good not only to the widows in it, but by setting an example to Bombay and Madras"

ইহার অর্থ এই। কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক কর্ত্তৃক ছোট আকারে প্রতিষ্ঠিত পুণা বিধবাশ্রম দেখিলাম। মিষ্টার কার্ভি ও তাঁহার স্ত্রী এই আশ্রমের তত্ত্বাবধান করেন। বিধবাগণ অধিকাংশই হাই স্কুলে পড়িতে যায়। মিষ্টার কার্ভির কর্ম্মে খুব অনুরাগ। ডাক্তার ভাণ্ডারকর এই আশ্রমকে সাহায্য করেন। আমার মনে হয় যে আপনার বিধবাশ্রম যে কেবল তাহার অধিবাসী বিধবাদেরই সেবা করিয়া উপকার করিয়াছে তাহা নহে, এই বিধবাশ্রম বোম্বাই ও মান্দ্রাজকে একটি আদর্শ দিয়াছে। পুনার বিধবাশ্রম যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা সেই সময়কার কথা এখন পুনার আশ্রম একটি বৃহৎ ও সুন্দর আশ্রম।

ইংরাজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা বাহাদুর কলিকাতা আসিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার শিক্ষাসচিব মিষ্টার আয়েন্‌গার মহোদয় শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিলেন এবং বিধবাদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি এই স্থানে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শশিপদ বাবুর কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন—

"As a pioneer, and a successful pioneer, in truly noble and unselfish work, Mr. S. P. Banerji is entitled to the gratitude of the present generation and of posterity"

এই মহৎ ও সেবামূলক কার্য্যে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

পথ প্রদর্শক ও কৃতকর্ম্মাপথপ্রদর্শক, কেবল বর্ত্তমান যুগে নহে, ভবিষ্য যুগের দেশবাসীগণও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিবে।" মিষ্টার আয়েঙ্গার এক্ষণে মহীশূর মহারাণী-কলেজের সেক্রেটারি। তিনি কলিকাতা আসিয়া শশিপদ বাবুর বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রম দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। মহীশূর মহারাণী কলেজে বিধবাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি কার্য্যের উপযুক্ত করা হইতেছে। এখন মহীশূরে রাজকীয় সাহায্যে বিধবাদিগের শিক্ষা দান খুব বিস্তৃত ভাবে চলিতেছে। পঞ্জাবে আর্য্য সমাজের অক্লান্তকর্ম্মা সভ্যগণও বিধবাদিগের হিত-সাধনের জন্য অনেক কার্য্য করিতেছেন। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা শ্রীমতী গৌরীমাতা কলিকাতা গোয়াবাগানে আশ্রম খুলিয়া ও লোকের বাড়ী বাড়ী স্বয়ং যাইয়া ও শিক্ষয়িত্রী পাঠাইয়া বিধবাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিতেছেন।

কিছু দিন হইল মিসেস্ পি, মুকার্জি মহিলা শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রথমে কলিকাতা নগরীতেই ইহার কার্য্যালয় ছিল, এক্ষণে ভবানীপুরে উহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই স্থানে মহিলাগণকে স্বাবলম্বন মূলক কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিধবাশিক্ষার জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে যে টাকা দিয়াছেন সেই টাকার সুদে এই শিল্পাশ্রমে একটি মহিলার শিক্ষার সাহায্য করা হইয়া থাকে। অল্প দিন পূর্ব্বে ঢাকায় একটি বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমতী নির্ম্মলা দাস এই আশ্রম পরিচালনা করেন। এই আশ্রমটিরও বেশ উন্নতি হইতেছে, সরকার বাহাদুরও এই আশ্রমকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া হিন্দু সমাজের অনেকেই বিধবাদিগের কেবলমাত্র অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন—যেমন স্বর্গীয় মহারাজা

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—তিনি এই উদ্দেশ্যে একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে হিন্দু বিধবাগণকে মাসিক সাহায্য করা হইয়া থাকে। স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দানও বিশেষ রূপে স্মরণীয়। এ প্রকারের দান আরও অনেক আছে। এই প্রকার দানের যাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশে অভাব যেরূপ বাড়িতে চলিয়াছে, তাহাতে এই প্রকারে ভিক্ষাদান পদ্ধতি দ্বারা এই অভাব দূর করা একেবারে অসম্ভব। বিধবাগণকেও নিজের অধিকারমত স্বাবলম্বন শিক্ষা না দিলে চলিবে না—শশিপদ বাবুর কার্য্য সেই স্বাবলম্বন শিক্ষাদানমূলক। সম্প্রতি বিধবা সমস্যার মীমাংসার জন্য হিন্দুসমাজ হইতে একটি সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। শ্রীমতী সরলা ঘোষ একজন হিন্দুবিধবা। তিনি উত্তমরূপে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভবানীপুরে তিনি হিন্দুবিধবাগণের জন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লেডী কারমাইকেল মহোদয়া কিছু দিন পূর্ব্বে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

বিধবাগণের জন্য যাহা হউক একটি কিছু ব্যবস্থা করার চেষ্টা যে কেবল হিন্দু সমাজেই আসিয়াছে তাহা নহে, মুসলমান সমাজেও এই চেষ্টা দেখা যাইতেছে। কার্য্য ধীরে ধীরেই হউক, আর যাহাই হউক শশিপদ বাবু যে পথ দেখাইয়া ছিলেন দেশ সে পথ গ্রহণ করিতেছে।

শশিপদ বাবুর এই বিধবাগণকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য কি তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব এই যে তিনি কাজ চাহেন। তাঁহার প্রতি ত কোন অনুষ্ঠান তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে বিদ্যমান থাকুক, তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হউক ইহা তিনি ততটা চাহেন নাই। তিনি চাহিয়াছেন কাজ। আমাদের দেশে এই রাজসিক

যুগে একদল লোক আছেন, তাঁহারা সৎকার্য্যে যোগদানও করেন সাহায্যও করেন, কিন্তু অতিশয় মনোযোগের সহিত সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করেন এই কার্য্যে যেন তাঁহার স্থান খুব উচ্চে থাকে। যদি দেখেন তাহা থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলেই অমনি সে কার্য্যের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। আবার সেই সমস্ত লোকই নিজেরা যে কার্য্য করিয়া দেশের হিত সাধন করিতেছেন, সেই প্রকারের কার্য্যই যদি অন্য কেহ অন্যস্থানে আরম্ভ করেন তাহা হইলে তাঁহারা সেই কার্য্যটি যাহাতে নষ্ট হইয়া যায় সে জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন। এই প্রকারের ঘটনা যে কত ঘটিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই, এই প্রকারের অসৎ প্রতিযোগীতায় আমাদের দেশের যে ভীষণ ক্ষতি হইতেছে তাহা অবর্ণনীয়। মনে করুন আপনি স্ত্রীশিক্ষার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, অর্থব্যয় করিতেছেন, আমি ভাবিলাম আপনি স্ত্রীশিক্ষার একজন বন্ধু। আমিও স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটা কিছু করিলাম। আপনি আমার উপর বিরক্ত হইলেন, আমার অনুষ্ঠানটি যাহাতে নষ্ট হয়, সে জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন বুঝিলাম আপনি সত্য সত্য স্ত্রীশিক্ষা হউক, ইহা চাহেন না। আপনি চাহেন নাম, তবে স্ত্রী শিক্ষা দানের চেষ্টায় আপনার এই নাম ও খ্যাতিলাভের সুবিধা হইবে বলিয়া আপনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আমাদের দেশে বড় বড় কাজ আরম্ভ হয়, বহু অর্থও ব্যয় হয়, কিন্তু শেষে সেই কাজের দ্বারা যে হিত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, সেই হিত না হইয়া তাহার বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে। কেন এরূপ হয়? ইহার একমাত্র কারণ আমাদের আত্মবিলোপী প্রেম নাই। সুবিকশিত ধর্ম্মজীবন ব্যতিরেকে এই আত্মবিলোপী প্রেম সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি শশিপদ বাবু এই আত্মবিলোপী প্রেমের দ্বারাই চালিত হইয়া সমুদয় কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যের প্রত্যেকটি আলোচনা করিলেই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে।

শশিপদ বাবু এইরূপ চিন্তা করেন যে তিনি দরিদ্র লোক, তিনি প্রাণ দিয়া কার্য্য করিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, দেশকে একটি আদর্শ ও ভাব দেওয়া। তাঁহার কার্য্যের আলোকে যদি অন্য কেহ সেই কার্য্যের সহিত ও তাহার সাধনোপায়ের সহিত পরিচয় লাভ করেন, তাহা হইলেই তিনি সার্থক। তিনি সাধুভাবে অন্তরের সহিত কার্য্য করিতেছেন এই জ্ঞানই ও তৎপ্রসূত ভগবৎ করুণার অনুভূতিই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া বিবেচনা করেন। আরও তিনি চিন্তা করেন যে যে, কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে সৎ, তাহা কখনও নষ্ট হয় না। তাহার বীজ অমর। যতই দিন যাইবে তাহার প্রসার ততই বাড়িবে। এই যে বিধবাশ্রম, যাহা উঠিয়া যাইবার কথা আমরা বর্ণনা করিতেছি, প্রকৃত প্রস্তাবে, ভাবের দিক হইতে দেখিলে, তাহা উঠিয়া যায় নাই এবং উঠিয়া যাইতে পারে না। তাঁহার সাধনার বীজ ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিধবা-সমস্যার যে মীমাংসা তিনি করিয়াছেন, সেই সমস্যার মীমাংসা যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাই তাঁহার আনন্দ। শশিপদ বাবু যৎকালে এই বিধবাগণের সেবার কার্য্যে প্রথমে হস্তক্ষেপ করেন। তখন ভাবিতেও পারেন নাই যে এই সামান্য ভাবে আরব্ধ কার্য্য এত বড় একটি বৃহৎ অনুষ্ঠানে পরিণত হইবে। যাহা হউক দেখিতে দেখিতে স্বপ্নের অগোচর ব্যাপারও সম্ভব হইল। ইহাই ভগবানের লীলা।

বরাহনগর বিধবাশ্রম অর্থাভাবে উঠিয়া যায় নাই। ষোড়শবৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শশিপদ বাবু বিধবাশ্রমের যে আয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে বিধবাশ্রম উঠিয়া না যাওয়ারই কথা। আমরা বলিয়া থাকি আমাদের দেশে যে সৎকার্য্য হয় না এবং হইলেও স্থায়িত্ব লাভ করে না তাহার কারণ অর্থাভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে, এই কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য নহে। অভাব কর্ম্মবীরের। যিনি

প্রকৃত উদ্যোগী পুরুষ ও ধর্ম্মশীল কর্ম্মবীর, লক্ষ্মী তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহা মহাভারতের একটি অতি সুপরিচিত উপদেশ—শশিপদ বাবুর ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক এতগুলি সৎকার্য্যের সাধন হইতেই ইহা প্রমাণীকৃত হইতেছে। বরাহনগর বিধবাশ্রমের প্রতি জনসাধারণের যে বিশেষ সহানুভূতি ছিল, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শশিপদ বাবুর কর্ম্ম পদ্ধতি অতীব সুন্দর। তিনি এই আশ্রমে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সহানুভূতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বরাহনগর বিধবাশ্রম উঠিয়া যাওয়ার কারণ, উপযুক্ত লোকের অভাব। শশিপদ বাবু ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন, কর্ম্ম করিবার শক্তি ও কমিয়া আসিল, তিনি এমন কোন ব্যক্তি বা সমিতি পাইলেন না, যাঁহার বা যাঁহাদের হস্তে এই আশ্রমের ভার অর্পণ করা যায়। অবশ্য তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী ব্যক্তি যে পূর্ব্ব হইতে ইহা চিন্তা করিয়া তাহার জন্য কোন উপায় বিধানের চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু মানব চেষ্টা করিবারই অধিকারী, সফলতা সকল সময়ে মানব ইচ্ছার আয়ত্ত নহে। স্ত্রী-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা অন্তঃপুরের সম্পাদিকা শ্রীমতী বনলতা দেবী শশিপদ বাবুর দ্বিতীয়া কন্যা, তিনি তাঁহাকে প্রথম হইতেই এমনভাবে শিক্ষাদান করিতে ছিলেন, যাহাতে তিনি ভবিষ্যতে এই বিধবাশ্রমের ভার লইয়া আশ্রম পরিচালনা করিতে পারেন। শ্রীমতী বনলতা দেবীও এই কার্য্যে তাঁহার পিতাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। বনলতা দেবী অকালে দিব্যলোকে প্রয়াণ করিলেন। বনলতা দেবীর মৃত্যুতে শশিপদ বাবুর জীবনের অনেক আশাই ভাঙ্গিয়া গেল। স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী জাতির সার্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন চেষ্টার যে মন্ত্র তিনি শৈশবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ও আজীবন যে মন্ত্র লইয়া জীবন পথে নানা কার্য্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, বনলতা দেবীকেই তিনি তাঁহার

সেই মন্ত্র উদ্‌যাপণের ভার দিয়াছিলেন। সুতরাং বনলতা দেবীর মৃত্যুতে তাঁহার অনেক আশাই ভাঙ্গিয়া গেল। যাহা হউক এতদ্বারা যে তিনি একেবারে ভগ্নোৎসাহ বা নিরুদ্যম হইয়া পড়িলেন, তাহা নহে। বিধবাশ্রমের ভার কাহার উপর অর্পণ করা যায়, এজন্য তিনি চিন্তা ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বরাহনগর 'ইনষ্টিটিউট' ভবন লইয়াও তাঁহার এইরূপ চেষ্টা ও চিন্তার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এমন কাহারও সন্ধান পাইলেন না যাঁহার বা যাঁহাদের উপর এই আশ্রমের ভার বেশ নিশ্চিন্তভাবে অর্পণ করিতে পারা যায়। এইবার শশিপদ বাবু বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রম লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। শশিপদ বাবু তাঁহার নিজের বাসভবন, তৎসংলগ্ন উদ্যান চতুস্পার্শ্বের ছয় বিঘা ভূমি, বিলাত হইতে ১০০৲ টাকা করিয়া মাসিক চাঁদা, ইহা ছাড়া মাসিক ৭৫৲ টাকা সরকারী সাহায্য তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতে চাহিলেন। অনেক চিন্তা ও আলোচনার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই আশ্রমের ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের আপত্তি এই যে আশ্রম আনুষ্ঠানিক হিন্দু আচারে পরিচালিত হয়—শশিপদ বাবুরও ইচ্ছা এই যে এই আশ্রম যেন বরাবর এই ভাবেই চালিত হয়। এই প্রকারে নিরাশ হইয়া শশিপদ বাবু বিধবাশ্রম বন্ধ করিয়া দিলেন—বন্ধ করিবার আরও এক বিশেষ কারণ এই যে এই সময়ে তাঁহার নিজেরও শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। পূর্ণ ষোড়শ বৎসরকাল অক্লান্ত ভাবে দেশের বিধবাগণের হিতসাধনকল্পে পরিশ্রম করার পর বিধবাশ্রম উঠিয়া গেল। অনেকে বুঝিতে ও পারিলেন না, এই যে ব্যাপারটি ইহার সহিত দেশের উন্নতিমুখী গতির সম্বন্ধ কি? বিধবাশ্রম উঠিয়া যাওয়ার পর সরকার বাহাদুর শশিপদ বাবু যাহাতে এই কার্য্য একেবারে উঠাইয়া না দিয়া পুনরায় উহা আরম্ভ করেন সেজন্য অনুরোধ করিলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার সাহেব শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুকে অহ্বান করিয়া বিধবাশ্রম চালাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে সময়ে শশিপদ বাবুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এতই খারাপ যে তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না, এমন কি কমিশনার বাহাদুর তাঁহাকে একটি কার্য্যপ্রনালীর পাণ্ডুলিপি প্রনয়ন করিতে দিতে বলেন, তিনি তাহাও দিতে পারিলেন না। সরকার বাহাদুর তাঁহাদের নিজেদের মতানুসারে বিধবা শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। বিধবাগণের বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হইল। তাহা ছাড়া বেথুন কলেজে ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে বিধবাগণের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার বঙ্গে সমাজসংস্কার নামক ইংরেজী গ্রন্থে এই বিধবাশ্রমের বিশেষত্ব ছয়টি লক্ষণের দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন, সেগুলি এই। ইহার প্রথম লক্ষণ নিয়মবদ্ধতা (Regularity)। সমস্ত কার্য্যই যথা সময়ে নির্ব্বাহিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকায় যাহারা আশ্রমে আসিত, প্রথম প্রথম তাহাদের কিছু কষ্ট হইত বটে, কিন্তু শেষে তাহাদেরও সকল বিষয়েরই অভ্যাস সুনিয়মিত হইত। দায়ীত্বপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইলে এই নিয়মবদ্ধতা প্রথম প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ এই আশ্রমে যে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইত তাহা সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক ছিল এবং তাহা কেবলমাত্র বাক্যে পর্য্যবসিত না হইয়া, যাহারা শুনিত তাহাদের চরিত্রের উপর প্রত্যক্ষভাবেই ফলোপধায়ী হইত।

তৃতীয়তঃ মত-সহিষ্ণুতা, এই আশ্রমের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মও আচার বিষয়ক মতের অনুবর্ত্তন করিতেন কিন্তু কেহ কাহাকেও অশ্রদ্ধা করিতেন না। এই ভেদ সত্বেও সমস্ত আশ্রম একটি আনন্দ নিকেতন ছিল।

চতুর্থতঃ সংযতভাবে ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া (discipline) সকলকে অপরের সহিত মিশিয়া কাজ করিতে হইত।

পঞ্চমতঃ যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা সম্পূর্ণরূপেই কার্য্যকরী। যাহার মনের যে দিকে স্বাভাবিকী গতি ও যে কার্য্যে উপযুক্ততা আছে তাহা ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার শিক্ষার তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইত।

শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই যে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু ও তাঁহার পত্নী ঠিক পিতামাতার মত স্নেহে ও যত্নে আশ্রমের সকলকে দেখিতেন।

বিধবাশ্রম উঠিয়া যাওয়ার পর বিলাতের মানচেষ্টার কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ জে, ই কার্পেণ্টার ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ শশিপদ বাবুকে একখানি পত্র লেখেন। তাহা এই,

"You have so long prepared us for the closing of your work in the widows Home, that I cannot be surprised that you have at last found it necessary, under the stress of failing health and advancing years. The end of so long a labour cannot but be painful, especially when there is not one to hand on your work to, and it seems to drop altogether out of sight. But you must think of the many whom the Home helped and whose lives will be happier, sweeter for the opportunities which came to them through you. The labour of the pioneer is always heavy and those who come after along the easy road know little of the toil of their predecessors who first marked out the path. But it remains hidden in the remembrance of God, and no loving sacrifice passes heedless out of his sight. May this trust sustain you now"

আপনি এতদিন ধরিয়া আপনার বিধবাশ্রমের কার্য্যের সমাপ্তি সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছেন। কাজেই আজ যে আপনি বয়োধিক্য ও ভগ্নস্বাস্থ্য প্রযুক্ত বিধবাশ্রম তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। এত দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের সমাপ্তি সত্যই খুব ক্লেশকর, আবার যখন সেই কার্য্যের ভার দেওয়া যায় এমন কাহাকেও পাওয়া যায়, না এবং ফলে কার্য্যটি একেবারে দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন তাহা আরও কষ্টকর। তবে সেই সমুদায় বিধবা যাঁহাদের এই আশ্রম সাহায্য করিয়াছে এবং যাঁহারা আপনা কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত সুযোগের সাহায্যে নিজ নিজ জীবনকে মহত্তর ও সুখী করিয়াছে, আজ আপনি তাহাদের বিষয় ভাবিতে পারেনা। কোনও কার্য্যে যিনি পথ-প্রদর্শক তাঁহার কার্য্য সর্ব্বদাই খুব গুরুতর। পরে যাঁহারা সহজ পথ অনুসরণ করেন তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী-গণের কঠোর পরিশ্রম জানিতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীগণের কঠোর পরিশ্রম ভগবানের স্মৃতিতে চিরদিনই থাকিয়া যায়, কোনও প্রেমপূর্ণ আত্মোৎসর্গ তাঁহার অগোচর থাকে না, প্রার্থনা করি এই সত্য এক্ষণে আপনার সান্ত্বনা হউক।

বিধবাশ্রম উঠিয়া যাওয়ার পর আর একটি ঘটনা ঘটিল তাহা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। কুমারী মেরি কার্পেণ্টার মৃত্যু-কালে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা রাখিয়া যান। মেরি কার্পেণ্টার এ দেশের বিধবাগণের যে কিরূপ হিতৈষিণী ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য যে সকল বিধবা পড়িতেন, তিনি তাহাদের বৃত্তি দিতেন এবং এই বৃত্তি কাহাকে দেওয়া হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার শশিপদ বাবুর উপর ছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মেরি কার্পেণ্টার মহোদয়া যে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা রাখিয়া

যান, তাহার কয়জন ট্রাষ্টি নিযুক্ত হন। এই কয়েক জনের মধ্যে শশিপদ বাবু একজন, ইহা ছাড়া ভারতবাসীর মধ্যে বোম্বাইএর একজন ভদ্রলোক ছিলেন। মিস কার্পেণ্টারের মৃত্যুর কিছু দিন পরে বিলাতের ট্রাষ্টিগণ শশিপদ বাবুকে এক পত্র লিখিলেন যে, তিনি বহুদূরে থাকেন, সুতরাং এই ধনভাণ্ডারের ট্রাষ্টি হওয়া বেশ সুবিধাজনক নহে। এই পত্র পাওয়ার পর শশিপদ বাবু ও বোম্বাইএর ভদ্রলোক তাঁহাদের অনুরোধে ট্রাষ্টি পদ পরিত্যাগ করিলেন।

বরাহনগর বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে শশিপদ বাবু ট্রাষ্টিদিগকে লিখিলেন যে,মেরি কার্পেণ্টার মহোদয়ার টাকা হইতে তাঁহার আশ্রমকে সাহায্য করা হউক। ট্রাষ্টিগণ তাঁহার পত্রের উত্তরে লিখিলেন যে,তাঁহারা আইনজ্ঞ ট্রাষ্টি মহাশয়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার মত নাই, মেরি কার্পেণ্টারের অর্পণ পত্রে (Trust-deed) এই কথা আছে যে ভারতবর্ষে যে বালিকা বা স্ত্রীবিদ্যালয় ইউরোপীয় মহিলার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত, সেই বিদ্যালয়কেই এই ফণ্ড হইতে সাহায্য করা হইবে, অন্যগুলিকে নহে। শশিপদ বাবু এই পত্রের দ্বারা নিরস্ত হইলেন না। তিনি ট্রাষ্টিগণকে লিখিলেন, যে মেরি কার্পেণ্টার যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাব লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। আমরা যে এত শীঘ্র আমাদের দেশীয় মহিলাগণের সম্পূর্ণ নেতৃত্বাধীনে স্ত্রীশিক্ষার অনুষ্ঠানগুলি চালাইতে পারিব, ইহা তিনি মনে করিতেও পারেন নাই। কাজেই তাঁহার অর্পণ পত্রে এই সর্ত্ত রহিয়াছে। এখন আমাদের দেশের বড় বড় স্ত্রী-বিদ্যালয়, এমন কি বেথুন স্কুলও দেশীয় মহিলা কর্তৃক পরিচালিত। এই প্রকার লেখা-লিখির পর ট্রাষ্টিগণ প্রথম কিছু টাকা দিলেন, শশিপদ বাবু তাহাতেও ছাড়িলেন না। লেখালেখি চলিতে লাগিল, শেষে তিনি এই পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার প্রায় সমুদায় সুদই বিধবাশ্রমের জন্য প্রাপ্ত হইলেন। কুমারী মেরি কার্পেণ্টার যাহা

চাহিয়াছিলেন তাহাই হইতে লাগিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শশিপদ বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে যখন বিধবাশ্রম অর্পণ করিতে চাহেন, তখন তিনি ১০০ টাকা বিলাতের মাসিক সাহায্য দিতে চাহিয়াছিলেন। এই ১০০ টাকা ঐ মেরি কার্পেণ্টারের টাকার সুদ। এই টাকার ট্রাষ্টিগণ শশিপদ বাবুকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যত দিন বিধবাশ্রম থাকিবে ততদিন তাঁহারা টাকা দিবেন, ব্রাহ্মসমাজ বিধবাশ্রমের ভার লইলেও এই টাকা দেওয়া হইবে। মেরি কার্পেণ্টার ফণ্ডের টাকা হইতে মান্দ্রাজ বোম্বাইএ কিছু কিছু দেওয়া হইত।

এখন মেরি কার্পেণ্টার ফণ্ডের মূলধন দ্বারা কলিকাতা ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট 'মেরি কার্পেণ্টার হল' নামক এক ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মসমাজের অধীন, তাহাতে মধ্যে মধ্যে সভা সমিতি হইয়া থাকে।

কাগজপত্র দেখিয়া মনে হয় যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক প্রধান ব্যক্তিও বরাহনগর হিন্দুবিধবাশ্রম গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে কথিত সভাপতি রজনীনাথ রায় এম, এ মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত নিম্নের অংশ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—

"I desire in this place to acknowledge with heart-felt thank a very liberal offer made by that enthusiastic and veteran friend of education, Babu Sasipada Banerji of Baranagar. I trust the Executive Cammittee of the coming year will be able, with, Babu Sasipada's help, to devise a suitable scheme for turning this kind offer to practical account."

ইহার অর্থ এই—বরাহনগর-নিবাসী সুপরিচিত, উৎসাহী ও প্রাচীন, শিক্ষাবিস্তারের বন্ধু, শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে উদার

দানের প্রস্তাব করিয়াছেন আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত আমি তাহার এই স্থলে উল্লেখ করিতে চাই। আমি ভরসা করি যে আগামী বর্ষের কার্য্যকরী সভা শশিপদ বাবুর সাহায্যে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার উপযুক্ত উপায় বিধান করিবেন।

কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক বিখ্যাত মনীষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বরাহনগরের এই সমস্ত অনুষ্ঠান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে নিম্নরূপ অভিমত লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"I paid a visit to the Baranagar Hindu Widows Home and Training School and took part in the interesting ceremony of the distribution of prizes to the meritorious boys and exstudents of the Baranagar Night School. The Hindu female Boarding and Training School appears to me to be conducted on very sound principles and as the Pioneer Institution of its class in the province of Lower Bengal, deserves the warmest sympathy, support and recognition of all who are interested in the elevation of the status of Hindu women and indeed of all true lovers of their country. The inception of the movement is entirely due to the self-sacrificing effer to and heroic struggles of Mr. Sasipada Banerji, to whom the Hindu community should be grateful as to one of its truest and most disinterssted benefactors."

অর্থাৎ বরাহনগর হিন্দুবিধবাশ্রম ও ট্রেনিং স্কুল পরিদর্শন করিলাম এবং বরাহনগরে নৈশবিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উপযুক্ত ছাত্র ও প্রাচীন ছাত্র-গণকে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হইল তাহাতেও উপস্থিত ছিলাম। আমার মতে হিন্দুরমণীগণের বোর্ডিং ও ট্রেনিং স্কুল অতি সুন্দর পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়, এবং নিম্নবঙ্গে এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বলিয়া হিন্দুরমণীগণের অবস্থার উন্নতি-

সাধনে যাঁহারা ইচ্ছুক, বস্তুতঃ প্রত্যেক স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিরই বিশেষ সহানুভূতি ও সাহায্য লাভের ইহা উপযুক্ত। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বীরোচিত পরিশ্রম ও আত্মোৎসর্গই এই আন্দোলন আরম্ভ হইবার একমাত্র হেতু। হিন্দু সমাজ শশিপদ বাবুর নিকট সমাজের একজন প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ বন্ধু বলিয়া কৃতজ্ঞ থাকিবে।

বাঙ্গালা ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সুবিখ্যাত 'নব্যভারত' পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বাবু দীর্ঘকাল ধরিয়াই শশিপদ বাবু ও তাঁহার পরিবারের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সুতরাং শশিপদ বাবুর কার্য্যাবলী তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনা। তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলিতে স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে শশিপদ বাবুর কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা ঐ সমস্ত প্রবন্ধ হইতে দুই একস্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বিধবাবিবাহ ও বিধবাগণের সুশিক্ষাবিধানের জন্য স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরেই, এই সদাশয় ও সহৃদয় পুরুষ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উচ্চকণ্ঠে গীত ও অমর লেখনীতে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য, কারণ এই বঙ্গ-সন্তান কেবল বাঙ্গালা দেশে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিধবা-জীবনের বিবিধ উন্নতি সাধন চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিভাগেও ঐরূপ সদনুষ্ঠান জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। পুণাতে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে * * পুণার বিধবাশ্রম শশিপদ বাবুর নিকট অর্থ ও উপদেশ বিষয়ে * ঋণী।"

আমাদের এই পরিচ্ছেদে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন ছিল—শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া পত্নী স্বর্গীয়া শ্রীমতী গিরিজাকুমারী দেবীর কথা। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন

স্বর্গীয়া গিরিজাকুমারী দেবী

তাঁহার এই গৌরবময় জীবনের অর্দ্ধেক অংশই তাঁহার স্ত্রী। শশিপদ বাবু যদিও অশেষ পরিশ্রম করিয়া তাঁহার পত্নীকে তাঁহার জীবনের আদর্শের উপযুক্তা করিয়া তুলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের অনেকগুলির সহিত তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলিতে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বাবু শশিপদ বাবুর পত্নী স্বর্গীয়া শ্রীমতী গিরিজাকুমারীর কথা দুই এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। আমরা তাঁহার দুই এক স্থল নিম্নে প্রদান করিলাম। "ইঁহাদের (আশ্রমবাসিনী বিধবাগণের) রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্য্যায় শ্রদ্ধেয় শশিপদ বাবুর গৃহিণী স্বর্গীয়া গিরিজাকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজ কন্যাগণের সঙ্গে কোনও পার্থক্য ছিল না। * * * যেদিন গিরিজাকুমারী দেবীর স্বর্গারোহণ হয়, সেদিন * এই শ্রেণীর বহুপালিতা কন্যা সেই শবপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কন্যার ন্যায় অশ্রুপাত করিয়াছেন। * * * শ্রীমতী লাহিড়ী প্রতিষ্ঠিত স্বল্পকাল স্থায়ী বিধবাশ্রমটি অনেক পরের ঘটনা। ভারতবর্ষে বিধবাশ্রম সর্ব্বপ্রথমে বরাহনগরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। * * শ্রীমতী লাহিড়ীর আশ্রমের পরিচালন বিষয়ে সভাপতিরূপে গিরিজাকুমারী বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।"

এই বিধবাশ্রম পরিচালনা কার্য্যে, মধ্যে মধ্যে বড় কঠিন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইত। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রকারে এই সমুদায় সমস্যার মীমাংসা করিতেন তাহা চিন্তা করিলে অনেক দিকেই আমরা শিক্ষা লাভ করিতে পারি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই বিধবাশ্রমের ব্যয় অধিকাংশই বিলাত হইতে ও ইংরাজ মহল হইতে সংগৃহীত হইত। সে সময়ে শশিপদ বাবুর সহিত অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলার ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাঁহাদের অনেকেই শশিপদ বাবুর কার্য্যেও যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। সাহেব-

দের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের সহিত কার্য্য করা অথচ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের মতে মত না দিয়া জাতীয়ভাব বজায় রাখা যে কত কঠিন তাহা সকলের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন। এই বিধবাশ্রমসম্পর্কীয় একটি ঘটনা হইতে আমরা এ সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই জানিতে পারিব।

শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রম যে সময়ে বেশ জোরে চলিতেছিল সে সময়ে খিদিরপুরে মিসেস্ গ্রাণ্ট্ নামক একজন অতি প্রবীণা ইংরাজ মহিলা বাস করিতেন। ইনি সামরিক বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর বিধবা পত্নী। সাহেবমহলে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, বড় বড় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও নানা সদ্‌গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। তাঁহার যেমন চরিত্রবল, তেমনি তেজস্বিতা, আবার তেমনি পরোপকারে অনুরাগ। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তৎকালীন বড়লাট লর্ড লরেন্স বাহাদুর তাঁহাকে যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন পেন্সন দিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তিনি এই পেন্সন প্রত্যাখ্যান করেন। সিপাহি হাঙ্গামার সময়ে সামরিক বিভাগের যে সমুদায় কর্ম্মচারী নিহত হয়েন তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণের জন্য যে অনাথাশ্রম হয়, ইনি সেই আশ্রমের কর্ত্রী ছিলেন। পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশানাল এসোসিয়েসনের কথা বলা হইয়াছে। শশিপদ বাবু এই এসোসিয়েসনের বাঙ্গালা দেশে একটি শাখা করেন সে কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মিসেস্ গ্রাণ্ট্ এই বাঙ্গলা দেশের শাখার সম্পাদিকা ছিলেন। কেবল সম্পাদিকা নহেন, প্রকৃত প্রস্তাবে মিসেস্ গ্রাণ্টই বঙ্গদেশীয় শাখার সর্ব্বস্ব ছিলেন, তাঁহার কথা মতই সমস্ত কার্য্য হইত। আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার কল্পে তাঁহার অশেষ সহানুভূতি ছিল—শশিপদ বাবুর বিধবাশ্রমে তাঁহার এত অনুরাগ ছিল যে তাঁহার ঐ অতি প্রাচীন বয়সেও তিনি প্রত্যেক মাসে দুইবার করিয়া বিধবাশ্রম দেখিতে আসিতেন।

এই মিসেস্ গ্রাণ্টের সহিত শশিপদ বাবুর মধ্যে মধ্যে মতভেদ নিবন্ধন গোলযোগ উপস্থিত হইত। ইংরাজী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে শ্রীমতী মিসেস্ গ্রাণ্ট্ বরাহনগরে বিধবাশ্রমের বিদ্যালয় দেখিতে আসিলেন। শশিপদ বাবু বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, তিনি কোর্টে গিয়াছেন। শশিপদ বাবুর সহিত মিসেস্ গ্রাণ্টের দেখা হইল না। তিনি একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া গেলেন। পত্রখানি এইরূপ—

"I was very sorry to miss you to-day but I can say what I wish to say in writing. I have made up my mind to give up the secretaryship of the N. I. A. unless I am allowed to permit Christain lady missionaries to visit the school and hold a Bible class. You may think that this is rather a hasty resolution but it is not so. Kindly ask all the guardians of the widows if they have any objection. I shall ask our Committee. It they object I shall resign I shall do the same with the Entally School."

এই পত্র খানিতে তিনি লিখিয়াছেন যে, আপনার এই বিধবাশ্রমের বিদ্যালয়ে ও এন্ট্যালিতে যে বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়ে খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারিকাগণ কর্ত্তৃক বাইবেল অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এ বিষয়ে আমি একেবারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। আমি কমিটিকে জিজ্ঞাসা করিব। আপনিও বিধবাগণের অভিভাবকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন তাঁহারা এই ব্যবস্থায় সম্মত আছেন কি না। এই ব্যবস্থা যদ্যপি না হয় তাহা হইলে আমি ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের শাখার সম্পাদিকার পদ পরিত্যাগ করিব।"

কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া শশিপদ বাবু এই পত্র পাইলেন ও

অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি খিদিরপুরে যাইয়া মিসেস্ গ্রাণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও বিশেষ ভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া আপাততঃ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন ও বলিলেন যে কুমারী ম্যানিংকে তিনি পত্র লিখিবেন, সেই পত্রের উত্তর আসার পর যাহা হয় হইবে। পরের ডাকেই শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু কুমারী ম্যনিংকে এক পত্র লেখেন। কুমারী ম্যানিং এর সাহায্যে বাইবেল শিক্ষার সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল।

আর একবার মিসেস্ গ্রাণ্ট এই ব্যবস্থা করেন যে, বিধবাশ্রমের পারিতোষিক বিতরণের সভা খিদিরপুরে হইবে আর তিনি তাঁহার যাবতীয় বন্ধুবান্ধবগণকে সেই সভায় নিমন্ত্রণ করিবেন।

মিসেস্ গ্রাণ্টের প্রকৃতি শশিপদ বাবু অতি উত্তমরূপেই জানিতেন, কিন্তু মিসেস্ গ্রাণ্ট বা অপর কাহারও প্রস্তাবে বা অনুরোধে কার্য্যের ও জীবনের যাহা নীতি তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়া শশিপদ বাবুর প্রকৃতি নহে। ইংরাজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে শশিপদ বাবু মিসেস্ গ্রাণ্টকে এ বিষয়ে যে পত্র লেখেন সেই পত্রের অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে। দৃঢ়তার সহিত সদ্‌যুক্তি প্রয়োগ করিয়া শশিপদ বাবু মিসেস্ গ্রাণ্টকে বিধবাশ্রমের বিশিষ্টতা কি তাহা সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন ও বলিলেন যে হিন্দুবিধবাগণকে লইয়া বৈদেশিকগণের সভায় উপস্থিত করা হিন্দুর জাতীয় ভাবের বিরোধী। স্ত্রীলোকদিগের পর্দ্দা খুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা আমাদের দেশে অনেকস্থলেই হইতেছে। কিন্তু এই বিধবাশ্রমের তাহা উদ্দেশ্য নহে। সম্পূর্ণরূপে জাতীয় ভাবের ভিত্তির উপর এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা, সুতরাং মিসেস্ গ্রাণ্ট যাহা করিতে চাহিতেছেন তাহা করা সঙ্গত নহে।

কোনও ঘটনা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু মিসেস্ গ্রাণ্টকে বলিয়াছিলেন।

কুমারী মেরিকার্পেণ্টার।

"I have many Mrs Grants in the mansion of my Father." এই প্রকারে আরও কত সমস্যা ও কত সংঘর্ষ মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইত। এই সমস্ত ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া শশিপদ বাবু এই আশ্রম পরিচালনা করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

শশিপদ বাবুর জীবনের নীতি হইতে বিচ্যুত না হওয়ার এই শক্তির আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই স্থলে প্রদান করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সে ঘটনা পূর্ব্বের ঘটনার অনেক পূর্ব্বের কথা। শশিপদ বাবু যখন বিলাতে কুমারী কার্পেণ্টারের গৃহে অতিথিরূপে সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পুত্র এল্‌বিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় (১৮৫১ খৃঃ অব্দ)। কুমারী কার্পেণ্টার শশিপদ বাবুর অনেক উপকার করিয়াছেন—এবং সেইজন্য তাঁহার প্রতি শশিপদ বাবু বিশেষ ভাবেই কৃতজ্ঞ। পুত্রের জন্ম হওয়ার পর একদিন রাত্রিতে কুমারী কার্পেণ্টার ও শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু অন্যান্য দিনের মত রাত্রিকালে বসিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতেছিলেন। অন্যান্য নানা কথার পর কুমারী কার্পেণ্টার বিশেষ আন্তরিকতার সহিত একটি অনুরোধ করিলেন। অনুরোধটি এই। কুমারী কার্পেণ্টারের পিতা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত Lewis Mead chapel নামক একটি উপাসনালয় আছে। রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ সেই উপাসনালয়ের ধর্ম্মযাজক। কুমারী কার্পেণ্টারের এই ইচ্ছা যে শশিপদ বাবুর এই নবজাত পুত্রের জন্য সেই উপাসনালয়ে রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ কর্ত্তৃক একদিন প্রার্থনা ও উপাসনা হউক। কুমারী কার্পেণ্টারের এই অভিলাষ যে তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম স্থল হইতেই নিঃসৃত হইতেছে ইহা তাঁহার কথা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শশিপদ বাবু কতদিকে কুমারী কার্পেণ্টার কর্ত্তৃক কত প্রকারেই উপকৃত! সুতরাং তাঁহার এই অনুরোধ শ্রবণ করিয়া শশিপদ বাবু কি করিবেন? তিনি খুব গম্ভীর ভাবে বলিলেন,

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা যাউক, তবে এই প্রার্থনা উপাসনালয়ে রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ কর্ত্তৃক না হইয়া আপনার বাড়ীতেই আপনার ভগ্নীপতি মিষ্টার টমাস্‌ কর্ত্তৃক হইলেই বেশ ভাল হয়। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর এই উত্তর পাওয়ার পর কুমারী কার্পেণ্টার গম্ভীর হইলেন, শশিপদ বাবুও নীরব। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে একটিও কথা নাই। অল্পক্ষণ পরে কুমারী কার্পেণ্টার বলিলেন—

"Mr. Banerji, I respect you all the more for this" অর্থাৎ এই মতভেদের জন্য আমি আপনাকে আরও অধিক সম্মান করি। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর সমস্ত ভাবই বিশ্বজনীন, যাহার যাহা ভাল শশিপদ বাবু চিরকাল অবনত মস্তকে আদর করিয়া আপনার বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ যেন কেহ মনে না করেন যে, তিনি স্রোতেভাসা লোক, অর্থাৎ যে দিকে স্রোত আসে সেই দিকে তিনি ভাসিয়া যান। পূর্ব্বের দুইটি ঘটনা ও এই প্রকারের শত শত ঘটনার দ্বারা অতি স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহার বিশ্বজনীনতা নিজত্বের দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই বিধবাশ্রম লইয়াই শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর আর একবার কিরূপ পরীক্ষা হইল তাহাও বর্ণনীয়। ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার লোক-হিতৈষী মিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় বিলাতে একদা কথা প্রসঙ্গে কুমারী ম্যানিংকে বলেন যে, শশিপদ বাবু এই বিধবাশ্রম করিয়া দেশের প্রাচীন-ভাবাপন্ন স্থিতিশীল সম্প্রদায়কে প্রীত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন অর্থাৎ তিনি উন্নতি প্রবাহে আর অগ্রসর হইতেছেন না। কুমারী ম্যানিং পত্রের দ্বারা শশিপদ বাবুকে এই কথা জ্ঞাপন করেন। সেই পত্রের উত্তরে শশিপদ বাবু যে দুইখানি পত্র লেখেন তাহাতেও এই জাতীয় ভাবের দৃঢ় ভূমির কথা উল্লেখ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অতি আবশ্যকীয় প্রসঙ্গের আলোচনা করিলেন। আমরা

একটি কার্য্যের সঙ্গে অকারণ দুচারিটি কার্য্য মিশাইয়া ফেলি, তদ্দ্বারা অনেক ক্ষতি হয়। হিন্দু বিধবাশ্রমের উদ্দেশ্য হিন্দু বিধবাগণকে সাহায্য করা। বিধবাগণের বিবাহ দেওয়া, বা জাতিভেদ ভঙ্গ করা, এ অন্য প্রকারের কার্য্য সুতরাং হিন্দু বিধবাশ্রম যদ্যপি সত্য সত্যই চালাইতে হয়, তাহা হইলে ইহার মধ্য দিয়াই সকল প্রকার সংস্কার সারিয়া ফেলার চেষ্টা করা কার্য্যের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ নহে। এই ঘটনাতেও শশিপদ বাবুর মতই বজায় রহিল।

একটা উদাহরণ দিলে এই প্রকারের চিন্তার এ যুগে উপযোগীতা কত তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের দেশে খাদ্যাখাদ্য বিচার খুবই অধিক, সংস্কারকগণ তাহা সংস্কার করুন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে যে দিন সংস্কারক নেতাগণ এই ভাবটি প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিলেন, যেদিন দেখা গেল যে, যাঁহার যাহা কিছু চেষ্টা, যেমন বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমস্ত দ্রব্যই স্বদেশীর বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইল, সেই দিন হইতেই আন্দোলনে দুর্ব্বলতা ও পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

যাহা হউক হিন্দু বিধবাশ্রম উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের এই দরিদ্রের দেশ বাহিরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে যাহাই মনে করি না কেন, দিন দিন অতি ভীষণ অন্নকষ্ট আসিয়া নির্দ্দয় দানবের মত আমাদের নগর ও গ্রামগুলিকে আক্রমণ করিতেছে। ধনীদের অতিথি-শালা উঠিয়া গেল, দেবমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি আসিয়া সকল-কেই গ্রাস করিয়াছে, সকলেই আত্মরক্ষার দিকে ধাবমান, পরকে আশ্রয় দেওয়ার শক্তিও নাই প্রবৃত্তি ও নাই। শেখা কথার বুলি আওড়াইবার প্রয়োজন নাই—হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করুন। শত শত অসহায়া বিধবা কেহ পিত্রালয়ে কেহ শ্বশুরালয়ে একমুষ্টি অন্নের জন্য প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত

পশুর অপেক্ষাও কঠোরতর পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতেছে—কিন্তু তাহাতেও দিন যায় নাই—সুতীব্র তিরস্কারের বিষবাণ বর্ষিত হইতেছে, এই তীব্র তিরস্কারের বিষবাণ শয়নে স্বপ্নে জাগরণে সর্ব্বদাই তাহাদের বিদ্ধ করিতেছে। আর সহ্য করিতে না পারিয়া কত বালিকা আত্ম-হত্যা করিতেছে—কতজন নিরুদ্দেশ—চিরদিনের জন্য কলঙ্কের ডালা মাথায় করিয়া নরকের পথে চলিয়াছে। আমরা সমাজের ও দেশের কল্যাণের জন্য নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছি আজ কি আমাদের কাণে এই অসহায়া বিধবাগণের কাতর বিলাপধ্বনি প্রবেশ করিবে না? আজ কি আমরা তাহাদের একটিরও নয়নের জল মুছাইতে পারিব না? ইহাই চিন্তার কথা। সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই আশ্রমের কথা পাঠ করিয়া কেহ বলিতে পারিবেন না যে তাহাদের দুঃখ ও অভাবের কথা জানি, তাহাদের জন্য প্রাণও কাঁদে কিন্তু আমি যে দরিদ্র, আমি কি করিতে পারি? দারিদ্র্যের দ্বারা কার্য্যের ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু যদি ব্যাকুল হইয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে আজ যাহা অসম্ভব মনে হইতেছে দুদিনে তাহা সম্ভব হইয়া পড়ে। দেশের প্রায় সকলেই এই উদ্দেশ্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত—একজন অগ্রণী সরলচিত্তে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার অপেক্ষা। একটি নহে, দুইটি নহে এই প্রকারের শত শত আশ্রমে দেশ পূর্ণ হউক—জ্ঞানে ও বিদ্যায় উন্নত হইয়া বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা হইয়া সমাজের কল্যাণব্রতে জীবন উৎসর্গ করুন,—মাতৃশক্তি রমণীশক্তি; আমাদের এই দুর্দ্দশা দূরীভূত করিতে হইলে তাঁহাদের শক্তি এই ভাবে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত হওয়া চাই। আশা করি শশিপদ বাবুর এই আদর্শ সুবিস্তৃত ভাবে অনুসৃত হইবে।

Hindu Widows and Their Provision.

Reprint form The Indian mirror. 1895

The prominence, now given to social questions, is a sign of the times. There are Social Conferences in all parts of the country. However we may be divided as to the scope and utility of political agitations, probably there is practical unanimity as to the value of social reform. Madras has taken no small part in the discussion of questions of vital interest to the well-being of our country. There, men whose voice is worth listening to, have brought an amount of earnestness to the consideration of these questions, and the enunciation of schemes of social improvement, of which we cannot speak in too high terms. When so much interst is felt in these discussions, it may not be amiss to say a few words of a scheme of social reform which is being worked out for some time past in the vicinity of Calcutta, and which bears very intimately on the subject of social reform. We speak of the work that is being silently done by Mr. Sasipada Banerji in his native town.

The Baranagar Hindu Widows' Home is the first institution of the kind in this country. Generally stated, its object is to utilise that class of helpless creatures in Hindu society, whose life

is now either wasted in idleness or from want of care and protection, is exposed to graver perils, for such usefnl work as School Mistresses, Governesses, Doctors and Midwife' &c., and thus while furnishing them with means of occupation and suitable careers, to provide a supply of female teachers for our girls' schools, and for home teaching, and at the same time to solve the problem of their provision consistently with their position and the usages of society.

The Widows' Home has grown by a sort of natural development from efforts made in connection with the work of female education. Mr. Banerji has been a humble worker in this field for upwards of 30 (now 50) years. Beginning with the education of ladies in his ancestral family house, both widows and in married life, he soon felt the necessity of placing the work upon a more organized footing. The result was the establishment of the Baranagar Girls' School in 1865. It imparted elementary instruction in the vernacular, and it has thus proved itself the means of putting a considerable number of girls in the way of further education themselves in after-life. Its chief importance, however, lay in the educating influence it exercised upon public opinion as to the value of female

education. As yet the idea of giving education to the female sex was new to the country, and, naturally, Mr. Sasipada Banerji had no small difficulties and trials. These, however, by and by, disappeared. Popular prejudices against female education were softened down, and at last completely removed till now we find that the education of girls is given some thought in every Hindu household. How the Institution has exercised a subtle influence in the diffusion of a wide-spread public sympathy in favour of female education will be realised from the fact that girls of this school have been sent out by marriage to all parts of the province, and, as educated mothers, they are putting a new force at work in moulding the character of the new generation, and in giving a new direction to popular life and popular ideas in Bengal. The influence of a good tree is scarcely foreseen when it is planted. Wait some time, and the seeds are scattered far and wide which germinate and give birth to new trees. So is it in regard to the diffusive action of a sound measure of social improvement. Remembering the appalling obstacles, thrown in his way when he started operations, and viewing the steady and sure changes which the work of thirty (now fifty) years has brought about in the tone of society, one can-

not help wondering at the difference; Female education has now made considerable strides, young ladies are going in, in ever-increasing numbers, for the highest education available. In the stiffest University examinations they are found able to hold their own with all competitors. They ask for no special indulgences, but are willing to contest the prizes of higher edu cation on the same terms with the other sex. All this marks a new epoch in the social history of the country, and it must be no small satisfaction to feel that one had some hand in bringing about this result.

There is difference of opinion as to how far our women should advance in regard to higher education. There are even those who would not give the same education to the one sex as to the other. But for all such differences of opinion as to modes or extent, there is practical unanimity on the broad question as to the necessity of the thing itself, even the orthodox community being agreed on the point.

The great question that came to the front after some trial to the movement was who should teach our women? After sufficient consideration, the answer to this question arrived at was an emphatic—No, ta the system io vogue. It was

apprehended, and rightly apprehended, that with men engrossing the work of teaching women, at any rate, in the earlier stages, there was great danger of the learners parting with that softness and sweetness which constitute the best traits in feminine nature. This was felt to be too great a price to pay for the blessing of education. At the same time the fitness of men for the task began to be questioned. It came to be asked, why not have women to teach women. They were no doubt our earliest teachers. Women by nature are the best teachers, but to get them in the field was a practical difficulty. Who could best be had to hand for the purpose? The speculative part of the question being disposed of, it now remained to find out actual persons fitted and willing for the work. To our mind, the best class to be utilised for the purpose are our widows. By their early training and the austere habits which come naturally to them, they are best fitted for the work.

There is another consideration of great value. Hindu widows have always filled an important place in society. Theirs is a life of self-sacrificing devotion to the service not only of their own family, but of their neighbours and friends. They have occupied the position of those philanthropists who, in Western countries, go under the name of Sisters of charity. They have nursed the sick among their own relations and others. They have been distinguished by their benevolence, their purity and self-denial. This standard of widow-life, however, is fast falling off. The contact of Western civilisation and

Western ideas of life and society is working strange changes upon the character of Hindu society. There is, indeed, no ignoring the fact that our widows are no longer regarded, as they used to be, with the feelings due to the Ministering Angels of the Home. They are neglected, and in many cases they are miserable. Such a position is exposed to risks which may be easily imagined. In view of these changes in Hindu society, Mr. Banerji came to the conclusion that the best teaching agency that could be provided for the girls' schools which were springing up on all sides, was to be sought for among these unfortunate and helpless creatures. This to his mind would not only be of advantage for the purposes of female educauion itself, but it would do more for the widows themselves. It would rescue them from their state of present embarrassment and neglect and with some adaptations necessitated by the altered circumstances of the day retain them in their traditional position of respect and sanctity. With this idea, the Baranagore Hindu Widows' Home was established in the year 1887. For the last eight years, it has been at work, and the result has been encouraging. The training, given to the widows, enables them to qualify themselves for useful careers for themselves. If so minded, they may be fitted for the Medical School. One of the pupils, after finishing her education in the Campbell Medical School, is now practising as a doctor in East Bengal, while another is a midwife. The greater portion, of course, are now Mistresses in girls' schools or are useful in their own homes. The

value of the Home, however, is not to be measured by the actual outturn of the results. One is free to admit that the benefit of the training which the Home is intended to give has yet been shared by a comparatively small number. This is inevitable from the nature of the case. The really valuable work that the Home is now doing is the moral influence it exercises on public opinion. It is helping in the growth of a public opinion on behalf of widows, and of the movement set on foot for utilizing a neglected class for useful and educational purposes.

Society grows slowly. Sound principles take root slowly. Mr. Banerji has undertaken an experiment, and it will not do to expect a full harvest at once. His efforts are now more directed to enlist public sympathy for the cause. Vernacular tracts and leaflets have been written and circulated, explaining the objects in view, and the method by which they are proposed to be attained. There are helpless widows all over the country, and their number is on the increase. Their life is blank. They are idle, and open to temptations. They are no longer regarded as sacred as they used to be, and they are neglected. The Home offers them opportunities for self-improvement and usefulness. Female education is by no means new in this country. In the *Asramas* of ancient Hindu *Rishis*, there were females who sometimes received the highest culture. The Home in that view is no innovation. In form, of course, it is. And any innovation is regarded with keen jealousy in this country. One must be content, therefore, to wait before the institution

is popular. It is, however, gratifying that so far the progress of the Institution has been hopeful. That which has more than other things contributed to the modicum of success which has been attained is the Hindu character of the Home. Visitors of the orthodox classes, including Hindu spiritual guides and ladies from respectable Hindu families, have commended this feature of the Institution, while Government inspecting officers have testified that widows, trained in this Home, have nothing to fear on the score of their caste. Leaders of Hindu society in the place have also given testimonies of their sympathy in the Institution. Mr. Banerji's main efforts are now directed to enlisting public sympathy and educating public opinion in favour of the new idea.

During the year 1894, there were 19 widows in the Home, keeping to the number of the previous year, while the total number of boarders was 33 against 31. The number in the Day Girls' School, on the 31st December 1894, was 123 against 88 of the previous year. Of course, this is but a drop in the ocean. Nineteen is nothing in a country with 670,000 widows, varying from the age of 9 to 19according to the last Census. But one should not complain of this. This is the beginning of an interesting work, and a greater proportion of scholars is not to be looked for at the outset. It is sufficient that the importance of the movement is being recognised by the country. Of this, sufficient indications have been received. The boarders are not confined to Mr. Banerjis neighbourhood, on the contrary, it is the more remote parts which have responded to his call more readily. There is, indeed, no doubt now, that the Home has made its influence felt and set the country athinking on the problem of the future of our widows.

The question as to the condition of the Hindu widows

must press for a solution. The fact of the existence of a large and increasing class of helpless widows in our midst, is not denied. Maharajah Sir Jotindra Mohun Tagore has by his endowment of a lac of rupees in the name of his late widowed mother given prominence to the social difficulty which leaders of society and men of thought have to grapple with. The Maharajah's endowment is intended to afford small monthly allowances to widows in and about the metropolis for their maintenance. Commendable as this act of charity is, it will attack only a mere fringe of the vast area covered by the problem. It is a large country, and the difficulty that has to be encountered is proportionately great. We think external help to the widows will not do much, but they must be taught to help themselves. The Widows' Home has adopted self-help for its cardinal principle. It gives help so long as it is indispensable, but only with the object fo soon making them independent of it. It feeds and clothes them, and gives them shelter and good education, but above all things, it trains them to useful work, so that they may in time dispense with any help from outside. The training is given in entire conformity with Hindu ways and religious observances. The object is to rescue Hindu widows from their present unsettled, precarious and perilous position, and it will be a doubtful good to offer them to do aught, having the slightest appearance of an interference with their beliefs and their ways. The methods followed are in complete harmony with those of Hindu society, with only such improvements and adaptations as are called for by the needs of the present time. Society is undergoing changes in all directions, and Mr. Banerji's only effort is to help its healthy growth, while keeping on its national basis.

The inmates of the Home are trained on the principle of self-help. A part of such training is of course domestic. If the performance of the domestic duties is the proper sphere of Hindu widows, it will be a questionable policy to allow them no part in it. They cook their own food, have their own religious exercises, nurse the sick in the

home as well as attend to others. Cleanliness, which is enjoined by the Hindu Sastras as the most cardinal duty of a Hindu, is here observed, in every detail of life and purity of life is their chief concern. In fact, the method of life prescribed and followed is the closest approach to the old ideal of Brahmacharya that is attainable in the present time. Their prototypes of old knew no laziness, their lives being consecrated to the service of humanity. Here in this Home, there is an earnest endeavour to bring on the same spirit of self-devotion. This is an aspect of the Home which one may confidently commend to the consideration of the public.

The Home has since made a new development. It has introduced a scheme by which education is being imparted to widows and others in their own homes. It has succeeded by the grant of small stipends to Hindu widows who would not be permitted to stir out of the Zenana, to make its influence felt within that charmed circle. To widows, poor but respectable, small monthly allowances are given on condition that they should, to the extent of their knowledge, impart instruction to the female inmates of their family and immediate neighbourhood, and also direct their energies to self-improvement. This idea has been a success, no less than 14 families having thus been turned into so many centres for the diffusion of knowledge and for the readings of Ramayan and Mahabharat by the widows themselves. This new development cannot fail to receive the sympathy and support of the country as being thoroughly national and in conformity with the prevailing ideas of female improvement.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা বিস্তার ও পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা।

শিক্ষাবিস্তার অপেক্ষা পবিত্রতর ও সমাজের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্য আর কিছুই নাই। যাঁহারা দেশের জন্য সত্যই কিছু করিতে চাহেন তাঁহারা এই কার্য্য গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। শশিপদ বাবুর জীবনের অনেক প্রকার কার্য্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে এই কার্য্যগুলি সমস্তই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লোকশিক্ষামূলক। শিক্ষা বলিতে অনেক বিষয় বুঝায়। কাগজ পরিচালনা করা, পুস্তক প্রচার, বিদ্যালয় স্থাপন এগুলি দ্বারাও যেমন শিক্ষাদান, লোকে যাহাতে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও তেমনি একটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য। শশিপদ বাবু সাধারণ পাঠাগার বা পাব্‌লিক্ লাইব্রেরী করার কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আজকাল অনেক স্থানেই লাইব্রেরী হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে লাইব্রেরী করার ঢেউ দেশে উঠে নাই। অবশ্য শশিপদ বাবু লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা কার্য্য আরম্ভ করিবামাত্রই চারিদিকে লাইব্রেরী হইতে আরম্ভ হইল সে কথা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

হিন্দু দর্শনের একটি অতীব প্রসিদ্ধ মত এই যে মানুষ যখন জগতে আসে তখন প্রকৃতিগত একটা বিশিষ্টতা লইয়া আসিয়া থাকে। সকল লোকই যে জন্মকালে এক ভাবেরই বীজ লইয়া জগতে আসে

তাহা নহে। এইজন্য ভবিষ্যজীবনে মানুষ যাহা করিবে শৈশবেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্নপ্রাশনের দিনেই সম্মুখস্থিত অনেক বস্তুর মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানিই লইয়াছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শৈশবে পৌরাণিক লীলা সকলের অভিনয় করিতেন, নেপোলিয়ন্ বাল্যকালে দুর্গ বিজয়ের খেলা করিতেন, এ সমস্ত কথা সকলেই জানেন। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর নিকট আমরা শুনিয়াছি যে আমাদের বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অন্যতম গৌরবমণি অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় যখন বালক তখন আপন মনে সুতা লইয়া এখানে ওখানে বাঁধিতেন ও নিবিষ্ট চিত্তে এই প্রকারের অনেক খেলা করিতেন, তাঁহার পিতা বলিতেন যে ইহার লেখা পড়া কিছুই হইবেনা। এখন দেখা যাইতেছে যে সেই খেলাতেই মত্ত হইয়া সমস্ত জগৎকে আপনার মণীষা ও প্রতিভার আলোকে তিনি চমৎকৃত করিয়াছেন।

শশিপদ বাবুর বাল্যজীবন বর্ণনায় আমরা বলিয়াছি যে তিনি ঠাকুর পূজা করিতেন ইহা তাঁহার একটি প্রিয় খেলা ছিল। ইহা ছাড়া বাল্যকালে লাইব্রেরী করাও তাঁহার আর একটি খেলা ছিল। তাঁহার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর সেই সময়েই তিনি প্রথম লাইব্রেরী করেন। সে এক বাল্যক্রীড়া, কিন্তু এই ক্রীড়ার মধ্য দিয়াই তাঁহার ভবিষ্যজীবন আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। শশিপদ বাবুর পিতা সেকালের একজন ভাল ইংরাজীনবিশ ছিলেন—কাজেই তাঁহাদের বাড়ীতে কতকগুলি ইংরাজী পুস্তক ছিল। এই পুস্তকগুলি একটি বেতের প্যাটরার মধ্যে থাকিত। তাঁহার মৃত্যুর পর শশিপদ বাবু এই পুস্তকগুলিকে রৌদ্রে দিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া প্যাটরার মধ্যে রাখিতেন এবং এই পুস্তক সংগ্রহের নাম হইল "ব্যানার্জি ফ্যামিলি লাইব্রেরী"। পল্লীগ্রামে পাড়ার ছেলেরা একত্রে পড়াশুনা করে, এই

প্রকারের এক একটি আড্ডা থাকে—এখনও পল্লীগ্রামে এ প্রকারের ব্যবস্থা আছে। শশিপদ বাবুদের বাড়ীতে এই প্রকারের আড্ডা ছিল। শশিপদ বাবুর মাতা এই সমস্ত সমাগত বালকদিগের মধ্যে যাহারা শূদ্র তাহাদিগকে পর্য্যন্ত পা ধুইবার জল দিতেন। সে সময়ে কাঁচা রাস্তা ছিল, কাজেই বর্ষার দিন পথে বাহির হইলেই পা ধুইতে হইত। এই সমস্ত বন্ধুবালক অনেকেই তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিত ও তাঁহার মাতার স্নেহ উপভোগ করিত। প্রসিদ্ধ Reis and Riotএর সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শশিপদবাবুর এই সমস্ত বালকদিগের মধ্যে অন্যতম। এই প্রকারের এক প্রীতি-সম্মিলনের মধ্যে মাতার কোমল স্নেহের মধ্যে শশিপদ বাবুর বাল্যজীবন ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছিল। সেই সময়ে তিনি শৈশবের ক্রীড়া রূপে প্রথম এই লাইব্রেরী করেন।

সদ্‌গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সকলের চিত্তে গ্রন্থ পাঠের অনুরাগ জাগ্রত করা ও পুস্তক দিয়া তাহাদের এই অনুরাগ পোষণ করা, যে একটি অতীব প্রয়োজনীয় কার্য্য তাহা শশিপদ বাবু শৈশব হইতেই অনুভব করেন। তিনি যত লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছেন সকল গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট ভাবে এক একটি করিয়া ছোট পুস্তকাগার করিয়াছেন। সুরাপান নিবারণী সভা করিলেন, তাহার সহিত কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া এক লাইব্রেরী করিলেন। এই লাইব্রেরী করার সমস্ত ব্যয়ই তিনি স্বয়ং বহন করেন, শশীপদ বাবু বিলাত যাইবার সময় সুরাপান নিবারণী সভা তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন তাহাতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। বালিকা বিদ্যালয় হইল, সেখানেও একটি ছোট খাটো লাইব্রেরী করিলেন, তাহার পর ফিমেল্‌সার্‌-কুলেটিং লাইব্রেরী—ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পুস্তক বিতরণ করা এই লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য ছিল। এই লাইব্রেরী দ্বারা একটি বিশেষ কার্য্য সাধিত হইত। অনেক বালিকা পিত্রালয়ে বৎসরাবধি

লেখাপড়া শিক্ষা করে তাহার পর বিবাহের পর শশুর বাড়ী আসিয়া আর পুস্তকাদি পায় না, লজ্জায় পুস্তকাদি সংগ্রহেরও চেষ্টা করে না, কালে যেটুকু শিখিয়াছিল তাহাও ভুলিয়া যায়। এখন অবশ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও পুস্তক প্রচারের আধিক্য হওয়ায় এ অভাব অনেকটা পূরণ হইয়াছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এ কথাটিও বলা উচিত যে বাঙ্গালা পুস্তক বিশেষতঃ উপন্যাস নাটক প্রভৃতি এবং অনেক মাসিক পত্র যে কিছু কিছু কাট্‌তি হয় তাহার প্রধান কারণ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার। স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালা পুস্তক পড়েন বলিয়াই বাঙ্গালা পুস্তকের কাট্‌তি আছে। ধর্ম্ম-কার্য্য অর্থাৎ ব্রত, উপবাস, প্রভৃতি নিত্যপদ্ধতি ও বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ এই দুইটি কার্য্যের ভার এখন স্ত্রীলোকদের মধ্যেই আছে।

যাহা হউক শশিপদ বাবু বরাহনগরে ফিমেল্ সার্‌কুলেটিং লাইব্রেরী করিয়া স্ত্রীলোকদিগের বিশেষতঃ নববধূদিগের পড়িবার পুস্তকের অভাব নিবারণ করিয়া অন্তঃপুরে জ্ঞানচর্চ্চার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রমজীবিগণের জন্যও তিনি এক লাইব্রেরী করেন। তাহার পর শশিপদ বাবু বরাহনগরে যখন ব্রাহ্মসমাজ করেন তখন তাহার সহিত এক লাইব্রেরী করেন, তৎপরে সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভা (Social Inprovemunt Society) হয়। এই সভার সহিত সংশ্লিষ্টভাবে একটী লাইব্রেরী হইল। পূর্ব্বের ছোট ছোট লাইব্রেরী গুলিকে একত্র করিয়া এই লাইব্রেরী আরম্ভ হয়। এই লাইব্রেরীর জন্য তিনি বিলাত হইতে অনেক পুস্তক আনিয়াছিলেন। এই লাইব্রেরীর একটি সূচনা আছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবুর বন্ধু বনহুগ্লী নিবাসী স্বর্গীয় দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজ কবি ক্যাম্‌বেলের লিখিত Pleasures of Hope নামক ইংরাজি গ্রন্থের কিয়দংশ বঙ্গানুবাদ করিয়া 'আশা-সুখ' কাব্য নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। শশিপদ বাবু তাঁহার নিকট হইতে এই পুস্তক এক খণ্ড চাহিয়া লইলেন ও বলিলেন,

দেখ দুর্গাদাস! তোমার পুস্তকখানি লইয়া আমি বরাহনগরে একটী সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপন করিব অর্থাৎ এই খানি তাহার প্রথম পুস্তক হইবে। তিনি যাহা বলিলেন তাহাই করিলেন।

এই সময় হইতেই সর্ব্ব সাধারণের উপযোগী একটি বৃহৎ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা শশিপদ বাবু বিশেষ ভাবে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে যে সব ছোট ছোট লাইব্রেরীর কথা বলা হইয়াছে এই সমস্ত লাইব্রেরীই শশিপদ বাবুর কর্ত্তৃত্বাধীন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে এই ছোট ছোট লাইব্রেরী গুলিকে একত্র করিলেন। এই প্রকারেই প্রথম লাইব্রেরী হইল। ইংরাজি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে এই লাইব্রেরী উন্মুক্ত হয়। শশিপদ বাবু এই লাইব্রেরীর নিয়মাবলীর এক খসড়া করিলেন।

ডাক্তার ওয়াল্‌ডি Social Improvement Societyর সভার সভাপতি ছিলেন। এই সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভার অধিবেশনে বরাহনগরে একটি সাধারণ লাইব্রেরী করার প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়। প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হইল। নিয়মাবলীতে একটি বিধান এই ছিল যে যাঁহারা এককালীন পঞ্চাশ টাকা কিম্বা একশত পুস্তক দিবেন তাঁহারা আজীবন এই পুস্তকাগারের সভ্য হইবেন। সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিলেন যে পঞ্চাশ টাকা দিয়া কি আর কেহ আজীবন সভ্য হইবে। শশিপদ বাবুদের বাড়ীর সমস্ত পুস্তক যাহা লইয়া পূর্ব্বে তিনি ব্যানার্জি ফ্যামিলি লাইব্রেরী করিয়াছিলেন সেই পুস্তক গুলি লাইব্রেরী কমিটির হস্তে প্রদান করিলেন। এই পুস্তকের মধ্যে অনেক মূল্যবান ও কয়েকখানি দুর্লভ পুস্তক ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখের ইণ্ডিয়ান্ ডেলিনিউজ পত্রে বরাহনগরে সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভার অধিবেশনে লাইব্রেরী করার সংবাদ নিম্নরূপ প্রকাশিত হয়।—

"Babu Sasipada Banerjee and his brother made over their own library to the Social Improvement Society with a view to forming a public library at Baranagar. The president then read the names of the books which included many choice and a few rare books and spoke in highly complimentary terms of the disinterested zeal of the Secretary and his brother for the formation of a public Library at Baranagar. Resolve that a special vote of thanks be given to Babu Sasipada Banerji and his brother for setting the first example of of transferring their own library to the Society."

বরাহনগরে শশিপদ বাবু তাঁহার হৃদয়ের উৎসাহানল চারিদিকে বিস্তার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যে সমস্ত লোকের সহিত তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইত তাঁহাদের কাহারও প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইলে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইব ও ভাবিব যে এই সমস্ত লোককে সৎকার্য্যে উদ্যমশীল করা এক অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু অসম্ভব ও সম্ভব হইয়াছিল। আমরা অর্দ্ধশতাব্দীর ও অধিক পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। এই সময়কার শিক্ষিত ভদ্র সমাজের অবস্থা বহুগ্রন্থে বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম ইংরাজী শিক্ষার ফলে সমাজ মধ্যে যে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তখনও সে বিপ্লবের তরঙ্গ থামে নাই। শুধু তাহাই নহে প্রথম যুগের ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া সুরাপান করিতেন,অখাদ্য ভোজন করিতেন ইংরাজীতে হাসিতেন ও কাশিতেন কিন্তু তাঁহাদের অনেকের মধ্যে অনেক সদ্গুণও ছিল এবং তাঁহারা অনেকেই উচ্চতর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এই প্রথমযুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শ ইংরাজী

শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের মধ্যেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল ! এই সময়ে একদল শিক্ষিত লোক সর্ব্বদাই এই কথা বলিতেন প্রাইভেট্ ক্যারাকটার বা ব্যক্তিগত চরিত্র লইয়া আলোচনা কর কেন ? আমি যাহা বলি বা যাহা বলিয়া আমি জনসমাজে নিজেকে সপ্রমাণ করি তাহাতেই তোমার অধিকার। আমি সুরাপায়ী কি দুশ্চরিত্র এ সমস্ত ব্যক্তিগত চরিত্র আলোচনা করিবার কাহারও অধিকার নাই। এই প্রকারের একদল লোক ভদ্র গ্রাম সমূহে উদ্ভূত হয়। ইঁহারা কেহ কেহ সুলেখক ও সদ্বক্তা—সাহেব মহলে যাতায়াত করেন, মানসম্ভ্রম আছে, অর্থও উপার্জ্জন করেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে এতদূর কদর্য্য যে প্রাচীন হিন্দুসমাজে প্রাচীন শাস্ত্রের শাসনবিধি ও সামাজিক মতের প্রভাবে এ প্রকারের লোক জন্মাইতেও পারিত না। ইংরাজশাসন, ব্যক্তিগত অনধীনতা আইনের দ্বারা সুরক্ষিত, প্রাচীন সমাজের মতামতের সহিত ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির লাভালাভের কোন সম্বন্ধ নাই, ইংরাজ মহলে বা ইংরাজী শিক্ষিত মহলে নাম থাকিলেই ভদ্রলোক বা ভাললোক হওয়া যায়। এই গেল আমাদের সামাজিক অবস্থার এক স্তর।

শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু যে সময়ে বরাহনগরে কার্য্য আরম্ভ করেন বরাহনগরের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা, বিশেষতঃ যে সমস্ত লোক লইয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল তাঁহাদের নৈতিক চরিত্রের কথা, তাঁহার সেই সময়কার লিখিত একখানি জীর্ণ কাগজে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের যে অবস্থা, ইংরাজী শিক্ষিত গণের ব্যবহারের কথা যাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা যে কেবল বরাহনগরেই সে সময়ে ঘটিয়াছিল তাহা নহে—ইহা তখন দেশের সাধারণ অবস্থা। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া কবি নবীন

চন্দ্র সেনের নবপ্রকাশিত "আমার জীবন" গ্রন্থ পাঠ করিলেই সকলেই এই অবস্থার একটা পরিচয় পাইবেন। ইংরাজীনবীশেরা প্রাচীন সমাজের শাসনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বরাহনগরের স্থায় ব্রাহ্মণ প্রধান সমাজে অধিক কি তাঁহারা একরূপ সমাজচ্যুত অবস্থাতেও আছেন কিন্তু তাঁহারা ইংরাজীনবীশ, আইন আদালত প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তাঁহাদের সম্মান, সুতরাং সমাজ তাঁহাদের ঠেলিয়া দিয়াও একেবারে বর্জ্জন করিতে পারে নাই। যিনি বৃদ্ধ দলপতি, সময়ে হয়ত তাঁহার কোন মোকদ্দমার অনুরোধে অথবা ছেলেটির কোনো চাকুরীর জন্য তাঁহাকে সেই সমাজচ্যুত ইংরাজী নবীশেরই শরণাগত হইতে হইত, কাজেই প্রাচীন সমাজ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও এই সমস্ত স্বৈরাচারী ব্যক্তিগণকে সমাজের বাহিরে রাখিয়া প্রাচীন সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক লিখিত বর্ণনা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় ইংরাজীনবিশের দল সভায় আসিতেন, সাহেব যদি সভাপতি হইতেন তাহা হইলে তো আর কথাই নাই, ইংরাজিতে বক্তৃতা করিতেন, লোক-হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা সুন্দর ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিতেন; তাহার পর হয়ত সভা হইতে আসিয়া মদ্য, গাঁজা আফিং, চরস, মরফিয়া প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া এমন কি পাশবিক ইন্দ্রিয়সেবার মধ্যে তৃপ্তি অন্বেষণ করিতেন। যাঁহাদের লইয়া শশিপদ বাবুকে এই লাইব্রেরীর কার্য্য আরম্ভ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে এই প্রকৃতির লোকও যে ছিলেন না তাহা নহে। এই প্রকারের চরিত্র সম্পন্ন লোক লইয়া যদ্যপি কোন সৎকার্য্য আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে নিরীহ সাধু প্রকৃতি-সম্পন্ন বিশেষতঃ প্রাচীন কালের সরল চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সব বড় বড় কার্য্য ভাল জানিয়াও তাহাতে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু শশিপদ বাবু

তাঁহাদিগকেও তাঁহার কার্য্যে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অসৎ চরিত্র সম্পন্ন লোক লইয়া কার্য্য আরম্ভ করার পর শশিপদ বাবুকে ইহাদের সহিত কিছু ঘনিষ্ঠ রকমে মিশিতে হইল, যতই ঘনিষ্ঠরূপে মিশিতে লাগিলেন তাহাদের চরিত্রের গোপনীয় দিকের সহিত তাঁহার ততই পরিচয় হইতে লাগিল। তিনি আতঙ্কিত হইলেন, এই সমস্ত লোক লইয়া কার্য্যের প্রবর্ত্তনা কি প্রকারে সম্ভব? কিন্তু তাহাদিগকে চাই—শশিপদ বাবু বন্ধুর মত তাঁহাদের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের বুঝাইতে লাগিলেন যে এই সমস্ত দুর্ব্বলতা ও দোষ হইতে তাঁহাদের নিজ চরিত্রকে নির্ম্মুক্ত করা প্রয়োজন তাহা হইলেই তাঁহাদের দ্বারা দেশের অনেক সৎকার্য্য হইবে নতুবা সৎকার্য্যের প্রকৃত ফল হইবে না। সুতরাং এই সৎকার্য্য সফল করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিজেদের চরিত্র শোধন করা দরকার। এই প্রকারের চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিগণকেও লইয়া শশিপদ বাবু এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা কার্য্য হস্তক্ষেপ করেন।

প্রথম কার্য্য তিনি তাঁহাদের নিজের সমস্ত পুস্তকগুলি লাইব্রেরীতে দিলেন এবং তাঁহার এই উদাহরণের অনুবর্ত্তনে অন্যান্য সকলেও যাহাতে নিজ নিজ পুস্তকগুলি লাইব্রেরীতে প্রদান করেন সে জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আন্তরিক উৎসাহের দ্বারা অনেক অসম্ভব কার্য্যও সম্ভব হয়। পূর্ব্বে যে সমস্ত ইংরাজী শিক্ষিত লোকের কথা বলা হইল শশিপদ বাবু অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের বুঝাইতে লাগিলেন যে স্বার্থপরতা ও সৎকার্য্য এই দুইটি একত্রে থাকিতে পারেনা। শশিপদ বাবুর উৎসাহের দ্বারা তাঁহাদের সকলেরই চিত্ত কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অর্থ দিলেন, পুস্তক দিলেন। ক্রমশঃ লাইব্রেরীর পুষ্টি হইতে লাগিল। লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অনেক পুস্তক সংগ্রহ করা হইল। সৎকার্য্যের ও একটা

সংক্রামকতা আছে। এই সময়ে বরাহনগরের সর্ব্বত্র এক নবভাবের উদ্দীপনা আসিল। প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণনা আছে যে অন্ধ ও দেখিল, পঙ্গু ও নাচিল, বরাহনগরের ঠিক যেন সেই রকমের একটা অবস্থা হইল। নিজ নিজ বাড়ীর পুস্তক সকলে দিলেন তাহা ছাড়া যাহারা কৃপণ কখনও সৎকার্য্যে কিছু দেন নাই তাঁহারাও এই নব উৎসাহে পরিয়া অর্থ সাহার্য্য করিলেন। এমন কি পুরাতন ও নূতন পুস্তক ক্রয় করিয়াও লোকে দিতে লাগিলেন। অন্তরের অন্তরতম স্থলে সৎকার্য্যের সরল উদ্দীপনা লইয়া যিনি কার্য্য করেন, তাঁহার কার্য্য কদাচ নিষ্ফল হয় না। শশিপদ বাবুর উদ্যমে এই লাইব্রেরীটী যখন গড়িয়া উঠিল তখন এই বরাহনগরেরই ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় যুবকগণের মধ্যে লাইব্রেরী করার একটা উত্তেজনা আসিয়া পড়িল।

দেশে একটা জ্ঞান স্পৃহা আসিয়াছে সেই জ্ঞান স্পৃহার চরিতার্থতা সাধনের মধ্যে দেশের ও সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হইবে। এই প্রকারের বড় আদর্শের দ্বারাই যে সকলে চালিত হইয়াছিলেন তাহা নাও হইতে পারে তবে ভদ্রপল্লার অধিবাসীগণের যেন একটা লাইব্রেরী করা দরকার, এই প্রকারের একটা চিন্তা বরাহ-নগরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ক্রমে বরাহনগরের পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরী হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে আমরা কয়েকটি লাইব্রেরীর নাম দেখিতে পাই। বরাহনগর নিয়োগী পাড়ায় যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে এক লাইব্রেরী হইল। আলমবাজার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে, আর একটি রেড়ির তেলের কলওয়ালাদের পাড়ায় লাইব্রেরী হইল। শশিপদ বাবুর কার্য্যের অনুকরণেই হউক আর প্রতিযোগীতা করিয়াই হউক, যখন এই প্রকারে পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরী হইতে লাগিল, সেই সময়ে শশিপদ বাবু কি করিলেন?

তাহাই ভাবিবার বিষয়। তিনি সব জিনিষেরই ভাল দিকটা আগে দেখিতে পান। ইহাই তাঁহার অভ্যাস। চারিদিকে লাইব্রেরী হইতেছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন তাহা নহে তিনি সাধ্যমত সকলকেই সাহায্য করিতে লাগিলেন। কাহাকেও অর্থ দিয়া কাহাকেও পুস্তক দিয়া কাহারও সহিত পরিশ্রম করিয়া বা সৎপরামর্শ দিয়া সমস্ত চেষ্টাগুলিরই সহিত নিজে অকৃত্রিম সহানুভূতি পোষণ ও প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন নিজে-দের পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরী করার এই যে আকাঙ্ক্ষা ইহার নাম পল্লী-পেট্রিয়টীজম্। ইহাও ভাল। ইহা হইতে ক্রমে প্রকৃত দেশানুরাগ ফুটিতে থাকে। এত প্রকারে চারিদিকে লাইব্রেরী হইতে লাগিল বটে কিন্তু এগুলি স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই সে কথা আমরা পরে বর্ণনা করিব। এস্থলে একটি কথা বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য কাশিম বাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার সাহায্য। এই সময়ে দেশে বিদ্যালয়, লাইব্রেরী প্রভৃতি যেখানে যত কিছু সদনুষ্ঠান আরম্ভ হইত, মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট আবেদন পত্র পাঠাইলেই সেখান হইতে সাহায্য আসিত। এই সমস্ত লাইব্রেরীও মহারাণী স্বর্ণময়ীর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল অবশ্য সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লাইব্রেরীর জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই এই সাহায্য প্রার্থনা না করা তাঁহার কার্য্যের একটি বিশেষত্ব এই বিশেষত্বটুকু কর্ম্মবীরগণের চিন্তা করা প্রয়োজন।

শশিপদ বাবু লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কি ভাবে অগ্রসর হইলেন তাহাও দেখিবার বিষয়। নিজের হস্তে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব রাখিয়া কেবলমাত্র বহুসংখ্যক পুস্তক সংগ্রহাদি করা তাঁহার লক্ষ্য নহে। তিনি বরাহনগর-নিবাসী প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের চিত্তে

একটা নবভাব ও অনুরাগ জাগ্রত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাব ও অনুরাগ যাহার মূলে নাই এই প্রকারের কার্য্য যতই বিশালায়তন হউক না কেন তাহা প্রাণ-শূন্য দেহের মত। প্রত্যেক লোকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া পুস্তক লইয়া আসায় আর যাহাই হউক লাইব্রেরীটি যে আমাদের এই জ্ঞান গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকের মনে জাগিতে লাগিল। এই প্রকারে লাইব্রেরী হইল।

পূর্ব্বে আমরা স্থানীয় বোর্ণিও কোম্পানি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নৈশ বিদ্যালয়ের ঘরের কথা বলিয়াছি এবং সেই ঘরে কিছু দিনের জন্য এই লাইব্রেরী স্থান পাইয়াছিল সে কথাও বলিয়াছি। শশিপদবাবু লাইব্রেরীর কার্য্য সুব্যবস্থিত করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর তাঁহাকে অন্যান্য অনেক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হইল সে কথাও পরে বলা হইবে। ফলে তিনি আর এই লাইব্রেরী বিষয়ে তেমন ভাবে কার্য্য করিতে পারেন নাই। বোর্ণিও কোম্পানীর বাড়ী হইতে নৈশ বিদ্যালয় ও লাইব্রেরী উঠিয়া গেলে এই লাইব্রেরী প্রথমে ৺ কিশোরি মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পূজার দালানে তারপর ৺ গোপাল চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বাড়ীতে রক্ষিত হইল। ভাল ঘর পাওয়া যায় নাই। তেমন হিসাব নিকাশ ছিল না ফলে প্রত্যহই পুস্তক হারাইতে লাগিল, এই প্রকার যখন লাইব্রেরীর অবস্থা তখন অন্যান্য পাড়াতেও যে সব লাইব্রেরী হইয়াছিল তাহাদের অবস্থা এই প্রকার হইয়া পড়িল।

এই সময়ে শশিপদ বাবু বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট্-ভবন নির্ম্মাণ করিলেন। এই ইন্‌ষ্টিটিউট-ভবনে পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত লাইব্রেরী গুলি সম্মিলিত হইল।

বরাহনগর শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের কার্য্য বিবরণীর মধ্যে ইন্‌ষ্টিটিউট্ লাইব্রেরীর নিম্নরূপ ইতিহাস পরিদৃষ্ট হয়।

" A circulating library consisting of nearly 2500 volumes of useful and interesting works, both English and Bengali form a part of the Institute. The Necleus of this library was supplied by the Founder who made over his own private library and coutributed Rs. 100 for the purchase of Bengali books. To this has been added the collection of the defunct Baranagar public library, which also was originally started by the Founder of the Institute in the year, 1867, in connection with the Baranagar Social Improvement Society, to which he gave his own books and for which he secured, valuable presents of books and money from many friends, both in this country and in England. For want of a local habitation the Library had to be shifted from place to place and when the Social Improvement Society ceased to exist and the Institute had been established it got its location in the Institute Hall. During the terrible earthquake of 1897, when the Hall had to undergo thorough repairs, the Public Library was, as a private arrangement, removed to the local Municipal Office. It has since been amalgamated finally with the Library of the Institute. The Committee regret to say that the Public Library reached their hands shorn of

almost all the valuable books it possessed, while the rest are mostly in a dilapidated condition; some books have since been bound, while a large number still want repairs.

দেশে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করার কার্য্য শশিপদ বাবুর একটি জীবনব্যাপী সাধনা। শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লাইব্রেরী করার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া তাঁহাদের একতার উপর এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং এই লাইব্রেরীর স্থায়ীত্ব ও উন্নতি সাধন বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুরাগী করিতে হইবে ইহাই হইল তাঁহার পদ্ধতি। নতুবা দু একজন দানশীল বড়লোককে ধরিয়া একখানা বাড়ী করিয়া কতকগুলি পুস্তক কিনিয়া স্তূপ করিলে কি হইবে?

আর একটি লাইব্রেরীর কথা বলিতেছি—এই লাইব্রেরীটির নাম এখন অনেকেই জানেন—ইহা বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী। দক্ষিণ বরাহনগরে ইহা প্রতিষ্ঠিত। পুর্ব্বে যে লাইব্ররীর কথা হইল তাহা উত্তর বরাহনগরের। উত্তর ও দক্ষিণ বরাহনগর নামে একই বরাহ নগরের দুইটি অংশ হইলেও কার্য্যতঃ দুইখানি স্বতন্ত্র গ্রামের মত। শশিপদ বাবুর বাস উত্তর বরাহনগরে এবং উত্তর বরাহনগরই তাঁহার প্রথম কার্য্যক্ষেত্র।

ইংরাজী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। বিলাত গিয়া তিনি জাতীয় ভাব হারান নাই—আর তাঁহার প্রথম জীবনের যে ইতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে জাতীয় ভাব হারানো তাঁহার মত লোকের পক্ষে সম্ভবও নহে। যাহা হউক বিলাত হইতে তাঁহার উৎসাহ ও কার্য্যকরী শক্তি যেন বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আসিল। তিনি ফিরিয়া আসিয়াই বর্দ্ধিত অনুরাগে নব নব সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন—তাহার মধ্যে একটি কার্য্য—

প্রদর্শনী (Exhibition)

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে দক্ষিণ বরাহনগর নিবাসী স্বর্গীয় মাধব চন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাটিতে তিনি এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। এই বাড়ীতে তখন একটি শাখা বালিকা বিদ্যালয় ছিল। প্রদর্শনীতে বিলাত হইতে আনীত নানারূপ জিনিস প্রদর্শিত হইয়াছিল। বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউটে শশিপদ বাবু যে মিউজিয়ম দিয়াছেন, সেই মিউজিয়মের জিনিসগুলি এই প্রদর্শনীতে সাজান হইয়াছিল। বিলাতে শিল্প ও বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য যে সমস্ত চিত্র ব্যবহৃত হয় সেই সব চিত্র, নানাপ্রকার কৌতূহলোদ্দীপক প্রস্তর (Geological and conological specimens and fossils), রাজা রামমোহন রায়ের উপবীত কেশ ও হস্তলিপি (এই তিনটী জিনিস শশিপদ বাবু রামমোহন লাইব্রেরীকে দান করিয়াছেন) রাজা রামমোহনের মৃতদেহ সর্ব্ব প্রথমে যেস্থানে সমাহিত হইয়াছিল কুমারী মেরি কার্পেণ্টার কর্ত্তৃক অঙ্কিত সেইস্থানের (Stapleton Grove) চিত্র (এই চিত্র খানি শশিপদ বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান করিয়াছেন।) এই সমস্ত জিনিস সাজাইয়া তিনি প্রদর্শনী করেন এবং প্রদর্শনী দেখিবার জন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। যাঁহারা এই প্রদর্শনী দেখিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই এখনও জীবিত, তাঁহারা এই প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ইহার পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর তারিখে দক্ষিণ বরাহ নগরে ষ্টুডেণ্টস্ ক্লাব নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু দক্ষিণ বরাহনগরের যুবকগণকে উৎসাহিত করিয়া দেশ হিতকর সৎকার্য্য সমূহে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। কালীকৃষ্ণ দত্ত, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়,

উপেন্দ্র নাথ দত্ত, হরি নারায়ণ দাঁ, প্রভাত চন্দ্র দত্ত, গোপাল চন্দ্র দে, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দক্ষিণ বরাহনগরবাসী যুবকগণ এই আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে স্বদেশ সেবায় আত্ম নিয়োগ করিলেন। তাঁহারা সভাসমিতি করিয়া দেশের মধ্যে উদারভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। বরাহনগরে তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শশিপদ বাবু এই ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্বোক্ত যুবকগণ এই ব্রাহ্ম সমাজেও যোগদান করিলেন।

মানবের জীবনে দুইটি ভাবের প্রকাশ আমরা দেখিতেছি—একটী জড় জীবন—আর একটী আধ্যাত্মিক জীবন। দৈব ও আসুর এই দুইটি ভাব। এই দুইটির মধ্যে দৈব ভাবই প্রধান। Life of the spirit সেইটিই মূল জীবন, Life of matter or of the sen es সেটি তাহার সেবক মাত্র। এই আত্মাকে স্বীকার করা বা মানুষ আধ্যাত্মিক এইটুকু বোঝা একটা অন্ধ বিশ্বাস নহে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য। এইটি অনুভব করিতে হইবে। এই আদর্শ দেশে প্রচার করিতে হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই শশিপদ বাবুর ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। সচ্চরিত্র ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া পরহিতার্থে জীবন যাপন করিব, ইহাই ঈশ্বরের বা আত্মার অনুভূতির ফল। এই ভাবে জীবনের প্রত্যেক চিন্তায় প্রত্যেক চেষ্টায় তাঁহার সেবা করিব, সেবাই জীবন। ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার একটি দিনের একটি চিন্তা লিপিবদ্ধ আকারে আমরা পাইয়াছি তাহা হইতে তাঁহার আদর্শ বুঝিতে পারা যাইবে ঃ—

"Aspirations of the soul are now growing higher and higher and want some stronger and nobler environments but the body is daily becoming weaker and weaker and is unfit for present purposes. I want more work, more soaring high,

but my body fails. This is my present struggle and I am prayerfully waiting for the re-birth".

আত্মার আকাঙ্খা প্রতিনিয়ত উচ্চতর হইতে উচ্চতর হইয়া পড়িতেছে। আরও মহত্তর ও সবলতর পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন কিন্তু শরীর প্রত্যহ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর এবং বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সাধনের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। আমি আরও সেবা করিতে চাই আরও উচ্চে উড়িতে চাই, কিন্তু শরীর তাহা পারিতেছে না। ইহাই আমার বর্ত্তমানের সমস্যা—আমি এখন প্রার্থনার সহিত নবজন্মের প্রতীক্ষা করিতেছি।

শশিপদ বাবুর ব্রাহ্মধর্ম্ম খুব সংক্ষিপ্ত—ইহার গোড়ার কথা এই যে আধ্যাত্মিক জীবন একটা আনুমানিক বা কাল্পনিক ব্যাপার নহে—প্রত্যক্ষ সত্য। এই আধ্যাত্মিক জীবনকে মুখ্য রূপে গ্রহণ করিয়া আমাদের ভৌতিক, ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক জীবনকে তদ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। আদর্শ ও কর্ম্মপ্রণালী ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু যাঁহার জীবনে এই ভাবটি ফুটিয়াছে, শশিপদ বাবুর মতে তিনি ব্রাহ্ম। সত্যের আলোক সকলের কাছে একরূপ নহে—কিন্তু সকলেই সত্যের আলোক সরল ভাবে অনুসরণ করুন—সেবাব্রত গ্রহণ করুন, ইহাই শশিপদ বাবুর ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম।

দক্ষিণ বরাহনগরের এই 'ষ্টুডেণ্টস ক্লাব' শশিপদ বাবুর নেতৃত্বাধীনে নানারূপ সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। নৈশ-বিদ্যালয়, রবিবাসরীয়-বিদ্যালয় স্থাপন করা, নৈতিক সুশিক্ষা বিস্তার করা প্রভৃতি কার্য্যে ছাত্রগণ বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত আত্মনিয়োগ করিলেন।

ক্রমশঃ ইংরাজী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আত্মোন্নতি বিধায়িণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা এ সম্বন্ধে বরাহনগর পিপ্‌লস্ লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত নিম্নরূপ বিবরণ

পাইয়াছি। "১৮৭৬ সালে দক্ষিণ বরাহনগরে দুইটি দলের দ্বারা দুইটী লাইব্রেরী স্থাপিত হয়, একটির নাম হয় বরাহনগর আত্মোন্নতি বিধায়িণী সভা লাইব্রেরী। আর একটির নাম দক্ষিণ বরাহনগর লাইব্রেরী। ইহার প্রধান উদ্যোগীগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া এখন আর কেহই জীবিত নাই। মুন্সী বাবুদের পুরাতন বাটীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মঠে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ও বহুদিন থাকে। রবিবাসরীয়-নীতিবিদ্যালয়ও ইহার একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল। ভগবান রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন, ভক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ (তখন দত্ত মহারাজ) শ্রীযুক্ত সেবাব্রত মহাশয় সমাগত ছাত্রবৃন্দকে নীতি উপদেশ প্রদান করিতেন। প্রতি রবিবারেই প্রায় এই রকম তিনটি করিয়া ক্লাস হইত। আবৃত্তি, প্রার্থনা, কীর্ত্তন ও ভোগ ইত্যাদি হইত। পরমহংস দেবের "ফাগুর দোকানের" কচুরি ভোগ আমরা প্রসাদ পাইয়াছি। খোল করতাল সংযোগে কীর্ত্তনে, আমরা পরমহংস দেবের সহিত নাচিয়া গাইয়াছি ও কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার সমাধি অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই নীতি বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসরই মহা সমারোহের সহিত পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইত—গঙ্গাতীরস্থ প্রেমলাল মল্লিকের কুঠির দ্বিতল প্রকোষ্ঠে এই উৎসব সম্পন্ন হইত। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে মেডাল, পুস্তক ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে বিতরিত হইত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র ইত্যাদিকে উক্ত সভায় সভাপতি হইতে দেখিয়াছি।" এই সভার পরবর্ত্তী সময়ে শশিপদ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত আলবিয়ন রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় (এক্ষণে আই, সি, এস্) মহাশয়ও এই সভার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন, সঙ্গীত করিতেন ও ম্যাজিকলণ্ঠণ প্রদর্শন করাইয়া নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন ”

পূর্ব্বে মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা বলা হইল। তিনি লোক সমাজে বিশেষরূপে সুপরিচিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা বড় বাজারের স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের দক্ষিণেশ্বরের বাগানে পরমহংস দেব যাতায়াত করিতেন। তিনি সে সময়ে সরল ভক্তির উচ্ছ্বাসে করতালি দিয়া উন্মত্ত ভাবে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেন। শম্ভুনাথ মল্লিক মহাশয় একজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। যতদূর অনুসন্ধানের দ্বারা আমরা জানিয়াছি তাহাতে মনে হয় পরমহংসদেবের প্রথম পরিচয় এই শম্ভুনাথ মল্লিক মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হন। একবার খ্যাতি হইয়া গেলে শরণাপন্ন হইবার জন্য মহাপুরুষের নিকট অনেকেই আসিয়া থাকেন। কিন্তু পরমহংসদেব যে সময়ে, অন্তরে যে প্রেমের অমৃত বন্যা বহিতেছে, তাহার প্রভাবে বাহিরে পাগলের মত হাসিয়া নাচিয়া ও করতালি দিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন, সে সময়ে তাঁহাকে চেনা 'জহুরি ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। এই শম্ভুনাথ মল্লিক মহাশয় অতীব উদার প্রকৃতিসম্পন্ন ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত উত্তর বরাহ নগরের যে লাইব্রেরীর কথা বলা হইয়াছে তাহাতে নিয়ম করা হয় যে যিনি এককালীন পঞ্চাশ টাকা অথবা একশত পুস্তক লাইব্রেরীতে প্রদান করিবেন তিনি আজীবন সভ্য হইবেন। এইরূপ নিয়ম হইলে পর লোকে উপহাস করিয়াছিল, বলিয়াছিল এত টাকা দিয়া আর কে আজীবন সভ্য হইবে। এই শম্ভুনাথ মল্লিক মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম এই লাইব্রেরীর আজীবন সভ্য হইয়াছিলেন। শম্ভুনাথ মল্লিক মহাশয় খুব বদান্য লোক ছিলেন। একবার ব্যবসায়ে তাঁহার অনেক ক্ষতি হইল এবং তিনি দেউলিয়া হইতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে তিনি মহাজনদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে আমি আবার নূতন করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতেছি—এই ব্যবসায়ে আবার যদি উঠিতে

পারি তাহা হইলে আপনাদিগের ঋণ সর্ব্বাগ্রে পরিশোধ করিব। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার আবার ব্যবসায়ে বেশ উন্নতি হইল এবং তিনি মহাজন গণের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর সহিত শম্ভুনাথ মল্লিক মহাশয়ের অনেক কথা বার্ত্তা হইত ও উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুতা ছিল। শম্ভুনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার অর্থের দ্বারা অবৈতনিক বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল প্রভৃতি করিবেন এ বিষয়ে শশিপদ বাবুর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইত কিন্তু তাঁহার এই সাধুসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বাক্‌রোধ হয়, তিনি উইলও করিয়া যাইতে পারেন নাই।

শম্ভুনাথ মল্লিক মহাশয়ের গৃহেই শশিপদ বাবুর সহিত পরমহংসদেবের প্রথম পরিচয়। তাহার পর পরমহংসদেব শশিপদ বাবুর নিকট প্রায়ই আসিতেন। শ্রমজীবি আন্দোলনের সময় শশিপদ বাবুর গৃহে যে সব সভাসমিতি হইত তাহাতে তিনি আসিতেন। সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া নৃত্য করিতেন ও সমাধিস্থ হইতেন। এই প্রকারের সমাধি শশিপদ বাবুর গৃহে তাঁহার বহুবার হইয়াছে।

প্রথম যখন আত্মোন্নতি বিধায়িনী-সভা হয় সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি এই আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার একজন কর্ম্মী ছিলেন। শশিপদ বাবুর জীবনব্যাপী সেবাকার্য্যের সহিত স্বামীজির সহানুভূতি ছিল। তিনি আমেরিকায় ব্রুকলিনে যখন হিন্দু বিধবাগণের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন সেই সময়ে এই বক্তৃতায় তিনি কিছু টাকা পান—এই টাকার এক অংশ তিনি অযাচিতভাবে বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমে প্রদান করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজি তাঁহার সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে বরাহনগর ইনষ্টিটিউট দেখিতে যান। এই ভবনে শশিপদ বাবু যে সকল কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু রাখিয়াছিলেন তাহা

তিনি বিশেষভাবে দর্শন করেন বিশেষতঃ একখানি সচিত্র প্রকাণ্ড বাইবেল যাহা শশিপদ বাবুকে বিলাতের ইউইনস মিড ডোমেষ্টিক মিশন হইতে একঅভিনন্দন পত্রের সহিত উপহার দেওয়া হইয়াছিল, সেই বাইবেল্‌খানি বিশেষভাবে দর্শন করেন।

শশিপদ বাবুর আদেশে ও প্রবর্ত্তনায় যে সমস্ত যুবক এই আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভায় সমবেত হয়েন তাঁহারা অনেকেই উত্তর জীবনে সাধ্যমত দেশের সেবা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তিনি চাকুরী উপলক্ষে এলাহাবাদ গেলেন, সেখানে গিয়া তিনি খুব উৎসাহের সহিত নানাপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বালিকাবিদ্যালয়, লাইব্রেরী, নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি কার্য্য করেন এক্ষণে তিনি দক্ষিণ বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক। স্বর্গীয় রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার অনেক কার্য্য করিয়াছেন। তিনি উত্তর বরাহনগরস্থ ইনষ্টিটিউট হল, ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রমজীবিগণের কার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছেন। তিনি লিখিতে, পড়িতে, গাহিতে, বাজাইতে, সকল বিষয়েই একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন তাঁহার রচিত কয়টী ব্রহ্ম সঙ্গীত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে তিনি এক সময়ে বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

যে সমস্ত যুবকেরা নবীন উদ্যমে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর নেতৃত্বাধীনে মিলিত হইয়া এই আত্মোন্নতি-বিধায়িনী সভা গঠন করিয়াছিলেন সময়ে তাঁহারা পৃথক হইয়া পড়িলেন। কর্ম্মস্রোতে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেলেন। কালীকৃষ্ণ ভবনাথ প্রভৃতি কয়েকটি উৎসাহী যুবক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কালিকৃষ্ণ ও ভবনাথ সাহিত্যসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কালিকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত "চারু

নীতি পাঠ” ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “নীতিকুসুম” ও “আদর্শ নরনারী” গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়।

মুন্সি বাবুদের পুরাতন বাটির যে অংশে আত্মোন্নতি-বিধায়িনী সভার লাইব্রেরী স্থাপিত ছিল সেই অংশ নষ্ট হইলে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কুটিঘাটস্থিত আস্তাবল বাটির উপরের একটি ঘরে উহা স্থান পাইয়াছে। সেই সময়ে ঐ স্থানে ও একটি লাইব্রেরী ছিল তাহার নাম দক্ষিণ বরাহনগর লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরী দুইটির সম্মিলনে যে লাইব্রেরী হইল সেই লাইব্রেরী এখন “পিপ্‌লস লাইব্রেরী” নামে পরিচিত।

বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও লাইব্রেরী এবং দক্ষিণ বরাহনগরের পিপ্‌লস্ লাইব্রেরী এই দুইটির ইতিহাস বর্ণিত হইল। শশিপদ বাবুর দীর্ঘকাল ব্যাপী নীরব সাধনা এই দুইটি অনুষ্ঠানের পশ্চাতে কিরূপ-ভাবে কার্য্য করিয়াছে তাহাও দেখা গেল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার চতুঃসপ্ততিবর্ষীয় জন্মদিন উপলক্ষে বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট্ লাইব্রেরীতে পঞ্চাশ টাকা ও পিপ্‌লস লাইব্রেরীতে পঞ্চাশ টাকা প্রদান করেন। এই অর্থ বাঙ্গালা সৎগ্রন্থ ক্রয় করিবার জন্য প্রদত্ত হয়।

এই যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কার্য্য ইহা জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে একটি অতি আবশ্যকীয় কার্য্য এবং শশিপদ বাবু এই কার্য্যে চিরজীবনই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়—শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু এই নামে “সাধারণ” এই কথাটি প্রদান করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ‘সাধারণ ধর্ম্মসভা’ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ সেই ধর্ম্মসভার আদর্শ মনে করিয়াই তিনি সাধারণ এই শব্দটি যোগ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরী হওয়ার

পীযু শশিপদ বাবু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য এক সহস্র মুদ্রা অযাচিত ভাবে প্রদান করিলেন। এই দান সম্বন্ধে তৎকালীন Brahmo Public Opinion পত্রে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

We are glad to learn that our friend Babu Sasi Pada Banerji has subscribed Rs 1000. to the Sadharan Brahmo Samaj Library to be paid in ten annual instalments of Rs 100. The first annual instalment, we hear, has already been remitted to the Secretary of the Library. A good religious library and a reading room in connection with it, are the best means of promoting theological studies amongst our members. The special request attached to the donation is that the sum is to be devoted in purchasing books illustrative of good and useful works including the biographies of all earnest workers both men and women. The request is quite in accordance with the spirit of the life and character of our friend. He has been long known as an indefategable worker in the cause of various reforms. May his noble example be followed by many others, whom God has blessed with means and opportunities of doing good."

পূর্ব্বোক্ত অংশের মর্ম্ম এই :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরীতে শশিপদ বাবু এক হাজার টাকা দিয়াছেন। বৎসরে একশত টাকা

করিয়া দশ বৎসরে এই টাকা প্রদত্ত হইবে। প্রথমবারের একশত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। একটি ভাল ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকের লাইব্রেরী ও পাঠাগার ধর্ম্মালোচনার জন্য প্রয়োজন। এই দানের সঙ্গে এক অনুরোধ আছে যে সৎ ও হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়ক পুস্তক যে সমস্ত স্ত্রীলোক ও পুরুষ মানবজাতির হিতের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী এই সমস্ত পুস্তক এই টাকায় ক্রয় করা হইবে।

শশিপদ বাবুর এই অযাচিত দানের বিশেষ ফল হইল। পরবর্ত্তী সংখ্যা কাগজে আমরা দেখিতে পাই ১৬ই ডিসেম্বর এর কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। "Our friend Babu Sasi Pada Banerji has indeed set a very good example Two more members of the Sadharan Brahmo Samaj have come forward with contributions to the Library of the S B. Samaj". অর্থাৎ পূর্ব্ববারে শশিপদ বাবুর এই উদাহরণ অন্যে অনুসরণ করুন এই যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা সফল হইল। পরবর্ত্তী বারে লেখা হইল যে আরও দুইজন সভ্য শশিপদ বাবুর অনুবর্ত্তনে লাইব্রেরীতে টাকা দিয়াছেন। এস্থানে তাহার প্রতিষ্ঠিত আর একটী ছোট লাইব্রেরীর কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি ১৮৯৯ সালে তাঁহার কলিকাতাস্থ নিজ বাস ভবনে পল্লীস্থ বালক বালিকাদের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য বালসমাজ নামীয় একটী সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গেও একটী ছোট লাইব্রেরী করিয়াছিলেন। পরে ১৯০৮ সালে যখন কলিকাতা মহানগরীতে দেবালয় সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় তৎসঙ্গেও ধর্ম্ম পুস্তক সংগ্রহ করিয়া একটী লাইব্রেরী স্থাপন করেন। পরিশেষে ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা হইতে আমেরিকান নিউথট-এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট মিসেস

মার্গারেট লাগ্রেঞ্জ ও মিসেস ইডাবালা হার্শ এবং মিসেস কেথারিন অলটহাউস কলিকাতা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শশিপদ বাবু তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া কলিকাতায় তাঁহাদের সমিতির একটী শাখা প্রতিষ্ঠা করান ও তৎসঙ্গে একটী লাইব্রেরী ও রিডিং রুম স্থাপন করিতে উৎসাহিত করেন ও পরামর্শ দেন। তদনুসারে কলিকাতায় দেবালয় ভবনে একটী রিডিং রুম ও লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। দেবালয় সমিতির দ্বিচত্বারিংশ বার্ষিক রিপোর্টে এই অনুষ্ঠানের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে :—

Last December we were also fortunate to get unasked for sympathy from three American ladies—Rev Mrs. La Grange, Mrs. Hirsh and Mrs. Althouse, who were much interested in the work of the Devalaya and who in order to establish some permenant relationship between the Devalaya and the American National New Thought Association which they represent, and of which Mrs. La Grange is the President and Mrs. Hirsh, the secretary, have established a Library and a Reading Room at the Devalaya as their Calcutta Branch. Mrs. La Grange was kind enough also to give an address at the Devalaya Rooms and has by her earnest appeal infused sufficient earnestness in the minds of some of our young men which we hope will be of some lasting practical good. Mrs. Hirsh further expressed her personal appreciation of

our work by making a donation of Rs. 25, to the funds of the Devalaya. Our best thanks are due to these three ladies, for their angelic visits to the Devalaya and for their kind interest in and sympathy with the work of the Institution.

ইংরাজী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর শশিপদ বাবু যে সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করা হইল। এই সময়ে তাঁহার কৃত কর্ম্মের মধ্যে একটি কর্ম্ম বিশেষ রূপে উল্লেখ যোগ্য। এই কার্য্যটির নাম নর্থ সুবারবন এসোসিয়েসন (North Suburban Association) প্রতিষ্ঠা। বরাহনগর ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বিদ্যোন্নতি, দুঃখী ব্যক্তিকে সাহায্য করা প্রভৃতি এই সভার উদ্দেশ্য। এই সকল উদ্দেশ্য উত্তমরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উক্ত সভা তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। শিক্ষা বিভাগ, দাতব্য বিভাগ ও সাধারণ বিভাগ। শিক্ষা বিভাগের কার্য্য ছিল নূতন বিদ্যালয় স্থাপন, রিডিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও সাময়িক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা। স্ত্রী বিদ্যালয় ও অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থাও এই বিভাগের কার্য্য ছিল। এজন্য বৃত্তি ও পারিতোষিক দেওয়া হইত। নৈশ বিদ্যালয় ও ছিল।

দাতব্য বিভাগ হইতে শ্রম করিতে সক্ষম ব্যক্তিকে কাজ জুটাইয়া দেওয়া, খাদ্য বস্ত্রও প্রয়োজন হইলে ঋণ দিয়া সাহায্য করা, অসহায় রোগীদের জন্য ঔষধ পথ্য চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইত; প্রয়োজন মত যাহাদের হাঁসপাতালে যাওয়া দরকার তাহাদের জন্য হাঁসপাতালে স্থান সংগ্রহ করা, মৃতদেহ দাহ করা বা সমাধি দেওয়ার সাহায্য করা, বিধবা বা অনাথ বালক বালিকাদের সাহায্য করা।

A SAINT OF MODERN INDIA

সাধারণ বিভাগ হইতে স্থানীয় অভাব অভিযোগাদির অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূরীকরণের উপায় করা হইত। এই সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির মধ্যে নড়াল, টাকি, সাতক্ষীরা প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বর্গীয় কিশোরী চাঁদ মিত্র ও তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত নীলমনি দে মহাশয় ইহার মধ্যে ছিলেন। এই সভার কার্য্য চার বৎসর কাল চলিয়াছিল এবং এই সভার দ্বারা অনেক হিতকর কার্য্য হইয়াছিল; বিশেষ করিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কার্য্য উল্লেখ যোগ্য। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবু ডাক বিভাগের কর্ম্ম লইয়া স্থানান্তরে গমন করেন ফলে এই সভার কার্য্য স্থগিত হয়।

এই সভা ও তাহার কার্য্য সম্বন্ধে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস্ পত্রে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—

BARANAGORE ASSOCIATION—The Anniversary of the North Suburban Association of Baranagore was held at 4 p. m. on Tuesday, the 3rd instant, in the house of Babu Nim Chand Moitra at Bon Hoogli. Babu Sasipada Banerji in the chair. This Association aims to be a really working Institution and intends to look after the education of all classes of the Community, to help in extending the knowledge of arts and Sciences and generally see to the welfare of the people. It was established by a few friends on the 12th May, 1872, and during its existence of one and a half years it

has quietly done its work in the three Sections (education, charity and general) into which it has been divided. Two girl's Schools, two night Schools, one working men's and a Reading Club, have been working in connection with this Society. The Committee of the female education section Mr. and Mrs. Justice Phear. Mrs. Murray, Dr. Waldie and Babus Prasanna Kumar Banerjea and Sasipada Banerjea applied to Government for increased aid in order to be able to place these two Schools in charge of an English Mistress, and they are very happy to know that the District School Committee of 24 Oarganas have recommended Rs. 90. a month for the sanction of Government. The Girl's School was visited during the year by the Hon'ble Miss Bearing, (Daughter of the then Governor General Lord North of brook) Kumar Girish Chandra Singha. Miss Akroyad, Babu Rad hica Prasanna Mukherjea and other ladies and Gentlemen. Mrs, Phear distributed the Prizes in the last Annual examination. The executive council of the North Suburban Association feel very thankful to the ladies and Gentlemen who have helped the council in carrying out their female education work during the last year.

The attention of the Executive Council was directed in a large measure and with great success, for the social and moral elevation of the working classes during the year-

The public papers have already taken notice of the working of this section, so no separate account is needed here.

For want of Funds the operation of the Charity section have not been so extensive as desirable ; knowing that dependence on public charity takes away all desire for work, the Executive Council have been sparing in giving away their charities, and only to those who are the real objects of charity. The rule for giving small loans to persons in want in two cases taken advantage of in both instances, the receipients repaid to the Committee the amount of the loan. Monthly assistance has been given for maintenance to families, and schooling and books to three boys, besides casual aids has been rendered to some poor widows for their thatches. A few sick people who have none to take care of them were at the cost of the Society sent to Hospital for treament, and assistance was given in two cases for burning and burying dead bodies. The principal work for the general

section has been to bring the local grievances before the district authorities for redress. The council feel themselves very thankful to Mr. F. B. Peacock, Collector and Magistrate of 24. Perganas, for sending them, for their opinions, questions framed by Government bearing on the social position of the Mohamedans. The Executive Touncil have great pleasure to send a long report on the subject. An exhibition of pictures, stones, fossils and curiosities was held in connection with this section which drew a great number of visitors, and which was made very entertaining and instructive by simple explanatory remarks on the things exhibited."

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে শিক্ষা বিস্তারই আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় কার্য্য। অন্যান্য কার্য্য এই শিক্ষা বিস্তারের উপরেই নির্ভর করিতেছে। এই শিক্ষা বিস্তার বলিতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের বা ছাত্রীর সংখ্যা বুঝিতে হইবে না। আমাদের কি চাই, জীবন সফল করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন কি প্রকারে করা যায় সে সম্বন্ধে একটা জ্ঞান দরকার এবং সেই জ্ঞানানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্তি, ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সকল বিষয়েই শিক্ষা লাভ করা দরকার, এই শিক্ষাদান কার্য্যেই শশিপদ বাবু আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের এই লক্ষ্যটুকুর প্রতি চাহিলেই আমরা তাঁহার সমস্ত কার্য্য বুঝিতে পারি।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে

ভাবের প্রেরণায় চালিত হইয়া ও যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই লাইব্রেরী ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন তাহার কথা বলা হইল। এখন এই দেশে এই ভাব বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, দেশে জ্ঞান স্পৃহা ও আসিয়াছে, আর যুবকগণ লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপনের জন্য নানা স্থানে উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা একটি অতি সুলক্ষণ। এই আকাঙ্খার সহিত দেশের প্রকৃত মঙ্গল কিরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত তাহা যাঁহারা একটু ভাবিয়া না দেখেন তাহারা এই চেষ্টার মর্ম্ম অনেক সময়ে ঠিক বুঝিতে পারেন না। এই চেষ্টা সফল হউক! গ্রামে গ্রামে সুসজ্জিত পুস্তকালয় ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হউক। দেশের ও বিদেশের উচ্চতম চিন্তার স্রোত পল্লীর সরল জীবনের মধ্যে এক নব উর্ব্বরতা সঞ্চারিত করুক। ইহা এখন প্রয়োজন। একতার প্রয়োজন আমরা জানি, কিন্তু সমবেতভাবে সর্ব্বজন হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে এই একতা সম্ভব নহে। সদ্‌গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সকলের মধ্যে সেই গ্রন্থের যাহা শিক্ষা, তাহা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার মধ্যে আমাদের সকলের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শক্তিকে যদি আমরা মিলিত করিতে পারি, তাহা হইলে তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই সমস্ত পুস্তক-পাঠাগার যাঁহারা পরিচালনা করিবেন তাঁহাদের আবার একটু নির্ব্বাচন শক্তি প্রয়োজন।

বরাহনগরে যে লাইব্রেরী শশিপদ বাবু দীর্ঘকালের সাধনার ফলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই লাইব্রেরীর কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। বরাহনগর বাসী প্রত্যেক ভদ্রলোকের পক্ষে এই লাইব্রেরী একটি অতীব পবিত্র বস্তু। তাঁহাদের পিতা পিতামহের বক্ষের রক্ত এই পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইয়াছে। একদিন প্রত্যেক পরিবার আনন্দের সহিত এক উদার কল্পনার প্রেরণায় এই লাইব্রেরীতে নিজেদের সমস্ত পুস্তক দান করিয়াছেন। এই লাইব্রেরী বরাহনগর

নিবাসী প্রত্যেক লোকেরই তুল্যরূপে নিজস্ব। এই লাইব্রেরী স্থায়ী হউক, ইহার দ্বারা বরাহনগর উন্নত হউক, এ চেষ্টা তাঁহাদের সকলেরই থাকা দরকার। এখন এই লাইব্রেরীর কোন সম্পত্তিও নাই, মজুত টাকাও বিশেষ কিছু নাই। এরূপ অবস্থায় লাইব্রেরী স্থায়ী হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। কেবলমাত্র শশিপদ বাবু পুস্তক ক্রয়ের জন্য তাঁহার সাধ্যমত একটি সামান্য স্থায়ী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু এই ধনভাণ্ডার অতি সামান্য তদ্দ্বারা লাইব্রেরী চলে না। অন্যান্য সকলেও যদি শশিপদ বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কিছু কিছু এথ স্থায়ী ধনভাণ্ডারে প্রদান করেন, তাহা হইলে অনেক কাজ হয়। মিউনিসিপালিটির নিয়ম আছে লাইব্রেরীকে সাহায্য করা। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি অনেক লাইব্রেরীকে সাহায্য করেন—সরকার বাহাদুরও লাইব্রেরীকে সাহায্য করেন। বরাহনগর লাইব্রেরী এই উভয় সাহায্যই যাহাতে পায় সে জন্য চেষ্টা হওয়া দরকার।

স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় বরাহনগরের তৎকালীন শশিপদ বাবু কর্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত "হিন্দু-পেট্রিয়ট" পত্রিকায় বলিয়াছিলেন বরাহনগরের আদর্শ দেশের সমুদয় গ্রাম কর্ত্তৃক অনুসৃত হইলে দেশের প্রচুর কল্যাণ হইবে। আমরাও প্রার্থনা করি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা "পূর্ণ হউক! পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক !!! হে ভগবন্।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বাল্যভাব ও শিক্ষকতা।

মানুষ কলের পুতুল নয়, অন্ধভাবে কেবল নিয়মের দাসত্ব করিতে মানুষের জন্ম হয় নাই। নিয়মকে অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে, যেথচ্ছাচারের পথ মানুষের জন্য নহে—কিন্তু এই নিয়মের অনুবর্ত্তনেই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা, যথার্থ আনন্দ। বাহিরের জগতে বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, ক্রমশঃ বড়গাছে পরিণত হইতেছে, সে নিয়মের মধ্য দিয়াই পরিণতির মুখে ছুটিয়াছে—সে নিয়মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে বটে কিন্তু এই নিয়ম মানিয়া চলা তাহার পক্ষে একটা নিরানন্দকর ও ক্লান্তিজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। সে নিয়ম অনুসারে বিকাশ ও বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, মাটি হইতে রস লইতেছে, পাতা দিয়া বায়ুমণ্ডলের বায়ু ও সূর্য্যের আলো লইতেছে—সমস্তই হইতেছে—কিন্তু একটা নিত্য আনন্দ ও তৃপ্তি সকল সময়েই যেন তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

এই তত্ত্বের উপরেই কিণ্ডারগার্টেন নামক নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত; মানুষ একটা বড় পবিত্র জিনিস, তাহার স্বাধীনতা আছে—এবং সেই স্বাধীনতা তাহাকে উপভোগ করিতে পরিপূর্ণ অধিকার দিতে হইবে—অথচ সে সমাজে, গৃহস্থালীতে, বিশ্বমানবের মধ্যে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বেশ আনন্দের সহিত নিয়ম মানিয়া চলিবে। এইভাবে ও এই আদর্শের অনুবর্ত্তনে ছেলে মেয়েদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াও তাহাদিগকে যে মানুষ করিয়া তোলা তাহাই কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার পদ্ধতি।

পূর্ব্বে ছেলেদের জোর করিয়া কতকগুলি নিয়ম শেখান হইত,

কতকগুলি বিষয় মুখস্থ করান হইত, বিদ্যালয়ের মধ্যে ছেলে মেয়েদের আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত, তাহারা যেন কলের পুতুল যেদিকে চালান যাইবে সেই দিকেই চলিবে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি এই প্রাচীন পদ্ধতির প্রতিবাদ।

এই যে নূতন শিক্ষাপদ্ধতি ইহা যদি ঠিক ভাবে, উপযুক্ত শিক্ষকের সহায়তায় চালাইতে পারা যায় তাহা হইলে ইহার দ্বারা আমাদের দেশের ও সমাজের যে কত উপকার হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের মনে হয় যে আমরা আমাদের দেশের ভাল করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত যে সব চেষ্টা করিয়াছি—এই নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এই চেষ্টা যদি সফল হয় তাহা হইলে আমাদের অন্যান্য সমস্ত চেষ্টাও সফল হইবে। এই জন্য যাঁহারা এই পদ্ধতি চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং তাঁহাদের সাহায্য করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

আজ যাহারা পথে খেলা করিতেছে—ভবিষ্যতের সমাজ তাহাদেরই ইঙ্গিতে চলিবে; আমরা তখন কোথায় চলিয়া যাইব!

আমরা কতদিকে দেশের ভাল করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছি! দেশের হিতের প্রতি আমাদের মনোযোগ পড়িয়াছে, সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই আমাদের দেশে বরাহনগরে সর্ব্বপ্রথমে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে—কলিকাতার 'ফ্রোএবেল্ সোসাইটি' নামক এক সমিতি গঠন কল্পে যে প্রকাণ্ড সভা হয় তাহার কার্য্যবিবরণীতে এই কথা বিশেষভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন—তখন সেখানে এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, এখনকার

মত এতটা ব্যাপকতা লাভ করে নাই। তিনি অতি মনোযোগের সহিত বিলাতে নবপ্রবর্ত্তিত এই শিক্ষাপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করেন—এবং তিনি বুঝিতে পারেন যে দেশের যে সমস্ত উন্নতি সাধন করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা সুচারুরূপে সাধন করিতে হইলে বাঙ্গালাদেশের ও ভারতবর্ষের ছেলে মেয়েদেরও ঠিক এই ভাবে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া দরকার।

তাহার পূর্ব্বে তিনি স্বদেশে অনেক হিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন, দেশের অবস্থা তিনি সমস্তই জানিতেন। তিনি বেশ বুঝিলেন যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও বেশ পরিষ্কাররূপে এই নূতন পদ্ধতির উপযোগীতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, কাজেই দেশে ফিরিয়া যদি এই কার্য্য আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে দেশবাসি গণের নিকট সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার ভরসা বড়ই কম। এই ভাবিয়া তিনি বিলাতেই অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিছু টাকা সংগৃহীত হইল—তিনি সেই টাকা ব্রিষ্টল ব্যাঙ্কে রাখিয়া দেশে ফিরিলেন।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি নিজ গ্রাম বরাহনগরে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে পরিচালিত এক শিশুপাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের কথা। বাঙ্গালাদেশে এই প্রথম কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল।

এই 'কিণ্ডারগার্টেন' শিক্ষাপদ্ধতির সহিত শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর জীবনের ইতিহাস ও সাধনার একটি অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শশিপদ বাবুর জীবনে এমন একটা জিনিস আছে, যাহা ব্যতিরেকে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি মোটেই সফলতা লাভ করিতে পারে না। কথাটা একটু ভাল করিয়াই আলোচনা করা যাউক। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি সফল করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে উপযুক্ত

শিক্ষক প্রয়োজন। শিক্ষকের চরিত্রে এমন একটা বাল্যভাব ও প্রেম থাকা চাই যে তাহার সাহায্যে শিক্ষক বালকের সহিত বালক হইতে পারেন। এইরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন শিক্ষক প্রস্তুত করিতে না পারিলে যতই যন্ত্র ও গ্রন্থ সংগ্রহ করা যাউক না কেন, যতই অর্থব্যয় করা যাউক না কেন, এই পদ্ধতি কিছুতেই সফলতা লাভ করিবে না।

শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর জীবনের এই দিকটার কতকগুলি কথা সকলের নিকট বর্ণনা করা খুবই দরকার। যাঁহারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষকের কাজ করেন তাঁহারা ত ইহা হইতে অনেক শিখিতে পারিবেনই, আমার মনে হয় পিতামাতারাও অনেক বিষয় শিখিতে পারিবেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়াই ভগবান যেন শশিপদ বাবুকে এই জগতে পাঠাইয়াছিলেন।

প্রথম যৌবনে শিক্ষকরূপেই তিনি সংসারে প্রবেশ করেন। প্রথমে কাশিপুর বিদ্যালয়ে ৮৲ টাকা বেতনে তিনি শিক্ষকতা-কার্য্য আরম্ভ করেন। এখানে তিনি অধিক দিন ছিলেন না, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে সমস্ত বালকদিগকে পড়াইয়াছিলেন তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াও অতীব কৃতজ্ঞতার সহিত শশিপদ বাবুকে স্মরণ করেন। তিনি যখন হাবড়া শালিখিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক তখন তিনি নিজে নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাঁহাকে যে শ্রেণীতে পড়াইতে হইত সে শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যাও কিছু বেশী, প্রধান শিক্ষকেরাও তথায় গিয়া ছেলেদের বেশ সুশাসনে রাখিতে পারিতেন না। অথচ এই বালক শিক্ষকের গুণে ছেলেরা এত বেশী মুগ্ধ ছিল যে, তিনি আসিলেই সব নিস্তব্ধ, আনন্দের সহিত সকলেই নিজ নিজ কার্য্য করিত। অনেক প্রবীণ শিক্ষক মনে করিতেন এই বালকশিক্ষক

বোধ হয় কিছু যাদু জানে। বাস্তবিকই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বশীভূত করিয়া বেশ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তাহাদের দ্বারা তাহাদের কর্ত্তব্যগুলি পালন করাইয়া লওয়া ও তাহাদের মনে যথার্থ জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপিত করিবার জন্য যে যাদুমন্ত্রের প্রয়োজন, শশিপদ বাবু চিরদিনই সে মন্ত্রে একজন সিদ্ধপুরুষ।

সে মন্ত্রটা কি ? তেমন কিছু কঠিন জিনিস নয়—তাহা ভগবানের একটা অযাচিত দান, হৃদয় মধ্যে তাহার বাস—তাহার নাম 'ভালবাসা' ; যাহাতে জগৎ বাঁধা আছে, যাহার স্পর্শে নিতান্ত পরও আপনার হয়, খলপ্রকৃতি বিষধর সর্পও বনের ব্যাঘ্রও যাহার প্রভাবে পোষ মানে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সত্য সত্য ভালবাসিতে হইবে—আহা তাহাদের ভালবাসা, সেত অতি সহজ কাজ, কেন যে কোন কোন মানুষ তাহাদের ভালবাসিতে পারে না, তাহাই আশ্চর্য্য। যে শিক্ষক তাঁহার অধীন ছাত্র ও ছাত্রীদের সত্য সত্য ভালবাসিতে পারেন তাঁহার দ্বারাই শিশুশিক্ষা সম্ভব, অন্য কাহারও দ্বারা নহে। নিতান্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও একটা বড় আশ্চর্য্য শক্তি আছে, সে শক্তিটা বোধ করি জগতে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত সব প্রাণীরই আছে, কেহ যদি তাহাদের হৃদয়ের সহিত ভালবাসে তাহা হইলে তাহারা অন্যদিকে যতই অজ্ঞান হউক না কেন, সে ভালবাসাটুকু সে বুঝিতে পারে। আর এই প্রেম—বিশ্ববিজয়িনী ইহার শক্তি—স্বয়ং ভগবান হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার বশীভূত সকলেই। এই ভালবাসার ক্ষমতাই শিক্ষকরূপে শশিপদবাবুকে এই কৃতকার্য্যতা দিয়াছিল।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষকতা দ্বারা যে যশোলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্রগণ আজীবন যে গুরুরূপে তাঁহাকে ভক্তি-

পূর্ব্বক পূজা করেন ইহার কারণও এই যে স্বর্গীয় রামতনু বাবু এই প্রেমের দ্বারাই ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয় তাহা শশিপদ বাবুর দৈনন্দিন জীবনের মধ্য হইতে আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা অসম্ভব—কেবলমাত্র তুএকটি কথা বর্ণনা করা যাইতেছে।

পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষাদান বিষয়ে শশিপদবাবু যে সুন্দর ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন করিতেন তাহা পাঠ করিলে প্রত্যেক পিতামাতা নিজ নিজ গৃহস্থালীতে এই কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির যাহা মূল কথা, তাহা কি প্রকারে অবলম্বন করিতে প্পারেন তাহা বুঝিতে পারিবেন। শশিপদ বাবুর ছেলে মেয়েদের জন্য তাঁহার বাড়ীতেই এক 'সেভিংস্ ব্যাঙ্ক' ছিল। শশিপদ বাবু নিজেই ব্যাঙ্কার ছিলেন, ছেলে মেয়েদের প্রত্যেকের একখানি করিয়া খাতা ছিল। টাকাকড়ি শশিপদ বাবুর নিকটেই জমা থাকিত; ছেলে মেয়েরা শতকরা ১২ টাকা হারে সুদ পাইত—সে সুদ নিয়মিত ভাবে খাতায় জমা হইত। কোনও বিশেষ উৎসবের দিনে তিনি ছেলে মেয়েদের প্রত্যেককে কিছু কিছু দিতেন তাহা প্রত্যেকের খাতায় জমা হইত। কেহ কোন ভাল কার্য্য করিলে তাহাকে কিছু বিশেষ রকম পুরস্কার দেওয়া হইত—আবার কেহ যদি কোনরূপ অন্যায় করিত তাহা হইলে তাহার কিছু বাদ দেওয়া হইত—এই সমস্তই খাতায় লেখা থাকিত। ছেলেদের হাতে সহসা পয়সা কড়ি দিতেন না, তবে মেয়েদের হাতে পয়সা দিতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের সময় সমাজের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মপরিবারে ও ছাত্রাবাসে উপাসনার পদ্ধতি শশিপদ বাবুই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার বাড়ীতে এই উপাসনা হইলে পর তিনি নিজে সমাজের জন্য কিছু দিলেন, তাঁহার স্ত্রীও কিছু দিলেন;

অতঃপর তিনি ছেলে মেয়েদের ডাকিয়া তাহাদের বলিলেন যে আজ একটি বিশেষ আনন্দের দিন, সমাজের হিতকল্পে তোমাদেরও কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য। তখন সকলেই দুই আনা চারি আনা আট আনা করিয়া দান করিল।

অতি শৈশব হইতে ছেলেমেয়েদের এই ভাবে প্রতিপালন করার কি ফল তাহা চিন্তা করা উচিত। নিজের পয়সা নিজে খরচ করিবে অথচ কোনওরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা হইবে না, সঞ্চয়শীলতা একেবারে অভ্যাস হইয়া যাইবে—মানব যে একটি নৈতিক দায়িত্বসম্পন্ন স্বাধীন জীব—সে যেমন কর্ম্ম করিবে তাহাকে তেমনি ফলভোগ করিতে হইবে—এই সমস্ত শিক্ষা অতি শৈশব হইতেই অতি সুন্দর ভাবে এই সমস্ত বালকবালিকার চিত্তে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শশিপদ বাবুর পুত্রকন্যাগণের উত্তর জীবন যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা এই শিক্ষার দ্বারা কি সুফল ফলিয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

শশিপদ বাবুর একটি পুত্রের নাম ছিল স্বপ্রকাশ, আঠার বৎসর বয়ঃক্রম কালেই ইনি মর্ত্তলীলা সম্বরণ করেন। স্বপ্রকাশ বড়ই গীতবাদ্যের অনুরাগী ছিলেন—নিজে বেশ সুন্দর গাহিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীর পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহার কিছু টাকা ছিল, মৃত্যুকালে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত বিভাগের উন্নতিকল্পে সেই টাকার কিয়দংশ দান করেন, অপর অংশ জনৈক দুঃস্থ দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের জন্য দান করেন। আঠার বৎসরের একটি বালক—তাহার মনে উন্নততর কর্ত্তব্যের বুদ্ধি এরূপ ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে যে মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাহার বিস্মৃতি ঘটে নাই ইহা একটি বিশেষ রূপেই স্মরণীয় ঘটনা। শৈশব হইতে তাঁহার পিতার অধীনে তিনি যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন ইহা যে সেই শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য শশিপদ বাবু আর এক অতি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করেন। প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে নিজের বাগানের একখণ্ড করিয়া জমি দিতেন, সেই জমিতে তাহারা বাগান করিয়া ফুলের গাছ প্রভৃতি রোপণ করিয়া পালন করিত। পরে শশিপদ বাবু যখন বিধবাশ্রম করেন তখন ও আশ্রমের মেয়েদের একখণ্ড করিয়া জমি দিতেন ও বাগান করাইতেন। (পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের "বঙ্গের সমাজ সংস্কার"নামক ইংরাজী গ্রন্থে ইহার বর্ণনা আছে।) ছেলে মেয়েদের দ্বারা এই যে বাগান করানো ইহা যে কত সুফল প্রদ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শারীরিক ব্যায়াম, সৌন্দর্য্যানুভব, হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সমূহ পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অনেকগুলি বৃত্তির অনুশীলন হয়।

ছেলে মেয়েদের শিশুকাল হইতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু এই কার্য্যটি অনেকে যত সহজ বলিয়া বিবেচনা করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তত সহজ নহে। বাহিরে একজন লোক আপনাকে ডাকিতেছেন, আপনি এখন পরিশ্রান্ত, লোকটির হাত এড়াইবার অভিপ্রায়ে আপনার একটি ছোট ছেলেকে অথবা একজন চাকরকে বলিলেন "লোকটিকে বল. বাবু বাড়ী নাই।" এ প্রকারের ব্যবহার আজকাল অনেকেই করিয়া থাকেন, যে ছেলে তাহার বাপের এই অসত্যমূলক আজ্ঞা একবার পালন করিল, অথবা কোনও ভৃত্যকে তাহা পালন করিতে দেখিল, সেই শিশু নীতিগ্রন্থপাঠে অথবা মৌখিক উপদেশে সত্যকথন ও সত্য ব্যবহারের মহিমা যতই পড়ুক না কেন—এই উদাহরণের প্রভাব তাহার চরিত্রে নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে।

কত ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়া অসতর্ক পিতামাতার অগোচরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের যে ভবিষ্য জীবন গড়িয়া উঠিতেছে

তাহা সকলেরই ধীরভাবে চিন্তা করা উচিত। আপনি আমি ভাল করিয়া না ভাবিয়া যে সমস্ত কথা ও ঘটনাকে 'কিছুই না' বলিয়া ছাড়িয়া দিতেছি—সেই সমস্ত কথা ও সেই সমস্ত ঘটনাই অনেক সময়ে এক মানব শিশুর জীবনে ভবিষ্যতের এক মহাবিপ্লবের অঙ্কুর স্বরূপে চিরসঞ্চিত হইয়া যাইতেছে।

এই সমস্ত বিষয়ে শশিপদ বাবুর চরিত্রের আদর্শ, ও নিত্য-সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকলেরই অনুকরণীয় বলিয়া মনে হয়। ছেলেমেয়েদের মানুষ করা—এই কার্য্যটি সকলের চেয়ে কঠিন আর এই খানেই আমাদের দায়িত্ব সকলের চেয়ে অধিক।

এ বিষয়ে দু একটি উদাহরণ দেওয়া দরকার—কিন্তু উদাহরণের দ্বারা মানব চরিত্রের এ দিকটা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। কারণ তাহা হইলে সমস্ত জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাগুলি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে হয়। আমরা মানুষকে নানা স্থানে দেখি, রাজা মানুষ রাজ্য শাসন করিতেছে—যুদ্ধ করিতেছে—বক্তা মানুষ হাজার হাজার শ্রোতার চিত্তে উত্তেজনার আগুণ জ্বালাইয়া বক্তৃতা করিতেছে, কবি মানুষ হাজার হাজার নরনারীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতেছে—এ সমস্ত মানব চরিত্রের একটা দিক—এদিক হইতে আসল মানুষটিকে ঠিক ধরা যায় না। যে মানুষটি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব লইয়া ঘর বাঁধিয়া বাস করে, সকাল সন্ধ্যা প্রতিবেশীদের সঙ্গে ব্যবহার করে, চাকর, বাকর, মুদি, মহাজন প্রভৃতির সঙ্গে প্রত্যেক মুহুর্ত্তে সংস্পর্শে আসে, সেই যে আসল মানুষটি, সেই যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক ব্যাধি অভাব দারিদ্র্য ও নানাবিধ পরীক্ষার মধ্যবর্ত্তী মানুষটি—তাহারই সহিত ছেলে মেয়েদের এবং অনেক স্থলেই প্রতিবেশীদের সম্পর্ক। দেশের নৈতিক আদর্শ উচ্চ করিবার জন্য যিনি বই লিখিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, সভা সমিতি করিতেছেন কাগজ চালাইতেছেন—যাঁহারউপদেশেত হয়

হাজার হাজার বিপথগামী লোক ধর্ম্মের পথে, সাধুতার পথে ফিরিয়া আসিতেছে—তাঁহার পুত্র কন্যাগণ দুর্নীতির পঙ্ক মধ্যে নিপতিত কেন? ইহা অপেক্ষা মানবের অদৃষ্টের আর অধিক বিড়ম্বনা কি হইতে পারে?

সকলেই জানেন শশিপদ বাবু একজন কৃতী ও স্বনাম ধন্য সমাজ সংস্কারক—নব্যবঙ্গে যে সমস্ত লোক সমাজ সংস্কারক রূপে প্রশংসার মাল্য লাভ করিয়াছেন শশিপদ বাবুর নাম তাঁহাদের কাহারও নিম্নে নহে। কিন্তু সমাজ-সংস্কারক শশিপদ বাবুর কার্য্য যাঁহারা জানেন, তাঁহারা গৃহ-সংস্কারক শশিপদ বাবুকে যেন বিস্মৃত না হন—এই গৃহ সংস্কার ব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্ব যদি আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা না করি তাহা হইলে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপদেশ সমূহ আমরা পাইব না।

কুমারী কার্পেণ্টার তাঁহার 'ভারতে ছয় মাস' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে শশিপদ বাবুর গৃহের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এমন সুন্দর বস্তু দেখি নাই। কুমারী কার্পেণ্টারের এই কথা বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। তিনি যে সময়ে বরাহনগরে শশিপদ বাবুর গৃহে গমন করেন তখন শশিপদ নিজের উদার ধর্ম্মমতের জন্য পৈতৃক বাসভবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি তখন একটি সামান্য একতলা ভাড়াটি বাড়ীতে থাকেন—সেই দরিদ্রের সামান্য গৃহস্থালী—অথচ তাহার মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্না কুমারী কার্পেণ্টার এমন একটা কিছু দেখিয়াছিলেন যাহা তাঁহার নিকট সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় পদার্থ বলিয়া মনে হইয়াছিল। সে জিনিসটি কি? সমগ্র পরিবারের মধ্যে একটি অকৃত্রিম প্রীতি ও সদ্ভাব ব্যতীত তাহা আর কিছুই নহে।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে তাঁহার পুত্রদিগের গৃহশিক্ষক রূপে অনেক দিন ছিলেন, শশিপদ বাবুর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তিনি সমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রণীত 'ইন্দুবালা' নামক ইংরাজী গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিতেছেন—

A close study of the system of domestic training of which that character was a necessary result, have taught me much,—have furnished me with the most valuable principles and living examples for my guidance as the father of a family; and in recording the results of my study I hope to make others share in the benefits I have derived from it.

* * * *

"The reformer who neglects his wife and children, and proceeds to reform the country, is either a pretender who covets the honours but shrinks from the troubles of a true reformer, or lacks the wisdom that ensure success. He is as foolish as the gardener who only moistens the leaves of his plants but neglects the roots and the soil from which they draw their nourishment. Reform, like charity, should begin at home. When you have made converts of your own wife and children to your principles of reform, and seen their happy results in their daily lives, you have made your success as the reformer of your country, sure and certain. Unless you have done that, not only your success, but even your own faith in your principles, is doubtful. Of this fundamental truth I have seen no more firm believer than the father of the family I am going to paint—no one who has been more strenuous in reducing it to practice.

পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী অংশদ্বয়ের মর্ম্ম এই। ইন্দুবালা শশিপদ বাবুর

কন্যা, ১৫ বৎসর বয়সে পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার সুন্দর ও সুপবিত্র জীবন কথা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় ইংরাজী ভাষায় এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে ইন্দুবালা যে পরিবারে জন্মিয়াছিলেন, সেই পরিবারে বালক বালিকাদিগের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহাই ইন্দুবালার জীবনে প্রকটিত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন যে তিনি ঐ পরিবারের শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনেক শিক্ষা পাইয়াছেন, পরিবারের পিতারূপে কিভাবে চলিতে হয়, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও জীবনপ্রদ উদাহরণ পাইয়াছেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান পদ্ধতি পাইয়াছেন। এই প্রকারে নিজে কি প্রকারে উপকৃত হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করার পর, তিনি বলিতেছেন যে আমি যে উপকার পাইয়াছি তাহা অপরকে দিবার অভিপ্রায়েই আমি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

উদ্ধৃত দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম এই। যে সংস্কারক তাহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণকে অবহেলা করিয়া দেশের সংস্কার করিতে অগ্রসর হয়েন তিনি হয় ভণ্ড অর্থাৎ যশঃপ্রার্থী, কিন্তু প্রকৃত সংস্কারক হইতে হইলে যে সমস্ত ক্লেশের মধ্যে পতিত হইতে হয় তাহা এড়াইতে চাহেন, অথবা প্রকৃত কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইলে যে বুদ্ধি প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই।

পরিবারে পুত্র কন্যাগণকে কিরূপ ভাবে শশিপদ বাবু পালন করিতেন, একটি সামান্য শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে ও তিনি কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে তাহার অনেকগুলি উদাহরণ দিয়াছেন আমরা নিম্নে দুইটি প্রদান করিলাম।

শশিপদ বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের পর একদিন তাঁহার প্রথম

পক্ষের কনিষ্ঠ পুত্র এলবিয়ন তাঁহার বিমাতাকে কিছু বিরক্ত করেন। এলবিয়ন অবশ্য তখন নিতান্তই শিশু। তাঁহার বিমাতা বিরক্ত হইয়া তাহাকে দুষ্ট বলিয়াছিলেন। 'দুষ্ট' বলার পরেই শিশু অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়া বিমাতাকে বলেন "মা, তুমি আমায় দুষ্ট বলিলে, আচ্ছা বাবা আসুন তাঁহাকে বলিয়া দিব।" শশিপদ বাবু তখন কর্ম্মস্থানে গিয়াছিলেন, তিনি কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসার পর, শিশু এলবিয়ন পিতার নিকট আসিয়া পিতার গায়ে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন এবং অত্যন্ত মলিন মুখে বলিলেন "দেখ বাবা, মা আমাকে দুষ্ট বলিয়াছেন।' শশিপদ বাবু সস্নেহে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি করিয়াছিলে" বালক উত্তর করিল "যে আমি তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছিলাম।" শশিপদ বাবু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। বালক তুষ্ট মনে চলিয়া যাওয়ার পর তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "বাড়ীর ছেলেদের দুষ্ট বলাও সঙ্গত নহে, আমি এ কথা কখনও বাড়ীতে ব্যবহার করি না, কারণ শিশুকে দুষ্ট বলিলে সে দুষ্টই হইয়া পড়ে, আর দুষ্ট হওয়া যে দোষের বিষয় ইহা তাহার মনেও থাকে না।" তাঁহারা অবশ্য সতর্ক হইলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শশিপদ বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শশিপদ বাবুর প্রথম পক্ষের পুত্র কন্যাগণের সহিত এমনি ব্যবহার করিতেন যে পরিবারে থাকিয়া, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও কেহ বুঝিতে পারিতেন না যে তিনি তাঁহাদের বিমাতা। পরিবারে এই যে সুন্দর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মূলে শশিপদ বাবুর এই সতর্ক দৃষ্টি প্রধান কারণ।

আর একটি ঘটনা উল্লেখ করিলে বালকবালিকাগণের মধ্যে শ্রদ্ধা-বৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা কিরূপে ধর্ম্মভাব পোষণ করা হইত তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। একদিন খুব বৃষ্টি হইতেছিল। এক দাসী বাজার করিতে গিয়াছিল, পথে ভিজিয়া, যেমন এই শ্রেণীর

লোকে স্বভাবতঃ করিয়া থাকে সেইরূপ ভাবে ও ভাষায় অকালে বৃষ্টির জন্য দেবতার নিন্দা করিতে করিতে বাড়ী আসিয়া প্রবেশ করিল। এল্‌বিয়ন তখন বালক। কিন্তু দাসীর মুখে এই দেবতানিন্দা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন "ঝি, তোমার আচ্ছা সাহস তো, তুমি দেবতার নিন্দা করিতেছ।" তাহার পর তাহার মাতাকে বলিলেন "দেখ মা আমরা যে দেবতার পূজা করি, ঝি সেই দেবতার নিন্দা করিতেছে।" ঝি বলিল 'কখন আমি দেবতার নিন্দা করিয়াছি!" বালক রুষ্ট হইয়া বলিলেন "এইমাত্র তুমি দেবতার নিন্দা করিলে, আবার মিথ্যা কথা বলিতেছ!" এইরূপ পারিবারিক শিক্ষার মধ্য দিয়া এলবিয়নের বাল্যজীবন বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা উত্তর-জীবনে স্বাধীন রাজ্যের দেওয়ানরূপে এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস্‌ মহাশয়কে জানেন তাঁহারা দেখিবেন যে কর্ম্মজীবনে যে মহত্ত্ব ও রাজ্যশাসনে যে নিপুণতার দ্বারা তিনি গৌরবান্বিত হইয়াছেন তাহার বীজ কোথায়!

ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিত ৺কৃষ্ণহরি শিরোমণি মহাশয় শশিপদ বাবুর গৃহকে প্রাচীন ঋষিদিগের আশ্রমের সহিত তুলনা করিতেন। কুমারী মেরি কার্পেণ্টারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দুই জন লোক, ইউরোপ ও ভারতবর্ষ এই দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার প্রতিনিধি—অথচ শশিপদ বাবুর গৃহস্থালী এই উভয়েরই তুল্যরূপ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল—ইহার অর্থ কি? আসল কথা শশিপদ বাবুর গার্হস্থ্য জীবনে একটা সুন্দর সমন্বয় ছিল—যাঁহারা পাশ্চাত্য ভাবে বিভোর হইয়া একেবারে দেশের যাহা ভাল তাহাকেও উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, শশিপদ বাবু তাহাদের দলেরও নহেন, আবার যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াও যেমন আছি, তেমনি থাকা যাউক বলিয়া একেবারে আলস্যময় জড়তার পথ আশ্রয় করিয়াছেন, শশিপদ বাবু

তাঁহাদের দলেরও নহেন। তিনি এমন একটি সুন্দর দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছেন, যেখানে দেশী ভাবের ও দেশী সাধনার যাহা উৎকৃষ্ট জিনিস, তাহা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াও পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা উৎকৃষ্ট অংশ তাহা বেশ চেতন ভাবে গ্রহণ ও আত্মপ্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়।

বালকবালিকাগণের উপর শশিপদ বাবু নিজের চরিত্রের দ্বারা কিরূপ প্রভাব চিরদিন বিস্তার করিয়া আসিতেছেন তাহা সকলেই জানেন—দু একটি কথা উল্লেখ করি।

বালকগণ খাইতে বসিয়া প্রায়ই বড় গোলমাল করে। ইহাতে বড়ই অসুবিধা হয়। ব্রাহ্মসমাজের রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে, সাধারণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরে, শশিপদ বাবু একদিন বালকদিগকে আহারের সময় বেশী কথা বলা বা গোল করা ভাল নহে, এই বিষয়ে একটি উপদেশ দিয়াছিলেন।

শশিপদ বাবুর এই উপদেশের বড়ই আশ্চর্য্য ফল ফলিয়াছিল। যে সমস্ত বালক এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল—তাহারা আর খাইবার সময় আদৌ কোনরূপ গোলযোগ করিল না—বাড়ীর লোকেরা এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। যে সমস্ত বালক সেদিন বিদ্যালয়ে আসে নাই, ক্রমে ক্রমে সংসর্গ প্রভাবে তাহাদেরও স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে আজ প্রায় তিরিশ বৎসরের কথা সেদিন যাঁহারা বালক ছিলেন, আজ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত। শশিপদ বাবুর সেদিনকার উপদেশের প্রভাব এখনও তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই।

শশিপদ বাবু বালকবালিকাগণের সৎশিক্ষা বিধানের জন্য জীবনে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বরাহনগরে বালকবালিকাগণের জন্য তিনি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং নিজে গল্প রচন

করিয়া সেই গল্পের সাহায্যে তাহাদের উপদেশ দিতেন। তাঁহার গল্প রচনার ক্ষমতাও কিছু আশ্চর্য্য রকমের, এই প্রকারের গল্প শুনিতে শুনিতে বালকগণ আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িত এবং সদুপদেশ তাহাদের কোমলচিত্তে চিরদিনের মত মুদ্রিত হইয়া যাইত।

কেবলমাত্র ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করাই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বরাহনগরের শ্রমজীবি বালকগণের শিক্ষার জন্য তিনি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন, বরাহনগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয় এখনও বিদ্যমান। ঐ বিদ্যালয়ে শ্রমজীবি বালক ও বয়স্কেরা এখনও বিনাবেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে। কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়েও তিনি কিছুদিন নীতিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বরাহনগরে বালিকাবিদ্যালয় যে সময়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এদেশে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা বড়ই দুরূহব্যাপার ছিল—একমাত্র শশিপদ বাবুর স্নেহশীল সাধুপ্রকৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাগণ নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে আসিত। বরাহনগরে সেই বালিকাবিদ্যালয় এখনও রহিয়াছে – এখন সেখানে অনেক বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি ছিল, এখন আর সে সমস্ত আপত্তি নাই।

ব্রাহ্মসমাজের বালকবালিকাদিগের জন্য শশিপদ বাবুই সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীত রচনা করেন। স্বাভাবিক অভাব বোধ হওয়াতেই তাঁহার মনে এই কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহার এই সঙ্গীতগুলি অত্যন্ত সরল, প্রাচীন কালের ঠিক ছড়ার মত, বালকবালিকারা অভ্যাস করিয়া আপন মনে এই গান গাহিত। বালকবালিকাদিগের জন্য তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। একটি সঙ্গীত এই।

"মা আমি ভাল মেয়ে হবগো তোমার,

তুমি যা বলিবে তাই করিব করিবনা হুঁ হাঁ।

আমি কি খাইব, কি করিব সদা এই ভাবনা মা তোমার ॥

আমার অসুখ হলে, চোখের জলে মুখে বল দয়াময় ॥

তাঁহার রচিত জন্মদিনে গাহিবার জন্য একটি সঙ্গীত "ব্রহ্মসঙ্গীত" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম।

আলাইয়া—যৎ।

আজ মনের সাধে প্রাণ ভরে ডাকৃব দয়াময়

যেন জনম দিনের ফল জীবনেতে রয়।

যেন কুভাব না মনে আনি, কুকথা না কানে শুনি

মন্দ বালক যথা (আমি) যাবনা তথায়।

পিতা মাতা গুরুজন করেন কত যতন,

তাঁহাদের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়।

তুমি ভালবাস বলে ভালবাসেন সকলে

আমি যেন শিখি ভাল বাসিতে তোমায়।

ব্রাহ্মসমাজের বালকবালিকাদিগের জন্য শশিপদ বাবুই বাল্যসমাজ নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রবিবারের দিন সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনার সময় বালকেরা বড়ই গোলমাল করিত—তাহারা উপাসনার কিছু না বুঝিয়া বিরক্ত ও অস্থির হইয়া উঠিত, তাহাদের জনক জননীরা তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া উপাসনায় আসিয়া থাকেন, গৃহে তাহাদিগকে একাকী রাখিয়া আসিতে পারেন না। কেমন করিয়া এই সমস্ত বালকবালিকাদিগের শান্ত করিয়া রাখা যাইতে পারে তাহার উপায় কেহই নিরূপণ করিতে পারিতেন না। শশিপদ বাবু সমাজ-মন্দিরে উপাসনার ঐরূপ ব্যাঘাত দেখিয়া সমাজের নিকটে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে এই বাল্যসমাজ স্থাপন করেন। প্রথমে তিনি নিজেই এই বাল্যসমাজের কার্য্য পরিচালনা করিতেন—এখন দেবালয়

গৃহে এই সমাজের কার্য্য হইতেছে। শ্রীমতী ইন্দুমতী মজুমদার ও প্রভাবতী মজুমদার ও অন্যান্য কয়েকজনে এই কার্য্য চালাইতেছেন। শশিপদ বাবুর শিশুশিক্ষার একটি বিশেষ পদ্ধতি এই যে তিনি নিতান্ত ছোট ছেলেমেয়েদের সহিতও অত্যন্ত সম্মানের সহিত ব্যবহার করেন। 'তুই' এই কথা তাঁহার পরিবারে একেবারে অজ্ঞাত—দাসদাসীগণকেও কেহ কখন এই প্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্যের দ্বারা আহ্বান করেন না, মেথরকে পর্য্যন্ত তিনি "তুমি" "বাবা" প্রভৃতি শিষ্টশব্দে সম্বোধন করেন। এইজন্য তাঁহার কন্যা স্বর্গীয়া বনলতা দেবী বাল্যকালে বলিতেন "বাবার সবাই বাবা, আমরাও বাবা মেথরও বাবা।" পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার ইংরাজীগ্রন্থ "ইন্দুবালা"তে এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত সম্মান করিলে এই সম্মানের দ্বারা তাহাদের চরিত্র আপনা আপনি কিরূপ উন্নত হয়, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

শশিপদ বাবুর দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহার সপত্নী পুত্রগণের সহিত চিরদিন এরূপভাবে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, যে কেহ দীর্ঘকাল ধরিয়াও শশিপদ বাবুর পরিবার মধ্যে বাস করিয়াও বুঝিতে পারিতেন না যে, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী এই বালকদিগের বিমাতা, গর্ভধারিণী নহেন।

শশিপদ বাবু বালকবালিকাগণের উপর স্বভাবতঃই ইন্দ্রজালের মত এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেন। একটি বালিকা বড়ই দুষ্ট, কাহারও কথা শোনেন না, তাহার পিতামাতা তাহাকে শাসন করিতে পারিতে-ছেন না; তাঁহারা তাহার প্রতি যতই উগ্র ব্যবহার করেন বালিকাও ততই অবাধ্য হইয়া পড়ে। পরিশেষে শশিপদ বাবু এই ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তিনি বালিকাকে কোনরূপ তিরস্কার করিলেন না, তিনি যে বালিকার দুষ্টতার কথা কখনও শুনিয়াছেন,

তাহা বালিকা জানিতেও পারিল না। তিনি বালিকাকে আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন "মিষ্টি দিদি"। বালিকাও তাঁহাকে আদর করিয়া "মিষ্টি দাদা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। এই প্রকারে শশিপদ বাবুর প্রভাবে বালিকা আপনা আপনি বেশ শিষ্ট হইয়া পড়িল।

এই প্রকারে স্নেহ ও প্রেমের সহিত, আদর ও সম্মানের সহিত ব্যবহার করেন বলিয়া তাঁহার চরিত্রে যে দৃঢ়তা নাই এবং বালকবালিকাগণের প্রতি সেই দৃঢ়তা যে তিনি প্রয়োগ করেন না, তাহা নহে। শশিপদ বাবুর কন্যা বনলতা দেবী, যিনি উত্তরকালে 'অন্তঃপুর' নামক মাসিকপত্র সম্পাদন করিতেন এবং এখন যিনি স্বর্গগতা, তিনি যখন নিতান্ত বালিকা, সেই সময়ে একদিন শশিপদ বাবু বরাহ-নগর হইতে কোনও ধর্ম্মসভার অধিবেশনে কলিকাতা আসিতেছেন। বালিকা বনলতা ঝোঁক ধরিলেন, তিনিও আসিবেন। অন্যান্য বালক-বালিকাগণ পিতামাতার নিষেধে কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া মান্য করিল, কিন্তু বনলতা ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তাঁহাদের সঙ্গে কলিকাতা আসিবার জন্য ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন। শশিপদ বাবুও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। পরদিন আর তাহাকে সে কথা কিছুই বলিলেন না। তাহাকে একটি পুতুল উপহার দিলেন, সেই পুতুলটির নাম রাখা হইল "আব্দার"।

এই প্রকারে কি নিজের পুত্রকন্যাগণের প্রতিপালনে, কি দেশের বালকবালিকাগণের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধন বিষয়ে শশিপদ বাবু আজীবন অনেক কার্য্য করিয়াছেন। তিনি স্বকীয় চরিত্র প্রভাবে এই কার্য্যে এক বিশেষরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের এই অংশ বিশেষরূপে আলোচনা করিলে আমরাও লাভবান হইব সন্দেহ নাই।

কত বালকবালিকা যে শশিপদ বাবুর মিষ্ট ব্যবহারে বশীভূত হইয়া শৈশবসুলভ দুরন্তভাব ও অবাধ্যতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া এখন সংসারে খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহার সংখ্যা নাই। বালকবালিকাগণের সহিত তাঁহার এই যে অতি আশ্চর্য্য ব্যবহার, ইহা আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়। একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। কলিকাতা কাঁসারিপাড়ার একটি বাড়ীতে শশিপদবাবুর ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন বন্ধু একত্রে বাস করিতেন। শশিপদ বাবু তখন ডাকবিভাগে কার্য্য করেন, তিনি কৃষ্ণনগরে থাকিতেন। একদিন শশিপদ বাবু কলিকাতা আসিলেন, কয়েকদিন থাকিবেন' সঙ্গে স্তূপাকার আপিসের কাগজ পত্র, তিনি তাঁহার বন্ধুগণের বাসায় আসিয়া উঠিলেন। শশিপদ বাবু একটি বড় প্রকোষ্ঠে উঠিয়াছেন, কাগজপত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, এ বাসায় এই সব কাগজ পত্র ছড়াইয়া আপনি কিছুতে কার্য্য করিতে পারিবেন না। এই বাড়ীতে একটি ছোট মেয়ে আছে সে অতিশয় দুরন্ত, কেহই তাহাকে শাসনে রাখিতে পারে না। সে আসিয়া একেবারে ঘাড়ে চড়ে। শশিপদবাবুর বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিলেন যে তাহার হস্ত হইতে কাগজপত্রগুলি রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। শশিপদ বাবু তাঁহার বন্ধুগণের এই ভীতি প্রদর্শনের উত্তরে বিশেষ কিছু বলিলেন না।

শশিপদ বাবু কাগজপত্র সাজাইয়া তাঁহার ঘরে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে সেই মেয়েটি দৌড়াইতে দৌড়াইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্যান্য লোকের সহিত বালিকা তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত উল্লাসের সহিত যেমন উচ্ছৃঙ্খলতা করিয়া বিরক্তি উৎপাদন করে, সে অবশ্য শশিপদ বাবুর সহিত সেইরূপ ভাবে ব্যবহার করিবার জন্যই আসিয়াছিল।

বালিকাটি যেমন দুয়ারে আসিয়াছে অমনি শশিপদ বাবু গম্ভীর ভাবে কেবল তাহার মুখের পানে চাহিলেন। দৃষ্টি, সাংসারিক ব্যাপারে একটা খুব বড় জিনিস, দৃষ্টির মধ্য দিয়া মানবের হৃদয় ও চরিত্র সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে 'দৃষ্টি' সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতেছে। Magnetic Gaze নামক গ্রন্থে দৃষ্টির দ্বারা কি প্রকারে লোককে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে বহুল আলোচনা আছে। শশিপদ বাবু এই দৃষ্টিশক্তির কখনও যে কোন সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। এই দৃষ্টি তাঁহার স্বাভাবিক। তিনি চাহিতেই বালিকা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, সে আর লাফাইয়া গায়ের উপর পড়িল না। দৃষ্টির দ্বারা বালিকার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমিত করা হইল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে দৃষ্টি কঠোর নহে। বালিকা যেমন দাঁড়াইয়াছে' অমনি শশিপদ বাবু গম্ভীর অথচ স্নেহকোমলকণ্ঠে, অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া আদর পূর্ব্বক বালিকাকে ডাকিলেন। বালিকা তাঁহার নিকট আসিল, কিন্তু অবাধ্য ও অশিষ্ট ভাবে নহে; এই যে বালিকা বশীভূত হইল— বরাবর সে সেইরূপ থাকিয়া গেল। কোমল প্রেম অথচ ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার দ্বারা সংযমন এই উভয়ের সংমিশ্রন যাঁহার প্রকৃতিতে আছে কেবলমাত্র তিনি বালকবালিকাকে শাসন করিতে পারেন ও তাহাদের যথার্থ শিক্ষক হইতে পারেন। এই বালিকাটির পরিবর্ত্তন দেখিয়া বাসার সমস্ত লোক একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল।

শশিপদ বাবুর চরিত্রের এই বিশেষত্বটুকু তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, সেই সময়েও তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের চিত্তে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। বিলাতেও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া অনেক অবাধ্য বালক বালিকার জীবন প্রবাহের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। ইহা

তাঁহার বিলাতের বন্ধুগণের পত্রে অতিশয় কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। বিলাতে একটি পনর ষোল বৎসরের বালিকা বড়ই অবাধ্য ছিল। শশিপদ বাবুর শিক্ষা, সদুপদেশ ও সংস্পর্শে তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। শশিপদ বাবু দেশে ফিরিয়া আসার পর এই বালিকার অভিভাবক তাঁহাকে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি বালিকার জীবনে তাঁহার স্থায়ী প্রভাব বর্ণনা করার পর বলেন যে আপনি বালিকাকে যে শিক্ষা দিয়াছেন ও তাহার পুস্তকে যাহা লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা সংসার পরীক্ষায় না পড়িয়াও তাহার চরিত্রে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

কি পারিবারিক জীবনে কি সামাজিক জীবনে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বালকবালিকাগণের কোমলচিত্ত ভালবাসার দ্বারা আয়ত্ত করিয়া তাহাতে সুশিক্ষার বীজ বপন করিয়াছেন। আজকাল দেশে বালকবালিকাদিগের জন্য অনেক মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। সে সময়ে অবশ্য এপ্রকারের মাসিক পত্র ছিল না। বালকবালিকাদিগের উপযোগী মাসিকপত্র প্রচার করার সঙ্কল্প তাঁহার মনে বহুদিন ধরিয়াই জাগ্রত ছিল। কিন্তু নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্যে ইহা আর তিনি নিজে করিয়া উঠিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় প্রমোদাচরণ * সেন মহাশয় যে সময়ে বালকবালিকাদিগের জন্য "সখা" নামক মাসিক পত্র প্রচার করেন তখন শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু সাধ্যমত সকল প্রকারেই তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। ইহা ছাড়া বালক বালিকাগণের জন্য লাইব্রেরী করার সঙ্কল্পও তাঁহার মনে ছিল।

আমাদের দেশের চিরদিনের আদর্শ বাল্যভাব। কেবল আমাদের

---

* জন্ম ১৮৯৫, ১৮ই মে ; মৃত্যু ১৮৮৫, ২১শে জুন। মহাজীবনের আখ্যায়িকাবলী" "চিন্তাশতক" ও "সাথী" নামক গ্রন্থ রচয়িতা। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে তিনি 'সখা' মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।

দেশের বলিয়া নহে জগতের যাবতীয় ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাত্মাই সরল বাল্যভাবকে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন। সাধনার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়া যাঁহারা পরমহংস হইয়াছেন তাঁহারা ঠিক বালকের মত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা সকলেই জানেন। তিনি একদিন জিলিপি খাইতেছেন, এমন সময়ে দুইটি বালক সেই স্থানে আসিল, একজন ছোট ছেলে আর একটি ছেলে দেখিলে যেমন করিয়া খাবার লুকায়, পরমহংসদেব ঠিক তেমনি করিয়া খাবার লুকাইলেন। তাঁহার সেই সময়কার ভাব দেখিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার প্রভৃতি চিরকালই বালক, শুকদেবও তাহাই। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রেও এই বাল্যভাবের বিকাশ দেখা যাইত।

প্রকৃত প্রস্তাবে কথা এই। শ্রীভগবানের করুণা 'তারুণ্যামৃতধারা' রূপে জগতে সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। জগৎ পুরাতন বা প্রবীণ হইতে জানে না, সর্ব্বদাই নূতন হইয়া উঠিতেছে। অমবস্যার অবসানে নূতন চন্দ্র উদিত হইয়া পূর্ণিমার আয়োজন করিতেছে, বর্ষার অন্ধকারযুক্ত মেঘমালা ভেদ করিয়া শরতের শুভ্রহাসি আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, নিশীথের অবসানে উষালোক প্রকাশ, শীতের জড়তা যাইয়া নববসন্তে পরিণতি লাভ করিতেছে। জগৎ পুরাতন হয় না। আমরা বিশ্বলীলার সহিত অহঙ্কারের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি তাই আমরা প্রবীণ হইয়া পড়ি, তাই দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া শোকে ও দুঃখে হাহাকার করি। শাক্ত যিনি, তিনি জানেন আমি জগন্মাতার সন্তান, চিরদিনের শিশু, চিরকাল তাঁহারই চরণাশ্রয়ে রহিয়াছি, জগজ্জননীর সন্তান রূপে আত্মোপলব্ধি করিয়া আনন্দময়ীর চরণরেণুর টীকা কপালে ধারণ

করিয়া আনন্দধামে সকলের সহিত মিলিত হইতে হইবে—ইহাই সত্য ইহাই প্রকৃত জাগরণ। মরণের দুঃস্বপ্ন নাই. শোকের অন্ধকার নাই। বৈষ্ণব জানেন যিনি আমার সখা, আমার চিরদিনের প্রিয় সঙ্গী তিনি নিত্য কিশোর। প্রবীণতা নাই। ইহাই ভক্তভাব।

শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুও বালকের সঙ্গে বালক, চিরকালই বালক এখন ও তিনি পাড়ার বালকদিগের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মেশেন, সকল বালকেরই তিনি আপনার জন, সকলেরই আব্দার তাঁহার উপরে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারক শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয়ের লেখা হইতে নিম্নের অংশটুকু উদ্ধৃত হইল, তিনি বহু দিনের প্রতিবেশী, সুতরাং এ বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী—

“তাঁহার (শশিপদ বাবুর) এই ভাব চিরদিনই দেখিতে পাওয়া যায়! এক্ষণে তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, বেড়াইতে কষ্ট হয়, সে জন্য তিনি প্রতিদিন বৈকালে মন্দিরের পশ্চাতের প্রাঙ্গনে আরাম চেয়ারে বসিয়া থাকেন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া গান করে এবং নানাপ্রকার আমোদ করে। তিনি তাহা বেশ সম্ভোগ করেন। ব্রাহ্মপল্লীর স্ত্রীলোকেরা একবার বলিলেন “আপনার শরীর অসুস্থ, কন্যার বাড়ী গিয়া থাকিলে ভাল হয়, সেখানে নাতি নাতনীরা আছে, আপনার ভাল লাগিবে। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন “এখানেও অনেক নাতি নাতনি আছে।”

শশিপদ বাবুর চরিত্রের এই অংশটুকু অর্থাৎ তাঁহার বাল্যভাব এবং সেই ভাবের প্রভাবে বালক বালিকাগণের চিত্তের উপরে আধিপত্য লাভ করিয়া স্নেহের দ্বারা সৎপথে তাহাদের পরিচালন, ইহা বিশেষ ভাবে আলোচ্য। এই শক্তির দ্বারাই তিনি আদর্শ গৃহস্থ হইয়াছেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার ইন্দুবালা গ্রন্থে সত্যই বলিয়াছেন—

"A single, all-comprehensive aim now inspires and unites this people how we can grow into a true, strong and progressive nation and the wisest amongst us, are at one in thinking that to attain this object, the most important thing for us to do is to reform our homes-to make there the centre of that 'light and sweetness, that strength and beauty which we wish to see all over the country"

অর্থাৎ আজ আমাদের দেশে এক নবভাবের প্রেরণা আসিয়া আমাদিগকে একতাবদ্ধ করিয়াছে, আমরা কেমন করিয়া সত্য সত্যই এক সবল ও উন্নতিশীল জাতিতে পরিণত হইতে পারি ইহাই একালের লক্ষ্য। যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ তাঁহারা সকলেই এইরূপ বিবেচনা করেন যে যতক্ষণ আমরা আমাদের গৃহগুলির সংস্কার করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান ও আনন্দের কেন্দ্রে পরিণত করিতে না পারিব, যতক্ষণ সেখান হইতে শক্তি ও সৌন্দর্য্য না পাইব, ততক্ষণ কিছুই হইবে না।

এই পরিচ্ছেদের প্রথমে যে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির কথা হইয়াছে, একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই পদ্ধতি আমাদেরই দেশের সেই প্রাচীন কালের আশ্রমে গুরু সন্নিকটে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতি আবার দেশে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হউক। আবার আশ্রমের ফুলগুলির সঙ্গে সরল বালকবালিকার চিত্ত-কুসুম আনন্দের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠুক, বনপাখীর উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত রোলের সুরে সুর মিলাইয়া বালক বালিকাগণের হৃদয়-বীণা বিশ্ব-সঙ্গীতের আনুগত্য করুক। এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টাও দেশে আরম্ভ হইয়াছে। এখন চাই শিক্ষক—এই জন্যই আমরা এই ভাবের একজন আজন্মসিদ্ধ নিপুণ শিক্ষকের চরিত্রের এই অংশ দেশবাসীগণের নিকট সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জীবনের পরিণতি—লীলাদর্শন ও ভগবানের কৃপার জয়।

মানুষ সংসারে আসিয়া নানা ঘটনার মধ্য দিয়া বিকাশলাভ করিতেছে, ধন জন মান সম্ভ্রম হাস্য ও হর্ষ কলরোল আর শোকতাপ ও বিষাদ নিরাশা এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল আলো ছায়ার মধ্য দিয়া জীবনতরণী কালের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে—কখনও কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝাঘাতে উন্মত্ত তরঙ্গকুলের মস্তকোপরি সভয়ে দোদুল্যমান, আবার কখন ফুলগন্ধময় বসন্তের মৃদুলসমীরণে ও বিহগ কলকণ্ঠকূজনে আপ্যায়িত। কখনও অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার, কখনও পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্না বন্যা। এমনি করিয়া জীবনতরণী বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কোন্ বন্দর হইতে যে এই তরণী বাহির হইয়াছে আর এই নিত্য সংঘটিত পরিবর্ত্তন পুঞ্জের মধ্য দিয়া কোন বন্দরের দিকে তাহা অগ্রসর হইতেছে, কেহ বা অলক্ষ্যে থাকিয়া এই শত শত তরণীর কর্ণধারের কার্য্য করিতেছেন আর কেহ বা আসিয়া আসিয়া ইহাদের শক্তিদান করিতেছে, একথা সাধারণ মানব বুঝিতে পারে না। বিজ্ঞান যতই উন্নত হউন না কেন, তিনি বলিয়া দিতে পারিবেন না আদিই বা কি অন্তই বা কি, আর এই সমস্ত আপাতবিরোধী ঘটনা বা পরিবর্ত্তনের মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্রই বা কি! জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা বিশ্বের ও মানবজীবনের এই শেষ মীমাংসাটুকু হয় না। দার্শনিকের মণীষা বিশ্বতত্ত্বও জ্ঞানতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়া দিতে পারেন যে যিনি পরমার্থ সত্য তিনি পুরুষ, এই বিশ্বপুরের তিনি অধিবাসী। আরও চিন্তা করিয়া বলিতে পারেন তিনি আদ্যপুরুষ। এই যে পুরুষের সহিত পুরের, দেহের সহিত দেহীর

সংযোগ ও বিয়োগ হইতেছে এই ব্যাপারে তাঁহার ইচ্ছাই কারণ। তিনি প্রকৃতির নিয়ামক এবং সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে তিনি বিদ্যমান। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত আমাদের এই তিন খানি দর্শন এই পর্য্যন্ত বলিলেন—এ পর্য্যন্ত বুঝিলাম, কিন্তু বুঝিয়া হইল কি? কেবল বুঝিলাম, দেখিতেও পাইলাম না ধরিতেও পাইলাম না, আপনার করিতেও পারিলাম না। তাই শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে তাঁহার স্তবে বলিলেন

"নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতং।"

তিনি অলক্ষ্য থাকিয়া গেলেন কেন? এইবার ইহাই প্রশ্ন। শ্রীশ্রী কুন্তীদেবী ইহার উত্তর দিলেন, বলিলেন

"ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা।" ইহার অর্থ শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এইরূপভাবে করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন একজন নর্ত্তক আসিল, সে খুব নিপুণ, আমি তাহার নাচ দেখিতে গেলাম। কিন্তু আমি নাচের কিছুই জানি না। ভাব ও রসের সহিত আমার পরিচয় নাই, আমি কেবল চক্ষু দুইটি লইয়া নাচ দেখিতে গেলাম। অঙ্গভঙ্গী দেখিলাম কিন্তু এই অঙ্গভঙ্গী দেখাই তো নাচ দেখা নহে; সে তো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ব্যাপার, সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে কেবল চক্ষু থাকিলেই নাচ দেখা হয় না, আরও একটা কিছু দরকার। সেইটি ভাব ও রসের সহিত হৃদয়ের পরিচয়। এই জিনিষটি কোথা হইতে আইসে তাহা মানুষ বলিতে পারে না—প্রাচীন আচার্য্যেরা বলেন ইহা ভগবানের দান, মানুষের অর্জ্জিত নহে।

যাইহোক্ এইটুকু পাইলেই মানুষ লীলাদর্শন করে। প্রত্যেক জীবনের মধ্যে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্ত্তে এই লীলা হইয়া যাইতেছে,

প্রত্যেককেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। শাস্ত্রে যে সমস্ত লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে, একটু ধীরভাবে সেই সমস্ত লীলা প্রাচীনেরা যে ভাবে বুঝাইয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে এই লীলাগুলি যেন বীজগণিত শাস্ত্রের কতকগুলি কশা অঙ্ক (Book Articles) এগুলি আয়ত্ত করিলে পর অঙ্ক কষিবার নিয়ম পাওয়া যাইবে এবং সেই নিয়মের সাহায্যে নিজের জীবনের যে সমস্যা তাহার মীমাংসা করিয়া আমরা ধন্য হইতে পারিব। অবশ্য যাঁহারা মীমাংসা করিতে চাহেন তাহাদেরই এই মীমাংসা হয়। প্রকৃতির শোভা অতি বিচিত্র ও অতি মনোহর তাহার মধ্যে ভগবানের প্রকাশ হইতেছে, বিশ্বের মর্ম্মস্থলে বসিয়া আনন্দময় পরমপুরুষ তাঁহার প্রেম বাঁশরী বাজাইতেছেন, সেই বাঁশরী রবে বিশ্ব নিত্য নূতনায়মান হইয়া উঠিতেছে। এই প্রকৃতির শোভার মধ্যে যতক্ষণ তাঁহাকে দেখি ততক্ষণ তাঁহার স্বরূপ আমরা ঠিক করিতে পারি না, তাঁহাকে আপনার করিতে পারি না। তত্ত্বের মধ্য দিয়া আলোচনা করিয়াও এই প্রকারে তাঁহার সহিত একটি দূরতার ব্যবধান হইয়া যায়। তাহার পর লীলা! ভক্তদিগের জীবনে তাঁহার লীলা ধরা পড়িয়া গিয়াছে—আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে এই ভক্তজীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্য দিয়া সেই লীলার তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহার পর আমরা নিজ নিজ জীবনে লীলা দেখিতে পাইবে। নিজের জীবনে লীলাদর্শন, ইহাই জীবনের পূর্ণ পরিণতি।

সেবাব্রত শশিপদবাবুও তাঁহার জীবনে এই লীলা দর্শন করিয়াছেন। নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম হইতে তিনি কিরূপ অনুশীলন করিয়াছেন, সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভক্ত ও সাধুদিগের সহিত তিনি কিরূপভাবে শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত সঙ্গ করিয়াছেন, সে কথা পূর্ব্বে কিছু কিছু বর্ণনাও করা গিয়াছে। সমস্ত সাধনার ও সমস্ত তত্ত্বালোচনার

শেষ কথা এই লীলাদর্শন, কিন্তু সেবাব্রত শশিপদবাবু জীবনের প্রথম হইতেই কেমন একটা স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বশে চিরদিনই অন্তরে বাহিরে লীলাময়ের এই লীলা দর্শন করিতেছেন। বড় বড় কার্য্যের মধ্যে লীলাময়ের হস্ত প্রত্যক্ষ করা তত কঠিন নহে, কিন্তু লীলাতো কেবলমাত্র বড় বড় কার্য্য লইয়াই নহে। "Each thing in its place is best" প্রত্যেক বস্তুই স্বস্থানে সর্ব্বোত্তম। প্রত্যেক বস্তুকে ঠিক স্বস্থানে দেখা—to see in right proportion ইহাই লীলাদর্শন। প্রকৃত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিকশিত হইলে কেবলমাত্র বড় বড় ঘটনায় নহে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায়ও এই লীলাদর্শন হইয়া থাকে। মানব সকল সময়ে এই লীলার রহস্য অপরকে বুঝাইয়া বলিতে পারেন না, বলিলে অপরে বুঝিতে পারে না, কেবল মাত্র যাঁহারা এই ভাবের ভাবুক, যাঁহারা মর্ম্মী তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারেন—এই কারণে লীলাগ্রন্থ পর্য্যন্ত ঠিক উপলব্ধি করা অনেকের পক্ষে কঠিন।

ছোট ছোট কার্য্যের মধ্যে লীলাময়ের হস্ত শশিপদবাবু কিভাবে অনুভব করিয়াছেন নিম্নের ঘটনাটি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত শশিপদবাবু দার্জ্জিলিং গমন করেন। যাইবার দিন বাড়ীতে বসিয়া জিনিসপত্র সাজাইতে সাজাইতে একখানি পুরাতন চিঠি তাঁহার হাতে পড়িল। চিঠিখানি বহুদিন পূর্ব্বে ঢাকা নববিধানের শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত, বঙ্গবাবু শশিপদবাবুর একজন পুরাতন ধর্ম্মবন্ধু। এই পত্রখানি যখন লিখিত হয়, তখন ব্রাহ্মসমাজের নবীন উদ্যমের কাল, তখনও কেশববাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বিরোধ হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সে এক বড় আনন্দ ও উল্লাসের, আশা, উদ্দীপনা ও প্রেমের দিন। বহুদিক হইতে বহুলোক একত্রে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাণে প্রাণে মধুর মিলন, ন্যায় ও সত্যের পতাকা

হস্তে লইয়া নানা বিপদ ও নানা নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হইব, এই দৃঢ় সঙ্কল্প সকলেরই চিত্তমধ্যে হোমানলশিখার মত প্রজ্বলিত হইতেছে। তাহার পর সেদিন চলিয়া গিয়াছে, কত ঘাত প্রতিঘাতের ঝড়ে সে আশার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বঙ্গবাবুর পত্রখানি পাঠ করিয়া যেন এক বৈদ্যুতিক শক্তি শশিপদবাবুর চিত্তমধ্যে হঠাৎ ক্রিয়া করিয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান ভুলিয়া সেই অতীতের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সমস্ত আশা উদ্দীপনা ও ভালবাসা যেন আবার চিত্তের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। শশিপদ বাবু এই ভাবের প্রেরণায় স্থির করিলেন বঙ্গবাবুকে একখানি পত্র লিখিতে হইবে। পত্র লিখিবার জন্য প্রাণে একটি ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিল। এইকথা মনে হইল বটে কিন্তু পত্র আর লেখা হইল না। কাজের ভিড়ে আর সময় হইল না। তাহার পর তিনি দার্জ্জিলিঙ্ গেলেন। দার্জ্জিলিঙে বাস করিবার সময় একদিন রাত্রিকালে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে স্বপ্নযোগে দর্শন করিলেন। এই ঘটনা অবশ্য কেশববাবুর মৃত্যুর পরের ঘটনা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর যে মতের অনৈক্য ছিল না তাহা নহে—সংসারে এরূপ মতের অনৈক্য হইয়াই থাকে। কেশবচন্দ্রের প্রতি শশিপদবাবুর অগাধ ভক্তি ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। প্রথম যৌবনের ধর্ম্মবন্ধু, তিনি কেশববাবুর নিকট কত উপকার পাইয়াছেন তাহার সীমা নাই। কেশবচন্দ্রের হৃদয় যখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে বিগলিত হইয়া, সেই উচ্ছ্বাস অমৃতময় মধুর বাক্যের মধ্য দিয়া শত শত শ্রোতার পাষাণহৃদয় বিগলিত করিয়া উপাসনা স্থলে এক মহাভাবের বন্যা বহাইয়া দিত, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! শশিপদবাবু এই ভাববন্যায় কতদিন ভাসিয়াছেন, চিত্তের মধ্যে কত দিন কত বড় বড় আনন্দবার্ত্তা জাগিয়া উঠিয়াছে, নয়নযুগলে কত অশ্রুধারা

রহিয়া গিয়াছে—এই সব সুখের স্মৃতি শশিপদ বাবুর জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ—বড় যত্নে এই স্মৃতি তিনি ভক্তিপুষ্পে প্রত্যহ হৃদয়ের অন্তরতমস্থলে পূজা করিয়া থাকেন।

আজ তিনি পবিত্র হিমালয় পর্ব্বতের উপর আসিয়াছেন, মহাযোগীর মত এই পর্ব্বত কতকাল ভারতবর্ষের শিয়রে অভিভাবক ও গুরুর মত ধ্যান সমাধিতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, নিজের পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অমৃত বারির ধারা বিতরণ করিয়া ভারতভূমিকে ধন্য করিতেছেন। কত যোগী ঋষি সাধু তপস্বী, ভক্ত ও যাজ্ঞিকের পুণ্যস্মৃতি এই পর্ব্বতের প্রতি অনু পরমানুতে এখন ও সজীব হইয়া রহিয়াছে, এই হিমালয় পৃষ্ঠে বসতি কালে কেশব বাবুর সহিত স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ—সে আনন্দ অবর্ণনীয়।

স্বপ্নে দেখিলেন, কেশবচন্দ্রের সহিত অনেক কথা বার্ত্তা হইল। কি কথা হইল তাহা আর সকাল বেলায় তাঁহার ঠিক মনে আসিল না। তবে প্রাতঃকালে হৃদয় এক আনর্ব্বচনীয় আনন্দ রসে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহা বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন।

তাহার পর সকালে ইণ্ডিয়ান্ মিরার পত্র আসিল। পত্র খানি খুলিয়া দেখিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গবর্ণমেণ্টকে বালকদিগের নীতিশিক্ষাদান সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্র খানিও মিরর পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। পত্র খানি পড়িয়া শশিপদ বাবুর মনে বড় আনন্দ হইল, প্রতাপবাবু তখন শিমলা পাহাড়ে ছিলেন। শশিপদবাবু প্রতাপবাবুকে সঙ্গে সঙ্গে একখানি পত্র লিখিলেন। এই পত্রে তিনি প্রতাপবাবুর মন্তব্যগুলির সহিত নিজের ঐকমত্য জ্ঞাপন করার পর তাঁহাকে লিখিলেন যে ভগবানের বিধানে আপনার ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত একযোগে কার্য্য করার সুবিধা আপনার হইয়া উঠিল না। যাহা হউক ভগবানের লীলা বড়ই চমৎকার,

ভগবান আপনাকে আর এক নূতন ও আবশ্যকীয় কর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া যাইবেন। আপনার এই পত্রখানি পড়িয়া এই তত্ত্বটুকু আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। যাঁহারা শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় প্রতাপ বাবুর উত্তর জীবন অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে শশিপদ বাবুর এই বাক্য কিরূপে সফল হইয়াছিল। কলিকাতার ছাত্রগণের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট প্রতাপ বাবুর জীবনের একটি কীর্ত্তি।

সেইদিন বিকালে দার্জ্জিলিঙের Union Chapel এ উপাসনায় যোগ দিবার জন্য শশিপদ বাবু নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি এই উপাসনায় গিয়া বসিলেন, চাহিয়া দেখেন অদূরে বঙ্গবাবু বসিয়া রহিয়াছেন।

শশিপদ বাবু মনেও করিতে পারেন নাই যে এই স্থানে বঙ্গবাবুর সহিত দেখা হইবে। তাঁহাকে দেখিবার মাত্রই তাঁহার হৃদয়ের এক গুপ্ত কক্ষের দ্বার যেন সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, এক নূতন চিণ্ময় আলোক যেন তাঁহার সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত হইল, এই আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন যে পূর্ব্বের ঘটনাগুলি সম্বন্ধহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে, তাহাদের মধ্যে এক অপূর্ব্ব যোগ সূত্র রহিয়াছে।

উপাসনা শেষ হওয়ার পর তিনি বঙ্গবাবুকে সাশ্রু নয়নে ও সপ্রেমে আলিঙ্গন করিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপে সমস্ত কথা —তাঁহার পুরাতন পত্র প্রাপ্তির কথা, তাঁহাকে পত্র লিখিবার সঙ্কল্প ও তাহা না হওয়ার কথা, তাহার পর কেশববাবুকে স্বপ্নযোগে দর্শন, পরে প্রতাপবাবুর পত্রপাঠ ও তাঁহাকে পত্র লেখা এই সব কথা বলিলেন। শশিপদবাবুর চিত্ত কেমন একটা অনির্ব্বচনীয়ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে নানা ঘটনা ঘটিতেছে, নানারূপ ভাবনা ও কল্পনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিত্তের মধ্যে জাগ্রত হইতেছে। কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে যে একটা অন্তর্নিহিত ও অতি

অপূর্ব্ব যোগসূত্র রহিয়াছে তাহা আমরা সচরাচর ধরিতে পারি না। সংসারের কোলাহলে ও প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আমরা অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সমস্ত ব্যাপার মিল করিয়া দেখিতে পারি না—মিল করিয়া দেখিতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে কোনও ঘটনা বিচ্ছিন্ন নহে, প্রত্যেকটির সহিত প্রত্যেকটীর অতি গূঢ় ও গভীর যোগ আছে—এই যোগদর্শনের দৃষ্টি আমাদের এখনও বিকশিত হয় নাই বলিয়াই আমরা জীবনরহস্যের ও জগৎরহস্যের যথার্থ মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারি না। তাহার পরদিন শশিপদ বাবু নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের কথা মনে উদিত হইল।

ভাবিলেন দাৰ্জ্জিলিঙ, হইতে বাড়ী ফিরিয়া একদিন ত্রৈলোক্যবাবুকে বিধবাশ্রমে আনিয়া গান করাইবেন। এই চিন্তা সেদিন তাঁহার মনের মধ্যে থাকিয়া গেল। পরদিন সকালে স্বাস্থ্যাবাসে (Sanitarium) বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ ত্রৈলোক্য বাবু সেখানে যাইয়া উপস্থিত। পর পর এতগুলি ঘটনা ঘটিয়া গেল, সকলেরই জীবনে এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পর পর সংঘটিত ঘটনাগুলি গভীর ভাবে আলোচনা করার অবসর এই ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের প্রায়ই ঘটিয়া উঠেনা। শশিপদ বাবু দাৰ্জ্জিলিঙ্ বাসকালে এই ঘটনা গুলি চিন্তা করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে ডুবিয়া গেলেন, তাঁহার এক নূতন দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। এই ঘটনাটি তিনি প্রায়ই বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার চিন্তার স্রোত এক নূতন পথে চলিতে লাগিল। এই বিশ্ব ভগবানের লীলা-হস্তের ইঙ্গিতে চলিতেছে। সমস্ত ঘটনাগুলিকে পর পর তিনিই সাজাইয়া চলিয়াছেন। কি প্রকারে লীলা দর্শন হয় তাহার একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

শশিপদ বাবু সকলকে উপদেশ দেন এবং নিজেও খুব গভীর ভাবে চিরকাল উপলব্ধি করেন যে আকস্মিক ঘটনা (Accident) বলিয়া একটা জিনিষ নাই। বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছেন যে জড় জগতে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম খেলা করিতেছে, ভগবানের লীলার ইচ্ছা এই সমস্ত নিয়মের ভিত্তি। সমস্ত ঘটনা ও সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সেই আনন্দময় পুরুষ আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। আকস্মিকতা জগতে নাই—সমস্ত জগৎ এক মহা শৃঙ্খলে বদ্ধ, এই তত্ত্বটুকু তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতেই শশিপদ বাবু উপলব্ধি করেন। কিন্তু এই যে উপলব্ধি, ইহার মধ্যে ঘটনাগুলির যোগ এমন জটিল ভাবে অনেক সময় থাকে যে তাহা অপরকে বুঝাইয়া বলিতে পারা যায় না, বিশ্বাসী মন তাহা বুঝিতে পারে, বুঝিয়া আত্মহারা ও উৎফুল্ল হয় এবং সেই হৃদয়েশ্বর পরম দেবতাকে নিবিড় স্পর্শের মধ্যে লাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় ভাব সাগরে ডুবিয়া যায়, কিন্তু সেই যোগটুকু যে কি, তাহা একা মর্ম্মীজন ব্যতীত অপরকে বুঝাইয়া বলা চলেনা।

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে এই লীলাদর্শনের কথা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমাদের ব্যক্তিগত লাভালাভ ও জয় পরাজয়ের ভূমি হইতে, অথবা অহঙ্কারের ভূমি হইতে যাহা দেখা ও বুঝা যায় তাহার নাম ভবদর্শন, আর শ্রীভগবানের চরণে লীন হইয়া তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছার বা হ্লাদিনী শক্তির বিলাস রূপে যাহা অনুভব করা যায় তাহাই লীলা। এই দুই প্রকারের দর্শনে ও উপলব্ধিতে যে কত প্রভেদ তাহা একরূপ বর্ণনাতীত। যে কোন লীলা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কালিয় নাগ, মূঢ় ও অহঙ্কারী (মূর্ত্তিমান তমোগুণাভিমুখী রজোগুণ), সে সমাজের স্থিতির বিরুদ্ধে তাহার বিদ্রোহের বিষময় ফণা উত্তোলন করিল, গরুড়ের সহিত তাহাদের সন্ধির যে সর্ত্ত ছিল সেই সর্ত্ত ভাঙ্গিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল, যুদ্ধে

কালিয় পরাস্ত হইল, রমণক দ্বীপ হইতে গরুড়ের বাম পক্ষের আঘাতে বিতাড়িত হইয়া কালিন্দী হ্রদে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। কালিন্দী হ্রদকে সে বিষময় করিয়াছে, তৃণ জন্মায় না, পাখী পর্য্যন্ত সে খানে আসিতে পারে না। আমরা দেখিতেছি যে কালিয় ক্রমাগত দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন লীলা দেখা গেল তখন সমস্যার মীমাংসা হইল, আমরা দেখিলাম কালিয় যত দূরে যাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে সে না জানিয়া তত নিকটে আসিতেছে। রমণক দ্বীপ হইতে সে আসিয়া কালিন্দী হ্রদে আশ্রয় পাইল। যেমন একটী বৃত্তের পরিধির উপর ভ্রমণ করিবার সময় আমরা মনে করি দূরে পলাইতেছি, কিন্তু আমাদের এই পলায়নই প্রকৃত প্রস্তাব বৃত্তের যাহা শীর্ষ-বিন্দু তাহার নিকটবর্ত্তীতা! লীলাদর্শনের এই একটী সত্য সকল দেশের ভক্তগণই মানবকে অনুভব করিতে উপদেশ দিয়াছেন। খৃষ্টীয় শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে অমিতব্যয়ী পুত্র পিতার টাকা কড়ি লইয়া বিদেশে গিয়া সব নষ্ট করিয়া শেষে নিরুপায় হইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল, পিতা তাহাকে বক্ষে ধরিয়া আদরে আলিঙ্গন করিলেন সে দিন বাড়ীতে মহামহোৎসবের আয়োজন হইল। বড় ছেলে মিতব্যয়ী, সে ভাবিল আমি পিতার সুপুত্র, আমাকে পিতা বন্ধু বান্ধবদের ভোজ দিতে একটী পয়সা দেন না, আর আজ এই অমিতব্যয়ী আসিয়াছে, হয় ত সে আরও কত অমিতব্যয় করিবে তাহার জন্য এই ভোজ। মিতব্যয়ী পুত্রের দিক হইতে দেখিলে তাহার কথাই সত্য মনে হইবে। ইহার নাম ভবদর্শন। এ ভাবে দেখিলে প্রধান ভক্তগণের অনুভূতি ঠিক বুঝিতে পারিবনা। পিতার স্নেহময় হৃদয়ের মধ্য দিয়া দেখিলে আমাদের লীলা দর্শন হইবে এবং তখন আমরা এই ঘটনার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিব। ভগবান আনন্দময় তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস বিশ্ব-ঘটনায় নিত্য প্রকটিত হইতেছে। এইটুকু ধরিতে পারিলে মানবজীবনে

এক নূতন দৃষ্টি বিকশিত হয়। এই দৃষ্টি আসিলে মানব শ্রীভগবানের চিহ্নিত দাস হইয়া পড়ে, তিনি প্রতি কার্য্যে ও প্রতি কথায় জগতে আনন্দ রশ্মি বিকীরণ করিতে থাকেন।

শশিপদ বাবুর বয়স যখন চারি বৎসর, সে সময় তাঁহার পিতা জীবিত। সে সময়ে তাঁহার পিতা বরাহনগর নিয়োগীপাড়ায় এক বসত বাড়ী খরিদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বায়না স্বরূপ ঐ বাড়ীর স্বত্বাধিকারীকে কিছু টাকাও অগ্রিম দিয়াছিলেন, বাড়ী ক্রয় করিবার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই সময়ে শশিপদ বাবুর পিতামহী একদিন তাঁহাকে কোলে করিয়া নিয়োগী পাড়ার এই বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলেন।

যাহা হউক সে সময়ে এ বাড়ী তাঁহাদের লওয়া হয় নাই। তাঁহার পিতার মৃত্যুই ইহার কারণ।

বহু দিন পরে শশিপদ বাবুকে বাধ্য হইয়া যে সময়ে পৈতৃক বাস-ভবন পরিত্যাগ করিতে হইল, সেই সময়ে তিনি যাইয়া এই নিয়োগী পাড়ায় ঐ বাড়ীর নিকটেই বাসস্থাপন করিলেন। শশিপদ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেদার বাবু কলিকাতায় মাতুলের সম্পত্তি এক বাস বাড়ী পাইয়া বরাহনগর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া কিছু কাল বাস করেন —পরে তাঁহাকেও আবার বরাহনগরে যাইতে হইল এবং তিনিও ঐ নিয়োগী পাড়াতেই বাস করিতে লাগিলেন। সাধারণ লোকের চক্ষুতে ঘটনাটি অতি সামান্য বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু শশিপদ বাবু বলেন যে তাঁহার পিতার নিয়োগীপাড়ায় বাস করিবার এই ইচ্ছা ও পরে তাঁহার দুই পুত্রের নিয়োগীপাড়ায় বাস, এই ঘটনারও অন্তর্নিহিত রহস্য আছে। ইহার মধ্যেও তিনি লীলাময়ের লীলা হস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এই যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হইল, ইহা পড়িয়া একজন লোকের

মনে হইবে যে ইহা আর এমন কি, যাহা আলোচ্য। এরূপ মনে হওয়াই সম্ভব। সাধু মহাত্মা লালা বাবুর কথা সকলেই জানেন। মেছুনী বলিল, "বেলা গেল, পারে যেতে হবে" এই কথাতেই লাল বাবুর জীবনের গতি ফিরিয়া গেল, তিনি তীব্র বৈরাগ্য পথ আশ্রয় করিয়া মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মেছুনীর এই কথাটিও কিছু নহে, কিন্তু লালা বাবুর হৃদয়ে তাহার যে ধ্বনি উদিত হইল তাহা কত অসাধারণ! আমরা যে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম তাহা শশিপদ বাবুর চিত্তে কি ভাবে সমুদিত হইয়াছিল, অথবা তিনি এই সামান্য ঘটনার অন্তস্তলে কি অসাধারণ ভাবের বিকাশ দেখিয়াছিলেন তাহা ঠিক বর্ণন করা অত্যন্ত কঠিন। তবে আমরা এই ভাবে ব্যাপারটা বুঝিতে পারি। এই বর্ত্তমানে আমরা বাস করিতেছি, অনন্ত কালের অতীত এই বর্ত্ত-মানে পরিণতি লাভ করিয়াছে,আর অনন্ত কালের ভবিষ্যৎ এই বর্ত্তমানে বীজরূপে ঘুমাইয়া রহিয়াছে, কালের এই যে তিন খুঁট এক সঙ্গে যিনি ধরিয়া রহিয়াছেন তিনি মহাকাল, এই যে লীলাময়ী প্রকৃতি যিনি কখন হাস্যময়ী, আবার কখন প্রলয়ঙ্করী, অথচ এই কঠোর ও মধুরের সংমিশ্রণে আনন্দময়ী জননী তিনি এই মহাকালের বুকের উপর নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন। পূর্ব্বের ঘটনায় এই ভাবটিই অস্পষ্টভাবে শশিপদ বাবুর চিত্তে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তিনি জননীর করুণ হস্তের স্নেহ স্পর্শ অকস্মাৎ অনুভব করিয়া এক নবচেতনায় জাগিয়া উঠিলেন। লীলা-অনুভূতি এই ভাবে সকল সময়ে ও সর্ব্বত্র হয়, তাহা স্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

শ্রীভগবানের লীলা-দর্শনের ফলে ভক্ত সাধক জীবনে সেই ভগবানের কৃপার জয় প্রত্যক্ষ করেন। শ্রীভগবান মধু হইতেও মধু, তিনি 'প্রাণ বঁধু' এই করুণার জয় প্রত্যক্ষ করাই মানবজীবনের শেষ সফলতা। 'ভগবানের কৃপার জয়' ইহাই সমগ্র জীবন ব্যাপারের উপসংহার।

চিরকাল ভক্ত সাধুগণ এই কৃপার জয় প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের এই বিজয় ঘোষণার ধ্বনি জগতের সকল জাতির সাহিত্যকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে।

যিনি এই কৃপার জয় প্রত্যক্ষ করেন, ইহার রহস্য তাঁহারাই বোঝেন আর যাঁহারা অন্তর্মুখী হইয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়েন তাঁহারাও নিজ নিজ শক্তি অনুসারে বুঝিতে পারেন। জগতের সাধারণ বহির্মুখ লোকে এই কৃপার জয়ের স্বরূপ ঠিক বুঝিতে পারে না। একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। মহাত্মা খৃষ্টের জীবন-লীলা হইতে আমরা ইহা বুঝিতে পারি। ভক্তগণ জানেন তাঁহার জীবন শ্রীভগবানের কৃপার জয়। কিন্তু একজন বহির্মুখ সাধারণ মানব মহাত্মা খৃষ্টের জীবন সম্বন্ধে যদি সরলভাবে নিজের মনোভাব সাহস করিয়া বলিতে পারেন তাহা হইলে বলিবেন "জীবনে কি আর হইল, শেষে ক্রূশ কাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া সামান্য আসামীদিগের সহিত জীবন শেষ করিতে হইল।" মহাত্মা খৃষ্ট সম্বন্ধে সাধারণ ইন্দ্রিয় সর্ব্বস্ব ও ইহসর্ব্বস্ব-বাদী লোকে হয়ত সাহস করিয়া এত বড় একটা কথা বলিতে পারিবে না, কিন্তু এই জড়বাদের যুগে আমাদের সাধারণ চিন্তা পদ্ধতি এইরূপ। রাজা হইল না, বাদশাহ হইল না, একটি ধনশালী পরিবার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না, সাহিত্য রাজনীতি বা দর্শন বিজ্ঞানে একটা স্থায়ী নাম রাখিয়া যাইতে পারিল না, কি হইল! জীবনটা নষ্ট হইয়া গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে একখানি বিখ্যাত বাঙ্গালা মাসিক পত্রে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী ও উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি সরলভাবে এই প্রকারের কথা লিখিয়াছিলেন। শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একজন একালের ইংরাজী-নবিশ বিখ্যাত ধর্ম্মবক্তা এই প্রকারের কথা বলিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মবক্তা মহাশয় পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের

উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন, যে সম্প্রদায়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপা তুল্যরূপে বিদ্যমান সেই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, অতএব বৃক্ষতলবাসী দরিদ্র ও একরূপ নিরক্ষর পরমহংসদেব তাঁহার নিকট একজন সামান্য ঈশ্বরবিশ্বাসী সরল গ্রাম্যলোক ছাড়া বেশী কিছু নহেন। কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, মহাত্মা খৃষ্ট ও শ্রীমৎ পরমহংসদেবের কৃপায় কত পতিত সাধুজীবনের স্বর্গীয় আলোকে উন্নীত হইয়াছে, কত বড় বড় প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা তাঁহাদের চরণ আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছে। এই জন্যই বলিতেছিলাম লীলা দর্শন করিয়া ভক্ত সাধক যে শ্রীভগবানের কৃপার জয় দর্শন করেন, তাহা যিনি বোঝেন তিনিই বোঝেন, আর যিনি অন্তরঙ্গ তিনিও বোঝেন।

আমরা সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনে এই লীলা দর্শনের কথা উল্লেখ করিয়াছি—তিনিও সমস্ত ব্যাপারে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের কৃপার জয় প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় মধ্যে সেই হৃদয়রাসমন্দিরবিহারী শ্রীহরির রাঙ্গাচরণ দুখানি লাভ করিয়া পরমোপশান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লীলা দর্শন করিয়া মানব যাহাতে জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে শ্রীভগবান তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি বাহিরের জগতে যেমন, "যেখানে যা সাজে তাই দিয়া সাজায়ে" রাখিয়াছেন তেমনি আমাদের প্রত্যেকের জীবনকেও যেখানে যে ঘটনাটি দিলে ঠিক হয়,সেখানে সেই ঘটনাটি দিয়া নিত্যকাল সুশোভিত করিতেছেন। ভক্তগণ অনুভব করিয়াছেন ও এখনও অনুভব করিয়া থাকেন যে শ্রীভগবানের কৃপা শক্তি সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় মানবকে মঙ্গলে ও আনন্দে লইয়া যাইতেছেন। আমরা অহঙ্কারের যবনিকা পাত করিয়া অর্থাৎ আমি আমার নিজের শক্তিতে সমস্ত করিতেছি এই প্রকারের ভ্রান্ত কল্পনার কুহকে পড়িয়া তাঁহার করুণ হস্তের এই ক্রিয়া ধরিতে পারি না।

ভগবান নিত্য সন্নিহিত, প্রত্যেক অনু পরমানুটিতে পর্য্যন্ত নিত্য ক্রিয়ান্বিত, মানব আত্মার তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, জীবনকে একটু মুক্তভাবের মধ্যে ছাড়িয়া না দিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় না। কেবল আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে এ রসের আস্বাদন হয় না। ভগবানের কার্য্য বলিয়া কোনও মহৎ কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ করিয়া, ভগবচ্চিন্তার স্রোতে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু জীবনের প্রথম হইতেই নিজকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি পদে পদে লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসম্বিদো।
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাকথাঃ।"

সাধুগণের নিকট শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে উপবেশন করিলে ভগবানের লীলার কথাই শুনিতে পাওয়া যায়; এই যে কথা ইহা হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন।

"তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরণুক্রমিষ্যতি।

এই কথা শুনিতে শুনিতে তৎক্ষণাৎ অপবর্গবর্ত্মে শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি জাগিয়া থাকে।

যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ভাবে কখনও সেবাব্রত শশিপদ বাবুর সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বিশ্বব্যাপার উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি টুকু বুঝিতে পারিবেন। তিনি জীবনে অনেক বিপদে পড়িয়াছেন, বিপদে পড়িয়াই তিনি ভগবানে নির্ভর করার জন্য ভগবানের কৃপা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,এই সব লীলা তিনি সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করেন, বলিতে বলিতে হৃদয় গলিয়া যায়; জীবনের, সামান্য ঘটনাতেও তিনি ভগবানের কৃপার প্রকাশ দেখিয়াছেন বলিয়া সামান্য বলিয়া মনে করেন, তিনি যাহাদের ভালবাসেন তাঁহাদের নিকট নিজের জীবনের ঘটনা বলেন

কিন্তু নিজের কৃতীত্ব দেখাইবার জন্য নহে; ভগবানের কৃপার জয় কি প্রকারে হইতেছে তাহাই দেখাইবার জন্য। শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে এই সব কথা শুনিলে দুর্ব্বলের হৃদয়ে বল আসে, শোকার্ত্ত সান্ত্বনা পান, প্রাকৃত লোকের ভগবদ্বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হয়।

স্ত্রীর ব্যায়ারাম, অতি ভয়ানক ব্যায়ারাম, সেবা করিবার কেহই নাই, নিজেই সব করেন, এমন সময়ে আপনা হইতে একজন দাসী আসিয়া উপস্থিত, প্রাণপণ যত্নে সেবা করিল, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল, সে দাসী কাঁদিল। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু বলেন রোগীর সেবার জন্যও কেহ ছিল না, মৃত্যুর পর কাঁদিবার জন্যও কেহ ছিল না, এই দাসীর দ্বারা উভয় কার্য্যই হইল। এমন ঘটনা কতবার হইয়াছে! আজ টাকা নাই, শশিপদ বাবু জানেন টাকা আসিবে. আসিয়াও থাকে। বরাহনগরে ইন্‌ষ্টিটিউট্ ঘর মেরামত করিতে হইবে টাকা নাই শশিপদ বাবু কাজ আরম্ভ করাইলেন, টাকা আসিল। তিনি বলেন আমার যাহা প্রয়োজন তাহা ভগবান দিবেন, তবে আমি যদি হাজার রকম অকারণ প্রয়োজন সৃষ্টি করি তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। তিনি সমস্ত ঘটনাকে "হরি কথা" করিয়া ফেলিয়াছেন; ইহাই লীলা দর্শন।

এই লীলা দর্শন বিষয়ে আমরা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শিরোরত্ন মহাশয়ের লিখিত একটি বিবরণ তাঁহার অনুমতি অনুসারে নিম্নে প্রকাশ করিলাম। পণ্ডিত শিরোরত্ন মহাশয় সাতক্ষীরার বিখ্যাত চৌধুরী বাবুদিগের গুরুবংশীয় তিনি অশেষশাস্ত্রপারদর্শী সাধক-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজেও আজীবন শাস্ত্র চর্চ্চাই করিয়াছেন। তিনি কর্ম্মসূত্রে প্রায় তিরিশ বৎসর কাল শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর অতীব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বাস করিয়াছেন। তিনি শশিপদ বাবুর জীবন কথা সম্বন্ধীয় অনেক উপকরণ লিখিয়া রাখিয়াছেন—তাহার মধ্যে অনেক মূল্যবান ও সর্ব্বজন জ্ঞাতব্য বিষয় আছে—আমরা নিম্নের অংশ পণ্ডিত

মহাশয়ের লিখিত বিবরণ হইতে তাহার অনুমত্যানুসারে মুদ্রিত করিলাম।

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে ভগবানের কৃপায় জয়।

এই পৃথিবীতে যে সকল লোক নিজ জীবনে ভগবানের কৃপা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই দুঃখের সংসারে পালিত, দারিদ্র্যের নিষ্পেষনে নিষ্পেষিত, বিপত্তি জালে জড়িত। দুঃখ, দারিদ্র্য ও বিপত্তি এই তিনটি প্রশ্নের দ্বারা বিধাতা তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি বিধাতার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চান, বিধাতাপুরুষ ঐ তিনটি প্রশ্ন দিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। যিনি এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তনি তাঁহার কার্য্যের উপযুক্ত, যিনি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তিনি ভগবানের কাজের অনুপযুক্ত, সুতরাং তাঁহার পুরস্কার স্বরূপ যে তাঁহার কৃপানুভব, তাহা আর ঐ ব্যক্তি নিজ জীবনে করিতে পারেন না। তখন তিনি ভগবানকে ছাড়িয়া মোহ বশতঃ সংসারেব দাসত্বে আপনাকে নিয়োজিত করেন; সংসারের সেবা করিতে করিতে ক্ষণিক সাংসারিক সুখ লাভ হয়, সাংসারিক অভাবত দূর হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক সুখ ও আধ্যাত্মিক সম্পত্তিরূপ যে ভগবানের কৃপা, তাহা আর তিনি অনুভব করিতে পারেন না। তিনি তখন সংসারের দাস, সয়তানের শিষ্য, সুতরাং বিধাতার বিপক্ষ। করুণাময় সর্ব্বজ্ঞ দেব, সেই বিপক্ষ দৈত্যকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য, সংসারের সুখ সম্পত্তি সে যাহা চায় তাহাই তাহাকে দেন, সে যখন তাহাতে সম্পূর্ণ আসক্ত হয়, তখন দয়াময় তাঁহার সংসার সয়তানকে ধ্বংশ করেন বা কাড়িয়া লন। আর যিনি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, বিধাতা তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহার কার্য্য

তাঁহার সেবা, সেই বিশ্বপতির দান লইয়া তাঁহার বিশ্বের সেবা. দুঃখীর দুঃখ-মোচন, দরিদ্রের অভাব খণ্ডন, বিপন্নের বিপদ-ভঞ্জন। এই তিনটিই ভগবানের কাজ, ভগবান অনুরক্ত ও ভক্ত সেবকের দ্বারা ঐ তিনটি কাজ করাইয়া লন, সুতরাং যিনি ভগবানের সেবক তাঁহাকে ঐ তিনটি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, দুঃখীর দুঃখ তাঁহাকে মোচন করিতেই হইবে, দরিদ্রের অভাব দূর করিতেই হইবে, বিপদগ্রস্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেই হইবে। দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে গেলে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়, নিজে কষ্টে পড়িতে হয়, দরিদ্রের অভাব খণ্ডন করিতে গেলে নিজে অভাবগ্রস্ত হইতে হয়, বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করিতে গেলে নিজে বিপন্ন হইতে হয়, সুতরাং সাংসারিক দুঃখ, দারিদ্র্য ও বিপদ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একটি পুরস্কার লাভ হয়, যাহা অতি দুর্লভ, ভগবানের কৃপানুভব। শশিপদবাবু একজন ভগবানের সেবক, তিনি ভগবানের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তাই দুঃখ-দারিদ্র্য ও বিপদ তাঁহার চিরসাথী। বিধাতা শৈশব হইতেই তাঁহাকে দুঃখের আগুনে ফেলিয়া দারিদ্র্যের লৌহ মুদ্গরে পিটিয়া তাঁহার পরীক্ষা করিয়াছেন। শশিপদবাবু যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন তাঁহার জননী অত্যন্ত পীড়িতা, সঙ্কট অবস্থা-পন্না, সেজন্য তাঁহার প্রতিই বাটীর সকলের দৃষ্টি, প্রসূতি যাহাতে রক্ষা পান সে জন্য সকলে ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত, সুতরাং ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রতি কাহারও যত্ন করিবার তত অবকাশ ছিল না। শশিপদবাবু যদি জননীর প্রথমপুত্র হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি সকলের অন্ততঃপক্ষে কিয়ৎপরিমাণ দৃষ্টি ও যত্ন পড়িত, শশিপদবাবু তৃতীয়পুত্র, সেজন্য তাঁহার প্রতি কাহারও তত দৃষ্টি নাই, তাঁহার মাতার জন্যই সকলে ব্যতিব্যস্ত। সেই হেতু শশিপদবাবুর জন্মনক্ষত্রের সময় ও লগ্ন

কেহ দেখেন নাই, এজন্য তাঁহার জন্মপত্রিকা, কোষ্ঠি কিছুই প্রস্তুত হয় নাই। শশিপদবাবু সেই অসহায় সদ্যপ্রসূত অবস্থায় জননীর অভাবে বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের যত্নের অভাবে জীবিত রহিলেন। যাহাহউক ভগবান তাঁহার জননীকে ও তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। শশিপদবাবুর বয়স যখন দেড় বৎসর, তখন একদিন তাঁহার পিতামহী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ছাদ হইতে নামিতেছেন, এমন সময় ত্রিতল ছাদের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ক্রোড়স্থ শিশুর সহিত দ্বিতীয় তলে পতিত হইলেন, তিনি তাহাতে ভয়ানক আঘাতপ্রাপ্ত হন; তাঁহার জঙ্ঘা হইতে অনর্গল রক্তধারা বহিতে থাকে। কিন্তু তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুর কোনও স্থানে আঘাত লাগে নাই। পরে তাহাকে আঘাতের কথা জিজ্ঞাসা করাতে পূর্ব্বদিন আগুনে তাহার পদতলের একস্থান একটু পুড়িয়াছিল, তখন তাহার ক্ষত বা বেদনাদি কিছুই ছিল না, সে সেই স্থানে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিতে লাগিল। তাহাতেই সকলে বুঝিলেন যে, সেদিনকার এই ভয়ঙ্কর পতনে, এই সাংঘাতিক ঘটনাতে ঐ শিশুর গাত্রে কোথাও একটুও আঘাত লাগে নাই। ভগবান সে দিনও এই শিশুকে রক্ষা করিলেন। সে দিন যদিও তাঁহার অঙ্গে কোন আঘাত লাগে নাই, কিন্তু সেদিনকার সেই ঘটনাটি স্মরণ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে সেদিন বালকের কোমল প্রাণে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছিল। শশিপদবাবু শৈশবে কাহারও আদর যত্ন পান নাই। তাঁহার পিতামহী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, শশিপদবাবুর এক খুল্লপিতামহী ছিলেন তিনি শশিপদবাবুর মধ্যম ভ্রাতাকে খুব আদর করিতেন, শশিপদবাবুর জননী একে অসুস্থা, তাহাতে গৃহকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকাতে সন্তান-দিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তত লইতে পারিতেন না, সুতরাং শশিপদ বাবুকে আদর যত্ন করিবার লোক কেহই ছিলেন না। তিনি "ফেলা

ছেলের” মত ছিলেন, শশিপদবাবুর ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় যখন তাঁহাদের বাটীর কোনও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইত, তিনি তখনই বলিতেন “শশি আমিইত তোকে মানুষ করেছি” এইরূপ বাটীর অনেক বৃদ্ধা বলিতেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, শশিপদ বাবু বাটীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজনের অত্যধিক স্নেহ আদর পান নাই, অনেকের কৃপাসম্বলিত স্নেহে ও যত্নে তিনি লালিত হইয়াছেন। ভগবান যেন শশিপদবাবুকে অনেকের সেবাতে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া বাল্য হইতেই তাঁহাকে এইরূপ অনেকের স্নেহে ও যত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন। শশিপদবাবু যখন শৈশবের অজ্ঞানাবস্থা অতিক্রম করিয়া পঞ্চমবর্ষে পতিত হইলেন, যখন তাঁহার জ্ঞান বাহ্য জগতে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতেছে, যখন তিনি জনক জননীকে চিনিয়াছেন, জনক জননীর স্নেহ বুঝিয়াছেন, এবং তাঁহার সেই কোমল প্রাণে পিতা-মাতাকেই ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন সেই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ফেলিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। মৃত্যু কাহাকে বলে তিনি তখন তাহা বুঝিতেন না, কিন্তু তাঁহার মাতার ক্রন্দনে যখন বুঝিলেন যে তাঁহার বাবা আর আসিবেন না, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না, তখন সেই বালকের প্রাণে কি বিষম আঘাত লাগিল! সুখের কৌমার বয়সের প্রথমেই এই দারুণ আঘাত। তাঁহার শোকাতুরা জননী অতি ক্লেশে সন্তান কয়টীকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জননীর হস্তে সামান্য অর্থ ছিল, তিনি সাবধানে সেই অর্থদ্বারা সন্তান-দিগকে রক্ষা করিতেও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ঐ বুদ্ধিমতী জননী, সন্তান ভিন্ন আর কিছুতেই অর্থব্যয় করিতেন না, এবং সাংসারিক ব্যয়ে ও অতি মিতব্যয়িনী ছিলেন, তথাপি তাঁহার সামান্য অর্থ অল্প দিনের মধ্যেই নিশেঃষিত হইল। প্রথম দুই পুত্রের শিক্ষা সমাপ্তির পরে তাঁহার হস্ত শূন্য হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার আর এক দুঃখের

কারণ উপস্থিত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের অসদ্ব্যবহার এবং চরিত্রগত দোষের জন্য তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সালকিয়া স্কুলের হেডমাষ্টার হওয়াতে তিনি সাংসারিক অনাটন কথঞ্চিৎ দূর করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রের ব্যবহারে তিনি আরও কাতর হইলেন। পুত্র ভাবিতেন মাতার নিকট আরও অর্থ আছে, এজন্য মাতাকে অর্থ সাহায্য করিতেন না। বাস্তবিক শশিপদবাবুর মাতার হস্তে তখন কিছুই ছিলনা, ইহা মাতার মনের অতি বিষম ক্লেশ। শশিপদবাবু জননীর এই ক্লেশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন মাতার মুখ মলিন দেখিলে অথবা তাঁহার চক্ষে জল দেখিলে তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা লাগিত, ঐ সময় মাতার দুঃখের জন্য শশিপদবাবুকে অনেক দিন মলিন ও বিষণ্ণভাবে দিন কাটাইতে হইয়াছিল। এই সকল কারণে শশিপদবাবু উচ্চশিক্ষা পাইতে পারেন নাই, এণ্ট্রান্স অবধি পড়িয়াই তাঁহাকে চাকুরী করিতে হইল। এই অল্পবয়সেই তিনি সামান্য কাশীপুর স্কুলে ৮৲ টাকা বেতনে স্কুলমাষ্টারি করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। শশিপদবাবু মাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। শশিপদ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অতি সমারোহে জননীর শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া শশিপদবাবু জ্যেষ্ঠকে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাহা না শুনিয়া ঋণ করিয়া মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ করিলেন। শ্রাদ্ধের পরেই শশিপদবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা লোকান্তরিত হন। এই সময়ে শশিপদবাবু কিরূপ বিপদ গ্রস্ত! সংসারে এখন তিনি একাকী, একে মাতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, তাহাতে সংসারের ভার তাঁহার মস্তকে! তাঁহার আয় ষোল টাকা মাত্র; এই সময়ে তিনি সালকিয়া স্কুলের শিক্ষক ছিলেন—পরিবার অনেকগুলি, তাঁহাতে মাতৃশ্রাদ্ধের সমস্ত ঋণ তাঁহার উপরে। শশিপদবাবু এই বিপদের সময়ে ধীর, অটল, ঈশ্বরবিশ্বাসী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ।

অল্পবয়স্ক শশিপদবাবু ষোলটাকা আয়ের উপরে নির্ভর করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। পোষ্য পরিবার ছয়সাতটি, বাটী ভগ্নপ্রায়, মাতৃ-শ্রাদ্ধের নগদ দেনা সাতশত টাকা এবং দোকান দেনা। এই ঋণ পরিশোধের কোনও উপায় নাই; কোনও সংস্থান নাই, আয় যাহা, তাহাতে অতগুলি পরিবার প্রতিপালন করা অসম্ভব! কিন্তু এই পরিবার প্রতিপালনের এবং সমস্ত দেনার ভার তাঁহার মস্তকে পড়িল। শশিপদবাবুর হৃদয়ের বল কিরূপ তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, এরূপ গুরুতর বিপদে কত প্রবীণ জ্ঞানী লোকের মন ভাঙ্গিয়া যায়; এত বড় বিপদের আঘাত অনেকেই সহ্য করিতে পারে না, কত মানুষ জন্মের মত নষ্ট হইয়া যায়, সত্যপথে, স্থিরপথে, কর্ত্তব্যের পথে অনেকেই দাঁড়াইতে পারে না। অনেকেই ভ্রাতার ঋণ বলিয়া ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করিতে সম্মতই হয় না। শশিপদ বাবু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি সেই সময়ে কেবল প্রাণধারণোপযোগী আহারের ব্যবস্থা করিলেন, এইরূপ ক্লেশে কাল-যাপন করিয়া ক্রমে সকল ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে পীতাম্বর গাঙ্গুলী, শশিপদবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ৩০০৲ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর একদিন শশিপদবাবু কোন কার্য্যোপলক্ষে পীতাম্বরবাবুর কনিষ্ঠ কিশোরীমোহন গাঙ্গুলীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ে দেখেন পীতাম্বর গাঙ্গুলী ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতেছেন। একটু পরেই তিনি চাকরকে বাহিরের দরজা বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া শশিপদবাবুকে বলিলেন "তুমি এখনি ৩০০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দাও; না দিলে দরজা খুলিব না।" শশিপদবাবু তৎক্ষণাৎ তাহা লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। অল্প বয়সেই এই অপমান তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। যাহা

হউক ভগবানের কৃপায় শশিপদবাবু ক্রমে ক্রমে ঐ ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এই অবস্থায় শশিপদবাবু দীর্ঘকাল শুধু কলাইএর দাল ও ভাত খাইয়া দিন কাটাইতেন। ৪।৫ দিন অন্তর কাঁচকলা ভাজা খাইতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি বিপদে যিনি স্থির, ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ থাকিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরের কৃপা অনুভব করেন, শশিপদবাবু এই ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াও কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করেন নাই, কষ্টে পড়িয়াও সত্যপথ হইতে বিচলিত হয়েন নাই, তাই তিনি ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন। ঐরূপ বয়সে ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া শশিপদবাবুর ন্যায় স্থির থাকিতে পারেন এরূপ লোক সচরাচর দেখা যায় না। এমন অল্পবয়স্ক বাঙ্গালী যুবক কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? যিনি মাসে ষোল টাকা উপায় করেন এবং সেই অর্থে বিধবা ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতৃকন্যা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিকে প্রতিপালন করেন; আবার তাহা হইতে সঞ্চয় করিয়া দেনা পরি-শোধ করিতে পারেন? দেনা ভাইয়ের; পরিবার—বিধবা ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি, বাঙ্গালী পাঠক! একবার চিন্তা করুন! একজন যুবা তাহার স্বোপার্জ্জিত ষোলটাকা নিজের ভাল খাবার ভাল পোষাকের জন্য ব্যয় না করিয়া, বিধবা ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি পরিবার প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করিতে পারেন, এবং অল্প বয়স্কা স্ত্রীর সাবান পমেটম প্রভৃতি বিলাসোপকরণের দ্রব্য না কিনিয়া ভ্রাতৃকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন? এত ক্লেশ কে স্বীকার করে? যিনি এই সকল ক্লেশ স্বীকার করিতে পারেন, তিনিই ভগবানের কৃপা অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটে ভগবানের কৃপা দিন দিন উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হয়। দুঃখ বিপদরূপ পরীক্ষায় যিনি যত উত্তীর্ণ হন, সত্যের আলোক তত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়। শশিপদবাবু বাল্যকাল হইতে দুঃসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিন দিন সত্যালোকের নিকটবর্ত্তী হইতে

লাগিলেন, দিন দিন ভগবানের দয়ায় বিশ্বাস গাঢ়তর হইতে লাগিল এবং প্রার্থনাশীলতার ভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেন। ইহাতে তাঁহার উপরে নূতন রকমের বিপদ আসিতে লাগিল। এতদিন শোকতাপ ও অর্থক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, এখন তাহার উপরে আত্মীয়স্বজনের এবং দেশের লোক কর্ত্তৃক উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন। সেই তুমুল সংগ্রামে বড় বড় যোদ্ধারাও পৃষ্ঠভঙ্গ দেন, কিন্তু শশিপদবাবু একাকী সেই সকল দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অটলভাবে আপনার কর্ত্তব্যপথে দণ্ডায়মান ছিলেন।

কার্য্যই শশিপদবাবুর প্রাণ, তিনি কার্য্যকে তাঁহার প্রথম সন্তান বলিয়া জানিতেন, কার্য্যের ব্যাঘাত বা বিঘ্ন তাঁহার নিকটে ঘোর বিপত্তি, তিনি আর কোনও ঘটনাকে তত বিপদ বলিয়া মনে করেন না, কার্য্যের ব্যাঘাতকে যত বিপদ মনে করেন। তিনি আর কোনও ক্লেশে তত আঘাত প্রাপ্ত হন না, কার্য্যের বিঘ্ন জন্য ক্লেশে যত মর্ম্মাহত হন। তিনি নিয়ত কার্য্যরত; সমাজসংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি কার্য্যই তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি যখন যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তখনি সেই কার্য্যে যেন সয়তান কৃত বাধা উপস্থিত হইয়াছে, কতবার কার্য্য ধ্বংশ হইয়াছে, ইহার জন্য কতবার কত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, পরিশেষে ভগবানের কৃপার জয় হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, কত চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইবার পর সয়তানের আক্রমণে সেই বালিকা বিদ্যালয় গৃহ হইতে বিতাড়িত ও নানা অসুবিধায় নিপতিত হইল। এইবারে শশিপদবাবুর অন্তঃস্থলে আঘাত লাগিল, বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে যে সকল ক্লেশ করিয়াছিলেন, যে সকল বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সে সকলে তিনি কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করেন নাই, কিন্তু

এইবার তিনি বড় কষ্ট পাইলেন, এই কষ্ট অধিক দিন স্থায়ী হইল না, পুনর্ব্বার স্কুল নূতন গৃহের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল, ভগবানের কৃপার জয় হইল। শশিপদবাবু শ্রমজীবীদিগের শিক্ষার জন্যে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, এদিকে নৈশবিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গৃহ না থাকাতে, অত্যন্ত অসুবিধা উপস্থিত হইল. দুদিন এখানে, দুদিন সেখানে স্কুল হওয়াতে স্কুলের কার্য্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তখন শশিপদবাবু পাটের কলবাড়ির সাহেবদিগকে অনেক অনুনয় বাক্যে নাইট স্কুলের জন্য একটি ঘর করিয়া দিতে বলিলেন, শশিপদবাবুর আন্তরিক অনুরোধে সাহেবেরা কলবাড়ীর মধ্যে বৃহৎ একখানি ঘর প্রস্তুত করাইয়া দিলেন. সেই গৃহে স্বচ্ছন্দে নাইট স্কুলের কার্য্য হইতে লাগিল। এদিকে সৎকার্য্য ধ্বংশকারী সয়তানের তাহা সহ্য হইল না, সয়তান বলিল "বটে! আমি থাকিতে এদেশে সৎকার্য্য প্রতিষ্ঠা ? তাহা কখনই হইবে না" এইরূপ সয়তানের চেষ্টাতেই যেন কলের চিমনী হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া নাইট স্কুলের ঘরের চালে পড়িল, তাহাতেই গৃহের চাল জ্বলিয়া উঠিল, এবং তাহাতেই গৃহখানি পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইল। শশিপদবাবুর ক্লেশের সীমা রহিল না। তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া স্কুলের গৃহের জন্য আবার উদ্যুক্ত হইলেন, তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে কলবাড়ির সাহেবেরা টীনের ছাদ করিয়া বৃহৎ ও সুন্দর ঘর করিয়া দিলেন। নাইট স্কুল নির্ব্বিঘ্নে সেই গৃহে চলিতে লাগিল, ভগবানের কৃপার জয় হইল। এই সময় শশিপদবাবু কার্য্যের জন্য স্থানান্তরে গমন করেন, তাঁহার বিদেশে অবস্থানকালে আবার সেই পূর্ব্বপরিচিত সয়তান সাহেবদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া বাধ্য করিল, যাঁহারা নাইটস্কুলের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারাই সয়তানের পরামর্শে সেই গৃহ হইতে নাইটস্কুল, লাইব্রেরী সভাসমিতি প্রভৃতি উঠাইয়া

দিলেন ; এবং গৃহটিকে গুদামঘর করিলেন। শশিপদবাবু এই সংবাদ পাইয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। বালিকাবিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, সাধারণ হিতকারী সভা প্রভৃতির জন্য একটি স্থায়ী পাকা গৃহ স্থাপনের সংকল্প করিলেন, ঈদৃশ একটী গৃহের জন্য তাঁহার বহু যত্নে অনুষ্ঠিত কার্য্যের ব্যাঘাতে তিনি বারংবার অত্যন্ত ক্লেশ ও নিগ্রহ ভোগ করিতেছিলেন, এখন সেইরূপ একটি গৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। অনেক চেষ্টা ও অদম্য পরিশ্রমে অর্থসংগ্রহ করিয়া এবং নিজে বহু অর্থ দিয়া বরাহনগর ইনষ্টিটিউট হল নামক একটি সুবৃহৎ হল নির্ম্মিত করিলেন। ঐ ইনষ্টিটিউট হল নির্ম্মাণের জন্য শশিপদবাবু যখন বিলাতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন তখন সেখানে তাঁহার কোনও বাঙ্গালী বন্ধু উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহার সেই চেষ্টাতেও বাধা দিয়াছিলেন, একজন পদস্থ বাঙ্গালীর বাধাতে শশি-পদবাবুর চেষ্টা বিফল হয় নাই, তাহাতেও তিনি ভগবানের কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন। সেই সুন্দর সুপ্রশস্ত গৃহে বালিকাবিদ্যালয় ও নৈশবিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে হইতে লাগিল, এত-দিন পরে শশিপদবাবু নিশ্চিন্ত হইলেন, সকল সাধুকার্য্যের সহায় ভগবানের কৃপার চিরজয় হইল। এই পৃথিবীতে এক রকম লোক দেখা যায়, যাঁহারা সকল বিষয়েই সুবিধা পান, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহাই সহজে সুসিদ্ধ হয়, বিনা কষ্টে ও বিনা পরিশ্রমে তাঁহারা কার্য্যের ফলভোগ করেন, তাঁহাদের কার্য্যে কোনও বাধা বিঘ্ন আসে না, ইহাদিগকে ভাগ্যবান লোক বলে, আর একরকম লোক আছেন, তাঁহারা সকল কার্য্যেই বাধাবিঘ্ন প্রাপ্ত হন, কিছুতেই সুবিধা পান না, ভগবান যেন ইহাদিগকে কঠোর পরীক্ষার যন্ত্রে পেষিত করিতে থাকেন, ইহাঁরা যে হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহাতেই বাধা ও বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, বাধার উপরে বাধা বিঘ্নের উপরে বিঘ্ন ; যাঁহারা

প্রথমে ভয় পাইয়া নিরস্ত হন, তাঁহারা চিরদিনের মত অকৃতকার্য্য হইলেন, যাঁহারা তুফানে পতিত হইয়াও হাল পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারা বহুকষ্টে ও বহুপরিশ্রমে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অভীষ্ট বস্তু সয়তান কর্ত্তৃক অপহৃত হইলেও ভগবানের কৃপায় তাহা তাঁহাদিগের করতলে আসিয়া উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস মহা-ভারত ও পুরাণে ঐরূপ বিধাতা কর্ত্তৃক পরীক্ষিত মানবের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, নিষধ দেশাধিপতি নলরাজা কলির (অর্থাৎ সয়তানের) আক্রমণে রাজ্যচ্যুত হইলেন, ঐশ্বর্য্য, ধনরত্ন সমুদায় অপহৃত হইল পরিশেষে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী দময়ন্তীর নিকট হইতেও দূরে বিচ্ছিন্ন হইলেন, এইরূপ কলি কর্ত্তৃক তিনি কত ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও দিন অপরের সাহায্যপ্রার্থী হন নাই, অযোধ্যার রাজগৃহে দাসত্ব করিয়াছেন, তথাপি বিদর্ভরাজ শ্বশুরের শরণাপন্ন হন নাই, বস্ত্রহীন অবস্থায় পতিত হইয়াও অবস্থোন্নতির জন্য একবারও পাপপথে পদার্পণ করেন নাই, শেষে ভগবানের কৃপা তাঁহাকে সেই অপহৃত রাজ্য, সম্পদ, ধনরত্ন সমুদয় দেওয়াইয়া ছিলেন, দময়ন্তীর সহিত সম্মিলিত হইলেন। যাহা যাহা গিয়াছিল সে সমু-দয়ই ফিরিয়া পাইলেন। যাঁহারা বিপদকে মাথা পাতিয়া লইতে পারেন, এবং তাহার ভারে পতিত বা বিচলিত হন না, স্বর্গের পুরস্কার তাঁহাদের এইরূপেই প্রাপ্য। তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শশিপদবাবুও যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহাতেই অনেক বাধা ও বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, ভগবানের কৃপায় শেষে সকল বাধা অপসৃত হইয়াছে। সয়তান যেন শশিপদবাবুর হস্ত হইতে অনেক অভীষ্ট বস্তু কাড়িয়া লইয়াছে, কিছুদিনের পর ভগবানের কৃপা আবার সেই বস্তু তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়াছে। যাহা দূরে গিয়াছিল, তাহা ভগবানের কৃপায় আবার নিকটে পাইয়াছেন, যাহা আর পাইবার আশা ছিল না

তাহা আবার নিকটে পাইয়াছেন,আমরা এখানে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শশিপদবাবু অনেক চেষ্টা ও যত্নে তাঁহার ভগিনী ও বিধবা ভাগিনেয়ীকে নিজগৃহে আনিলেন, সয়তান তাহাদিগকে শশিপদবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার গৃহ হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল, কোথা লইয়া গেল তাহার স্থিরতা নাই. একেবারে দেশছাড়া করিল। শশিপদবাবু কিছুদিনের পর জানিতে পারিলেন যে তাহারা কাশীধামে আছেন। কিছুদিন পরে তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন, ভগবানের কৃপার জয় হইল। শশিপদবাবুর ভাগিনেয়ী কুসুমকুমারীর বিবাহের পরে বরাহনগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, শশিপদবাবুর নিন্দা ও কুৎসার কোলাহলে বরাহনগর পূর্ণ হইল। যাঁহারা বিপক্ষ তাঁহারা এই সময়ে শশিপদবাবুর উপরে খুব আক্রমণ করিলেন, মনের সাধে শশি-পদবাবুকে গালি দিতে লাগিলেন, যাঁহারা স্বপক্ষ ছিলেন তাঁহারাও বিপক্ষের দলে মিশিলেন. এইরূপ গ্রামশুদ্ধ লোক একত্র হইয়া শশিপদবাবুকে অপদস্থ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। শশিপদবাবু বরাহনগর-সামাজিক-উন্নতি সভার সম্পাদক ছিলেন, সেই বৎসর বাৎসরিক অধিবেশনের সময় গ্রামস্থ সকলে শশিপদবাবুকে সম্পা-দকের পদ হইতে চ্যুত করিলেন। সয়তান কুসুমকুমারীকে স্থানান্ত-রিত করিয়াছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই কুসুমকুমারী পুনর্ব্বার শশিপদবাবুর নিকট আসিয়া বিবাহিত হইলেন, সয়তান পরাস্ত হইল। সেদিকে আর কিছু করিতে না পারিয়া অন্য প্রকারে শশিপদবাবুকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ভগবানের কৃপার কাছে সয়তানের সয়তানি আর কতদিন থাকিবে, দেশের লোকের চৈতন্য হইল। শশিপদবাবুর সদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রতি দেশের লোকের মনের ভাব ফিরিতে লাগিল। এক বৎসর পরে উক্ত সভার বাৎসরিক অধিবেশন সময়ে, যাঁহারা শশিপদবাবুকে পদচ্যুত করিয়া-

ছিলেন, তাঁহারাই আবার শশিপদবাবুকে সেই সভার সম্পাদকের পদে বরণ করিলেন, ভগবানের কৃপার জয় হইল। আর একবার সয়তান, শশিপদবাবুকে বাস্তুগৃহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। কোন বন্ধু শশিপদ বাবুর নিকট কিছু টাকা গচ্ছিত রাখেন, সেই টাকা কেহ অপহরণ করে। শশিপদবাবু সেই ঋণদায়ের জন্য বরাহনগরে বসতবাটী বিক্রয় করিয়া ফেলেন, সুতরাং বরাহনগরের বাটি হইতে তিনি একেবারে নিঃস্বত্ত হইলেন। এই সময় তিনি কলিকাতায় থাকিতেন, কিন্তু বরাহনগরই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্র, তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভগবানের আদেশেই কলিকাতা হইতে বরাহনগরে প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে বরাহনগরের নিজবাটি হস্তান্তরিত, থাকিবেন কোথায় তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু ভগবানের আদেশ পালনের জন্য এবং কার্য্যের অনুরোধে সকল অসুবিধা সহ্য করিয়া ইনষ্টিটিউটহলের পার্শ্বে একটা ছোট কুঠারি আছে, তাহাতেই এবং পার্শ্বে একটি চালাঘর বাঁধিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। যখন শশিপদবাবু হলের পার্শ্বে বাস করিতেছেন, তখন বরাহনগরের কেহ কেহ শশিপদবাবু ইনষ্টিটিউটহল আত্মসাৎ করিয়া লইতেছেন বলিয়া সংবাদপত্রে অপবাদ রটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, যিনি শশিপদবাবুর বাটি ক্রয় করিয়াছিলেন, ভগবান তাঁহাকে সুস্থির হইতে দিলেন না, তাই তিনি স্বয়ং উপযাচক হইয়া আসিয়া শশিপদবাবুকে সেই বাটি বিক্রয় করিলেন। তাঁহার অর্থের অনাটন ছিল না, বরং তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল, শশিপদবাবুর বাটি ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিবার কোন কারণ ছিল না, কিন্তু ভগবানের বিধানে শশিপদবাবু পুনর্ব্বার নিজবাটি ফিরিয়া পাইলেন, সয়তান যে বাটি একেবারে হস্তান্তরিত করিয়াছিল, যাহা ফিরিয়া পাইবার কোন আশা ছিল না, ভগবানের কৃপায় তিনি সেই বাটি পুনর্ব্বার পাইলেন। ভগবানের কৃপার জয় হইল।

কুসুমের বিবাহের পরে শশিপদবাবুর জ্ঞাতি স্বজনেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইলেন, এমন কি তাঁহার সহোদর ভ্রাতাও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভ্রাতৃভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। আত্মীয় স্বজনদিগের সহিত মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইল। কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইল, ক্রমে তাহাদের মনের সেই ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, শশিপদ বাবুর সদ্ব্যবহারে ও সহানুভূতিতে আত্মীয়স্বজনদিগের সহিত পুনর্ব্বার সদ্ভাব সঞ্চারিত হইল, যে ভাই বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, সেই ভাই সদ্ভাবের সহিত মিলিত হইল, বালক বৃদ্ধ বণিতা সকলের অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইল। সয়তান শশিপদবাবুর আত্মীয়স্বজনদিগের মনের সদ্‌ভাব অপহরণ করিয়াছিল, বাহিরের ধনমান অপেক্ষা স্বজনের প্রীতি অনেক মূল্যবান, সয়তান শশিপদবাবুর সেই বস্তুও নষ্ট করিয়াছিল, ভগবানের কৃপায় তিনি পুনর্ব্বার সেই আত্মীয়স্বজনদিগের অমূল্য আত্মীয়তা প্রাপ্ত হইলেন, শশিপদবাবু সেই হারাণ সদ্ভাব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অশেষ প্রীতি ও আনন্দের সহিত ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এবং ভগবানের কৃপার জয় গাইতে লাগিলেন।

শশিপদবাবু ১৮৭৩ সালে একবার মহিলা বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বহু যত্নে মহিলা বিদ্যালয়ের সব স্থির হইয়া গেল, গভর্ণমেণ্ট সাহায্য মাসিক ৭৫ টাকা মঞ্জুর হইল, এমন সময় সয়তান আসিয়া পোষ্টআফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাকরির প্রলোভনে ভুলাইয়া শশিপদবাবুকে স্থানান্তরিত করিল, উক্ত সদিচ্ছা আর সম্পন্ন করিতে দিল না। কিছুদিন পরেই ভগবানের কৃপার জয় হইল; সয়তান যে চাকরির জন্য শশিপদবাবুকে বরাহনগর হইতে লইয়া গিয়াছিল ভগবানের কৃপায় শশিপদবাবু সেই চাকরি ছাড়িয়া দিয়া ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্র বরাহনগরে পুনরায় আসিলেন, এবং ১৮৮৭ সালে সেই পূর্ব্ব সদিচ্ছা পূর্ণ করিলেন। আত্মীয় স্বজন ও

বন্ধুবান্ধবদিগের নিষেধ অবহেলা করিয়া সয়তানের ভয় ও বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বিধবাশ্রম ও মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, এবারেও সয়তান যথেষ্ঠ বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সে সমুদয় ভগবানের কৃপার নিকট পরাজিত হইল। ১৮৯০ সালে গবর্ণমেণ্ট সেই ৭৫৲ টাকা বরহানগর মহিলা বিদ্যালয়ে সাহায্য মঞ্জুর করিলেন, ভগবান বলিলেন এই লও তোমার সেই ৭৫৲ টাকা। সয়তান যে ধন অপহরণ করিয়াছিল ভগবানের কৃপায় শশিপদবাবু সেই অপহৃত ধন ফিরিয়া পাইলেন। ভগবানের কৃপার জয় হইল। এই মহতী সদিচ্ছা পূর্ণ করিতে কত দিন গেল, কত কষ্টভোগ করিতে হইল, সয়তান বিপক্ষ হইয়া কত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করিল, শশিপদবাবুকে স্থানচ্যুত করিল, আত্মীয় স্বজনেরা ঐ সৎকার্য্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, কিন্তু ভগবানের কৃপার জয় হইবেই হইবে, শেষে সেই কৃপারই জয় হইল। সয়তান ছাড়িয়াও ছাড়ে না সে সৎকার্য্যের পশ্চাতে লাগিয়াই থাকে, একবার দূরে যায় আবার সুযোগ পাইলেই নিকটে আসে। সয়তান শশিপদবাবুর বিধবাশ্রম স্থাপন সময়ে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপার নিকট পরাস্ত হইল, তাঁহার কৃপায় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু সয়তান তাহার পাশে পাশে থাকিয়া বাধা দিতে লাগিল। বিধবা লইয়াই বিধবাশ্রম, সয়তান দেখিল এই বিধবাকে বিধবাশ্রমে যাইতে না দিলেই, বিধবাশ্রম থাকিবে না। যে বিধবা বিধবাশ্রমে আসিতে চাহিবে, তাহাকে পথ হইতে কাড়িয়া লইব, সয়তান এইরূপ স্থির করিয়া পথ আগলাইয়া রহিল।

একটি হৃদয়বান ভদ্রলোক পশ্চিমাঞ্চলে কার্য্য উপলক্ষে বাস করেন, তাঁহার অল্পবয়স্কা একটি বিধবা ভগিনী শিলেটে থাকেন। ১৮৮৭ সালে উক্ত সহৃদয় ভ্রাতা তাঁহার ভগিনীকে বরাহনগর বিধবা-

শ্রমে রাখিবার ইচ্ছা করেন, এবং পত্রের দ্বারা শশিপদবাবুকে সেই ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন, শেষে তাঁহার ভগিনীকে বিধবাশ্রমে রাখাই স্থির হইল। তিনি পশ্চিমাঞ্চল হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত শিলেটে ভগিনীকে আনিতে গেলেন, শিলেট হইতে ভগিনীকে লইয়া প্রথমে কলিকাতায় কোন বন্ধুর আবাসে উপনীত হইলেন, কলিকাতা হইতে বরাহনগরে আসিবেন সব স্থির, কিন্তু সেখানে সয়তান সব গোলমাল করিয়া দিল। তাঁহার ভগিনীকে বরাহনগর বিধবাশ্রমে রাখিতে দিল না, ভ্রাতা কি করেন ভগিনীকে কলিকাতায় রাখিয়া যাইতে পারেন না, এদিকে তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া গেল, সয়তানের ষড়যন্ত্রে উক্ত ভদ্রলোক মহা বিপদে পড়িলেন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইল না; অগত্যা তাঁহাকে ভগিনী সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থানে যাইতে হইল। ঐ বিধবাটিকে সয়তান পথ হইতে ফিরাইয়া দিল, বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল। কিন্তু ভগবান যাহাকে বিধবাশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন, সয়তান তাহাকে আর কতদিন ধরিয়া রাখিবে, ১৮৯০ সালে সেই বিধবা পুনর্ব্বার বরাহনগর বিধবাশ্রমে আসিল, এই আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষা পাইল, উপযুক্ত, সুশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তির সহিত তাহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল, ভগবানের লীলার জয় হইল। ১৮৮৮ সালে পাবনা জেলা হইতে দুইটি বিধবার বরাহ-নগর বিধবাশ্রমে আসিবার কথা হইল, তাহাদের অভিভাবক পত্রের দ্বারা শশিপদবাবুকে সকল বিষয় জানাইলেন, শশিপদবাবুও পত্রের দ্বারা জ্ঞাত করাইলেন, তাহাদের আগমন স্থির হইল, তাঁহারা যাত্রা করিলেন বলিয়া লিখিলেন, এদিকে তাঁহাদের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া শশিপদবাবু তাঁহাদের সন্ধান লইতে গিয়া জানিলেন, যে তাহারা সেখান হইতে অন্যস্থানে গিয়াছেন। সয়তান তাহাদিগকে পথ হইতে অন্যস্থানে ডাকিয়া লইয়া গেল। কিছুদিন পরে ১৮৯০ সালে ভগবান

সেই দুইটি বিধবাকে বরাহনগর বিধবাশ্রমে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। এই আশ্রমে থাকিয়া তাহারা শিক্ষা পাইয়াছে। তাহাদের সমস্ত ব্যয় আশ্রম হইতেই দেওয়া হইয়াছে। বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় শশিপদবাবুর যে সকল বন্ধুগণ বিপক্ষ হইয়াছিলেন, ভগবান তাঁহাদিগকে পরে স্বপক্ষ করিয়া দিলেন। তাঁহাদেরই বাটী হইতে কুমারী ও বিধবা বরাহনগর আশ্রমে আসিয়াছিল এবং তাহারা এস্থানে শিক্ষা পাইয়া একজন যথা সময়ে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীতা হইয়া সুখে সংসার ধর্ম্ম করিতেছে, আর একজন শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছে, এখানেও ভগবানের লীলার জয় দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য শশিপদবাবু মেয়েদের লিখিত ও পরিচালিত একখানি মাসিক পত্রিকার অভাব দেখিয়া সেই অভাব মোচনের নিমিত্ত স্বীয় কন্যাদিগকে উক্ত পরিচালন কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া শিক্ষিত করেন। শশিপদবাবুর কন্যা কয়েকটী শিক্ষিতা হইলেন এবং ১৮৯৭ সালে শশিপদবাবু "বঙ্গগৃহ" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত করিতে ও প্রচার করিতে মনস্থঃ করেন; তিনি যে সময়ে ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহার অল্পদিন পরেই "বঙ্গগৃহ" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রচারের বিজ্ঞাপন কলিকাতায় বাহির হয়, শশিপদবাবু সেই বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাঁহার সঙ্কল্পিত বঙ্গগৃহ নাম পরিত্যাগ করিলেন, যদিও বঙ্গগৃহ নামক কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি বিজ্ঞাপনের দ্বারা উহার নূতনত্ব হানি করিয়াছে বলিয়া উক্ত নাম আর গ্রহণ করেন নাই। এই ব্যাঘাতে কিছুদিন বিলম্ব ঘটিল, পরে "অন্তঃপুর" নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র মাসিকপত্রিকা প্রচার করিতে তাঁহার মধ্যম কন্যাকে বলিলেন। শশিপদবাবুর মধ্যম জামাতা তাহাতে অসম্মত হইলেন, শশিপদবাবুর এই অভীষ্ট কার্য্যে সয়তান এইরূপ বাধা দিতে লাগিল, তাঁহার মধ্যম কন্যা উক্ত পত্রের

সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না, স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়া কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া পিতার কথায় নিরুত্তর থাকিতেন। এই ঘটনার বিবরণ এই—বনলতার স্বামী একজন শিক্ষিত উৎসাহী যুবা এবং সৎকার্য্যের অনুরাগী, তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিবেন, তিনি স্বয়ং যে সকল (সংকল্পিত) কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন তাঁহার স্ত্রী সেই সকল কার্য্যের সহায় হইবেন এই কারণেই তিনি স্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। বনলতা দেবী ইহাতে উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। একদিকে পিতৃভক্তি, অপরদিকে স্বামীভক্তি, স্বামীর আদেশ পালন করাই সাধ্বীস্ত্রীর কর্ত্তব্য। শশিপদবাবু এই কার্য্যের ব্যাঘাতে ব্যথিত হইয়া তৃতীয়কন্যা শ্রীমতী উষাবালা দেবীকে সম্পাদিকা করিয়া ১৮৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে "অন্তঃপুর" পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ভগবানের কৃপায় শশিপদবাবুর সংকল্প সিদ্ধ হইল। "অন্তঃপুর" মহিলা-দিগের দ্বারাই পরিচালিত হইতে লাগিল। সাত আট মাস পরে তাঁহার তৃতীয়কন্যা বিবাহিতা হইয়া বোম্বাই প্রদেশে স্বামীগৃহে গমন করিলে তাঁহার মধ্যমা কন্যা বনলতাদেবী স্বতঃই "অন্তঃপুরের" সম্পাদকীয়ভার গ্রহণ করিলেন, অবশ্য তখন তাঁহার স্বামী সম্মত হইয়াছিলেন। এখন তিনিই সেই "অন্তঃপুরের" সম্পাদিকা, তাঁহার স্বামীও "অন্তঃপুরের" প্রচারের জন্য যথেষ্ঠ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় "অন্তঃপুরের" দিনদিন উন্নতি হইতে লাগিল। শশিপদবাবু এই কার্য্যটিতেও ভগবানের কৃপার জয় প্রত্যক্ষ করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন।*

শশিপদবাবু, সমস্তজীবনে, সমস্তঘটনায় ঐরূপ ভগবানের মঙ্গল-

* এই প্রবন্ধটি যখন লিখিত হয় সে সময়ে অন্তঃপুর পত্র পরিচালিত হইতেছিল। এখন নানা কারণে এই পত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

হস্ত ও ভগবানের কৃপা অনুভব করিয়াছেন, এস্থানে অনেক ঘটনার উল্লেখ করা গেল না। যাহাতে তিনি ঐরূপ দুঃখের মধ্যে বিপদের মধ্যে ভগবানের মঙ্গলহস্ত বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, বিঘ্ন-পরিপূর্ণ অন্ধকারের মধ্যেও ভগবানের কৃপার আলোক দর্শন করিয়াছেন, ইহলোকে পাপ-সয়তান যেমন তাঁহার কিছুই করিতে পারে নাই, তাহাদের প্ররোচনায় ও ভয়প্রদর্শনে যেমন তিনি নির্ভীক ও অটল থাকিয়া পদেপদে ভগবানের কৃপা অনুভব করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার স্থিরবিশ্বাস যে পরলোকেও তাঁহার কৃপালাভ করিবেন, সয়তান তাঁহার শোণিতবিন্দু শোষণ করিয়া করিয়া যখন তাঁহার দেহ ক্ষয় করিবে, তখনও ভগবানের কৃপায় নবজীবন পাইয়া পাপশূন্য অন্ধকারশূন্য, ভয়শূন্য নিত্য আনন্দধামে নিয়ত তাঁহার কৃপা অনুভব করিবেন, এবং যে সকল প্রিয় ও প্রাণের ধনসকলকে জীবদ্দশায় হারাইয়াছেন, পরলোকে তাহাদিগকে পাইয়া আনন্দে ব্রহ্মকৃপার জয়গান করিবেন। ইহলোকে ভগবানের লীলায় জয় এবং পরলোকে তাঁহারই কৃপার জয়।"

পণ্ডিত শিরোরত্ন মহাশয় কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হইতে শশিপদ বাবুর সমগ্রজীবনের বিচিত্রঘটনা পুঞ্জের অন্তরালে যে ঐক্য বা যোগসূত্র রহিয়াছে, অথবা শশিপদবাবু তাঁহার সমগ্রজীবনের ঘটনা ও পরিবর্ত্তনপুঞ্জের মধ্যে যে ঐক্য অনুভব করিয়াছেন তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য এই একত্ব অনুভব করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। জীবন-ধারণ করিয়া সংসারের বিবিধ পরিবর্ত্তন ও ঘাত প্রতিঘাতের তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইয়া যদ্যপি এই একত্বটুকু উপলব্ধি করিতে না পারা যায় তাহাহইলে জীবন ধারণ বিফল পরিশ্রমমাত্র। দুঃখে যিনি কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়েন, তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় তিনি সত্য দেখিতে পান না। দুঃখে

কাতর না হইয়া যিনি বীরের মত দৃঢ়চিত্তে সেই দুঃখের সহিত প্রফুল্ল-ভাবে যুদ্ধ করেন তাঁহার মধ্যে ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়। সত্ত্বগুণের স্বভাব উজ্জ্বলতা ও নির্ম্মলতা। সত্ত্বগুণে চিত্ত অবস্থিত হইলেই প্রকৃত জ্ঞানের সাহায্যে বা প্রজ্ঞালোকে সেই পরমার্থ সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটে এবং যে সুখ ভগবদ্গীতার মতে আত্যন্তিক, বুদ্ধিগ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় তাহা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রাচীন শাস্ত্র ও সাধুগণের অভিজ্ঞতার নিকট জানা যায় ইহাই জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি। লীলা-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ ও অভিভূত না হইয়া বীরের ন্যায় নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধ করিয়া সেই লীলাময়কে জানিতে হইবে ও তাঁহাকেই একমাত্র আপনার করিতে হইবে। এই যে শিক্ষা, শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর জীবনে আমরা তাহার সফলতা দেখিতে পাই। এইজন্যই তাঁহার জীবনবৃত্ত আলোচনা করা এই বহির্মুখ সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের দিনে এত বেশী প্রয়োজন। এই একত্বের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং একত্ব-বুদ্ধিকে দৃঢ় ও সবল করিয়া জীবন-যুদ্ধের অবসানে তাহাতে বিশ্রাম লাভ করাই হিন্দুর যাবতীয় সাধনার পরম লক্ষ্য। শাস্ত্র এই অবস্থাকেই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়াছেন। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং মনো যত্র প্রসীদতি।"

উপসংহার।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে একটি নবভাবের জাগরণ আসিয়াছে। ইহা বড়ই আশাপ্রদ। যাহাকে "মানবতার ধর্ম্ম" (Religion of Humanity) বলে, আমাদের প্রাচীনশাস্ত্রে তাহার উপদেশের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু শাস্ত্রের সকল কথাই সকল সময়ে মানবের বা সমাজের জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না। দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে শাস্ত্রের এক একটি উপদেশ মানবের সাধনায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসংঘের ইতিহাস আলোচনা করিলেই এই কথা বুঝিতে পারা যায়। এক সময়ে পর্ব্বতগুহায় নির্জ্জন সাধনা, এক সময়ে গৃহস্থাশ্রম, এক সময়ে জ্ঞান, আবার অন্য সময়ে ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাধকের হৃদয় ও মন আকর্ষণ করে। বর্ত্তমানযুগে জনসেবার আদর্শই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে কেবল আমাদের দেশে নহে পৃথিবীর সকল দেশেরই মানবের চিত্ত অধিকার করিতেছে। এই এক সমন্বয়ের ভূমি; মত লইয়া বিরোধ করিবার সময় নাই, কাহারও তাহাতে প্রবৃত্তিও নাই। কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মসংঘই সমস্ত সত্য অধিকার করিয়াছে এ প্রকারের কথা প্রচার করার দিনও চলিয়া গিয়াছে। এখন লোকে চায় জীবন, মিলন ও কর্ম্ম। দূরে বা সম্মুখে স্বর্গ বা সত্যযুগ এই একদলের মত, পশ্চাতে স্বর্গ বা সত্যযুগ এই আর একদলের মত—এখন বলা হইতেছে এখনই এইখানে সত্যযুগ, Act, act in the living present—এই যে নূতন ভাব, একমাত্র যাহা আমাদের নবযুগের সাধনা, তাহার সাহিত্য চাই। জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান দেশে অনেক হইয়াছে আরও অনেক হইবে, কিন্তু সে সকলের মর্ম্মকথা আমরা অনেকেই জানি না। যাঁহারা নানা অসুবিধার

মধ্য দিয়া এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ করেন তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন সেবাব্রতের পথ কেবল তাঁহারাই জানেন। বাহির হইতে দেখিতে বেশ, ধনবান যাঁহারা, তাঁহারা প্রচুর অর্থ দিতে পারেন, তাহাও বেশ, কিন্তু দারুণ উদ্বেগে কত বিনিদ্র রজনী সাধককে যাপন করিতে হয়, তিল তিল করিয়া আপনার হৃদয়রক্ত কি ভাবে দিতে হয়, কেমন করিয়া চিত্তবৃত্তিসমূহকে সর্ব্বদা অন্তর্মুখ করিয়া প্রেমের সাধনা করিতে হয়, এ সকল গুপ্ত কথা কি আমরা জানি? যাঁহারা করেন, অবশ্য সত্য করিয়া করেন, সমস্ত ভার নিজের মস্তকে লইয়া অসহায়-ভাবে একাকী সানুভূতি ও উপলব্ধিহীন সহচর লইয়া শত নৈরাশ্য ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আপনি আচরণ করিয়া অপরকে এই নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চান তাঁহারাই জানেন. এ পথ কেমন। এই গুপ্তপথের পরিচয় আজ জগতে ব্যক্ত হউক। দেশের যুবকগণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে, তাঁহারা জনসেবার সাধন লইতে ব্যগ্র, তাঁহাদের এই পথের সঙ্গে পরিচিত করিতে হইবে। বিদেশে অনেক সন্ধান আছে জনসেবকের জীবনকথা অনেক আছে, কিন্তু তাহার দ্বারা উপকার হইলেও সমগ্র অভাবের নিবৃত্তি হইবে না। দেশের মধ্যে যাঁহারা এই নবপথের সন্ধান পাইয়া এই পথে চিরজীবন চলিয়াছেন তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে সকলের মধ্যে প্রচারিত হউক। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বর্ত্তমান গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়। সেবাব্রত শশিপদবাবুর জীবনকথা বলিতে গ্রন্থ বৃহৎ হইয়া গেল। যে সমস্ত কথা বলিবার সঙ্কল্প ভূমিকায় করা গিয়াছিল তাহা হইল না।

এই নবভাবের একটা ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসের সহিত পরিচয় প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায় এই নবপথের কথা বলিয়া গিয়াছেন, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই পথেরই পথিক, আর্য্যসমাজ, থিওজফিক্যাল সোসাইটি, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতি, শিশিরকুমার

—বিজয়কৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত নব্যবৈষ্ণব আন্দোলন সমস্তেরই প্রাণের মধ্যে, প্রাণের প্রাণরূপে এই মহাসত্যের আদর্শ বিদ্যমান। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই ভাবের ভাবুক এই নব-মতের সাধক, তাঁহাদের উপদেশ ও শিক্ষার দ্বারা এই মতের দৃঢ়তা সাধন করা প্রয়োজন। এ সমস্ত মনীষি ও মহাপুরুষ বাহিরে অবান্তর বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচারক হইলেও এই সমন্বয়ের পথে বন্ধুভাবে একই পরমদেবতার উপাসকরূপে সকলেই দাঁড়াইয়া আছেন। বিভিন্নতার জনকোলাহল ভেদ করিয়া মিলনের শান্তিময় মন্দিরে মহাজীবনের যে উচ্চ আসন রহিয়াছে আমাদিগকে সেইখানে গিয়া বসিতে হইবে।

সুতরাং এই গ্রন্থ শেষ হইয়াও এখন শেষ হইলনা। অতি বৃহৎ গ্রন্থ অনেক সময়েই পাঠকের হৃদ্য হয় না, এই এক কারণ। তাহা ছাড়া শশিপদবাবুরও জীবন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বর্ণনা করিবার আছে, আর দেশের কথা, দেশের সাধনার কথা, বর্ত্তমান সাহিত্যে গতি, কেমন করিয়া এই পথে আসিতেছে সে কথা অপর এক গ্রে আলোচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়া এই গ্রন্থ এইখানেই শেষ করা গেল

বিশ্বমানবের একমাত্র লক্ষ্য যিনি, মানবের বিচিত্র সাধনার মধ্যে শক্তিরূপে জ্ঞানরূপে প্রেমরূপে যিনি মহামিলনের রাসস্থলীতে যুগ মন্বন্তর ও কল্পের মধ্য দিয়া কত সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্য দিয়া জগৎকে ল ইয়া যাইতেছেন, যাঁহার বাঁশরীর আহ্বানধ্বনি শাশ্বত, বর্ত্তমান সময় কোলাহল ভেদ করিয়াও যাঁহার বাঁশীর তান মিলনের আনন্দবার্ত্ত কীর্ত্তন করিতেছে, তিনি জয়যুক্ত হউন। সেই মিলনের দেবতা একজন সেবকের জীবনকথা অর্ঘ্যরূপে সেই পরমদেবতার চর অর্পিত হইল।

সূচীপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিষয় | পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

উপসংহার